# প্রান্তিক মানব

## পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুজীবনের কথা

প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী



প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস্ প্রাইভেট লিমিটেড

**প্রথম প্রকাশ** স্বাধীনতার ৫০তম বর্ষ, ১৯৯৭

**প্রকাশক**

প্রিয়ব্রত দেব

প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস্ প্রাইভেট লিমিটেড,

৭ জওহরলাল নেহরু রোড। কলকাতা—৭০০ ০১৩

**মুদ্রক**

প্রতিক্ষণ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড,

১২বি বেলেঘাটা রোড। কলকাতা—৭০০ ০১৫

**কৃতজ্ঞতা**

কালীপদ সেন

**প্রচ্ছদ**

গণেশ হালুই

# মুখবন্ধ

১৯৯০-এ আমার বই 'দ্য মার্জিনাল মেন' প্রকাশিত হয়। সারা ভারতের পত্রপত্রিকায় এবং ভারতের বাইরেও এই বই অভিনন্দিত হয়। ১৯৯৩-এ বইটি 'রবীন্দ্র স্মৃতি' পুরস্কারে সম্মানিত হয়। পাঠকসমাজে বইটি রীতিমত আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। দেশ ও বিদেশ থেকে বহু পাঠক-পাঠিকা বইটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে চিঠি দিয়েছে। অধিকাংশ চিঠিতেই বইটির একটি সংক্ষেপিত বাংলা সংস্করণ প্রকাশ করার অনুরোধ ছিল। তাদের বক্তব্য ছিল এই যে এই বইয়ের যারা নায়ক—বিপুল উদ্বাস্তু জনসমষ্টি—ইংরেজিতে লেখা বইটি তাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে।

'দ্য মার্জিনাল মেন'-এর বাংলা সংস্করণ অনেক আগেই প্রকাশ কবা উচিত ছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার ব্যাধিগ্রস্ত, জরায় আক্রান্ত অনিচ্ছুক শরীর দিয়ে এ কাজ করানো সহজ ছিল না। তা সত্ত্বেও প্রায় জবরদস্তি করেই বই-এর প্রায় অর্ধেকটা লিখে ফেলেছিলাম। তারপর শরীর জবাব দিল। ইতিমধ্যে আমার কৃতী ছাত্র শ্রীমান কালীপদ সেন বইটির অনুবাদ করে আমার কাছে নিয়ে আসেন। বই-এর অবশিষ্ট অংশ এই অনুবাদেরই সংক্ষেপিত, সংশোধিত ও পরিমার্জিত রূপ।

'দ্য মার্জিনাল মেন'-এ পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুদের দুঃসহ জীবনযন্ত্রণার ও আন্দোলনের কাহিনী বিবৃত। এই বই বাংলায় লেখাই স্বাভাবিক ছিল। একটি বিশেষ কারণে বইটি ইংরেজি ভাষায় লেখার প্রয়োজন বোধ করেছিলাম। এই বই-এর উপাদান সংগ্রহের জন্য যখন ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে উদ্বাস্তু ক্যাম্প ও কলোনি ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম তখন বাঙালি উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে অ-বাঙালির এমনকী সম্পন্ন বাঙালিদের মুখেও এই ধরণের অবজ্ঞাভরা উন্নাসিক উক্তি প্রায়ই শুনতে হত : কাদের নিয়ে বই লিখছেন আপনি! বাঙালি উদ্বাস্তুদের তো মানুষ বলেই মনে হয় না; এরা অলস, অকর্মণ্য, অপদার্থ। একবার পাঞ্জাবি উদ্বাস্তুদের দিকে তাকিয়ে দেখুন। তাহলেই পার্থক্যটা বুঝতে পারবেন। ওরা সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে। ওদের দেখে কে বলবে ওরা সব হারিয়ে পাকিস্তান থেকে চলে এসেছে। ওদের গা থেকে উদ্বাস্তু গন্ধ মুছে গেছে। ওরা এখন এদেশের সম্ভ্রান্ত, সম্পন্ন মানুষ।

প্রতিবাদ করার মতো উপাদান তখনো আমার হাতে ছিল না। তখনো ক্যাম্পে কলোনিতে, দিল্লি ও কলকাতায় মহাফেজখানা ও গ্রন্থাগারে আমি উদ্বাস্তুদের ইতিহাস রচনার উপাদান খুঁজছিলাম। যত দিন যেতে লাগল, যত বিভিন্ন তথ্য, দলিল ও কাগজপত্র আমার হাতে আসতে লাগল ততই একটি সত্য ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠল : পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা অলস, অকর্মণ্য বা অপদার্থ নয় তারা কেন্দ্রীয় সরকারের নির্মম অবহেলার শিকার। এই অবহেলা এমনই পক্ষপাতদুষ্ট ও ভয়ানক যে মনে হয় কেন্দ্রীয় সরকার উদ্বাস্তু বলতে পশ্চিম-পাকিস্তানি উদ্বাস্তুদের বুঝেছিল। পূর্ব-পাকিস্তানের উদ্বাস্তুরা আসলে উদ্বাস্তুই নয়, তাদের পুনর্বাসনের দায়িত্বও কেন্দ্রীয় সরকারের নয়। কেন্দ্রীয় সরকারের ঔদাসীন্য পূর্ববঙ্গের লক্ষ লক্ষ হৃতসর্বস্ব মানুষকে উদ্বাস্তু আশ্রয় শিবিরে পশুর জীবন যাপন করতে বাধ্য করেছে। এদের পুনর্বাসন দেওয়া হবে কি না সে বিষয়ে মনস্থির করতে কেন্দ্রীয় সরকারের ১০ বছর সময় লেগেছিল। এই ১০ বছরে ক্যাম্পের খাঁচায় আবদ্ধ মানুষগুলির মনুষ্যত্ব পুরোপুরি নিঃশেষিত হয়ে যায়।

পশ্চিম-পাকিস্তানি উদ্বাস্তুদের জন্য প্রায় সারা ভারতের ঐশ্বর্য ঢেলে দেওয়া হয়েছিল। তারা ক্ষতিপূরণ পেয়েছে, পাঞ্জাবের এবং ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের দেশত্যাগী মুসলমানদের সম্পত্তি পেয়েছে। ভারত সরকার তাদের জন্য আধুনিক শিল্পনগরী নির্মাণ করে দিয়েছে। পশ্চিম-পাকিস্তানে তারা যা ফেলে এসেছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি তারা পেয়েছে এই দেশে। পূর্ব-পাকিস্তানের উদ্বাস্তুরা পেয়েছে শুধু বঞ্চনা। তারা ক্ষতিপূরণ পায়নি, দেশত্যাগী

মুসলমানদের সম্পত্তি পায়নি। ভারত সরকার কথা দিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গেও উদ্বাস্তু শিল্পনগরী নির্মাণ করবে। সে কথা সে রাখেনি। চরম দুর্গতির মধ্যেও অনিঃশেষিত প্রাণশক্তিকে সম্বল করে তারা জোট বেঁধেছে। জবরদখল কলোনি গড়ে তুলেছে, বেঁচে থাকার জন্য আন্দোলন করেছে এবং পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহ্যানুসারী সমাজে ও রাজনীতিতে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। এই গ্রন্থ রচনার সময় আমার মনে হয়েছিল যে এই সত্যটি ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মানুষের কাছে উপস্থাপিত করা প্রয়োজন যাতে বাঙালি চরিত্রের বিরুদ্ধে দুরভিসন্ধিমূলক প্রচার বন্ধ হয়। যাতে বাঙালি চরিত্রের অন্তর্নিহিত সহনশীলতা, মৃদুতা, দৃঢ়তা এবং শক্তির পরিচয় মেলে। বইটি তাই ইংরেজিতে লিখেছিলাম। ইংরেজি বইটির পাশাপাশি বাংলা বইটিও পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে আজ আমি আনন্দিত।

আমার এই ব্যাধিগ্রস্ত ভাঙা শরীর নিয়ে এই গ্রন্থ রচনা সম্ভব হত না যদি আমার কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর অকৃপণ সহায়তা না পেতাম। প্রীতিভাজন শ্রীরণেন্দ্রনাথ দেব, এই গ্রন্থের আদ্যন্ত দেখে দিয়ে আমাকে দুশ্চিন্তা-মুক্ত করেছেন। বন্ধুবর শ্রীবিষ্ণুচরণ আচার্য এই বই-এর প্রস্তুতিতে আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। তাঁর কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী। অধ্যাপক রঞ্জিত কুমার সরকার ও অধ্যাপক প্রভাস রায় আমার প্রাক্তন ছাত্র। এই বইয়ের সর্বাঙ্গে তাঁদের পরিশীলিত মনের ছাপ। শ্রীতুষারকান্তি তালুকদার আমার অকৃত্রিম সুহৃদ। তাঁর সঙ্গে আমার যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক তাতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অবকাশ নাই। তাঁর নামের সঙ্গে এই বই অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত থাকবে। পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচন কমিশনের সভাপতি শ্রীতরুণ কুমার দত্ত অনায়াস করুণায় আমার মতো অশক্ত মানুষের প্রতি সহায়তার হাত না বাড়িয়ে দিলে এই বই আমার জীবদ্দশায় দিনের আলো দেখত কিনা সন্দেহ। তাঁর মতো বিদ্বান আর্তদরদী মানুষ আছেন বলেই আমাদের দেশ আজও বাসযোগ্য। তাঁর কাছে আমার ঋণ অপরিশোধ্য। অনুজপ্রতিম সুহৃদ শ্রীবিমলেন্দু পালের সহায়তা না পেলে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হত কিনা সন্দেহ। তাঁর ভালোবাসার ঋণে বাঁধা রইলাম। এই বই লেখার সময় আমি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। আমি হয়তো বই শেষ করার জন্য বেঁচে থাকতাম না যদি কলকাতার বি এম বিড়লা হার্ট রিসার্চ সেন্টারের প্রথিতযশা হৃদ্‌রোগবিশেষজ্ঞ ডাক্তার তরুণকুমার প্রহরাজ আমার প্রাণ ফিরিয়ে না দিতেন। আমি যতদিন বেঁচে থাকব, তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ হয়ে থাকব। এসময়ে আমার পাশে থেকেছেন আমার পরম প্রিয়জন শ্রীসাগর গুপ্ত। তিনি আমাকে কল্যাণী থেকে কলকাতা নিয়ে গেছেন, বি এম বিড়লা হার্ট রিসার্চ সেন্টারে চিকিৎসার পর আমাকে আবার কল্যাণী ফিরিয়ে নিয়ে এসেছেন, আমার সব অভাব মিটিয়েছেন। তাঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতার সীমা নাই।

ভালোবেসে 'দ্য মার্জিনাল মেন'-এর প্রচ্ছদ এঁকে দিয়েছিলেন শ্রীগণেশ হালুই। এই প্রচ্ছদের থেকে এই বইকে আলাদা করা যায় না বলে বাংলা বইয়ের জন্যও এই প্রচ্ছদই রেখে দিলাম। গণেশবাবুর কাছে আজীবন ঋণী হয়ে রইলাম।

আমার বিড়ম্বিত জীবনের দুঃখভার হাসিমুখে বহন করেছেন আমার স্ত্রী শ্রীমতী হেনা দেবী। ঈশ্বরের করুণা তাঁর উপর বর্ষিত হউক। আমার চিররুগ্‌ণ পুত্র কল্যাণ রোগশয্যায় শুয়েও আমাকে স্থির থাকতে দেয়নি, এই বই শেষ করার জন্য ক্রমাগত তাগিদ দিয়েছে। তারই প্রেরণায় ও ভালোবাসায় এই বই সম্পূর্ণ হল।

বারবার উদ্বাস্তুদের সংস্পর্শে এসেছি। তাঁরা আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন। তাঁদের প্রাণের উত্তাপে আমাকে সঞ্জীবিত করেছেন। সেই বাঙালি উদ্বাস্তুদের নমস্কার জানাই।

পরিশেষে এই বইয়ের সস্নেহ ও দ্রুত প্রকাশনার জন্য শ্রীপ্রিয়ব্রত দেবকে ধন্যবাদ জানাই।

তটস্থ
এ ১১/৫৪৭, কল্যাণী,
নদীয়া

প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী

## সূচিপত্র

### প্রথম অধ্যায়

# উদ্বাসন

দেশ বিভাজনের পর পূর্ব-পাকিস্তান থেকে হিন্দুদের ঘর ছেড়ে বাধ্যতামূলকভাবে চলে আসা সাম্প্রতিককালের সবচেয়ে হৃদয়বিদারক ঘটনাসমূহের অন্যতম। সুন্দরী জন্মভূমির সঙ্গে ভালোবাসার অচ্ছেদ্যবন্ধনে আবদ্ধ একটি জীবন্ত, জাগ্রত মনুষ্যগোষ্ঠীকে পুরোপুরি উপড়ে ফেলে দেওয়ার এই কাহিনী। কিন্তু পাঞ্জাবে যা ঘটেছিল, পূর্ববাংলায় তা ঘটেনি। এক প্রচণ্ড বিধ্বংসী হত্যালীলা ও জনবিনিময়ের দ্বারা জন্মভূমি থেকে দুই বিপুল মনুষ্যগোষ্ঠীকে স্বল্পকালের মধ্যে উপড়ে ফেলার কাজ সম্পন্ন হয়েছিল পাঞ্জাবে। কিন্তু বিভক্ত বাংলায় হিন্দু-মুসলমান—এই দুই মনুষ্যগোষ্ঠীর বিনিময় হয়নি। পূর্ব-পাকিস্তান থেকে চলে আসতে হয়েছিল শুধু হিন্দুদের। কিন্তু মুসলমানদের পূর্ব-পাকিস্তানে চলে যেতে হয়নি। পাঞ্জাবের মতো কোনো মহাপ্রলয় হয়নি বাংলায়। পূর্ব-পাকিস্তানের সব হিন্দুদের একসঙ্গে একই সময়ে উপড়ে ভারতে ছুঁড়ে দেওয়া হয়নি।

কিন্তু পূর্ব-পাকিস্তান থেকে বাঙালি হিন্দুদের উপড়ে ফেলাটা একটা দীর্ঘকালব্যাপী যন্ত্রণাময় প্রক্রিয়া। দেশ বিভাজনের পর বাঙালি হিন্দুদের অবস্থা হয়েছিল ফাঁদে-পড়া জন্তুর মতো। হিন্দুদের ধনসম্পত্তি কেড়ে নিয়ে তাদের বিতাড়নের জন্য মাঝে মাঝে সরকারি আমলাতন্ত্র ও মুসলমান জনসাধারণের যোগসাজশে একতরফা দাঙ্গা হয়েছে। আর হৃতসর্বস্ব বিধ্বস্ত মানুষের তরঙ্গ এসে এপারে আছড়ে পড়েছে। কখনো এই জনস্রোত এসেছে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ উন্মত্ত তরঙ্গের মতো; কখনো এসেছে ক্ষীণ ধারায়। কিন্তু কখনো তা থেমে থাকেনি। থামবেও না। যতদিন একটিও অ-মুসলমান পূর্ব-পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশ) থাকবে, ততদিন ঘরছাড়া মানুষের পদধ্বনি শোনা যাবে। ওদের চলে না এসে কোন উপায় নেই। মুজিব-শাসনের স্বল্পকাল বাদ দিলে এই মিছিল কোনোদিন থামেনি।

পূর্ব-পাকিস্তানের হিন্দুরা দেশ ছেড়ে চলে আসতে শুরু করে ১৯৪৬-এর নোয়াখালির দাঙ্গার পর থেকেই। দেশ বিভাজনের পরেও হিন্দুরা ক্রমাগত চলে আসতে থাকে। দেশ বিভাজনের অব্যবহিত পরেই পূর্ব-পাকিস্তানে কোনো বড় ধরণের দাঙ্গা হয়নি এবং ঘর ছেড়ে চলে আসা মানুষের ধারাও কিছুটা ক্ষীণ হয়েছিল। কিন্তু ১৯৪৯-এর সেপ্টেম্বরে হায়দরাবাদে কেন্দ্রীয় সরকারের পুলিশি ব্যবস্থার পর উদ্বাস্তুপ্রবাহ আবার খরবেগে বইতে থাকে। ১৯৪৯-এর শেষভাগে উদ্বাস্তুপ্রবাহ ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে প্রায় শুকিয়ে যায়। বলা যেতে পারে, ১৯৪৯-এ হিন্দু সংখ্যালঘুদের পূর্ব-পাকিস্তান থেকে চলে আসার প্রথম পর্যায় শেষ হয়। প্রথম পর্যায়ে যেসব উদ্বাস্তু হিন্দুরা চলে এসেছিল তাদের সংখ্যা এইরকম :

১৯৪৮-এর মার্চে তাদের সংখ্যা ছিল দশ লক্ষ। এই বছরেরই জুনে তাদের সংখ্যা পৌঁছে যায় ১১ লক্ষে। এই ১১ লক্ষের মধ্যে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার ছিল শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর, ৫ লক্ষ ৫০ হাজার গ্রামীণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর, ১ লক্ষের কিছু বেশি ছিল কৃষক এবং ১ লক্ষের কিছু কম কৃষির সঙ্গে যুক্ত কারিগর।

হিন্দু সংখ্যালঘুদের দেশ ছেড়ে চলে আসার দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয় ১৯৫০-এ। এই বছরের ফেব্রুয়ারি থেকে পূর্ব-পাকিস্তানের নিরস্ত্র, অসহায় হিন্দুদের যথাসর্বস্ব কেড়ে নেওয়ার জন্য, হিন্দু নারীদের পিতা অথবা স্বামীর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য সংখ্যাগুরু মুসলমানেরা যে বীভৎস হত্যাকাণ্ড ও লুণ্ঠন শুরু করে, তার ফলে যন্ত্রণায় কাতর, নিরুপায় ও পুরোপুরি বিধ্বস্ত এক বিপুল মনুষ্যগোষ্ঠী এক বিশাল হিমপ্রবাহের মতো পশ্চিমবঙ্গে এসে আছড়ে পড়ে। এই বিপুল জনস্রোতের চাপে পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনিক যন্ত্র প্রায় ভেঙে গিয়েছিল।

সংগঠিতভাবে হিন্দুপুরুষদের হত্যা ও নারী অপহরণ এবং তাদের ধনসম্পত্তির লুণ্ঠন শুরু হয় পূর্ব-পাকিস্তানের বাগেরহাটে এবং তারপর তা অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু এবারের পূর্ব-পাকিস্তানের দাঙ্গা, সব হারানো মানুষের মৃত্যুযন্ত্রণার মর্মভেদী আর্তনাদ এবং সারা পশ্চিমবঙ্গে ছড়িয়ে পড়া লক্ষ লক্ষ নগ্ন, ক্ষুধার্ত, শীর্ণকায় নরনারী ও শিশুর ছায়ামূর্তি স্বাধীনতার পর প্রথম ও শেষবারের মতো পশ্চিমবঙ্গের মনে উথালপাথাল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এই প্রথম ও শেষ আলোড়ন। এই একবার পশ্চিমবঙ্গে প্রতিহিংসার প্রচণ্ড উন্মাদনা সৃষ্টি হয়েছিল। একটি স্বল্পস্থায়ী রক্তাক্ত দাঙ্গা শুরু হয়েছিল যা এতকালের একমুখী উদ্বাস্তুপ্রবাহকে দ্বিমুখী উদ্বাস্তুপ্রবাহে পরিণত করেছিল। আতঙ্কিত মুসলমানেরাও এবার পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে পূর্ব-পাকিস্তানে যেতে শুরু করে।

১৯৫০-এর দাঙ্গায় পশ্চিমবঙ্গে যে বিপুলসংখ্যক উদ্বাস্তু হিন্দু চলে আসে, তাদের সংখ্যা জানা যায় ১৯৫১-র জনগণনা থেকে : ১৯৫১-তে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুর সংখ্যা ৩৫ লক্ষে পৌঁছে গিয়েছিল।

নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তির (১৯৫০-এর দিল্লি চুক্তি) পরও উদ্বাস্তুদের চলে আসা বন্ধ হয়নি। এই চুক্তিতে সীমান্তের দুদিকের উদ্বাস্তুরা যাতে ঘরে ফিরতে পারে তার ব্যবস্থা করা হয়। তাদের আশ্বস্ত করা হয়। তারা যে স্থাবর সম্পত্তি ফেলে এসেছে, তার মালিকানা তাদের আছে। এই চুক্তির ফলে হিন্দু উদ্বাস্তুদের চলে আসা কিছুটা কমেছিল কিন্তু বন্ধ হয়নি। মুসলমানদের ক্ষেত্রে চুক্তির ফল হয়েছিল ঠিক উলটো। এই চুক্তির ফলে যেসব মুসলমান পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম ছেড়ে চলে গিয়েছিল, তারা সবাই ফিরে আসে। কিন্তু শুধু তারাই ফিরে আসেনি। তাদের সঙ্গে পূর্ব-পাকিস্তানের অনেক মুসলমানও এদেশে চলে আসে। তারা যাতে তাদের এদেশে ফেলে যাওয়া স্থাবর সম্পত্তি ফিরে পায় তার জন্য নেহরু উদ্যোগী হয়ে ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের ওপর তাঁর আস্থা ছিল না।

কিন্তু হিন্দু উদ্বাস্তুরা পূর্ব-পাকিস্তানে ফিরে যেতে পারেনি। যারা গিয়েছিল, তারাও তাদের স্থাবর সম্পত্তি ফিরে পায়নি। উদ্বাস্তুরা যাতে তাদের বাড়ি ঘরদোর ফিরে পায়, তা নিয়ে নেহরুর কোনো মাথাব্যথা ছিল না। শুধু মুসলমানদের ওপর যাতে কোনো অন্যায় না হয়, সে বিষয়ে তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল। কেননা, তা না হলে কাশ্মীর সমস্যা জটিলতর হতে পারত। চুক্তির ফলে স্বল্পসংখ্যক হিন্দুই পূর্ব-পাকিস্তানে ফিরে গিয়েছিল। তবে উদ্বাস্তু আগমনের হার কিছুটা কমেছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু উদ্বাস্তুদের চলে

আসা বন্ধ হয়নি। উদ্বাস্তুদের প্রয়োজন ছিল নিরাপত্তার বোধ। এই চুক্তি তাদের তা দিতে পারেনি।

১৯৫১-র জুন মাসে উদ্বাস্তু আগমনের হার অকস্মাৎ বেড়ে যায়। ১৯৫২-র অক্টোবরে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে যাতায়াতের জন্য পাসপোর্ট প্রথা প্রবর্তিত হয়। এতে আবার উদ্বাস্তু আগমনের হার বেড়ে যায়। এ হল পূর্ব-পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তু অভিপ্রয়াণের তৃতীয় পর্যায়। দেশ বিভাজনের সময় থেকে ১৯৫২-র অক্টোবর পর্যন্ত ভারত পাকিস্তানের মধ্যে অবাধ যাতায়াত ব্যবস্থা ছিল। অর্থাৎ যাতায়াতের জন্য তখন পাসপোর্ট ভিসা লাগত না। কিন্তু ১৯৫২-র ১৫ অক্টোবর পাকিস্তান এককভাবে পাসপোর্ট প্রথা প্রবর্তন করে। সুতরাং ভারতও এই প্রথা প্রবর্তন করতে বাধ্য হয়। ভারত এই ব্যবস্থা গ্রহণ করায় ভারতীয় মুসলমানরা নিরাপত্তার অভাববোধ করেনি। কিন্তু পূর্ব-পাকিস্তানের হিন্দুরা এতে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। তাদের এই ভয় হয়েছিল যে পূর্ব-পাকিস্তানের অন্ধকূপ থেকে ভারতে চলে আসার পথ এতে রুদ্ধ হয়ে যাবে। পাসপোর্ট প্রথা কার্যকর হওয়ার কয়েক মাস আগে থেকেই হিন্দুরা আবার দলে দলে চলে আসতে শুরু করে। সুতরাং অক্টোবরে চলে-আসা উদ্বাস্তুদের সংখ্যা ১৯৫০-এ যত উদ্বাস্তু এসেছিল তার সমান হয়ে যায়।

১৯৬০-৬১-তে বিপুল সংখ্যায় উদ্বাস্তু আগমনের তৃতীয় পর্যায় শুরু হয়ে যায়। ১৯৬১-৬৫-র মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে অন্তত দশ লক্ষ উদ্বাস্তু চলে আসে। ১৯৬২-তে পাবনা ও রাজশাহীতে এবং ১৯৬৪ ও ১৯৬৫-তে ঢাকা ও অন্যান্য এলাকায় ব্যাপকভাবে হিন্দু সংখ্যালঘুদের হত্যা করা হয়। তারই ফল বিপুলসংখ্যক উদ্বাস্তুর পশ্চিমবঙ্গে চলে-আসা। মন্ট্রিয়েল-এর টাইমস ইন্‌ক-এর কানাডীয় সংবাদদাতা এই নারকীয় হত্যাকাণ্ডের সত্যসন্ধ বিবরণ দেন। পাকিস্তান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—এই দুই সরকার নীরবতার ষড়যন্ত্রের দ্বারা এই হত্যালীলাকে গোপন করতে চেয়েছিল। কানাডীয় সংবাদদাতা এ বিষয়ে তাঁর যে প্রতিবেদন পাঠান, তা হল : এই ধ্বংসলীলার ফলে একমাত্র ঢাকা ও তার আশেপাশের এলাকায় প্রায় দশ হাজার লোক গৃহহীন হয়েছিল; অসংখ্য হিন্দুর ঘরবাড়ি ভস্মীভূত করা হয়েছিল। যে সব পুড়িয়ে দেওয়া হিন্দু বাড়ির মাটির দেওয়াল তখনো দাঁড়িয়েছিল, তাদের গায়ে কালি দিয়ে উর্দুতে লিখে দেওয়া হয়েছিল, "এই বাড়ি মুসলমানের।" শত শত আহত মানুষকে খোলা ট্রাকে ঢাকার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালে ডাক্তার ও নার্সের সংখ্যা ছিল অত্যন্ত কম। বিদেশী ডাক্তাররা স্বেচ্ছায় হাসপাতালের ডাক্তারদের সাহায্য করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সহায়তার জন্য তাদের প্রসারিত হাত ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই পাশব হত্যাকাণ্ডের ওপর যে লৌহ যবনিকা ফেলে দেওয়া হয়েছিল, কোনো বিদেশীর পক্ষেও তার ভেতর যাওয়া সম্ভব ছিল না।

এরপর পূর্ব-পাকিস্তান থেকে হিন্দুদের যে অভিপ্রয়াণ ঘটে, তা বাংলাদেশের জন্মযন্ত্রণার সঙ্গে জড়িত। ২·৭০ লক্ষ হৃতসর্বস্ব মানুষ পশ্চিমবঙ্গে চলে আসতে বাধ্য হয়। মানবেতিহাসে এই অভিপ্রয়াণ অশ্রুতপূর্ব। পূর্বপাকিস্তান যখন বাংলাদেশে রূপান্তরিত হল, তখন অনেককিছুই হয়তো পালটাল। পালটাল না শুধু হিন্দুদের চলে আসাটা। মুজিবের আমলে ও ইন্দিরা গান্ধীর চাপে সাময়িকভাবে ঘর ছেড়ে চলে আসা অনেক হিন্দু ফিরে গেল। কিন্তু হিন্দুদের তাদের মাতৃভূমিতে থাকার সুখ বেশিদিন সইল না। মুজিব নিহত হলেন, বাংলাদেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন হল। বাংলাদেশ

ইসলামি রাষ্ট্র হয়ে পূর্ব-পাকিস্তানের চেহারা নিল। হিন্দুদের চলে আসার প্রক্রিয়া আবার শুরু হল। এই প্রক্রিয়া এখনো চলছে। এখন আর শুধু হিন্দু নয়, খ্রিস্টান ও বৌদ্ধদেরও বাংলাদেশ থেকে বিতাড়ন পর্ব চলছে। ভারত সরকার বিতাড়িত বৌদ্ধ চাক্‌মাদের আবার বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করছে। কিন্তু একথা প্রায় নিশ্চিতভাবেই বলা চলে যে এই ব্যবস্থা সফল হবে না। যতদিন বাংলাদেশে একটিও অমুসলমান থাকছে, ততদিন বাংলাদেশিরা থামবে না। কিন্তু তারপরেও বাংলাদেশিরা থামবে কি?

### দ্বিতীয় অধ্যায়

# অন্ধকার ভবিষ্যতের পথে

আগেই বলা হয়েছে যে দেশবিভাগের অব্যবহিত পরে পূর্ববাংলায় কোনো বড় ধরণের দাঙ্গা হয়নি। যদিও হিন্দুরা দেশ ছেড়ে চলে আসতে থাকে, তবে দেশবিভাগের পরেই তারা মুসলমানদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে চলে এসেছিল একথা বলা চলে না। দেশবিভাগের আগে থেকেই যখন সুস্পষ্ট বোঝা গিয়েছিল যে পাকিস্তান হতে যাচ্ছে, তখন থেকেই মুসলমানরা অত্যন্ত সচেতনভাবে যেভাবে হিন্দুদের মানসিক নিপীড়ন করতে থাকে, তাই প্রথমদিকে হিন্দুদের মাতৃভূমি ছেড়ে আসতে বাধ্য করে। তাছাড়া, এ সময় থেকেই হিন্দুদের মধ্যে একটা আতঙ্ক দেখা দিয়েছিল। তাদের ভয় হয়েছিল মুসলমানদের হিন্দুনারী-লুব্ধতা থেকে তাদের পক্ষে ঘরের মেয়েদের বাঁচানো কঠিন হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থ 'উদ্বাস্তু' থেকে একটি ঘটনা তুলে দেওয়া যেতে পারে :[১]

এক হিন্দু মহিলা পুকুরে স্নান করতে নেমেছেন। সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছু যুবক ও বৃদ্ধ মুসলমান পুকুরের দুপারে জড় হয়ে অশ্লীল ছড়া কাটতে শুরু করল। এপার থেকে আওয়াজ উঠল—"পাক পাক পাকিস্তান।" অন্য পার থেকে উত্তর এল, "হিন্দুর ভাতার মুসলমান।" ভীত সন্ত্রস্ত মেয়েটি জলের মধ্যে অসাড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। একজন মধ্যবয়স্ক মুসলমান সিঁড়ি বেয়ে স্নানের ঘাটে নেমে এসে বলল, "বিবিজান, দেরি হয়ে যাচ্ছে যে! দেরি করছ কেন? বাড়ি যাবে না?" মেয়েটি তখনো জলের মধ্যে স্থির, আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে। তারপর দুপারে সমবেত মানুষের আনন্দোল্লাসেব মধ্যে মধ্যবয়স্ক লোকটি বলল, "আরে, তোদের চাচীর গাঁটগুলো শক্ত হয়ে গেছে রে। ওর নড়বার শক্তি নেই। তোরা ওকে হাত ধরে জল থেকে তুলে নিয়ে আয়।"

হিন্দুরা কি ভয়ানক মানসিক যন্ত্রণায় পুড়ছিল, এ ঘটনা তারই সাক্ষ্য বহন করে। এরা হিন্দু মধ্যবিত্ত। এরাই পূর্ববঙ্গের সম্ভ্রান্ত, প্রভাবশালী সম্প্রদায়। ভারতের স্বাধীনতাসংগ্রামে এই হিন্দু সম্প্রদায়ের অবদান অসামান্য। এই শিক্ষিত হিন্দু ভদ্রলোকেরাই স্বাধীনতাসংগ্রামে অংশগ্রহণ করে হাসিমুখে ফাঁসিতে প্রাণ দিয়েছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা ও কর্মীরা প্রায় সকলেই ছিলেন এই শ্রেণীর মানুষ। ইংরেজ আমলে সবাই দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল। সবাই দাস। দাস হিশেবে সবাই সমান। স্বাধীন ইসলামি রাষ্ট্র পূর্ব-পাকিস্তানে সেই শৃঙ্খল এখন আরো বেশি স্পষ্ট, নাগপাশে পরিণত। তারা মুক্ত আকাশে মাথা তুলে দাঁড়ানোর অদম্য আকাঙ্ক্ষায় বুক বেঁধেছিল। সেই স্বাধীনতা তাদের কাছে বিষ হয়ে এসেছে।

স্বাধীনতালাভের পর হিন্দুদের প্রতি মুসলমানদের আচার-আচরণ একেবারে পালটে যায়। তারা সুপরিকল্পিতভাবে হিন্দুদের, বিশেষত হিন্দু নারীদের নির্যাতন করে তাদের

অস্থির করে তোলে। তাদের নিরাপত্তাবোধ নষ্ট করে দেয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও হিন্দুরা তাদের ভিটে-মাটি কামড়ে পড়ে থাকত যদি রাষ্ট্রীয় প্রশাসন তাদের পাশে দাঁড়াত। কার্যত ঠিক উলটোটাই ঘটেছিল। সংখ্যালঘু বিদ্বেষী মুসলমানদের সঙ্গে পাকিস্তানি প্রশাসনের যোগসাজশ ছিল। এতে হিন্দুদের মনে সরকারের প্রতি অনাস্থা জন্মেছিল। নিরুপায় হয়ে তারা অজানা, অন্ধকার ভবিষ্যতের পথে পা বাড়িয়েছিল।

দেশবিভাগের পর পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের ঘর ছেড়ে চলে আসার অন্য কারণও ছিল। উদ্বাসনের প্রথম পর্বে মধ্যবিত্তরা দেশ থেকে চলে আসে। অসংখ্য নদনদী, খাল পূর্ববাংলার মধ্য দিয়ে এঁকেবেঁকে বয়ে গিয়ে তাকে নক্‌সী কাঁথার চেহারা দিয়েছে। পূর্ববাংলার সর্বত্রই জলের বেষ্টনী। এই দেশের ছোট দ্বীপের মতো বিভিন্ন অঞ্চলে হিন্দুরা ছড়িয়েছিটিয়ে বাস করত। জলের বেষ্টনী থাকায় বাইরের জগতের সঙ্গে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে তারা বাস করত। কিন্তু জলের বেষ্টনী ছাড়াও আর একটি বেষ্টনী ছিল—সংখ্যালঘু-বিদ্বেষী মুসলমানদের ঘৃণার বেষ্টনী। অতএব সভ্য জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হিন্দুদের এই ধারণা প্রায় বদ্ধমূল হয়ে উঠেছিল যে তাদের পক্ষে আর নিরাপদে বাস করা সম্ভব হবে না। এদের পক্ষে পরাক্রমশালী ব্রিটিশের বিরুদ্ধে জীবন পণ করে সংগ্রাম করা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু স্বাধীনতার পর সংখ্যালঘু বিদ্বেষের বিষবাষ্প এমনভাবে পূর্ব-পাকিস্তানের আকাশবাতাস আচ্ছন্ন করেছিল যে এই শ্বাসরোধী আবহাওয়া আর হিন্দুদের পক্ষে সহনীয় ছিল না। যত দিন যেতে লাগল, ততই সরকারি অফিসারদের যোগসাজশে মুসলমান জাতীয় রক্ষীবাহিনীর (আনসার) অত্যাচারের মাত্রা বাড়তে লাগল। এই অত্যাচারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল অর্থনৈতিক পীড়ন। শুধু হাতে মারাই নয়, হিন্দুদের ভাতে মারারও চেষ্টা চলতে লাগল। সহায় সম্বলহীন, অসহায় হিন্দুদের মৃত্যুযন্ত্রণা দেখেও পাকিস্তান সরকারের নিস্পৃহ নির্মমতাকে পাশবিক আচরণ বললে অত্যুক্তি হবে না। পূর্ববঙ্গ সংখ্যালঘু কল্যাণ কমিটির (East Bengal Minority Welfare Committee) বিবৃতিতে হিন্দুদের ওপর কী ধরণের অর্থনৈতিক পীড়ন চলছিল, তা উল্লেখ করা হয়েছে :[২]

ডাক্তার, আইনজীবী, দোকানিদের বয়কট করা হচ্ছে, ব্যবসায়ীদের ব্যবসা করার অনুমতিপত্র দেওয়া হচ্ছে না; কৃষকেরা জমিদারদের জমিজমা চাষ করছে না। এরপর বৃত্তিজীবী মানুষদের কিভাবে ওই দেশে থাকা সম্ভব?

উদ্বাস্তু দোকানদাররা অমৃতবাজার পত্রিকার রিপোর্টারকে বলেন[৩], "প্রতিটি হিন্দু দোকানের পাশে মুসলমানের দোকান গড়ে উঠেছে, হিন্দুর দোকান থেকে যাতে কিছু কেনা না হয় তার জন্য ক্রেতাদের চাপ দেওয়া হচ্ছে।" উদ্বাস্তু শিক্ষকরা জানিয়েছেন যে তাদের ছাত্ররাও তাদের অপমান করছে। এ সময়ে বড় রকমের দাঙ্গা না হলেও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অভাব ও মানসিক নির্যাতন হিন্দুদের ঘর ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য করে।

শুধু অর্থনৈতিক নিপীড়নই নয়, ধর্মীয় ও সামাজিক নির্যাতনও চলছিল। পূর্ব-পাকিস্তান সরকার সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় ও সামাজিক নির্যাতনের দিকে একেবারে চোখ বুজে ছিল। ডঃ সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জি অভিযোগ করেছিলেন যে এ ব্যাপারে সরকারের উদাসীনতা এমন অবস্থার সৃষ্টি করেছে যে হিন্দুরা দেশ ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য হচ্ছে। পূর্ব-পাকিস্তান থেকে তাঁর কাছে ক্রমাগত চিঠি আসছিল। তা থেকে তিনি জানতে পেরেছিলেন যে হিন্দু মহিলাদের নানারকমের নির্যাতন, এমনকী অপহরণও

দৈনন্দিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। হিন্দু ছাত্রদের জোর করে গোমাংস খাওয়ানো হচ্ছিল। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে এমন একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়েছিল যে হিন্দুদের পক্ষে তাদের ধর্ম ও আত্মসম্মান বজায় রেখে সেই দেশে টিকে থাকা সম্ভব ছিল না। সরকারের কাছে অভিযোগ করেও এই অমানবিক নির্যাতনের কোনো প্রতিকার হয়নি। সরকার শুধুই আশ্বাসের ললিতবাণী শোনাত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই আশ্বাস ছিল শুধুই ছলনা। এ থেকে হিন্দুরা বুঝতে পেরেছিল যে তারা যাতে তাদের ভিটেমাটিতে নিরাপদে বাস করতে পারে তার কোনো ব্যবস্থাই সরকার করবে না। পূর্ব-পাকিস্তানে থাকলে মুসলমানদের হিংস্র বিদ্বেষ ও সরকারের কপটতার মধ্যে ফাঁদে-পড়া ইঁদুরের মতো থাকতে হবে।

হিন্দুরা তাদের মাতৃভূমিকে প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসত। কিন্তু আত্মমর্যাদা ও নারীর সম্মানকে তারা সব কিছুর ঊর্ধ্বে স্থান দিত। আত্মমর্যাদা ও নারীর সম্মান বিসর্জন দিয়ে দিনযাপনের গ্লানি সহ্য করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। সুতরাং তারা নিরুপায় হয়েই ভারতে চলে এসেছিল, যদিও ভারত সরকারের কাছে তারা ছিল অবাঞ্ছিত।

শিয়ালদহ স্টেশনে উদ্বাস্তুদের সঙ্গে ইউনাইটেড প্রেস অভ ইন্ডিয়া ও অমৃতবাজার পত্রিকার রিপোর্টারদের সাক্ষাৎকার থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। অমৃতবাজার পত্রিকার রিপোর্টার লিখছেন :[৪]

কুমিল্লা জেলার রামপ্রসাদ নাথ জানান, "আমি চাষবাস ও মাছ বিক্রি করে কোনোক্রমে আমার দিন কাটাতাম। কিন্তু মুসলমানরা আমার জমির ফসল কেটে নিয়ে গেছে, বাজারে আমার কাছ থেকে জোর করে মাছ লুঠ করে নিয়ে গেছে। বলে গেছে, পাকিস্তানে এরকম ঘটনা ঘটবেই।" নোয়াখালির শশীভূষণ দত্তের বক্তব্য হল, "সর্বদা আমাদের ভয়ে ভয়ে থাকতে হত। মুসলমানরা প্রায় আমাদের বাড়ি এসে শাসিয়ে যেত, কুমারী মেয়েদের মুসলমানদের সঙ্গে বিয়ে দিতে হবে। আমার তিনটি মেয়ে। এরপর আমি পূর্ববঙ্গে কি করে থাকি?" বরিশালের শিশির ঢুলি জানান, "বাবুদের বাড়িতে পূজা, বিয়ে ও অন্যান্য অনুষ্ঠানেই আমাদের অন্নসংস্থানের একমাত্র উপায় ছিল। বাবুরাই চলে এসেছেন। আমরা থাকব কী করে? দেশে থাকলে না খেয়ে মরতে হত।" আর একজন উদ্বাস্তুর বক্তব্য থেকে পূর্ববঙ্গের পরিস্থিতির স্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়, "আমরা কী করব? চালের মণ চল্লিশ টাকা, অসুস্থ মানুষের জন্য ডাক্তার নেই, ওষুধ নেই, সরকারি অফিসারদের আমাদের দিকে কোনো দৃষ্টি নেই; আমাদের রক্ষণাবেক্ষণের কোনো ব্যবস্থা নেই। হিন্দুরা প্রতিদিন অপমানিত হচ্ছে; প্রত্যেক হিন্দুকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা হয়, চুরি-ডাকাতির মতো নিত্যনৈমিত্তিক অপরাধের কোনো প্রতিকার নেই। এই অবস্থায় কী করে আশা করেন যে আমরা পূর্ববঙ্গে বাস করব?"

১৯৪৮-এর ১৬ আগস্ট ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে এক সম্মেলনে সার যদুনাথ সরকার তাঁর ভাষণে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের দেশ ছেড়ে চলে আসার কারণ বিশ্লেষণ করেন।[৫] তিনি বলেন যে হিন্দুরা দেশ ছেড়ে চলে আসছে তার কারণ ধর্মীয় অত্যাচার, হিন্দুদের প্রতি অমানবিক আচরণ, পক্ষপাতদোষদুষ্ট প্রশাসন। হিন্দুদের পূর্ব-পাকিস্তান থেকে চলে আসাকে তিনি পৃথিবীর ইতিহাসের অন্যতম বৃহত্তম ও মর্মান্তিক উদ্বাসন বলে চিহ্নিত করেছেন। তিনি এই বিপুলসংখ্যক হিন্দু উদ্বাস্তুদের আশ্রয়ের সন্ধানে এদেশে আসার সঙ্গে ঐতিহাসিক গিবন বর্ণিত প্রাচীন যাযাবর উপজাতিদের আশ্রয়ের সন্ধানে দেশ থেকে দেশান্তরে যাত্রার সঙ্গে তুলনা করেছেন।

উদ্বাস্তুদের সঙ্গে তাদের পার্থক্য হল এই যে তারা দলবদ্ধভাবে দেশ থেকে দেশান্তরে গেছে, দেশ জয় করেছে, উপনিবেশ গড়ে তুলেছে এবং তারপর এক সময় স্থানীয় মানুষের সঙ্গে মিশে গেছে। উদ্বাস্তুদের সঙ্গে এখানেই তাদের পার্থক্য। উদ্বাস্তুদের এদেশ জয় করে নেবার প্রশ্নই ছিল না। ক্রমাগতই তাদের বলা হচ্ছিল, এদেশে তাদের ঠাঁই নেই। তারা এখানে অবাঞ্ছিত। হিংস্র বিদ্বেষে ভরা শ্বাসরোধী আবহাওয়া থেকে তারা পেল অবজ্ঞাভরা নিস্পৃহতা ও মৃত্যুর শীতলতা।

## শিয়ালদহ স্টেশন : নরকের সিংহদ্বার

ভিটেমাটি ছেড়ে ছিন্নমূল মানুষ দলে দলে সীমান্ত পেরিয়ে ট্রেনে চেপে শিয়ালদহ স্টেশনে নামতে লাগল। কিন্তু তারপর? তারপর আর কিছু নেই। আপাতত যাত্রা শেষ। সমুদ্রের মতো কলকাতা শহর। সন্ত্রস্ত, সর্বহারা মানুষগুলি এই শহর দেখে ভয় পেল। তারা থেমে গেল শিয়ালদহ স্টেশনে। অমৃতবাজার পত্রিকার এক সাংবাদিক শিয়ালদহ স্টেশনে উদ্বাস্তুদের সীমাহীন দুর্গতির জীবন্ত চিত্র তুলে ধরেছেন :[৬]

বৃহস্পতিবার আমি শিয়ালদহ স্টেশনে উদ্বাস্তুদের সঙ্গে বেশ কয়েক ঘণ্টা কাটিয়েছি। উদ্বাস্তুরা ট্রেনে শিয়ালদহ স্টেশনে এসেছে। যতদিন তাদের অন্যত্র পাঠানো না হচ্ছে, ততদিন তারা এখানেই থাকবে। এখানে এসেই কলেরা ও অন্যান্য রোগের প্রতিষেধক টিকা নেওয়ার জন্য প্রথমেই এদের লাইন দিতে হবে। তারপর আবার পরিবারের সকলকে নিয়ে স্টেশনের ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তরে লাইন দেবে। সেখানে একটি সার্টিফিকেট পাওয়া যাবে যে "তারা উদ্বাস্তু শিবিরে আশ্রয় পাওয়ার যোগ্য।" এই পর্ব শেষ হলেই তারা শিয়ালদহ সাউথ স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে বিছানাপত্তর কিছু থাকলে তা পেতে ফেলবে এবং উদ্বাস্তু শিবিরে আশ্রয়ের জন্য অপেক্ষা করবে। প্ল্যাটফর্মের কিছুটা জায়গা দড়ি দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছিল। উদ্বাস্তু শিবিরে স্থান না পাওয়া পর্যন্ত এই জায়গাটাই তাদের ঘরবাড়ি। ভারতে পারেন, কিভাবে এই স্বল্পপরিসর জায়গায় ৫ থেকে ৬ হাজার মানুষ স্ত্রীপুত্র কন্যা দিয়ে গাদাগাদি করে দিন কাটাচ্ছে! এত মানুষের পানীয় জল সরবরাহের জন্য জলের কল মাত্র তিনটি; মহিলাদের জন্য পায়খানা মাত্র দুটি, পুরুষদের জন্য মাত্র বারোটি।

প্ল্যাটফর্মে থাকাকালীন উদ্বাস্তুরা সরকারের কাছ থেকে রেশন হিশেবে বিনে পয়সায় চিঁড়ে গুড় পেত। এই রেশন বিতরণ করত বেসরকারি ত্রাণসংস্থার কর্মীরা। এখানেই সরকার ও সংস্থার কর্মীদের দায়িত্ব শেষ। কারুর অসুখ করলে তাকে দেখাশোনা করার কেউ ছিল না, প্রসব যন্ত্রণায় কাতর কোনো মহিলারও কোনো সাহায্যের আশা ছিল না। আমি যখন সাউথ স্টেশনে গেলাম, তখন দেখলাম একজন কঙ্কালসার উলঙ্গ মানুষ হাজার হাজার নিত্যযাত্রীদের যাতায়াতের সিঁড়িতে মলত্যাগ করছে।

এই মর্মান্তিক পরিস্থিতিতেও ত্রাণকর্মী সেজে কিছু মানুষ উদ্বাস্তুদের প্রতারণা করছিল। তারা উদ্বাস্তু পরিবারকে আশ্বাস দিত তারা সাপ্তাহিক অর্থ ও চিঁড়ে গুড়ের সরকারি বরাদ্দ (ডোল) পাইয়ে দেবে। পরিবর্তে অর্থ ও ডোলের কিছুটা তাদের দিতে হবে। এছাড়া এরা যুবতী উদ্বাস্তু নারীদের দেহ ব্যবসায়ের অন্ধকার জীবনে নিয়ে যেত।

ভাবতে পারেন, কিভাবে এই হতভাগ্য মানুষেরা দিনের পর দিন রাতের পর রাত প্ল্যাটফর্মে দিন কাটাচ্ছে? কল্পনা করুন যুবতী মেয়েরা হাজার হাজার মানুষের মধ্যে খোলা জায়গায় স্নান করছে, হাজার মানুষের ব্যবহার করা পায়খানা থেকে মাত্র কয়েক ফুট দূরে খোলা জায়গায় মানুষ ঘুমুচ্ছে। তিনটি ইট দিয়ে উনুন তৈরি করে আবর্জনা জ্বালিয়ে রাস্তার পাশে রান্না করা খাবার খাচ্ছে।

দুই সপ্তাহ পরে ইউ পি আই-এর একজন স্টাফ রিপোর্টার শিয়ালদহ স্টেশনে একই দৃশ্য দেখেছেন। তিনি লিখছেন :

এক হাজারেরও বেশি উদ্বাস্তুর অস্থায়ী বাসস্থান শিয়ালদহ স্টেশন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভ্যান এসে প্রতিদিন ৩০০ উদ্বাস্তুকে আশ্রয় শিবিরে নিয়ে যায়। নতুন উদ্বাস্তুর দল এসে তাদের শূন্যস্থান পূরণ করে। দৈনিক যাত্রীদের চলাচলের পথে উদ্বাস্তুরা সমস্যার সৃষ্টি করছে। উদ্বাস্তুদের পোটলা-পুটলি, নোংরা বিছানাপত্র প্ল্যাটফর্মের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। এত মানুষ এভাবে গাদাগাদি করে থাকায় প্ল্যাটফর্মের পরিবেশ অস্বাস্থ্যকর হয়ে উঠেছে। ইতিমধ্যে কলেরা, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ডায়েরিয়া, বদহজম ও আমাশয় দেখা দিয়েছে। কলেরায় মরেছে দুজন। মধ্যবিত্ত হিন্দুরা কলকাতা ও শহরগুলির আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবের বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে তাদের বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কৃষক, শ্রমিক, কারিগর দিনমজুর এবং নিম্নমধ্যবিত্ত দোকানদার স্টেশন প্ল্যাটফর্মে সরকারি আশ্রয়শিবিরে যাওয়ার অপেক্ষায় আছে।

শিয়ালদহ স্টেশনের উদ্বাস্তুরা আত্মমর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করে চলে এসেছিল। তারা জানত না, কী ভয়ানক মৃত্যুর মতো জীবন পশ্চিমবঙ্গে তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। সেই জীবনের বিষাক্ত আস্বাদ পেল তারা শিয়ালদহ স্টেশনের নরককুণ্ডে। তারা বুক বেঁধেছিল পশ্চিমবঙ্গের মুক্ত জীবনে স্বাধীন মানুষের মতো বাঁচবে বলে। কিন্তু নিষ্ঠুর কলকাতা তাদের কী দিল! পাষাণ শহর তাদের দিকে তাকিয়ে দেখল না, কঠিন অবজ্ঞায় মুখ ফিরিয়ে নিল। হাজার হাজার নিত্যযাত্রী যারা প্রতিদিন কলকাতা আসত, তারা একবারও এই ধুলোকালি মাখা মানুষগুলির মুখের দিকে তাকিয়ে দেখত কিনা সন্দেহ। কালিঝুলি মাখা পুরুষ, নারী ও শিশুর দেহের সংস্পর্শ সযত্নে এড়িয়ে চলতেন তারা। এরা কারা? এরা কি সত্যিই মানুষ? মলিন, নোংরা, বেআব্রু মানুষগুলির দেহ-মন থেকে সভ্যতার সব আবরণ খসে পড়েছে। সাপ্তাহিক মাথাপিছু দু-টাকা ও শুকনো চিঁড়ে গুড়ের বরাদ্দের (ডোল) জন্য এদের কাড়াকাড়ি, কল থেকে জল আনার জন্য মারামারি, ক্ষুধা তৃষ্ণা, নিদ্রাহীনতা, রোগশোক, প্রতিমুহূর্তের শ্বাসরোধকারী হাহাকার। ব্যস্ত নিত্যযাত্রীরা অনায়াসেই তাদের মাড়িয়ে দিয়ে যেতে পারত। ট্রেন থেকে নেমে আসা নিত্যযাত্রীদের ভিড়ের চাপে অন্তঃসত্ত্বা উদ্বাস্তু মহিলার সন্তানপ্রসবের উদাহরণও আছে।

একদিন এদের প্রতীক্ষার অবসান হল। উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তরের ট্রাক এসে এদের সরকারি উদ্বাস্তু আশ্রয়শিবিরে নিয়ে গেল। কিন্তু শিয়ালদহ স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম খালি হল না। প্রতিদিন ১০০০ থেকে ৩০০০ নতুন উদ্বাস্তু এসে তাদের স্থান দখল করল। কলকাতা ক্রমশ এই নোংরা মনুষ্য গোষ্ঠীর দৃশ্যে অভ্যস্ত হয়ে উঠল। এরা স্টেশনের ও আশেপাশে ফেলে-দেওয়া জিনিশ কুড়িয়ে খেয়ে পিঁপড়ের মতো জীবন কাটাতে লাগল।

## স্টেশন প্ল্যাটফর্ম থেকে সরকারি ক্যাম্প

যুদ্ধের সময় সৈন্যদের জন্য যে ব্যারাক গুদাম ঘরের মতো নিসেন হাট তৈরি করা হয়েছিল, আপাতত তাই উদ্বাস্তুদের আশ্রয়শিবিরে (ক্যাম্প-এ) পরিণত করা হল। হাজার হাজার উদ্বাস্তুকে এই সব ব্যারাকে এনে জড়ো করা হল। ব্যারাকের প্রতিটি ঘরে বিশটি পরিবারের থাকার ব্যবস্থা হল। প্রতিটি পরিবার তাদের জন্য বরাদ্দ জায়গাটুকু ভাঙা ইট ও পাথরের টুকরো দিয়ে পৃথক করে নিল। এখানে আড়ালের কোনো প্রশ্নই ছিল না। এই সব ক্যাম্প দেখে সমকালীন একজন সাংবাদিক মন্তব্য করেছিলেন, "বিড়াল-কুকুরের চেয়েও খারাপ অবস্থায় তাদের রাখা হয়েছিল।" কিন্তু হাজার হাজার উদ্বাস্তুকে আশ্রয় দেওয়ার মতো ব্যারাক বা নিসেন হাট পশ্চিমবঙ্গে ছিল না। সুতরাং পুরোনো সামরিক তাঁবু খাটিয়ে উদ্বাস্তুদের আশ্রয়ের সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা হল। কিন্তু দুপুরের প্রচণ্ড রোদে খোলা জায়গায় তাঁবুতে অসহ্য গরম। তার ওপরে জলের জন্য হাহাকার। যে কয়টি টিউবওয়েল বসানো হয়েছিল তাতে পানীয় জলের সমস্যা মেটেনি। শুকনো খাদ্যের জন্য মাসিক সরকারি বরাদ্দ (ডোল) ছিল যথাক্রমে প্রাপ্তবয়স্ক ও শিশুদের জন্য মাথাপিছু ১৫ ও ১০ টাকা। ক্যাম্পের উদ্বাস্তুরা এই টাকা দিয়ে ক্যাম্পের অধ্যক্ষদের (কম্যান্ডান্ট) কাছ থেকে চাল কিনে নিত। একটি শান্তিপূর্ণ, সুন্দর বাসস্থানের আশায় এই হতভাগ্য মানুষগুলি যে বিপদ সংকুল পথে যাত্রা শুরু করেছিল, তা এসে শেষ পর্যন্ত সরকারি ক্যাম্পের অন্ধকার কানাগলিতে ঠেকল। যখন তারা যাত্রা শুরু করেছিল, তারা মানুষ ছিল। এখন তারা সরকারি ক্যাম্পের অবয়বী অন্ধকারের মধ্যে নিজেদের মনুষ্যত্ব হারিয়ে পশুর জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হতে লাগল।

কিন্তু শরণার্থীদের একটি অংশ মাত্র সরকারি ক্যাম্প-এ আশ্রয় নিয়েছিল। ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তরের কমিশনার হিরণ্ময় ব্যানার্জি প্রথম পর্যায়ে আসা শরণার্থীদের তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন :[৭]

(১) অপেক্ষাকৃত সচ্ছল ও উদ্যোগী শরণার্থী যারা তারা সরকারি সাহায্য চায়নি। নিজেদের যা সম্বল ছিল, তা দিয়েই তারা নিজেদের পুনর্বাসনের চেষ্টা করে।

(২) আর-এক শ্রেণীর শরণার্থী ছিল যাদের অর্থ ছিল না, কিন্তু উদ্যম ছিল। তারা আশ্রয়ের সমস্যার সমাধান করেছিল পরিত্যক্ত অথবা শূন্যবাড়ি, ফাঁকা জমি দখল করে এবং গায়ে খেটে অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করে।

(৩) তৃতীয় শ্রেণীর শরণার্থীরা ছিল অত্যন্ত দরিদ্র। তাদের নিজেদের পায়ে দাঁড়াবার শিক্ষা অথবা সামর্থ্য ছিল না। তারাই সরকারি ক্যাম্পে আশ্রয় নেয়।

১৯৪৯-এর শেষদিকে ক্যাম্পের উদ্বাস্তুদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৭০ হাজারে। এদের মধ্যে সাড়ে সাত হাজার উদ্বাস্তুকে পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব ছিল না। এদের অধিকাংশই মহিলা ও শিশু। এদের সরকারি ক্যাম্পে স্থায়ীভাবে আশ্রিত মানুষ হিশেবে গণ্য করা হল, তাদের স্থায়ীভাবে আশ্রিত ক্যাম্পে স্থানান্তরিত করা হল। অবশিষ্ট ৬২,৫০০ উদ্বাস্তুকে পুনর্বাসন দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। ডঃ বিধানচন্দ্র রায় যখন ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তরের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন, তখন এই ছিল পরিস্থিতি। তিনি উদ্বাস্তুদের দ্রুত পুনর্বাসনের জন্য হিরণ্ময় ব্যানার্জিকে পুনর্বাসন ডিরেক্টরেট ও বিভাগীয় কমিশনার নিযুক্ত করলেন। ডঃ রায়ের তত্ত্বাবধান ও হিরণ্ময় ব্যানার্জির কর্মদক্ষতা ও নিরলস শ্রমে পুনর্বাসন দপ্তর উজ্জীবিত হল।

# নিরবচ্ছিন্ন উদ্বাস্তুপ্রবাহ ও সরকারি প্রতিক্রিয়া

দেশবিভাগের পর যখন হাজার হাজার শরণার্থী আসতে শুরু করল, তখন রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার হাত গুটিয়ে বসেছিল। তাদের আশা ছিল যে কিছুদিনের মধ্যেই এরা ফিরে যাবে। তা বোঝা যায় তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুকে যে প্রতিবেদন পাঠিয়েছিলেন তা থেকে। তিনি লিখেছিলেন যে পরিস্থিতি একটু শান্ত হলেই এরা দেশে ফিরে যাবে।[৮] এই প্রতিবেদনে প্রফুল্ল ঘোষের ইচ্ছাপূরণের ও নেহরুর খুশি হওয়ার ব্যাপার ছিল। উদ্বাস্তুরা ফিরে গেলে ভালো হয়; এই ইচ্ছা ছিল প্রফুল্ল ঘোষের এবং নেহরুও প্রফুল্ল ঘোষের কাছে এই কথা শুনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু উদ্বাস্তুরা ফিরে গেল না; তারা ক্রমাগত চলে আসতে লাগল। নেহরু এতে বিব্রত হয়ে পড়লেন। ক্রমাগতই বলতে লাগলেন, এদের চলে আসা উচিত হচ্ছে না; এরা ভুল করছে। চলে আসাটা সমস্যার কোনো সমাধান নয়। এদের ওদেশেই থাকতে হবে। পূর্ববঙ্গের শরণার্থীদের সম্পর্কে নেহরুর এই ধরণের মনোভাব তিনি ডঃ রায়কে যে চিঠি লিখেছিলেন তা থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য ডঃ রায়ের চিঠির প্রত্যুত্তরে নেহরু কয়েকটি চিঠি লেখেন।

১৯৪৮-এর ১৬ আগস্ট ডঃ রায়ের চিঠির উত্তরে নেহরু লেখেন : "পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুপ্রবাহ সম্পর্কে আপনার ৪ আগস্টের চিঠি আমি পেয়েছি। আপনার অসুবিধা আমি বুঝি এবং আপনাকে যথাসাধ্য সাহায্য করা আমাদের উচিত। কিন্তু অনেকদিন আগেই আমি আপনাকে বলেছি যে উদ্বাস্তুরা যদি বিপুল সংখ্যায় চলে আসতে থাকে, তবে সেই সমস্যার কোনো যুক্তিসহ সমাধান নেই। তাই যাই ঘটুক না কেন উদ্বাস্তুদের চলে আসাটা বন্ধ করতে আমি অত্যন্ত ব্যগ্র। আমি এখনো মনে করি উদ্বাস্তুদের চলে-আসা বন্ধ করার জন্য যে কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। পূর্ববঙ্গের অনেক হিন্দু নেতার পশ্চিমবঙ্গে চলে আসা অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে বলে আমি মনে করি।"[৯]

ডঃ রায়ের আর একটি চিঠির উত্তরে নেহরু তাঁর ২২ আগস্টের চিঠিতে লেখেন, "প্রথম থেকেই আমার এই সুনিশ্চিত ধারণা ছিল যে পূর্ববঙ্গ থেকে হিন্দুদের পশ্চিমবঙ্গে চলে আসা রোধ করার জন্য সব রকমের ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। যদি তারা বিপুল সংখ্যায় চলে আসে, তবে নিঃসন্দেহে তা বড় রকমের বিপর্যয় নিয়ে আসবে। আমি মনে করি পূর্ববঙ্গে যে সব হিন্দু নেতারা দেশ ছেড়ে চলে এসেছেন, তারা তাদের সাধারণ মানুষের প্রতি কোনো কর্তব্যই পালন করেননি। আপনি যা লিখেছেন, ব্যাপারটা যদি সত্যিই ততটা গড়িয়ে থাকে, তাহলে স্বভাবতই আমাদের পক্ষে যা সম্ভব করতে হবে। কিন্তু পরিণামে সাধারণ মানুষের যে অপরিমেয় দুর্গতি হবে তা চিন্তা করে আমি শিউরে উঠছি। যদি যুদ্ধ করতে হয় তাহলেও শেষ অবধি এই উদ্বাসন বন্ধ করার চেষ্টা করব।"[১০]

যদি তারা বিপুল সংখ্যায় চলে আসে একথা নেহরু কেন লিখলেন বোঝা যাচ্ছে না। উদ্বাস্তুরা তো সত্যিই বিপুল সংখ্যায় চলে আসছিল এবং এই ঘটনা একটা বড় রকমের বিপর্যয় তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। 'দুই-জাতি তত্ত্বের' ভিত্তিতে দেশবিভাগের মধ্যেই এই বিপর্যয় অন্তর্নিহিত ছিল। উদ্বাস্তুরা পালিয়ে আসছিল না। তাদের বিতাড়িত করা হচ্ছিল। ভারতের প্রধানমন্ত্রীই পালিয়ে যাচ্ছিলেন। সমস্যার মোকাবিলা করার সাহস ছিল না তাঁর। তিনি লিখেছেন সমস্যার কোনো যুক্তিসহ সমাধান নেই। সমস্যা

সমাধানের দুটি পথ খোলা ছিল। তিনি পাকিস্তানকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিতে পারতেন যে সংখ্যালঘুদের পূর্ববঙ্গে থাকতে না দিলে যুদ্ধ হবে। অথবা পাঞ্জাবে যেভাবে সমস্যার সমাধান হয়েছে, তিনি তাই করতে পারতেন। অর্থাৎ সম্পত্তি ও জনবিনিময়ের দ্বারা সমস্যার সমাধান করতে পারতেন। তিনি দুটির একটি পথ দিয়েও হাঁটলেন না। শুধু গালভরা বুলি আউড়ে গেলেন। পূর্ববঙ্গ থেকে যত হিন্দু এসেছে, তাদের সমসংখ্যক মুসলমানকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে পূর্ববঙ্গে পাঠিয়ে জনসংখ্যার সমতা বজায় রাখার দাবি জানিয়ে যে বিক্ষোভ শুরু হয়েছিল তার উল্লেখ করে নেহরু ডঃ রায়কে এক চিঠিতে লেখেন, "ঘটনা হল যে কোনো মানুষ মুসলমান হলেই সে অভারতীয় নয় অন্যত্র কিছু লোক দুর্ব্যবহার করছে, সেই জন্য কোনো ভারতীয় নাগরিকগোষ্ঠীকে দেশের বাইরে ঠেলে দেওয়া আইনসম্মত অথবা ন্যায়নীতিসঙ্গত নয়। এতে আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের মূলে আঘাত করা হবে। যাই ঘটুক না কেন আমরা তা করতে পারি না।"[১১]

পাঞ্জাবে সম্পত্তি ও জনবিনিময়ের পরেও নেহরুর ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু বাংলায় অনুরূপ বিনিময় হলে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের মূলে আঘাত করা হবে; তার কারণ 'যা ঘটে ঘটুক' কাশ্মীরকে বাঁচাতেই হবে। কাশ্মীর বাঁচাতে যদি ত্রিশ-চল্লিশ লক্ষ পূর্ববঙ্গের হিন্দু মরে, তবে তারা মরুক।

পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের প্রতি একধরণের পাথুরে উদাসীনতা ছিল নেহরুর। কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ববঙ্গ উদ্বাস্তুদের যে নগণ্য সাহায্য করেছিল, তাতে ক্ষোভ প্রকাশ করে ডঃ রায় নেহরুকে একটি চিঠি দিয়েছিলেন। তার উত্তরে নেহরু যে চিঠি লেখেন তাতে উদ্বাস্তুদের প্রতি তাঁর চরম অবজ্ঞাই প্রকাশ পায়। ১৯৪৯-এর শেষদিকে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ১৬ লক্ষ। ডঃ রায় প্রায় ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের দ্বারে দ্বারে ঘুরেছেন। তখন কেন্দ্রীয় সরকারের আচরণে তাঁর মনে হয়েছিল পশ্চিম-পাকিস্তানের উদ্বাস্তুরাই প্রকৃত উদ্বাস্তু। পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুরা উদ্বাস্তুই নয়। ১৯৪৯-এর ১ ডিসেম্বর তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে নেহরুকে একটি চিঠি লিখেছিলেন :[১২]

আপনাব এই ধারণা হয়েছে যে ত্রাণ ও পুনর্বাসনের জন্য আপনার সরকার আমাদের বিপুল আর্থিক অনুদান দিয়েছে। কিন্তু আপনি কি জানেন, আপনার সরকারের কাছ থেকে ১৯৪৮-৪৯ এবং ১৯৫০-৫১ এই দুবছরে যে অনুদান আমরা পেয়েছি তা তিন কোটি টাকার কিছু বেশি। অবশিষ্ট পাঁচ কোটি টাকা পেয়েছি ঋণ হিশেবে। আপনার কি মনে হচ্ছে না যে পশ্চিম-পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের তুলনায় এই টাকাটা একেবারেই নগণ্য? আমি তুলনা করতে চাই না। তাতে তিক্ততার সৃষ্টি হতে পারে। আমি শুধু বলতে চাই যে দুবছরে ২৬ লক্ষ উদ্বাস্তুকে অনুদান হিশেবে যে টাকাটা দেওয়া হয়েছে তাতে প্রত্যেক উদ্বাস্তু পায় অকিঞ্চিৎকর বিশটি টাকা। এই টাকাটাকে কি আপনি বিশাল অনুদান বলবেন? উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হিন্দুরা সর্বস্বান্ত হয়ে ক্ষুধায় ও উপবাসে ক্লিষ্ট হয়ে এদেশে এসেছে জীবিকার আশায়। অনেক মাস কেটে যাওয়ার পরও পূর্ব-পাকিস্তানি উদ্বাস্তুদের কেন্দ্রীয় সরকার কোনো স্বীকৃতি দেয়নি এবং তাদের কোনো দায়দায়িত্ব স্বীকার করেনি। তাদেব জন্য রাজ্য সরকার সাধ্যমতো সব করেছে। আর এই উদ্বাস্তুদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার দুবছরে বিপুল অর্থ—মাথাপিছু বিশটি টাকা বরাদ্দ করেছে।

এই চিঠির উত্তরে নেহরু যে চিঠি দেন তাতে পূর্ব-পাকিস্তানি উদ্বাস্তুদের প্রতি অবজ্ঞা ও পশ্চিম-পাকিস্তানি উদ্বাস্তুদের কোলে ঝোল টানার প্রবণতা লক্ষণীয়ভাবে প্রকাশ

পেয়েছে :[১৩]

পূর্ব-পাকিস্তান থেকে যারা এসেছে, তাদের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের জন্য কত খরচ হয়েছে, আমি জানি না। আপনি হয়তো ঠিকই বলেছেন তাদের জন্য পশ্চিম-পাকিস্তানি উদ্বাস্তুদের চেয়ে অনেক কম ব্যয় করা হয়েছে। তবে একথা সুনিশ্চিত যে যা ঘটেছে তা পশ্চিম-পাকিস্তানের প্রতি পক্ষপাতমূলক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বলে ঘটেনি। ঘটেছে এমন একটা পরিস্থিতিতে যার ওপর আমাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। তার মোকাবিলা করতে হয়েছিল আমাদের। দেশবিভাগের আগেই দশ লক্ষের মতো লোক পশ্চিম-পাকিস্তান থেকে চলে আসে। তাদের আমরা কোনো সাহায্যই করিনি। তারপর দুমাসের মধ্যে ৫০-৬০ লক্ষ মানুষের ঢল নেমে আসে।··· পূর্ব পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তুরা এসেছে ধীরে ধীরে। পশ্চিম-পাকিস্তান থেকে সব হিন্দু ও শিখ বিতাড়িত হয়েছে। পূর্ব-পাকিস্তানে হিন্দুদের এক বিরাট অংশ থেকে গেছে। আপনার ও আমাদের উভয়েরই নীতি হল এই যে এ ব্যাপারে এমন কোনো নীতি গ্রহণ করা উচিত্‌ হবে না যাতে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে সব হিন্দু পশ্চিমবঙ্গে চলে আসে। তাতে ভয়াবহ দুর্দশার সৃষ্টি হবে যার মোকাবিলা করা কোনো সরকারের পক্ষেই সম্ভব হবে না।

পূর্ব-পাকিস্তানি উদ্বাস্তুদের জন্য কত ব্যয় হয়েছে, তা তিনি জানেন না; একথা লিখতে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর লজ্জাবোধ হল না। তা খতিয়ে দেখার চেষ্টাও করলেন না তিনি। উপরন্তু উদ্বাস্তুদের চলে-আসা শুরু হওয়ার সময় থেকে তিনি যে গ্রামোফোন রেকর্ড বাজাতে শুরু করেছিলেন, তা বাজাতে ভুললেন না। তার মূল কথা হল : পূর্ব-পাকিস্তান থেকে হিন্দুদের চলে আসাটা অবাঞ্ছিত। এভাবে যদি তারা চলে আসতে থাকে তবে তা বিপর্যয় নিয়ে আসবে।

স্পষ্টতই নেহরু ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ দেশবিভাগের আগে সীমান্তের অপর পারের সংখ্যালঘুদের সমবেত কণ্ঠে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা ভুলে গিয়েছিলেন। কংগ্রেস নেতৃত্ব তাদের আশ্বাস দিয়েছিলেন যে ওদেশের সংখ্যালঘুরা যদি কোনোদিন সীমান্ত পেরিয়ে এদেশে চলে আসে, তবে তাদের সাদরে গ্রহণ করে আশ্রয় দেওয়া হবে। এই আশ্বাসের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে :

১৯৪৭-এর ১৬ জুলাই মহাত্মা গান্ধী নতুন দিল্লিতে তাঁর প্রার্থনান্তিক ভাষণে বলেছিলেন, "যেসব হিন্দুরা ভয়ে, তা সে বাস্তব অথবা কল্পিত যাই হোক না কেন, পাকিস্তান থেকে ঘর ছেড়ে চলে আসবে, তাদের সমস্যা আছে। তাদের দৈনন্দিন কাজে ও চলাফেরার পথে যদি বিঘ্ন সৃষ্টি করা হয়, নিজেদের দেশে যদি তাদের পরবাসী বলে আচরণ করা হয়, তাহলে সেখানে থাকা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। তাহলে সীমান্তের এ পাশে সংলগ্ন রাজ্যের কর্তব্য হবে তাদের সাদরে গ্রহণ করে সব রকমের ন্যায্য সুযোগ-সুবিধা দেওয়া। একথা যেন তাদের মনে না আসে যে তারা বিদেশে এসেছে।"[১৪] নেহরুও তাদের অনুরূপ আশ্বাস দিয়েছিলেন, "যারা পূর্ববঙ্গে বিপদগ্রস্ত হবে, আমাদের কর্তব্য হবে তাদের সেই দেশে রক্ষা করা এবং কোনো উপায়ান্তর না থাকলে তাদের আমাদের দেশে আশ্রয় দিতে হবে।"[১৫] কংগ্রেসের অধিকাংশ নেতাই এই ধরণের আশ্বাস দিয়েছিলেন। নেহরু ম্যাকিয়াভেল্লির শিষ্য ছিলেন, একথা হয়তো বলা চলে না। কিন্তু পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের সঙ্গে তিনি যে ব্যবহার করেছিলেন, তা ম্যাকিয়াভেল্লিকেই মানাত। পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন, কারণ সেই মুহূর্তে তা প্রয়োজন ছিল। কোনো পরিস্থিতিতেই উদ্বাস্তুরা যাতে এদেশে না এসে পড়ে, এই মুহূর্তেই তাই

প্রয়োজন। তাই এখন আর আশ্বাসের ললিতবাণী নয়, অতিশয় কর্কশ সাবধানবাণী "এদেশে এসো না। এলে বিপর্যয় হবে এবং আমার কিছু করার থাকবে না।"

অতএব দেশবিভাগের পর সব প্রতিশ্রুতি বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেল। যখন উদ্বাস্তুরা এদেশে আসতে শুরু করল, তখন কংগ্রেসি নেতারা এবং এদেশের মানুষ ঘৃণাভরে অবজ্ঞায় মুখ ফিরিয়ে রইলেন। তাঁরা উদ্বাস্তুদের অবৈধ অনুপ্রবেশকারী হিশেবে চিহ্নিত করলেন। তাদের বাঙাল ভাষা, পানীয় জল ও সরকারি ডোল-এর জন্য কলহ ও মারামারি, কালিঝুলি মাখা জীর্ণ দেহ পশ্চিমবঙ্গের ফিটফাট বাবুদের তাচ্ছিল্যভরা ঘৃণার উদ্রেক করত। এদের মানুষ বলে ভাবাই কঠিন। পঙ্গপালের মতো এরা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের দুষ্প্রাপ্য খাদ্যবস্তুতে ভাগ বসাচ্ছে। সংবাদপত্রে একথা বলা হতে লাগল যে এই অবাঞ্ছিত মানুষগুলির জন্য খাদ্যের ঘাটতি দেখা দিয়েছে।

ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউট হলে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে সার যদুনাথ সরকার পশ্চিমবঙ্গবাসীর এই ধরণের মনোভাবের বিরুদ্ধে তাঁর স্মরণীয় সাবধানবাণী উচ্চারণ করেন:

এই মূল্যবান জাতীয় শাখাকে (উদ্বাস্তুদের) পুরোনো ক্ষীয়মাণ বৃক্ষের সঙ্গে জুড়ে নাও এবং শক্তি ও সমৃদ্ধির এক নতুন যুগে মাথা তুলে দাঁড়াও।...এতে তোমাদের মঙ্গল হবে। তোমরা মন্ত্রিসভায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে ও অন্যান্য পেশায় জাঁকিয়ে বসে আছ। সুযোগ-সুবিধা হারাবার ভয়ে তোমরা শঙ্কিত হয়ো না; রাজনৈতিক দালালি অথবা নির্বাচন ব্যবস্থার নিপুণ ব্যবহার করে যা অর্জন করেছ, তা এদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে ভয় পেও না। তোমাদের রক্তে এই নতুন রক্ত মেশাও। নয়তো তোমরা মরবে এবং তোমাদের সন্তানসন্ততিদেরও ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

আপাতদৃষ্টিতে তাদের যতই বিবশ ও ভেঙেপড়া বলে মনে হোক না কেন, পূর্ববঙ্গ ছেড়ে যারা চলে আসছে, তারা মস্তিষ্ক, বিত্ত, সাংগঠনিক শক্তি, অদম্য মনোবলে সেই দেশের মানুষের শ্রেষ্ঠ অংশ। পূর্ববঙ্গে জনসমষ্টির সবচেয়ে মূল্যবান অংশ এরাই। একটা দেশের শ্রেষ্ঠত্ব ঠিক এই ধরণের মানুষের ওপরই নির্ভর করে। ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, ফরিদপুর এদের হারাচ্ছে এবং ঠিক পরবর্তী প্রজন্মেই ঈশ্বরের ন্যায়ের দণ্ড এদের ওপর নেমে আসবে।

যা নেহরু দেখেননি অথবা দেখতে চাননি, তা সার যদুনাথের চোখে পড়েছিল। তিনি স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন যে হিন্দুদের পক্ষে পূর্ববঙ্গে টিকে থাকা সম্ভব হবে না। পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের জন্য ভবিষ্যতের গর্ভে কী নিহিত আছে, তা তিনি সুস্পষ্টভাবে দেখতে পেয়েছিলেন। তাঁর এই ভবিষ্যৎ দৃষ্টি আক্ষরিকভাবে সত্য প্রমাণিত হয়েছিল। তিনি দ্রষ্টা ঋষির মতো বলেছিলেন :[১৭]

আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার স্বীকার করেছেন যে ১৯৪৮-এর জুলাই মাসের শেষ নাগাদ সাড়ে এগারো লাখ মানুষ পূর্ববঙ্গ ছেড়ে চলে এসেছে। এই উদ্বাস্তু প্রবাহ শেষ হয়নি; পাঁচদিন আগেও ৭৬০ জন মানুষ পূর্ব-পাকিস্তান থেকে শিয়ালদহ রেলস্টেশনে নেমেছে এবং এই প্রবাহ কখনো কখনো দিনে এক হাজারে গিয়ে পৌঁছচ্ছে। দূর ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়েও এই উদ্বাসন কখনো থামার সম্ভাবনা আছে বলে তো মনে হয় না; বছরের পর বছর আসবে এবং মানুষের একটি ক্ষীণ ধারা—প্রতিদিন পূর্ববঙ্গ থেকে অন্তত একশো লোক চলে আসবে এবং কলকাতা হবে এই মনুষ্যরূপ মালের গুদাম।

সার যদুনাথ স্পষ্টই দেখতে পেয়েছিলেন যে পূর্ব-পাকিস্তান বর্বরযুগে ফিরে যাচ্ছে। হিন্দুদের সেখানে কোনো ভবিষ্যৎ নেই, সম্মানজনক কোনো কর্মসংস্থানের সুযোগ নেই নেই খোলা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা লাভের কোনো আশা।

সার যদুনাথ অরণ্যে রোদন করছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ অথবা সরকার সার যদুনাথের সাবধানবাণীতে কান দেয়নি। ইতিহাসের সর্ববৃহৎ উদ্বাসনের সুদূরপ্রসারী অন্তর্নিহিত অর্থের বিন্দুমাত্র ধারণাও কারো ছিল না। এই উদ্বাসনের ফলে অবসাদগ্রস্ত পশ্চিমবঙ্গের পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনা ছিল। আবার এতে পশ্চিমবঙ্গের পঙ্গু হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও ছিল। সবকিছুই নির্ভর করছিল পশ্চিমবঙ্গের প্রতিক্রিয়ার উপর। এ সময়ে কেউ লক্ষ করেনি যে কলকাতা অবাঙালি মানুষে ভরে গিয়েছিল। কলকাতায় অবাঙালিদের সংখ্যা বাঙালিদের চেয়ে মাত্র পাঁচ শতাংশ কম ছিল। উদ্বাস্তুরা আসার ফলে জনসংখ্যার ভারসাম্যের এই অভাবের সংশোধন হল। কিন্তু কেন লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের মাতৃভূমি ছেড়ে অজানা ভবিষ্যতের পথে পা বাড়াল এবং কেনই-বা তারা একটি মহানগরের অজানা বিপদ অগ্রাহ্য করে সেখানে চলে এল, একথা কেউ গভীরভাবে ভেবে দেখল না। সংগঠিত আর্থিক ও ধর্মীয় পীড়ন কিভাবে একটি জাতিকে অনাহার ও মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিল, সে বিষয়ে এদেশে বিশেষ সচেতনতা ছিল না। সংগঠিত হত্যা ও সম্পত্তি লুণ্ঠনের চেয়েও আত্মপরিচয় হারিয়ে ফেলার যন্ত্রণা তাদের অনেক বেশি পীড়া দিত। হিন্দুরা সব হারিয়ে এদেশে চলে এল, কিন্তু এদেশের মুসলমানদের গায়ে কাঁটার আঁচড়ও লাগেনি।

পশ্চিমবঙ্গের বুদ্ধিজীবীরা পূর্ববঙ্গের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও হিন্দুদের উচ্ছেদের বর্ণনা করতে লজ্জাবোধ করত। মার্কাস ফ্রান্ডা তা লক্ষ করেছেন।[১৮] এই হতভাগ্য ছিন্নমূল মানুষগুলি সম্পর্কে কলকাতার উন্নাসিক বুদ্ধিজীবীদের কিছু বলার ছিল না। উদ্বাস্তুদের চরম দুর্দশার যে চিত্র দিনের পর দিন তাদের চোখে পড়ত, তা তাদের হৃদয় স্পর্শ করেনি। এ যুগের সাহিত্য ও শিল্পে উদ্বাস্তুদের দুর্ভাগ্যের প্রতিফলন কদাচিৎ চোখে পড়বে। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার যাতে এই হতভাগ্য মানুষগুলির প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করে, উদ্বাস্তুদের হয়ে তা বলার কোনো শক্তিশালী গোষ্ঠী ছিল না পশ্চিমবঙ্গে। যতদিন উদ্বাস্তুদের মধ্য থেকেই তাদের নেতারা উঠে আসেনি, ততদিন তাদের দাবি নিয়ে লড়াই করার কোনো মানুষ ছিল না পশ্চিমবঙ্গে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পূর্ণ উদাসীনতা সত্ত্বেও রাজ্য সরকার একেবারে চুপচাপ বসে থাকেনি। লক্ষ লক্ষ মানুষ যখন আহার ও আশ্রয়ের সন্ধানে কলকাতা ও শহরতলীতে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, তখন রাজ্য সরকারের পক্ষে চুপচাপ বসে থাকা সম্ভব ছিল না। ১৯৪৯-এর জুন নাগাদ উদ্বাস্তুপ্রবাহ অনেকটা হ্রাস পেয়েছিল। ১৯৪৮-এ 'ওয়েস্ট বেঙ্গল ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ও প্ল্যানিং অ্যাক্ট' (Act XXI of 1948) পাশ হওয়ায় উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য জমি অধিগ্রহণ সম্ভব হল। সরকারি আশ্রয়শিবিরে তখনো ২১,৫০০ উদ্বাস্তু ছিল। তাদের পুনর্বাসনের জন্য জমির প্রয়োজন ছিল।

মনে হচ্ছিল পরিস্থিতি অনেকটা সহজ হয়ে এসেছে। প্রয়োজনীয় জমি অধিগৃহীত হলেই ক্যাম্পের উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দেওয়া যাবে। কিন্তু হঠাৎ আবার পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে উঠল। ১৯৫০-এর প্রথম দিকে কলকাতায় খবর এল যে পূর্ববঙ্গের খুলনা, বরিশাল ও অন্যান্য জেলায় নমশূদ্রদের ওপর হিংস্র অত্যাচারের ফলে অসংখ্য মানুষ চলে

আসছে। হিন্দুদের ওপর অমানুষিক নির্যাতনের খবর পশ্চিমবঙ্গে ছড়িয়ে পড়ায় পশ্চিমবঙ্গে দাঙ্গা শুরু হয়ে যায়। কিন্তু এবার পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের সীমান্ত পেরিয়ে চলে আসাও সহজ হয়নি। হাজার হাজার উদ্বাস্তু পূর্ববঙ্গের রেলস্টেশন, স্টিমারঘাট ও ঢাকা বিমান বন্দরে অপেক্ষা করতে লাগল। পূর্ব-পাকিস্তান সরকার তাদের মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করার কোনো ব্যবস্থা করেনি। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতির অপেক্ষা না করেই ডঃ রায় এই মৃত্যুপথযাত্রী মানুষগুলিকে বাঁচাবার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিলেন। ঢাকা বিমানবন্দর থেকে উদ্বাস্তুদের নিয়ে আসার জন্য ১৬টি ভাড়াটে বিমান অবিলম্বে কাজে লাগালেন। ফরিদপুর, বরিশালের স্টিমারঘাটে যে হাজার হাজার উদ্বাস্তু মৃত্যুর দিন গুনছিল, তাদের নিয়ে আসার জন্য ১৫টি বড় যাত্রীবাহী স্টিমার পাঠালেন। হিন্দুরা যখন পালিয়ে আসছে, তখন পথেই তাদের খুন করা হচ্ছে, এই খবর ছড়িয়ে পড়ায় পশ্চিমবঙ্গ অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠল। সরোজ চক্রবর্তী লিখছেন,[১৯] "একদিন সন্ধ্যাবেলা রাইটার্স থেকে ফিরে ডঃ রায় জানতে পারলেন যে বনগাঁ সীমান্ত থেকে শিয়ালদহ স্টেশনে যে গাড়ি এসেছে, তার কয়েকটি কামরায় যাত্রী ছিল না; ছিল মেয়েদের হাতের বালা ও শাঁখার ভাঙা টুকরো, ছেঁড়া শাড়ি ও রক্তাক্ত মানুষের মৃতদেহ। ডঃ রায় তৎক্ষণাৎ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ফোনে কথা বললেন। আমরা যারা একতলায় ছিলাম, তারাও ফোনে ডঃ রায়ের উত্তপ্ত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। তিনি প্রধানমন্ত্রীকে বলছিলেন যে তাঁর পক্ষে আর এদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে রক্ষা করা সম্ভব হবে না। যুদ্ধ ছাড়া এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হবে না। তাঁর ধৈর্যের সীমা ছাড়িয়েছে। কলকাতা অগ্নিগর্ভ, হাওড়ার অবস্থা ভয়াবহ, সেনা নামাতে হচ্ছে।"

১৯৫০-এর উদ্বাস্তুপ্রবাহ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রশাসনিক কাঠামোকে প্রায় ভাঙনের মুখে নিয়ে এল। ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম দিকেই বোঝা যাচ্ছিল যে এই অগণিত মানুষের ঢল পশ্চিমবঙ্গকে প্রচণ্ড আঘাত করবে। কিন্তু এই মুহূর্তের সমস্যা ছিল যন্ত্রণায় কাতর এই মানুষগুলির জন্য খাদ্য ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা। রাজ্য সরকার পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তের বনগাঁ ও দর্শনাতে অস্থায়ী শিবির গড়ে তুললেন। এই আশ্রয় শিবিরের মানুষগুলিকে 'বাস্তুহারা' এই মর্মে সার্টিফিকেট দেওয়া হল। এই সার্টিফিকেট তাদের স্থায়ী সরকারি ক্যাম্পে আশ্রয়ের অধিকার দিল। পরে এই সার্টিফিকেটকে বর্ডার স্লিপ বলা হত।

১৯৫০-এর দাঙ্গায় একটি সত্য স্পষ্ট হয়ে উঠল। কেন্দ্রীয় সরকারের কথায় চিঁড়ে ভিজবে না। উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানের জন্য কিছু না করলেই নয়। কেন্দ্রীয় সরকারের পুনর্বাসনমন্ত্রী মোহনলাল সক্‌সেনা কলকাতায় বৈঠক ডাকলেন। এতে পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম, বিহার, ওড়িশার প্রতিনিধি ও মেঘনাদ সাহার মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে আমন্ত্রণ জানানো হল।

বৈঠকে আলোচনার বিশেষ কিছু ছিল না। বৈঠকে আহূত ব্যক্তিদের সক্‌সেনা জানিয়ে দিলেন যে নবাগত উদ্বাস্তুদের কেন্দ্রীয় সরকার ত্রাণ দেবে, পুনর্বাসন নয়, কেননা পূর্ববঙ্গে দাঙ্গাহাঙ্গামা বন্ধ হলেই আবার উদ্বাস্তুরা স্বদেশে ফিরে যাবে। অতএব পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করার কোনো যুক্তি নেই। স্পষ্টতই কেন্দ্রীয় সরকার পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে চাইছিলেন না। সক্‌সেনার কথা শুনে বোঝা গেল সরকার হাত গুটিয়ে বসে থাকতেই চাইছে।

ডঃ মেঘনাদ সাহা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করে বললেন যে সরকার ভুলে গেছে দেশবিভাগের আগে কংগ্রেসি নেতারা পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের

কি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এখন সেই প্রতিশ্রুতি পালন না করলে বিশ্বাসভঙ্গ করা হবে। সক্‌সেনা সব শুনলেন। কিন্তু তিনি তো আলোচনা করে উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে কলকাতা আসেননি। তিনি এসেছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত ঘটা করে বৈঠক করে জানিয়ে দিতে। কেন্দ্রীয় সরকার একথা বুঝতে চায়নি যে সাম্প্রদায়িক ধর্মের ভিত্তিতে দেশবিভাগ মেনে নেওয়া হয়েছিল। পাকিস্তান পুরোপুরি মুসলমানদের দেশ এবং মুসলমান দেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে সহ্য করা হয় না। তাই পশ্চিম-পাকিস্তান থেকে যেমন সংখ্যালঘুরা বিতাড়িত হয়েছে, তেমনি পূর্ব-পাকিস্তানের সংখ্যালঘুরাও দেশত্যাগ করতে বাধ্য হবে।

নেহরুর বোঝা উচিত ছিল পাঞ্জাবে যেভাবে জনবিনিময় করে উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান করা হয়েছে, ঠিক সেভাবেই পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান সম্ভব। পাঞ্জাবে জনবিনিময় সম্ভব হল, ভারতের ঐশ্বর্য ঢেলে দিয়ে তাদের পুনর্বাসন দেওয়া হল। কিন্তু বাঙালি হিন্দুদের ক্ষেত্রে জনবিনিময় সম্ভব নয়, পূর্ব-পাকিস্তানের লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুরা আসলে উদ্বাস্তুই নয়। তারা ভয় পেয়ে চলে এসেছে। কিন্তু তারা এদেশে থাকবে না। দেশে ফিরে যাবে। কেন দেশে ফিরে যাবে? কারণ নেহরু তাই বিশ্বাস করেন। কিন্তু এই বিশ্বাসের পেছনে কোনো যুক্তি ছিল না। এদিকে ১৯৫০-এ দুই বঙ্গে দাঙ্গার ফলে হিন্দুরা একতরফাভাবে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসছিল না। পশ্চিমবঙ্গ থেকে মুসলমানরাও পূর্ববঙ্গে চলে যাচ্ছিল। বেসরকারিভাবে সম্পত্তি ও জনবিনিময়ের ফলে উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু এই ধরণের বেসরকারি জনবিনিময় ঘটলে নেহরুর ধর্মনিরপেক্ষতার ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ণ থাকবে না। অথচ কাশ্মীরের অন্তর্ভুক্তির আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির জন্য এই বেসরকারি জনবিনিময় চলতে দেওয়া যেতে পারে না। অতএব কাশ্মীরের মুসলমানদের সন্তুষ্ট রাখার জন্য ভারতের সম্পদ বিলিয়ে দেওয়া যেতে পারে এবং পূর্ব-পাকিস্তানের কয়েক কোটি হিন্দুকে বিসর্জন দেওয়া যেতে পারে।

১৯৫০-এর ২৭ ফ্রেব্রুয়ারি সংসদে এ বিষয়ে উত্তপ্ত আলোচনা হয়েছিল। নেহরু বললেন, জনবিনিময়ের প্রস্তাব ভারতের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় আদর্শের পরিপন্থী। এই প্রস্তাবের সঙ্গে আরো বড আদর্শ জডিয়ে আছে। এতে বিশ্বাসভঙ্গ করা হবে।

উত্তরে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বলেছিলেন যে পাঞ্জাবে জনবিনিময়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করাব সময় পণ্ডিত নেহরুর বিশ্বাসভঙ্গের ব্যাপারটা হিমঘরে রেখে দিয়েছিলেন। বর্তমান পরিস্থিতিতেও বিশ্বাসভঙ্গের ব্যাপারটা সেভাবেই ঠাণ্ডা ঘরে তুলে রেখে অভিজ্ঞ রাজনীতিজ্ঞের মতো পরিস্থিতির মোকাবিলা করাই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু নেহরু ইতিপূর্বেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ডঃ মুখার্জির যুক্তিতে তিনি কান দিলেন না। পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানরা যাতে পূর্ববঙ্গে চলে না যায়, তার ব্যবস্থা করলেন। বিশ্বের দরবারে তাঁর ভাবমূর্তি অটুট রইল। তিনি সাড়ম্বরে ঘোষণা করলেন, ভারতের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নিরাপদে আছে। কাশ্মীরের ভারতভুক্তি যাতে বিঘ্নিত না হয় সেজন্য ১৯৫০-এ জনবিনিময়ের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু সমস্যার সহজ সমাধানের পথ রোধ করে দাঁড়ালেন নেহরু। তিনি পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের রক্ষা করলেন, কিন্তু পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের ঠেলে দিলেন এক শ্বাসরোধকারী অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে।

অতএব ডঃ মেঘনাদ সাহার তীব্র আক্রমণের কোনো জবাব ছিল না সক্‌সেনার

কাছে। তিনি শুধু দিল্লির সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা করলেন, "উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দেওয়া হবে না। সাময়িকভাবে তারা ত্রাণশিবিরে আশ্রয় পাবে।" তাঁর হিশেবমতো পশ্চিমবঙ্গে যত উদ্বাস্তু এসেছে, তাদের মধ্যে ২ লক্ষ সরকারের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হবে। এই ২ লক্ষ উদ্বাস্তুর মধ্যে ত্রিপুরা ও ওড়িশা নেবে ২৬,০০০ ও বিহার ৫০,০০০। অবশিষ্ট উদ্বাস্তুদের দায়িত্ব নেবে পশ্চিমবঙ্গ। সক্‌সেনা রাজ্য সরকারকে সীমান্তবর্তী এলাকায় আশ্রয়শিবির স্থাপনের নির্দেশ দিলেন। তাঁর আশা ছিল পরিস্থিতি শান্ত হলে উদ্বাস্তুরা আবার দেশে ফিরে যাবে।[২০]

ধুবুলিয়া, ফুলিয়া, রানাঘাট ও অন্যান্য জায়গায় আশ্রয়শিবির প্রতিষ্ঠা এই সিদ্ধান্তের ফল। এই শিবির বা ক্যাম্পগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল কুপার্স ক্যাম্প। কিন্তু উদ্বাস্তুরা সরাসরি এই সব ক্যাম্পে আসত না। সীমান্তে তাদের বর্ডার স্লিপ দেওয়া হত। এই বর্ডার স্লিপের জোরেই তারা যে কোনো একটি ক্যাম্পে আশ্রয় পেত। কিন্তু ক্যাম্পে আশ্রয় পাওয়ার আগে তাদের শিয়ালদহ স্টেশনে অপেক্ষা করতে হত। গঙ্গার দুপারের চটকলের গুদামগুলিতেও অস্থায়ী ক্যাম্প তৈরি করা হয়েছিল। উদ্বাস্তুদের পাটের গাঁটের মতোই গাদাগাদি করে রাখা হল এই গুদামগুলিতে। এভাবে কিছুদিন শিয়ালদহ স্টেশনে, কিছুদিন অস্থায়ী ক্যাম্পের স্যাঁতসেঁতে মাটিতে এবং শেষপর্যন্ত ত্রাণশিবিরে আশ্রয় পেল উদ্বাস্তুরা।

১৯৫০-এর ৮ মার্চ নেহরু স্বয়ং বনগাঁ সীমান্তের উদ্বাস্তু শিবির দেখতে এলেন। নিজের কানে উদ্বাস্তুদের দুঃখদুর্দশার কথা শুনলেন। নেহরু নিলোখেরি উদ্বাস্তু উপনগরীর প্রতিষ্ঠাতা এস কে দে-কে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। ফুলিয়াতে এ ধরণের আদর্শ উপনগরী গড়ে তোলার দায়িত্ব দেওয়া হল তাঁকে। তা থেকে বোঝা গেল যে উদ্বাস্তুদের দায়িত্ব নেওয়ার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তারা যে দেশে ফিরে যেতে পারবে না, এই বাস্তব সত্যকে নেহরুর পক্ষেও আর অস্বীকার করা সম্ভব ছিল না।

১ হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়—উদ্বাস্তু : পৃ ১৫৬-৫৭
২ অমৃতবাজার পত্রিকা : ৮ অক্টোবব, ১৯৪৮
৩ তদেব, ২০ অক্টোবব, ১৯৪৮
৪ তদেব, ৮ অক্টোবর, ১৯৪৮
৫ তদেব, ১৮ আগস্ট, ১৯৪৮
৬ তদেব : ৮ অক্টোবর, ১৯৪৮
৭ হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায—উদ্বাস্তু পৃ ৩১
৮ বিজয় মজুমদাবের সঙ্গে সাক্ষাৎকার
৯ **Saroj Chakraborti: with Dr. B. C. Roy and other Chief Ministers (Publisher Rajat Chakraborti) Vol I p. 107**
১০ তদেব, পৃ ১০৯
১১ তদেব, পৃ ১০৯
১২ তদেব, পৃ ১৪০—১৪২
১৩ তদেব, পৃ ১৪৩
১৪ তদেব, ১৬ জুলাই, ১৯৪৭ (?)

১৫ তদেব (?)
১৬ তদেব, ১৮ আগস্ট, ১৯৪৮
১৭ তদেব, ১৮ আগস্ট, পৃ ১৪৮
১৮ **Marcus Franda, Radical Politics in West Bengal. (M. I. T. Press USA) p-38** পাদটীকা
১৯ সরোজ চক্রবর্তী **With Dr. B. C. Roy and others Chief Ministers. Vol I.** পৃ ১৫৪-১৫৫।
২০ উদ্বাস্তু, পৃ ৫৯

তৃতীয় অধ্যায়

# জবরদখল কলোনি

আগেই বলা হয়েছে যে গ্রামাঞ্চলের কৃষক, শিক্ষক, কৃষির সঙ্গে যুক্ত কারিগর, ছোট দোকানদার ও অন্যান্য স্বল্প আয়ের মানুষ সরকারি ক্যাম্পে আশ্রয় নিয়েছিল। তাদের কাছে কলকাতা পুরোপুরি অজানা নির্বান্ধব শহর। এই নির্বান্ধব দেশে এই নিরুপায় মানুষগুলিকে অসহায়তার বোধ এমন আচ্ছন্ন করেছিল যে সরকারি ক্যাম্পে আশ্রয় নেওয়া ছাড়া টিকে থাকার অন্য কোনো পথ তারা খুঁজে পায়নি। কিন্তু উদ্বাস্তুদের মধ্যে আরো হাজার হাজার মানুষ ছিল যাদের অদম্য ইচ্ছাশক্তি ছিল, যাদের স্বনির্ভর হওয়ার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ছিল। তারা আশ্রয় চেয়েছিল, তা পতিত জমি, জনশূন্য বাড়ি, ক্যাম্প যেখানেই হোক না কেন। কলকাতার শহরতলীতে আশ্রয় পেলে অন্নের সংস্থান নিজেরাই করতে পারবে, এই ভরসা তাদের ছিল। ১৯৪৮-এর প্রথম দিক থেকেই শিয়ালদহ স্টেশনের দুর্বিষহ জীবন তাদের কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। সুতরাং এদের অনেকেই কলকাতায় বাসস্থান খুঁজে নেয়। বালিগঞ্জ লেক-এর ধারে, যোধপুরে, শাহপুরে, দুর্গাপুরে, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে এবং ধর্মতলায় যে সব ফাঁকা মিলিটারি ব্যারাক ছিল তা এরা দখল করে নেয়। তাছাড়াও কিছু পরিত্যক্ত বাড়ি ছিল, কিছু নবনির্মিত ফাঁকা বাড়ি ছিল তাতেও এরা অবৈধভাবে ঢুকে পড়ে। সরকার ডোল হিশেবে যে সামান্য অর্থ ও শুকনো খাবার দিত, তার বাইরে এরা সরকারের কাছে আর কিছু চায়নি।

এভাবে যারা অবৈধভাবে কলকাতা ও শহরতলীতে পরিত্যক্ত বাড়ি, বাগানবাড়ি, মিলিটারি ব্যারাকে চলে গেল, তাদের সংখ্যা বেশি ছিল না। তারা জানত এই ব্যবস্থা নিতান্তই সাময়িক। কলকাতার বুকের ওপর ছেঁড়া কাপড় উপবাসী দেহে জড়িয়ে তারা বেশিদিন থাকতে পারবে না, এইসব উদ্‌ভ্রান্ত মানুষেরা তা জানত। এই পদক্ষেপ প্রায় ভাঙা নৌকায় সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়ার মতো। তবু শিয়ালদহ স্টেশনের দরজা দিয়ে তারা ক্যাম্পের নরকে পচে মরতে চায়নি। তাছাড়া কলকাতার পাথুরে বুকে এভাবে দিশেহারা হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার পর একটা নতুন পথ খুলে যাওয়ার সংকেত পাওয়া গেল।

## নতুন পথ খুলে গেল

দীর্ঘকাল থেকেই মধ্যবিত্ত হিন্দুরা উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য ও চাকরির সন্ধানে ওপার বাংলা থেকে কলকাতায় চলে আসতেন। তাদের অনেকে কলকাতার সরকারি ও

সদাগরি অফিসে এবং গঙ্গার দুপারে গড়ে ওঠা কলকারখানায় কাজ করতেন। তাঁরা মেসে অথবা ভাড়াবাড়িতে থাকতেন। স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-পরিজন থাকত ধলেশ্বরী, বুড়িগঙ্গা, পদ্মানদীতীরের গ্রামে। পুজোর ছুটিতে তারা বাড়ি যেতেন। কলকাতার বাবুরা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এই নিদ্রিত গ্রামগুলি যেন জেগে উঠত। কলকাতা থেকে বাবুরা প্রিয়জনদের জন্য নানা উপহার নিয়ে আসতেন। গ্রামের হাটেবাজারে গিয়ে তারা দুহাতে টাকা খরচ করতেন, যাত্রা ও নাটকে অংশগ্রহণ করতেন। বিদেশে তাদের বুকের ভেতরে যে ভালোবাসা জমে থাকত, তা পদ্মাপারের গ্রামের নীলাকাশে, পাকা ধানের শীষে, সর্ষেখেতের হলুদে ছড়িয়ে যেত। গ্রামের মানুষ ও আত্মীয়-পরিজনদের মধ্যে এক ধরণের মূর্ছিত আবেশের মধ্যে দিন কেটে যেত। ছুটির পর কলকাতা ফিরে যাওয়া। এক বছর পরে আবার ঘরে ফিরে আসা।

তাদের দেশ নিয়ে এই মানুষগুলির গর্বের সীমা ছিল না। দেশের ভাষার প্রতিও মমত্ববোধের অন্ত ছিল না এই বাঙালদের। সত্যিই শস্যশ্যামলা তাদের দেশ। নদী-খাল-বিল- পুকুর-দীঘির জলে ভাসমান এই দেশ। পরমাশ্চর্য সব নদী। ব্রহ্মপুত্র, ধলেশ্বরী, মেঘনা, বুড়িগঙ্গা ও সমুদ্রের মতো পদ্মা। আরো কত ছোটবড় নদী। বড় কোমল, নরম মাটি। বর্ষায় পদ্মা ফুলে ওঠে, পাড় ভাঙে, দূর থেকে তার গর্জন শোনা যায়। গ্রামের পর গ্রাম ভেঙে নিয়ে যায় পদ্মা। সারারাত বৃষ্টির ঝমঝম, ঝোড়ো হাওয়া গাছ ভেঙে পড়ার শব্দ। মনে হয় প্রকৃতির রুদ্র রোষে যেন সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবে। তারপর হঠাৎ একদিন বৃষ্টি থেমে যায়। পদ্মার গর্ভের মাটি জেগে ওঠে। নতুন প্রাণের জন্ম হয়। কালো মেঘ মিলিয়ে যায়। পেঁজা তুলোর মতো মেঘ আকাশে ভাসে। এই তাদের ভালোবাসার দেশ।

এদেশে স্কুলের পাঠ শেষ করে এদের অনেকেই কলকাতার কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যেতেন। পড়াশোনা শেষ হলে কলকাতায় এবং ভারতের যে কোনো জায়গায় জীবিকার্জনের পথ খুঁজে নিতেন। যারা জীবনে প্রতিষ্ঠালাভ করতেন, তারা দেশ থেকে পবিবার পরিজন নিয়ে আসতেন। বেশিরভাগ মানুষই মেস বা ভাডা বাডিতে থাকতেন। পুজোর ছুটিতে দেশে যেতেন।

নোয়াখালি দাঙ্গার পর থেকে যখন পুব বাংলা থেকে বাস্তুহারা হয়ে মানুষেরা চলে আসতে লাগল, তখন এই প্রবাসী মানুষগুলির আত্মীয়-পরিজনেরা সব হারিয়ে তাদের কাছে এসে আছড়ে পড়ল। মেস বা ভাড়াবাড়িতে থেকে এরা যে টাকা পাঠাত, তাতে তাদের পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন হত। ভিটেমাটি ছেড়ে সর্বস্বান্ত হয়ে এদের আত্মীয়-পরিজন সব চলে এসেছে। তাদের কোথায় রাখবে এরা। সরকার ডোল নামে যে ভিক্ষা দিচ্ছিল, তা এরা চায়নি, ক্যাম্পের নরকও এদের পক্ষে সহনীয় ছিল না। তাতে এদের আত্মমর্যাদার হানি হত। এদের সমস্যা ছিল আশ্রয়ের, অন্নবস্ত্রের নয়। শেষপর্যন্ত আত্মমর্যাদাবোধ ও আশ্রয়হীনতার সংকট এদের রাজ্য ও কেন্দ্রীয সরকারের এবং জমির ফাটকাবাজদের জমি অবৈধ দখলের পথে নিয়ে যায়। এ থেকেই কলকাতার শহরতলীতে ও পশ্চিমবঙ্গের অন্যত্র উদ্বাস্তুদের দ্বারা জবরদখল কলোনি প্রতিষ্ঠা শুরু হয়।

কলকাতার দক্ষিণ শহরতলী যাদবপুরে প্রথম যে কলোনিটি প্রতিষ্ঠিত হয় তা বিজয়গড় নামে অভিহিত হল। এই কলোনি প্রতিষ্ঠার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বিখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী সন্তোষ দত্ত ও ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী। যাদবপুরে সরকারি জমিতে যুদ্ধের

সময় যে মিলিটারি ব্যারাক তৈরি হয়েছিল তা ফাঁকা পড়েছিল। কয়েকদিনের মধ্যেই সন্তোষ দত্তের নেতৃত্বে বহু উদ্বাস্তু পরিবার এই ব্যারাকগুলি দখল করে নেয়। ব্যারাকগুলির সংলগ্ন সরকারি জমিতে অসংখ্য উদ্বাস্তু পরিবার হোগলা ও বাঁশ দিয়ে ঘর তৈরি করে নেয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিজয়গড় কলোনিকে বে-আইনি জবরদখল কলোনি বলা হয়তো সঙ্গত নয়। কেননা সন্তোষ দত্ত এই কলোনি গড়ে তোলার আগে ডঃ রায়ের এমনকি নেহরুরও মৌখিক সম্মতি আদায় করে নিয়েছিলেন এমন প্রমাণ আছে। অতএব এই কলোনি বে-আইনি জবরদখল কলোনি নয়, আবার আইনসঙ্গত কলোনিও নয়। এর স্থান এই দুইয়ের মাঝামাঝি। ১৯৪৯-এ এটি একটি উপনগরীর রূপ নেয়। এই কলোনি গড়ে তুলতে সরকারের একটি কানাকড়িও খরচ হয়নি। এর সংগঠনে সরকারের মৌখিক সম্মতি ছিল মাত্র।

যদিও বিজয়গড় কলোনিকে অবৈধ জবরদখল কলোনি বলা চলে না, তবু এই কলোনি প্রতিষ্ঠার পেছনে যে সরকারের মৌন সম্মতি ছিল, তা খুব অল্প লোকই জানত। সাধারণ উদ্বাস্তুরা এই কলোনিকে বে-আইনি জবরদখল কলোনি বলেই মনে করেছিল। সুতরাং বিজয়গড় কলোনি উচ্ছেদের কোন সরকারি প্রয়াস দেখা গেল না। তখন অনেক উদ্বাস্তুর মনে এই ধারণা জন্মেছিল যে সংঘবদ্ধভাবে চেষ্টা করলে বিজয়গড় কলোনির মতো আরো কলোনি গড়ে তোলা সম্ভব।

এ সময়ে পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতিও এই ধরণের কলোনি গড়ে তোলার অনুকূল ছিল, বলা যেতে পারে। বিপুলসংখ্যক উদ্বাস্তুর চাপে পশ্চিমবঙ্গের নাভিশ্বাস ওঠার মতো অবস্থা হয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুর উপস্থিতি নিতান্তই সাময়িক ব্যাপার বলে উড়িয়ে দিতে চাইছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের আচরণে ডঃ রায় যে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন, তা নেহরুকে লেখা তাঁর চিঠি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। তাই শহরতলীতে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের এবং ফাটকাবাজদের পতিত জমিতে উদ্বাস্তুরা জবরদখল কলোনি গড়ে তুলে যদি ডঃ রায়ের কাঁধের বোঝা কিছুটা লঘু করে দেয়, তাহলে তাঁর অস্বস্তি হওয়ার কথা নয়। কিন্তু উদ্বাস্তুরা জানত যে অপরিকল্পিতভাবে জবরদখল কলোনি গড়ে তোলার জন্য ঝাঁপ দিলে তারা বিপদে পড়বে। তাদের সংঘবদ্ধ হতে হবে। পুলিশ ও জমির মালিকের ভাড়াটে গুণ্ডার আক্রমণের বিরুদ্ধে লৌহকঠিন সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা আছে। এই প্রয়োজনের তাগিদেই 'সংযুক্ত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদ' (ইউ সি আর সি—UCRC) নামে কেন্দ্রীয় উদ্বাস্তু সংগঠন জন্ম নেয়।

## সংযুক্ত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদ (ইউ সি আর সি—United Central Refugee Council)

পশ্চিমবঙ্গে ইউ সি আর সি নামে অভিনব সংগঠন গড়ে তোলার এবং জবরদখল কলোনি প্রতিষ্ঠার ইতিহাস যে বিচিত্র পথে গেছে, তা বুঝতে হলে স্বাধীনতার অব্যবহিত পূর্বে এবং পরে হিন্দু মধ্যবিত্ত উদ্বাস্তুদের বিশিষ্ট রাজনৈতিক প্রবণতার কথা মনে রাখতে হবে। এ সম্পর্কে ধারণা না থাকলে জবরদখল কলোনি পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে কিভাবে তাকে ভিন্নমুখে নিয়ে গিয়েছিল তাও বোঝা যাবে না।

দেশবিভাগের পর এদেশে যখন উদ্বাস্তুদের ঢল নেমে এল তখন কংগ্রেস, কমিউনিস্ট ও অন্যান্য বামপন্থী দল কিভাবে এই নতুন পরিস্থিতির মোকাবিলা করবে, তা ভেবে পায়নি। কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট পার্টি তো উদ্বাস্তুরা এদেশে আসায় রীতিমতো ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। তবে তাদের আশা ছিল যে পূর্ববঙ্গের অবস্থা স্বাভাবিক হলে তারা দেশে ফিরে যাবে। এ সময়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তো তাঁর এই আশা একটি স্মারকলিপিতে প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েছিলেন। নেহরুও ভেবেছিলেন যে উদ্বাস্তুরা দেশে ফিরে যাবে। মুখ্যমন্ত্রীর স্মারকলিপি পেয়ে তাঁর ইচ্ছা পূরণ হল।

দেশবিভাগের পূর্বে শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্তদের অধিকাংশই সুভাষপন্থী ছিল একথা বললে অত্যুক্তি হবে না। তাছাড়া অনুশীলন ও যুগান্তর—এই দুটি বিপ্লবী গুপ্ত দলের প্রতিও তাদের সক্রিয় সমর্থন ছিল। সন্ত্রাসবাদী এই দুটি বিপ্লবী দল কংগ্রেসকে তাদের আবরণের মতো ব্যবহার করত। পূর্ববঙ্গের কিছু বড় জমিদার, প্রভাবশালী আইনজীবী ও কিছু উচ্চবিত্ত মানুষ কংগ্রেসের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাবও প্রায় হিন্দু মধ্যবিত্তদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, যদিও বিক্ষিপ্তভাবে পূর্ব-পাকিস্তানের কোনো কোনো অঞ্চলের কৃষক উপজাতিদের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব পড়েছিল। নোয়াখালি, যশোহর, ও খুলনার কৃষকদের মধ্যে ঘাঁটি গড়ে তুলেছিলেন কৃষ্ণসুন্দর ভৌমিক, ইয়াকুব মিঞা, কৃষ্ণবিনোদ রায়, অনিল সিংহ ও অন্যান্য কমিউনিস্ট নেতারা। ময়মনসিংহের সুসঙ-এর গারো, হাজং ও দলুই উপজাতিদের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব বিস্তার করেছিলেন মণি সিংহ, ময়মনসিংহের মুসলমানদের মধ্যে কমিউনিস্ট প্রভাব বিস্তার করেছিলেন নগেন সরকার। সুসঙ-এর উপজাতি অধ্যুষিত এলকায় ও দিনাজপুরের কিছু কিছু জায়গায় তেভাগা আন্দোলনের সংগঠন ও নেতৃত্ব দিয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টি। এই কয়েকটি ছোটখাটো এলাকা ছাড়া কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্তদের মধ্যে দ্রুত প্রসারিত হচ্ছিল। কিন্তু যুদ্ধের সময় কমিউনিস্ট পার্টির 'জনযুদ্ধ তত্ত্ব', যুদ্ধে মিত্রপক্ষের সহযোগিতা, আগস্ট বিপ্লবের বিরোধিতা এবং নেতাজি সুভাষকে কুইসলিঙ (দেশদ্রোহী) আখ্যা দেওয়ায় পার্টি পূর্ববঙ্গের রাজনৈতিক জীবনের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সব রাজনৈতিক দল এবং সাধারণভাবে অধিকাংশ শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্তই কমিউনিস্ট বিরোধী হয়ে যায়। জাতীয়তাবাদী হিন্দুরা ভুলতে পারেনি যে যখন দেশের মানুষ স্বাধীনতার জন্য জীবনপণ করে লড়ছিল, তখন কমিউনিস্ট পার্টি ইংরেজের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল। কমিউনিস্টদের তার্কিকী বুদ্ধি সাধারণ মানুষকে বোঝাতে চাইছিল যে ইংরেজের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে যুদ্ধ করে তারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভাঙন নিয়ে আসবে। সাধারণ মানুষের কাছে এই যুক্তি দুর্বোধ্য ছিল। তাছাড়া যুদ্ধের শেষে ঘটনা পরম্পরা যেভাবে ভারতের স্বাধীনতা নিয়ে এল, তাতে কমিউনিস্ট পার্টি একেবারে কোণঠাসা হয়ে পড়ল। কুইসলিঙ-এর আই এন এ স্বাধীনতার জন্য উন্মুখ ভারতীয় চেতনাকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত সাধারণ মানুষের মনে এই ধারণা জন্মেছিল যে কমিউনিস্টরা যেন এদেশের মানুষ নয়। তাদের আনুগত্য দেশাতিরিক্ত একটি আন্তর্জাতিক সংগঠনের প্রতি।

এই হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী যখন এদেশে উদ্বাস্তু হয়ে চলে এল তখন তারা যে শুধু কমিউনিস্ট পার্টি থেকে দূরে সরে গিয়েছিল, তাই নয়, তারা কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি বৈরীভাবাপন্ন হয়ে পড়েছিল। দেশে থাকাকালীন তারা ছিল সুভাষপন্থী এবং তাদের

আনুগত্য ছিল প্রধানত সুভাষপন্থী বিপ্লবী সংগঠনের প্রতি। সাধারণভাবে তারা কংগ্রেসবিরোধীও ছিল। কিন্তু উদ্বাস্তু হয়ে এদেশে আসার পর তাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটল।

দেশ থেকে উদ্বাসনের স্রোত পুরোনো সব দিকচিহ্ন ভাসিয়ে নিয়ে গেল। দক্ষিণ ও বামপন্থী নেতারাও এই স্রোতে ভেসে গেলেন। পরিচিত জগৎকে খুঁজে পেতে তাদের বেশ কিছুদিন সময় লাগল। ইতিমধ্যে ভারতে ও পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে। কংগ্রেসের নেতারাই পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে নিপীড়িত হয়ে তারা যদি ভারতে চলে আসতে বাধ্য হয় তবে তাদের পুনর্বাসন দেওয়া হবে। এই পরিস্থিতিতে সর্বস্বান্ত উদ্বাস্তুদের মনে এই ভয় দেখা দিয়েছিল যে কংগ্রেসের প্রতি তাদের আনুগত্যের অভাব ঘটলে কংগ্রেস মুখ ফিরিয়ে নেবে। এই নির্বান্ধব বিদেশে তারা অনাহারে মরবে। সুতরাং পূর্ববঙ্গের মধ্যবিত্ত হিন্দু এদেশে এসে কট্টর কংগ্রেস সমর্থকে পরিণত হয়। তারা সুস্পষ্টভাবে দেখতে পেয়েছিল যে ক্ষমতায় আসীন পার্টি কংগ্রেসের পক্ষেই তাদের রক্ষা করা সম্ভব, তাদের দুর্গতির অবসান ঘটানো সম্ভব। এদের এই ভরসা ছিল যে তাদের জীবন্মৃত অবস্থা থেকে উদ্ধার করার ক্ষমতা একমাত্র কংগ্রেসেরই আছে। হিন্দু মধ্যবিত্ত উদ্বাস্তুদের দেশে থাকাকালীন বামপন্থী প্রবণতার এবং এদেশে চলে আসার পর কংগ্রেসি মনোভাবের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে :

উদ্বাসনের পূর্বে হিন্দু মধ্যবিত্তদের বামপন্থীপ্রবণতার দৃষ্টান্ত—

১৯৪০-এ সারা বাংলার বিধানসভার নির্বাচনে সুভাষচন্দ্র বোস অনুশীলন সমিতির জ্ঞান মজুমদারকে সরকারি কংগ্রেসের সতীশচন্দ্র চৌধুরীর বিরুদ্ধে মনোনীত করেছিলেন। এই নির্বাচনে জ্ঞান মজুমদার ১৮,৫০০ ভোটে জয়ী হয়েছিলেন।

উদ্বাসনের পরে মধ্যবিত্তদের কংগ্রেসি মনোভাবের দৃষ্টান্ত :

(১) পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ যখন 'নিরাপত্তা বিল' পেশ করলেন, তখন সিপিআই ও অন্যান্য বামপন্থী দল এই বিলের বিরোধিতা করে একে 'কালা বিল' আখ্যা দেয়। তখন উদ্বাস্তুরা কংগ্রেসিদের নেতৃত্বে লেক ক্যাম্প ও পাশাপাশি অন্যান্য ক্যাম্পের উদ্বাস্তুরা ফরওয়ার্ড ব্লকের নেত্রী লীলা রায়ের বাড়ি আক্রমণ করে।

(২) লেক ক্যাম্পের উদ্বাস্তুরা সেই ক্যাম্পের একটি পরিবারকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়।

কমিউনিস্ট পার্টি উদ্বাস্তুদের সাম্প্রদায়িক ও প্রতিক্রিয়াশীল বলে মনে করত। উদ্বাস্তুদের প্রতি কমিউনিস্ট পার্টির কঠিন অবজ্ঞা ছিল, শঙ্কাও ছিল। উদ্বাস্তুরা যদি কংগ্রেস বা অন্য কোনো সাম্প্রদায়িক দক্ষিণপন্থী দলের অন্তর্ভুক্ত হয় তবে তারা কমিউনিস্ট পার্টির শত্রুদের হাতে বিপজ্জনক অস্ত্র এবং শ্রমিক ধর্মঘট ভাঙার প্রধান হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে। ১৯৪৮-এর প্রথম দিকে মানিকতলায় কারখানার মালিকেরা উদ্বাস্তুদের ধর্মঘট ভাঙার কাজে ব্যবহার করেছিল। যে কোনোভাবে যে কোনো কাজ করে অন্নসংস্থান করার জন্য উদ্বাস্তুরা মরিয়া হয়ে উঠেছিল। তাই কারখানার মালিকদের পক্ষে তাদের অল্প মজুরিতে খাটিয়ে নেওয়া এবং তাদের ব্যবহার করে ধর্মঘট ভাঙা সহজ ছিল।

সুতরাং উদ্বাস্তুদের উপস্থিতি যখন কারখানার শ্রমিকদের পক্ষে সমস্যা হয়ে দেখা দিল, তখন আর কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে উদ্বাস্তুদের দিকে তাচ্ছিল্যভরা অবজ্ঞায় মুখ

ফিরিয়ে থাকা সম্ভব হল না। কিন্তু উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট নীতি গ্রহণ করাও পার্টির পক্ষে সহজ ছিল না। উদ্বাস্তুদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিষ আছে অতএব পার্টির ভেতরে আনা চলবে না। অথচ বিশাল জনসমষ্টিকে দক্ষিণপন্থীদের শিবিরেও চলে যেতে দিলে পার্টি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অতএব আপাতত তাদের ন যযৌ, ন তস্থৌ অবস্থায় অর্থাৎ বাম ও দক্ষিণ শিবিরের মাঝামাঝি জায়গায় রেখে দিতে পারলে ভালো। উদ্বাস্তুদের সাম্প্রদায়িক মনোভাব দূর করতে হবে, তাদের কমিউনিস্ট বিমুখতাও দূর করতে হবে। কিন্তু তাদের পার্টির ভেতরেও আনা চলবে না। বিজয় মজুমদারই কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সদস্য যাকে প্রথম উদ্বাস্তুদের মধ্যে কাজ করার দায়িত্ব দেওয়া হল। অতি অল্পদিনের মধ্যেই ময়মনসিংহের এই কমিউনিস্ট নেতা উদ্বাস্তুদের পরিচিত আপনজন হয়ে উঠলেন। হওয়াই স্বাভাবিক ছিল কারণ তিনি সৎ, অক্লান্তকর্মী ও উদ্বাস্তুদের জন্য নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। কিন্তু তবু উদ্বাস্তুদের মধ্যে কাজ করার সময় বিজয় মজুমদারকে তাঁর আত্মপরিচয় গোপন করতে হয়েছিল। কেননা তিনি কমিউনিস্ট একথা জানাজানি হয়ে গেলে তাঁর পক্ষে আর উদ্বাস্তুদের মধ্যে অবাধ বিচরণ সম্ভব হত না। তিনি শুধু তাঁর কমিউনিস্ট পরিচয় গোপন করেননি, প্রয়োজন মতো নিজেকে কংগ্রেসির ছদ্মবেশ ধারণের অনুমতিও পার্টি তাঁকে দিয়েছিল। উদ্বাস্তুদের বিশ্বাসভাজন হয়ে ওঠার জন্য বিজয় মজুমদার লেক ক্যাম্পের কিছু উদ্বাস্তুর কমিউনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গির নিন্দা করে কংগ্রেসিদের সঙ্গে যৌথ বিবৃতিও দিয়েছিলেন। ক্রমে আরো কিছু উদ্বাস্তু কমিউনিস্ট নিজেদের পরিচয় গোপন রেখেই বিজয় মজুমদারের সঙ্গে উদ্বাস্তুদের মধ্যে কাজ করতে লাগলেন। ১৯৪৮-এর মাঝামাঝি থেকে কমিউনিস্ট এজেন্ট বিজয় মজুমদার উদ্বাস্তুদের মধ্যে কাজ করতে শুরু করেছিলেন। বিজয় মজুমদার ও তাঁর উদ্বাস্তু সহকর্মীরা তাঁদের কাজের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন উদ্বাস্তুরা কী চায় এবং তাদের জন্য কী করা উচিত। পুরোপুরি নিবেদিত প্রাণ এই উদ্বাস্তু কমিউনিস্ট নেতারা লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুর নেতা হয়ে উঠেছিলেন। উদ্বাস্তুদের কমিউনিস্ট বিরোধিতা সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণায় রূপান্তরিত হয়েছিল।[১]

## নিখিলবঙ্গ বাস্তুহারা কর্মপরিষদ : সংযুক্ত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদের আদিরূপ

১৯৪৮-এর সেপ্টেম্বর মাসে প্রধান কংগ্রেস নেতা অমৃতলাল চ্যাটার্জির নেতৃত্বে নৈহাটিতে একটি সারা বাংলা উদ্বাস্তু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে 'নিখিলবঙ্গ বাস্তুহারা কর্মপরিষদ' গঠিত হয়। কর্মপরিষদের সভাপতি, সহসভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন যথাক্রমে অমৃতলাল চ্যাটার্জি, গণেশ দাস (কংগ্রেস), মহাদেব ভট্টাচার্য (হিন্দু মহাসভা)। কার্যনির্বাহী সমিতির অধিকাংশই ছিলেন কংগ্রেসি। তবে বিজয় মজুমদার, বিনয় রায় এবং আরো কয়েকজন এই সমিতির সদস্য হয়েছিলেন। এদের রাজনৈতিক পরিচয় সম্মেলনের উদ্যোক্তারা জানতেন না।

এই সম্মেলনের মূল প্রস্তাবে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুদের স্থায়ী পুনর্বাসনের দাবি জানানো হল। স্থির হল ভারতীয় কংগ্রেসের জয়পুর অধিবেশনে (১৯৪৮) অমৃতলাল চ্যাটার্জি,

মহাদেব ভট্টাচার্য এবং নগেন রায় নিখিলবঙ্গ বাস্তুহারা কর্মপরিষদের প্রতিনিধি হিশেবে নেহরুর কাছে একটি স্মারকলিপি দেবেন। জয়পুরে স্মারকলিপি পেয়ে নেহরুর প্রতিক্রিয়া দেখে এঁরা হতবাক হয়ে গেলেন। নেহরু বললেন, উদ্বাস্তুরা বিদেশী। সুতরাং কর্মপরিষদের প্রতিনিধিরা যেন জাতীয় কংগ্রেসের বিদেশ দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।[২]

কর্মপরিষদের নেতারা জয়পুর কংগ্রেস থেকে সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে ফিরে এলেন। কর্মপরিষদের কার্যনির্বাহী সমিতির স্পষ্ট ধারণা হল যে আন্দোলন ছাড়া পুনর্বাসনের অন্য কোনো পথ নেই। কিন্তু কংগ্রেসি হয়ে কংগ্রেসবিরোধী এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়া উচিত নয়, এই ভেবে অমৃতলাল চ্যাটার্জি কর্মপরিষদের সভাপতির পদ ত্যাগ করলেন। নেহরুই কর্মপরিষদকে আন্দোলনের পথে ঠেলে দিলেন।

১৯৪৮-এর ডিসেম্বরে বিভিন্ন ক্যাম্পের প্রায় ৫০০ জন প্রতিনিধি নিয়ে কর্মপরিষদের দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। নতুন কার্যনির্বাহী সমিতির সভাপতি হলেন হিন্দু মহাসভার মহাদেব ভট্টাচার্য এবং যুগ্ম সম্পাদক হলেন বিজয় মজুমদার ও দ্বিজেন ঘোষ। বিজয় মজুমদার তাঁর কংগ্রেসি ছদ্মবেশ তখনো বজায় রেখেছিলেন। এই সম্মেলনে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের দাবি জানিয়ে আর একটি স্মারকলিপি প্রস্তুত করা হল। এই স্মারকলিপিতে প্রথম বলা হল যে সরকার স্থায়ী পুনর্বাসনের দাবি প্রত্যাখ্যান করলে উদ্বাস্তুরা আন্দোলনে নামবে এবং প্রয়োজন হলে জোর করে জমি দখল করবে। আরো একটি প্রস্তাবে বলা হল যে ১৯৪৯-এর ১৪ জানুয়ারিতে নেহরু যখন সারিপুত্ত ও মোগ্‌গলানের দেহাবশেষ নিয়ে কলকাতা আসবেন, তখন কলকাতায় উদ্বাস্তুদের একটি বিরাট সমাবেশ হবে। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে কর্মপরিষদের প্রস্তাব থেকে বোঝা গেল যে উদ্বাস্তুরা আর ভিক্ষুকের মতো আবেদন-নিবেদন করে ক্ষান্ত থাকবে না।

কর্মপরিষদের হিন্দু মহাসভাপন্থী মহাদেব ভট্টাচার্য ছিলেন জাত সংগ্রামী। সুতরাং কংগ্রেস, কমিউনিস্ট ও অন্য যে কোনো দলের সংগ্রামী মানুষের সঙ্গেই হাত মিলিয়ে কাজ করতে তিনি রাজি ছিলেন। দলীয় সংকীর্ণতা তাঁর একেবারেই ছিল না। সুতরাং সভাপতি মহাদেব ভট্টাচার্য ও যুগ্ম সম্পাদক বিজয় মজুমদারের সংগ্রামী প্রেরণা কর্মপরিষদকে এক নতুন পথে নিয়ে গেল। বিজয় মজুমদার বুঝতে পেরেছিলেন যে উদ্বাস্তুদের স্বার্থে রাজনৈতিক দলমত নির্বিশেষে একটি বৃহৎ ফ্রন্ট গড়ে তোলা আবশ্যিক এবং উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসনের দাবিতে এই ধরণের ফ্রন্ট গড়ে তোলা সম্ভব। উদ্বাস্তু আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টির উদাসীনতাকে এই ধরণের ফ্রন্ট গড়ে তোলার সুযোগ হিশেবে ব্যবহার করলেন বিজয় মজুমদার। এতে বিজয় মজুমদার ও তাঁর কর্মপরিষদের সহযোগীরা পার্টির শাসন থেকে কিছুকাল অব্যাহতি পেয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, কর্মপরিষদকে পরিচালনার এবং উদ্বাস্তুদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে কাজ করার স্বাধীনতা পেয়েছিলেন তাঁরা।

নিখিলবঙ্গ বাস্তুহারা কর্মপরিষদের কর্মসূচি অনুযায়ী ১৪ জানুয়ারি শিয়ালদহ স্টেশনে ১৫০০০ উদ্বাস্তু সমবেত হয়। ওইদিন ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড-এ নেহরুর মিটিং-এর জন্য ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছিল। কর্মপরিষদের কংগ্রেসি নেতারা কলকাতায় বে-আইনি উদ্বাস্তু সমাবেশ না করে শিয়ালদহে অনশন করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু বিজয় মজুমদার ও অন্যান্য নেতারা এসপ্ল্যানেড ইস্ট ও আরো বিশেষ বিশেষ জায়গায় ছোট ছোট সমাবেশ করার সিদ্ধান্ত নেন।

১৪ জানুয়ারি নির্দিষ্ট কয়েকটি জায়গায় সমবেত হয়ে উদ্বাস্তুরা স্লোগান দিতে থাকে। বেলা চারটে নাগাদ শিয়ালদহ স্টেশনের বাইরে উদ্বাস্তুরা পুলিশি বেড়া ভাঙার চেষ্টা করে। পুলিশ গুলি চালায় এবং দুজন উদ্বাস্তু আহত হয়। মহাদেব ভট্টাচার্যসহ ১৫ জন নেতাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। কলকাতা শহরে এই ধরণের উদ্বাস্তু আন্দোলনে বিরাট প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। অনেকেরই এই ধারণা জন্মে যে এই আন্দোলনে কমিউনিস্টদের হাত আছে।

ওই দিন রাত্রিতে বিজয় মজুমদার সিপিআই-এর কলকাতা জেলা কমিটির সদস্য নীতিশ শেঠ এবং বাস্তুহারা কর্মপরিষদের আরো কিছু নেতা সিপিআই-এর ছাত্রনেতা হীরেন দাশগুপ্ত, তৃপ্তি গুহ, আনন্দ ভট্টাচার্য প্রভৃতির সঙ্গে দেখা করে তাদের উদ্বাস্তু আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আন্দোলন গড়ে তুলতে আহ্বান জানান। ছাত্রসংগঠন আন্দোলনের ডাক দিতে রাজি হল। তারা নিরস্ত্র উদ্বাস্তুদের ওপর পুলিশের গুলিচালনার প্রতিবাদ করবে, উদ্বাস্তুদের দাবিদাওয়ার প্রতি জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। ১৮ জানুয়ারি ছাত্রদের সফল ধর্মঘট হল। ওইদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের লনে (টেনিস কোর্টে) ছাত্র সমাবেশ বিক্ষোভে ফেটে পড়ল। তারা ৯টি ট্রাম পুড়িয়ে দিল। পুলিশের গুলিতে ৪ জনের মৃত্যু হল, আহত হল ১৫ জন। পরদিন ১৪৪ ধারা অগ্রাহ্য করে হাজার হাজার ছাত্র রাইটার্স বিল্ডিংস-এ অভিযান করল। ছাত্রদের ওপর পুলিশের গুলি চলল। ৫ জন গুলিতে প্রাণ হারাল। গ্রেপ্তার করা হল ২০০ জনকে। বিক্ষোভকারীরা ১০টি ট্রাম, ৫টি সরকারি বাস পুড়িয়ে দেয়। এই প্রথম ট্রাম ও বাস পোড়ানো শুরু হল। এখন কলকাতা শহরে বামপন্থী বিক্ষোভের প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়াল ট্রাম-বাস পোড়ানো। এই দুদিনের ঘটনা ভবিষ্যৎ উদ্বাস্তু ও বামপন্থী আন্দোলনের ক্ষেত্রেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রথম কলকাতার রাজপথে উদ্বাস্তু ও ছাত্রের রক্ত মিশে গেল। কংগ্রেস সরকাবের পুলিশ নিরস্ত্র বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য গুলি চালিয়েছিল।

এই দুদিনের রক্তাক্ত আন্দোলন উদ্বাস্তু আন্দোলনের নেতাদের সংকটে ফেলল। এই আন্দোলনকে তীব্রতর করা সম্ভব ছিল না। অথচ ছাত্র, উদ্বাস্তু ও সাধারণ মানুষের উত্তেজনা যখন তুঙ্গে তখন আন্দোলনের পথ থেকে সরে যাওয়াও কঠিন। বিজয় মজুমদার এস আর পি নেতা শরৎ বোসের (নেতাজির দাদা) হস্তক্ষেপের দ্বারা এই উভয় সংকটের সমাধানের ব্যবস্থা করলেন। ১৯ জানুয়ারির রাত্রিতেই বিজয় মজুমদার ও আরো কয়েকজন উদ্বাস্তু নেতা শরৎ বোসের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে হস্তক্ষেপ করতে রাজি করালেন। পরদিন তিনি পুলিশি অত্যাচারের নিন্দা করে ও ডঃ রায়ের পদত্যাগ দাবি করে সংবাদপত্রে বিবৃতি দিলেন। শ্রদ্ধানন্দ পার্কে উদ্বাস্তুদের প্রতিবাদ সভায় সভাপতিত্ব করতে সম্মত হলেন। তিনি উদ্যোগী হয়ে অনশনরত উদ্বাস্তু কংগ্রেস নেতাদের অনশন ভঙ্গ করালেন। শেষ পর্যন্ত ডঃ রায় আশ্বাস দিলেন যে উদ্বাস্তুদের স্থায়ী পুনর্বাসনেব জন্য তিনি সাধ্যমতো চেষ্টা করবেন। জানুয়ারির শেষ দিকে ৪০,০০০ উদ্বাস্তুর সভা হল শ্রদ্ধানন্দ পার্কে। সভাপতিত্ব করলেন শরৎ বোস। তিনি পুলিশের গুলি চালনার নিন্দা করলেন এবং উদ্বাস্তুরা যাতে তাদের প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা পায় তার দাবি জানালেন। কলকাতা শহরে উদ্বাস্তুদের প্রথম আন্দোলনের ওপর যবনিকা পড়ল।

এই আন্দোলন ভবিষ্যতের পক্ষে গুরুতর ইঙ্গিতবহ। আন্দোলন আপাতদৃষ্টিতে ব্যর্থ হলেও এর উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল। এই আন্দোলন থেকে উদ্বাস্তুরা একটি সত্য বিশেষভাবে বুঝতে পারল যে আন্দোলন ছাড়া তাদের উদ্দেশ্যসাধনের আর কোনো পথ

নেই। আন্দোলন ছাড়া সরকারের কাছ থেকে তারা কিছুই আদায় করতে পারবে না। এই আন্দোলনের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল। এই আন্দোলন কমিউনিস্ট ও উদ্বাস্তুদের অনেক কাছাকাছি নিয়ে এল। কমিউনিস্টরা উদ্বাস্তুদের কাছে অনেকটা গ্রহণীয় হয়ে উঠল। তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা অনেক বেড়ে গেল। ১৪ থেকে ৩১ জানুয়ারি এই কয়েকটা দিন উদ্বাস্তু আন্দোলন নতুন মোড় নেয় বললে হয়তো অত্যুক্তি হবে না। এই স্বল্পকালের মধ্যে উদ্বাস্তুরা কংগ্রেসের কাছ থেকে কিছুটা দূরে সরে যায় এবং কমিউনিস্টদের সঙ্গে তাদের দূরত্ব কিছুটা কমে যায়।

অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলেও জানুয়ারি মাসের গুলিচালনা উদ্বাস্তু আন্দোলনে এক নতুন যুগের সূচনা করে। এরপর থেকে উদ্বাস্তুদের মধ্যে যেসব কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য কাজ করছিলেন, তাঁদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দেওয়া হল বিজয় মজুমদারকে। তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের নিয়ে একটি সেল গড়ে তুললেন। এই সেলের সম্পাদক হলেন বিজয় মজুমদার। উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে পার্টির এই আকস্মিক উৎসাহের একটি বিশেষ কারণ ছিল। পার্টি তার মত ও পথ হঠাৎ পালটে ফেলেছিল। পি সি যোশীর পথের পরিবর্তে পার্টি বি টি রণদিভের পথ গ্রহণ করেছিল।

১৯৪৯-এর প্রথম দিকে নিখিলবঙ্গ বাস্তুহারা কর্মপরিষদই ছিল একমাত্র বিশ্বস্ত উদ্বাস্তু সংগঠন। কর্মপরিষদে হিন্দুমহাসভা, কংগ্রেস কমিউনিস্ট ও অন্যান্য বামপন্থী দলও ছিল। কিন্তু কর্মপরিষদের হয়ে যারা কাজ করছিল তারা যে দলেরই হোক না কেন, তাদের প্রধান পরিচয় ছিল, তারা উদ্বাস্তু। তাদের মধ্যে দক্ষিণ ও বাম মতের সংঘাত ছিল। কিন্তু মত ও পথের পার্থক্য সত্ত্বেও কর্মপরিষদের কর্মী ও নেতারা সবাই উদ্বাস্তু। উদ্বাস্তু জীবনের দুর্গতি তাদের জীবনধারণের যে প্রাথমিক পর্যায়ে নিয়ে এসেছিল, সেখানে দুবেলা দুমুঠো অন্ন, মাথার ওপরে একটা ছাদই একমাত্র সত্য, সেখানে মত ও পথের সব পার্থক্যের অবলুপ্তি। সুতরাং উদ্বাস্তু নেতাদের মধ্যে মতাদর্শগত পার্থক্য থাকলেও উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানের জন্য কর্মপরিষদ কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে তাঁরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে পারতেন। অন্যভাবে বলা চলে যে উদ্বাস্তু নেতাদের আলাদা আলাদা রাজনৈতিক পরিচয় থাকলেও তারা কখনোই চাইতেন না যে বাস্তুহারা কর্মপরিষদ কোনো রাজনৈতিক দলের হাতিয়ার হয়ে উঠুক অথবা কোনো রাজনৈতিক দলের স্বার্থে পরিচালিত হোক। উদ্বাস্তু নেতারা নিজস্ব দলীয় রাজনীতি টেনে এনে জল ঘোলা করেননি বলেই কর্মপরিষদের জানুয়ারি আন্দোলন সফল হয়েছিল।

ইতিপূর্বেই বলা হয়েছিল যে উদ্বাস্তুদের ব্যাপারে সিপিআই-এর কোনো আগ্রহ ছিল না। তাদের খাদ্য ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা নিয়েও এই পার্টির কোনো মাথাব্যথা ছিল না। উদ্বাস্তুরা যাতে প্রতিক্রিয়ার শিবিরে না চলে যায়, তা দেখাশোনা করার ভার দেওয়া হয়েছিল উদ্বাস্তু কমরেডদের। সিপিআই উদ্বাস্তু নেতারাও তাদের দলীয় রাজনীতি কর্মপরিষদে নিয়ে আসেননি। কিন্তু আকস্মিকভাবে সিপিআই-এর মত ও পথ পালটে যাওয়ায় কর্মপরিষদকে সি পি আই-এর কুক্ষিগত করার জন্য উদ্বাস্তু নেতাদের ওপর কমিউনিস্ট পার্টির চাপ আসতে লাগল।

১৯৪৭ থেকে ১৯৪৮-এর ফেব্রুয়ারিতে পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস পর্যন্ত সিপিআই-এর কর্মসূচি গণ আন্দোলন ও বিক্ষোভ সমাবেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে রণদিভের নেতৃত্বে নেহরু সরকারের বিরুদ্ধে বিপ্লবী অভ্যুত্থানের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। সুতরাং কর্মপরিষদে পার্টির উদ্বাস্তু নেতাদের ওপর পার্টির

নির্দেশ আসে যে তারা যেন তাদের উদ্বাস্তু অনুগামীদের নিয়ে বিপ্লবী অভ্যুত্থানের কর্মসূচিতে যোগ দেন। কিন্তু উদ্বাস্তু নেতাদের পক্ষে পার্টির এই নির্দেশ পুরোপুরি মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি। অবশ্য উদ্বাস্তু অনুগামীদের নিয়ে তাঁরা মাঝে মাঝে রেললাইন ওপড়ানো ও অন্যান্য হিংসাত্মক কাজে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা উদ্বাস্তুদের মনের খবর রাখতেন। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে রণদিভের এই বিদ্রোহে উদ্বাস্তুদের হিংসাত্মক আন্দোলনে নিয়ে গেলে শেষ পর্যন্ত উদ্বাস্তুদের থেকে তাঁরা আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবেন। অথচ এই বিচ্ছিন্নতা দূর করার জন্যই এতকাল তাঁরা উদ্বাস্তুদের মধ্যে নীরবে কাজ করেছেন। অতএব উদ্বাস্তু কমিউনিস্ট নেতারা উভয় সংকটে পড়েছিলেন। পার্টি চাইছিল, তাঁরা উদ্বাস্তুদের নিয়ে সরকারবিরোধী বিক্ষোভে যোগ দিক। কিন্তু তাঁরা জানতেন যে তাঁরা যদি উদ্বাস্তুদের এই আলোড়নের মধ্যে নিয়ে আসেন তবে উদ্বাস্তুরা তাঁদের কাছ থেকে দূরে সরে যাবে। উদ্বাস্তুদের সমস্যা ছিল খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয়ের। কমিউনিস্টদের ভাবাদর্শ ও সংগ্রামে তারা নিজেদের জড়িয়ে ফেলতে চায়নি।

## প্রথম জবরদখল কলোনি

১৯৫০-এর এপ্রিলে কর্মপরিষদের কার্যনির্বাহী পরিষদে সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে কলকাতার আশেপাশের অনাবাদী পতিত জমি দখল করে উদ্বাস্তুদের আশ্রয়ের সমস্যার সমাধানের ব্যবস্থা করা হবে। সিপিআই এই প্রস্তাব সোৎসাহে সমর্থন করেছিল। কারণ এই সিদ্ধান্ত রণদিভের নেতৃত্বে পার্টি যে বিদ্রোহের পথ বেছে নিয়েছিল তার অনুকূল ছিল। পার্টির কাছে জমির দখলের অর্থ ছিল মুক্তাঞ্চলের প্রতিষ্ঠা। কর্মপরিষদ জমির জবরদখলের জন্য ব্যাপক প্রচার অভিযান চালাতে লাগল। উদ্বাস্তুদের নিয়ে সর্বত্র সভা করা হতে লাগল, প্রচারপত্র বিলি করা হতে লাগল। কর্মপরিষদের নেতারা তাদের বোঝাতে লাগলেন যে জমির দখল ছাড়া তাদের আশ্রয়েব সমস্যার অন্য কোনো সমাধান নেই। সরকার তাদের জন্য কিছু করবে না।

কিন্তু উদ্বাস্তুরা দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। তারা ভয় পাচ্ছিল। তাদের সন্দেহ ছিল যে জমির জবরদখল করলে তারা হয়তো সিপিআই-এর বিপজ্জনক আন্দোলনের অঙ্গীভূত হয়ে যাবে। সুতরাং কর্মপরিষদের নেতৃত্ব পরীক্ষামূলকভাবে একটা জবরদখল কলোনি প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নিলেন। কলকাতা থেকে ১৫ কিলোমিটার দূরে সোদপুরে তারা একটি পতিত জমি বেছে নিলেন এবং কিছু উদ্বাস্তুকে বেছে নিলেন এবং রাতারাতি হোগলা ও বাঁশ দিয়ে কয়েকটা কুঁড়েঘর তৈরি করে তাদের সেখানে বসিয়ে দিলেন। সর্বসাকুল্যে খরচ হল ২২ টাকা ২৫ পয়সা। এই হল উদ্বাস্তুদের প্রথম উপনিবেশ, প্রথম জবরদখল কলোনি। বেশ বড়সড়ো গালভরা নাম দেওয়া হল এই উপনিবেশের: দেশবন্ধুনগর। ১৯৪৯-এর লক্ষ্মীপুজোর দিন নৈহাটিতে প্রতিষ্ঠিত হল বিজয়নগর কলোনি, যা তখন হয়তো পশ্চিমবঙ্গে বৃহত্তম জবরদখল কলোনি ছিল। তারপর কাঁচড়াপাড়ায় শহিদনগর কলোনি প্রতিষ্ঠিত হল। সাধারণভাবে একথা বলা যেতে পারে যে কর্মপরিষদের উদ্যোগেই এই সব কলোনি প্রতিষ্ঠিত হল। এই সব কলোনি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে জবরদখল কলোনি প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। কাঁচড়াপাড়া থেকে দমদম পর্যন্ত রেলপথের কাছাকাছি একটি লাইন ধরে

জবরদখল কলোনি গড়ে উঠতে লাগল। জমি জবরদখলের এই অভিযানে কমিউনিস্ট, কংগ্রেস ও অন্যান্য বামপন্থী দলের উদ্বাস্তু নেতারা অংশগ্রহণ করেছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহারে জবরদখল কলোনি প্রতিষ্ঠার নাম দেওয়া হল মুক্তাঞ্চল প্রতিষ্ঠা।

## জানুয়ারি ১৯৫০ থেকে মে ১৯৫০ : দক্ষিণ কলকাতায় জবরদখল কলোনির প্রতিষ্ঠা

সরকার অথবা জমির মালিকেরা এভাবে জমি দখলের কোনো বিরোধিতা করেনি, তা নয়। জবরদখল কলোনি প্রতিষ্ঠার সময় সরকার বা জমিদাররা কিভাবে বাধা দিয়েছিল এবং উদ্বাস্তুরা সেই বাধা কিভাবে অতিক্রম করেছিল, তার আদর্শ নমুনা পাওয়া যাবে মাহেশ কলোনি প্রতিষ্ঠার কাহিনী থেকে। মাহেশ কলোনি প্রতিষ্ঠার কাহিনীতে পরে আসছি। আপাতত কলকাতার দক্ষিণ শহরতলীতে জবরদখল কলোনি প্রতিষ্ঠার কথা বলা যাক।

কলকাতার উত্তর শহরতলীতে জমির জবরদখল সফল হয়েছে। কর্মপরিষদ এরপর দক্ষিণ শহরতলীতে সক্রিয় হয়ে উঠল। দক্ষিণ শহরতলীতে প্রথম জবরদখল কলোনি প্রতিষ্ঠার প্রয়াস সফল হয়নি। নিউ আলিপুরে টাঁকশালের পেছনে ভারত সরকারের একটি জমি বেছে নিয়েছিল দুর্গাপুর ক্যাম্প-এর উদ্বাস্তুরা। তারা পুলিশের আক্রমণ প্রতিহত করতে পারেনি। কিন্তু তবু কলোনি প্রতিষ্ঠার ব্যর্থ প্রয়াসও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই কলোনি গুঁড়িয়ে দেবার জন্য পুলিশের আক্রমণের বিরুদ্ধে উদ্বাস্তু মেয়েরা চারদিন প্রচণ্ড লড়াই করেছিল। এতে জবরদখল কলোনি প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে এক নতুন উন্মাদনার সৃষ্টি হয়। দৃঢ়তর প্রতিজ্ঞা ও নতুন পরিকল্পনা নিয়ে এবার কলোনি প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হলেন কমিউনিস্ট, আর এস পি এবং অন্যান্য বাম ও দক্ষিণপন্থী দলের নেতৃবৃন্দ।

১৯৫০-এর ২৮ জানুয়ারি কর্মপরিষদের নেতা বিনয় রায় ও শম্ভু চৌধুরীর নেতৃত্বে পোদ্দারনগর কলোনি প্রতিষ্ঠিত হল। আজাদগড় কলোনি প্রতিষ্ঠিত হল ইন্দু গাঙ্গুলির নেতৃত্বে। পরপর যাদবপুর অঞ্চলের অন্যান্য বিপুলায়তন কলোনি প্রতিষ্ঠিত হল। দক্ষিণ শহরতলীর অধিকাংশ বড় কলোনি ১৯৫০-এর জানুয়ারি থেকে মে মাসের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হল। এইসব বিচ্ছিন্ন কলোনির ক্রিয়াকলাপ সমন্বিত করার জন্য একটি কেন্দ্রীয় সংগঠনের প্রয়োজন ছিল। তারই ফলশ্রুতি দক্ষিণ কলিকাতা শহরতলী বাস্তুহারা সংহতি নামে সংগঠন। এই সংগঠনের সভাপতি হলেন কংগ্রেসের সুকুমার ব্যানার্জি এবং সম্পাদক হলেন আর এস পি-র দেব ব্যানার্জি। বিজয়গড় ও বাঘাযতীন কলোনি ছাড়া রেলপথের পশ্চিম দিকের সব কলোনি 'সংহতি'র অন্তর্ভুক্ত হল। বাঘাযতীন ও বিদ্যাসাগর কলোনির ওপর আর এস পি-র এবং রামগড় কলোনির ওপর ফরওয়ার্ড ব্লকের (লীলা রায় গোষ্ঠীর) আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হল। রেলপথের পুবদিকের ১৪টি আর এস পি প্রভাবিত কলোনি 'সংহতি'র বাইরে থেকে গেল। ১৯৫০-এর আগস্টে এই ১৪টির কয়েকটি কলোনি ইউ সি আর সি-তে যোগ দেয়।[৮]

১ **বিজয় মজুমদারের সঙ্গে সাক্ষাৎকার।**

২ **তদেব**

৩ এই অধ্যায়টি লেখার প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাদান প্রায় সবই সংগৃহীত হয়েছে বিজয় মজুমদারের কাছ থেকে।

চতুর্থ অধ্যায়

# সংযুক্ত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদের (ইউনাইটেড সেন্ট্রাল রিফিউজি কাউন্সিল—ইউ সি আর সি) প্রতিষ্ঠা

১৯৫০-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, প্রায় ভেঙে পড়া সরকারি প্রশাসনের উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসনের সমস্যা সমাধানের ব্যর্থতা ও জবরদখল কলোনি প্রতিষ্ঠার আন্দোলন উদ্বাস্তুদের একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করেছিল। ক্রমাগত নতুন জবরদখল কলোনি গড়ে উঠছিল; উদ্বাস্তুদের জীবনও ক্রমশ সংকটময় হয়ে উঠছিল। সুতরাং সামগ্রিকভাবে উদ্বাস্তুদের দেখাশোনা এবং নতুন গড়ে ওঠা কলোনিগুলিকে সংহত করে পরিচালনা করার জন্য একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের সংগঠন আবশ্যিক হয়ে পড়েছিল। অবশ্য ইতিমধ্যে কলকাতার উত্তর ও দক্ষিণ শহরতলীতে 'নিখিল বঙ্গ বাস্তুহারা কর্মপরিষদ' ও 'দক্ষিণ কলিকাতা শহরতলী বাস্তুহারা সংহতি'—এই দুটি উদ্বাস্তু সংস্থা উদ্বাস্তুদের সংগঠিত করার কাজ করছিল। তাছাড়াও উদ্বাস্তুদের মধ্যে অসংখ্য ছোট ছোট সংগঠন গড়ে উঠছিল। এই সব ছোটবড় সংগঠন গড়ে ওঠা থেকে বোঝা যায় যে ইতিমধ্যেই উদ্বাস্তুরা সংগঠিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিল। বিশেষত নিখিলবঙ্গ বাস্তুহারা কর্মপরিষদ জবরদখল কলোনি প্রতিষ্ঠার সফল আন্দোলন পরিচালনা করে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে একটি নতুন মোড় দিয়েছিল।

এখানে মনে রাখতে হবে যে রণদিভের নেতৃত্বে ১৯৪৮-এ সিপিআই যে বিপ্লবী অভ্যুত্থানের ডাক দিয়েছিল তা ইতিমধ্যেই ব্যর্থ হয়েছে। এই ব্যর্থ অভ্যুত্থান যে আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা নিয়ে এসেছিল তাতে পার্টির সদস্যসংখ্যা ১ লক্ষ থেকে ২০ হাজারে নেমে যায়। কমিউনিস্ট ট্রেড ইউনিয়নগুলি নিশ্চল ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে। কৃষক সংগঠনগুলি প্রায় মুছে যায়। সামগ্রিকভাবে পার্টি ভাঙনের মুখে এসে পড়ে।

পশ্চিমবঙ্গে পার্টির ভাঙন আরো বেশি করে চোখে পড়ছিল। রণদিভে যে অভ্যুত্থানের ডাক দিয়েছিলেন, তার সবচেয়ে বেশি সাড়া মিলেছিল পশ্চিমবঙ্গে। প্রশাসনের নির্মম নিপীড়ন সত্ত্বেও দীর্ঘকাল পার্টির মনোবল অক্ষুণ্ণ ছিল। তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ ১৯৪৯-এর দক্ষিণ কলকাতার উপনির্বাচনে অসামান্য বিজয়। কিন্তু ১৯৫০-এ কমিনফর্ম-এর মুখপত্র For a Lasting Peace, For a People's Democracy-তে একটি সম্পাদকীয় পার্টিকে ভাঙনের মুখোমুখি নিয়ে এল। এই সম্পাদকীয় থেকে বোঝা গেল যে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন নতুন মোড় নিয়েছে এবং কমিউনিস্ট পার্টিকে তার নীতি পালটাতে হবে। এই পরিবর্তিত নীতির ভিত্তি হবে : (১) ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী জোটের বিরুদ্ধে সংগ্রামে শান্তি আন্দোলনের ওপর অধিকতর গুরুত্ব প্রদান; (২) নেহরুর বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক নীতির পুনর্মূল্যায়ন; (৩) বর্তমান পরিস্থিতিতে হিংসাত্মক বিপ্লবের সাফল্যের কোনো সম্ভাবনা নেই—এই বিচারের স্বীকৃতি; (৪) শান্তি ও স্বাধীনতা—এই গণতান্ত্রিক কর্মসূচির ভিত্তিতে বিভিন্ন বামপন্থী দল

ও সংগঠনকে নিয়ে একটি ব্যাপক গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের কুশলী পন্থা গ্রহণ; এবং (৫) নির্বাচনে এই গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের অংশগ্রহণ ও ভবিষ্যতে নেহরুর বিকল্প হয়ে গড়ে ওঠা। ১৯৫১-তে এই কর্মসূচি পার্টি গ্রহণ করে।

১৯৫০-এ For a Lasting Peace, For a People's Democracy-র সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। ১৯৪৮-এর পার্টি কংগ্রেসে বিপ্লবী অভ্যুত্থানের যে কর্মসূচি গৃহীত হয়েছিল, তার সম্পূর্ণ বিপরীত কর্মসূচি গৃহীত হল ১৯৫১-তে। বিপ্লবী অভ্যুত্থান থেকে একেবারে গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের সহযোগিতা, সংসদীয় গণতন্ত্রকে মেনে নিয়ে নেহরুর বিকল্প হয়ে ওঠা। অর্থাৎ কমিউনিস্ট পার্টি সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী হয়ে নতুন করে যাত্রা শুরু করল। ১৯৫০-এ For a lasting peace-এর সম্পাদকীয় প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে ১৯৫১-র গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের কর্মসূচি গৃহীত হতে এক বছর সময় লেগেছিল। এই এক বছরে পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির ধসে যাওয়ার মতো অবস্থায় হয়েছিল। এসময় পার্টি কী কর্মসূচি নেবে সে বিষয়ে কারুরই প্রায় কোনো ধারণা ছিল না। কার্যত এ সময়ে কমিউনিস্ট পার্টির বলতে বোঝাত ব্যক্তিকেন্দ্রিক কিছু বিবদমান গোষ্ঠী। পার্টির বিশেষ কোনো কর্মসূচি ছিল না। তাই পার্টি সদস্যদের বিশেষ কাজও ছিল না। পারস্পরিক কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি ছিল। শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে পার্টির ঘাঁটি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ঠিক এই সময়েই ১৯৫০-এর দাঙ্গাপীড়িত পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুপ্রবাহ এসে পশ্চিমবঙ্গে আছড়ে পড়ে। কমিউনিস্টরা তখন ঘর সামলাতে ব্যস্ত। উদ্বাস্তুদের দিকে তাকাবার অবসর ছিল না তাদের। তাছাড়া অন্তর্বিরোধ পার্টিকে প্রায় পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে দিয়েছিল। কিন্তু পার্টির অনেক দরদী কর্মী ও নেতা এভাবে পরস্পরের বিরুদ্ধে কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি করে দিন কাটাতে চায়নি। বিশেষত এ সময়ে লক্ষ লক্ষ সর্বহারা মানুষের আর্তনাদ তাদের বিদ্ধ করেছিল। তাই এই সব হৃতসর্বস্ব মানুষ যাতে ত্রাণ ও পুনর্বাসন পায় সেজন্য তারা একটি সংগঠিত আন্দোলন গড়ে তুলতে অগ্রণী হন। ইতিমধ্যেই বিজয় মজুমদার ও তার সহযোগী উদ্বাস্তু কমিউনিস্ট নেতারা কর্মপরিষদের মাধ্যমে এই কাজই করছিলেন। জবরদখল কলোনি প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সংগঠিত করে তাঁরা রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে একটা মোড় দিয়েছিলেন।

অনিল সিংহ, গোপাল ব্যানার্জি ও চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অন্যতম নায়ক অম্বিকা চক্রবর্তী ও অন্যান্য কিছু কমিউনিস্ট নেতা এই কাজে এগিয়ে আসেন। সভা, মিছিল ও অন্যান্য অনুরূপ কর্মসূচির মাধ্যমে তাঁরা উদ্বাস্তুদের সংঘবদ্ধ করতে শুরু করেন। 'কর্মপরিষদ' ও 'সংহতি' ছাড়াও ইতিমধ্যে অসংখ্য ছোটখাটো উদ্বাস্তু সংগঠন গড়ে উঠেছিল। অম্বিকা চক্রবর্তী ও তার সহযোগীদের কাজ হল ঘুরে ঘুরে এই সব উদ্বাস্তু কলোনি সংগঠন ও বিভিন্ন বামপন্থীদলের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা এবং সব উদ্বাস্তু সংগঠন ও বামপন্থী দলের প্রতিনিধি নিয়ে একটি কেন্দ্রীয় উদ্বাস্তু সংগঠন গড়ে তোলা। এই সংগঠনের নাম হবে 'সংযুক্ত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদ'। এই সংগঠন একটি যৌগিক পরিষদ হবে। এতে সব রাজনৈতিক দল ও গণতান্ত্রিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা থাকবেন। প্রতিনিধিদের সভায় সংযুক্ত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদ গঠিত হবে।

Lead the All Bengal United Central Refugee Council Conference to be held on 12 and 13 August to success—এই শিরোনামে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হল। ১২ আগস্ট ৪৩টি উদ্বাস্তু সংগঠন ও কলোনির প্রতিনিধিদের সম্মেলনে সংযুক্ত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়। এই সম্মেলন সিপিআই, ফরওয়ার্ড ব্লক,

মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লক, সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার, আর সিপিআই (বিদ্রোহী), ডিমোক্র্যাটিক ভ্যানগার্ড, বলশেভিক পার্টি, সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান পার্টি ও হিন্দু মহাসভার প্রতিনিধিরা যোগ দেন। সংযুক্ত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটিতে এই সব দলের প্রতিনিধিরা ছিলেন। স্থির হল এই কেন্দ্রীয় কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে কমিটির সদস্যদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে। এই কমিটি তার প্রস্তাবে ১৩ আগস্ট সব ক্যাম্প ও কলোনির উদ্বাস্তুদের মনুমেন্ট ময়দানে সমবেত হয়ে তাদের প্রতি সরকারের উদাসীনতা ও বিমাতৃসুলভ ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর ডাক দিল। ৫০,০০০ উদ্বাস্তু ১৩ আগস্টের ময়দানের সভায় সমবেত হল। এই সভায় প্রস্তাব নেওয়া হল পুনর্বাসনের দাবিতে ক্যাম্প ও কলোনির উদ্বাস্তুরা নিয়মিতভাবে প্রতিবাদ সভায় সমবেত হবে।

১৯৫০-এর ১৩ আগস্ট সংযুক্ত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদের সংক্ষেপে ইউ সি আর সি-র (এই নামেই সংযুক্ত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদ পরিচিত) জন্ম হল। পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল। উদ্বাস্তুদের সভা সমিতি, মিছিল ও বিক্ষোভের যুগ এল।

ইউ সি আর সি-র জন্ম হল। এই সংস্থার সিপিআই নেতাদের দায়িত্ব হল এই সংস্থার পরিচালনার জন্য একটি ভিত্তিস্থানীয় নীতি নির্ধারণ করা। তা প্রয়োজন ছিল এই কারণে যে অন্যান্য বামপন্থী দলের এই ভয় ছিল যে সিপিআই এই সংগঠনকে কুক্ষিগত করে ফেলবে। কেন্দ্রীয় কমিটিতে সিপিআই-এর সদস্যদের সংখ্যা বেশি ছিল। সুতরাং বামপন্থীদলের আশঙ্কা যে একেবারে অমূলক ছিল তা নয়। কিন্তু যেসব সিপিআই নেতা ও কর্মী ইউ সি আর সি গড়ে তুলতে অগ্রণী হয়েছিলেন, তাঁরা চাননি যে এই সংগঠন একটি দলীয় সংগঠনে পরিণত হোক। অতএব স্থির হয়েছিল যে ইউ সি আর সি-র কেন্দ্রীয় কমিটি সব সিদ্ধান্তই নেবে ঐকমত্যের ভিত্তিতে। কিন্তু ঐকমত্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হলে এমন একটি নিয়ামক নীতি থাকা প্রয়োজন যার আলোকে সংগঠন তার কর্ম পরিচালনা করবে। ইউ সি আর সি-র সিপিআই সংগঠকেরা মাও-জে-ডঙের 'মাস লাইন' (সাধারণ মানুষ উদ্ভূত নীতি)-এর মধ্যে এই নিয়ামক নীতি খুঁজে পেয়েছিলেন। এই নীতিটি হল 'সাধারণ মানুষ থেকে' এবং 'সাধারণ মানুষের কাছে' (from the mass and to the mass)। লি শাওকি এই 'মাস লাইন'-এর ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে : 'আমাদের পার্টির সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক নীতি অকৃত্রিমভাবে জনসাধারণের কাছ থেকে উৎসারিত হবে এবং আবার তা অকৃত্রিমভাবে সাধারণ মানুষের কাছেই ফিরে যাবে।.... সঠিক সাংগঠনিক পন্থাই হল জনসাধারণ উদ্ভূত পন্থা।'

অনিল সিংহ এই জনসাধারণ উদ্ভূত পন্থা.... মাস লাইন ইউ সি আর সি পরিচালনার সঠিক নীতি বলে মনে করেছিলেন। তাঁর এই দৃঢ় ধারণা হয়েছিল যে এই নীতি অনুযায়ী ইউ সি আর সি পরিচালিত হলে সিপিআই এই সংগঠনটিকে কুক্ষিগত করবে—অন্যান্য বামপন্থীদলের এই আশঙ্কা দূর হবে। অনিল সিংহ জনসাধারণ থেকে এবং জনসাধারণের কাছে এই বাক্যটিকে ইউ সি আর সি-র ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছিলেন এভাবে—উদ্বাস্তুদের থেকে এবং উদ্বাস্তুদের কাছে। এই নীতি অনুযায়ী ইউ সি আর সি-র নেতৃবৃন্দ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ও তা কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগের ব্যবস্থা করেছিলেন। এই নীতি যে কতটা সঠিক ছিল তা ১৯৫১-র জবরদখল কলোনি উচ্ছেদের বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সময় বোঝা গেল।

পঞ্চম অধ্যায়

# আমরা কারা? বাস্তুহারা :
# ১৯৫১-র জবরদখল কলোনি উচ্ছেদ আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন

পশ্চিমবঙ্গে জবরদখল কলোনি প্রতিষ্ঠার আন্দোলন দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। জবরদখল কলোনি প্রতিষ্ঠার প্রথম পর্যায় ঠিক এক বছরের মধ্যে শেষ হয়ে যায়। সরকার এই ধরণের ঘটনার জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। স্বল্পকালের মধ্যে কাঁচড়াপাড়া থেকে যাদবপুর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় যেন মন্ত্রবলে সারি সারি দরমা ও টালির ঘর তৈরি হয়ে গেল। এইসব জবরদখল কলোনির প্রতিষ্ঠা থেকে উদ্বাস্তু নেতৃবৃন্দের অসামান্য উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় মেলে। কিভাবে এই বিস্ময়কর ব্যাপারের মোকাবিলা করা যাবে সরকার তা সহসা ভেবে উঠতে পারেনি। রণদিভের নেতৃত্বাধীন সিপিআই-এর অভ্যুত্থান ও অবিরাম উদ্বাস্তুপ্রবাহে সরকার বিপর্যস্ত হয়ে উঠেছিল। ঠিক সেই সময়েই গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো জবরদখল কলোনির মতো অভাবিত ব্যাপার। কেন্দ্রীয় পুনর্বাসনমন্ত্রীর পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯৫০-এর প্রথম ৫৩ দিনে পশ্চিমবঙ্গে ৫৬,০০০ উদ্বাস্তু চলে আসে। ১৯৫০-এর ২৩ ফেব্রুয়ারি থেকে ৮ মার্চের মধ্যে ৯৮,৪৬০ উদ্বাস্তু সীমান্ত অতিক্রম করে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসে। এই বছরের প্রথম তিন মাসে আসে দেড় লক্ষ উদ্বাস্তু। ১৯৫০-এর শেষদিকে পশ্চিমবঙ্গে পূর্ব-পাকিস্তানের উদ্বাস্তুর সংখ্যা ২১ লক্ষে পৌঁছে যায়। অল্পকালের মধ্যেই উদ্বাস্তুদের সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার এক দশমাংশ হয়ে দাঁড়াল।[১]

এই উদ্বাস্তুপ্রবাহ প্রায় ভূমিকম্পের মতো পশ্চিমবঙ্গকে ধাক্কা দিয়েছিল। ইংরেজ আমলের জরাজীর্ণ প্রশাসন নিয়ে এই প্রচণ্ড আঘাতের মোকাবিলা করার সাধ্য ছিল না সরকারের। উদ্বাস্তুপ্রবাহকে সামলাতেই সরকারের সকল উদ্যম ব্যয়িত হচ্ছিল। অন্য কোনো দিকে তাকাবার সময় ছিল না। তাই এমন অনায়াসে একটার পর একটা উদ্বাস্তু কলোনি গড়ে উঠছিল। জমিদারের গুণ্ডাবাহিনী ও পুলিশ দরমার বেড়া ও টালির ছাদ দেওয়া নড়বড়ে ঘর ভেঙে দিতে চেষ্টা করেছিল। সেই চেষ্টা সফল হয়নি। উদ্বাস্তুদের প্রতিরোধের ফলে এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। কলোনি ভেঙে দেওয়ার জন্য পুলিশি হামলা কিভাবে উদ্বাস্তুদের প্রতিরোধের ফলে ব্যর্থ হয়েছিল, তার আদর্শ নমুনা জানা যাবে মাহেশ কলোনি প্রতিষ্ঠার দৃষ্টান্ত থেকে। পরে তা বিবৃত হয়েছে। আপাতত সরকার একটি গেজেট বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জবরদখল কলোনির উদ্বাস্তুদের জানিয়ে দিল যে অবৈধভাবে যারা জমি দখল করেছে, তাদের জমি থেকে উঠে যেতে হবে। নয়তো তাদের জমি থেকে

উচ্ছেদ করা হবে। জমি থেকে উচ্ছেদের হুমকি সত্ত্বেও উদ্বাস্তুরা জমি আঁকড়ে পড়ে রইল। এমন কোনো জায়গা ছিল না যেখানে তারা জমি ছেড়ে দিয়ে যেতে পারত। তাছাড়া তারা এও জানত যে সেই মুহূর্তে তাদের জমি থেকে উচ্ছেদের ক্ষমতা সরকারের ছিল না। ২,৩৯০,০৪৯ একর জমিতে ১৪৯টি জবরদখল কলোনির ঘরদোর ভেঙে প্রায় ১ লক্ষ ৫০ হাজার মানুষকে (২৯,৮৫৬টি পরিবারকে) উচ্ছেদ করার শক্তি সরকারের ছিল না।[২] ইতিমধ্যেই সরকারি ক্যাম্পের ১ লক্ষ ৪৫ হাজার মানুষকে নিয়ে সরকার ল্যাজেগোবরে হয়ে গিয়েছিল।

জবরদখল কলোনি প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ও কমিউনিস্ট অভ্যুত্থান ছাড়াও ১৯৪৯-এ কলকাতার প্রথম উপনির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয় মন্ত্রীসভার সংকট নিয়ে এসেছিল। ঐক্যবদ্ধ বামপন্থী জোটের সমর্থনে শরৎ বোসের কাছে কংগ্রেস প্রার্থীর পরাজয়কে নেহরু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে জনতার রায় বলে ব্যাখ্যা করেন এবং একটি অন্তর্বর্তী সাধারণ নির্বাচন করার কথা বলেন।[৩] ১৯৪৯-এর জুন থেকে ১৯৫০-এর জানুয়ারি পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও মন্ত্রীসভার সংকট চলতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে জবরদখল কলোনি প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে মোকাবিলা করার শক্তি সবকারের ছিল না।

## মাহেশে জবরদখল কলোনি প্রতিষ্ঠার কাহিনী

জমির মালিকের গুণ্ডাবাহিনী ও পুলিশি হামলার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলে কিভাবে জবরদখল কলোনিগুলি টিকে ছিল, তার আদর্শ দৃষ্টান্ত হিশেবে মাহেশের কলোনি প্রতিষ্ঠার কাহিনী বিবৃত হচ্ছে।

হুগলি জেলার মাহেশে ক্ষেত্র সাউ নামে এক ব্যক্তির জমিতে উদ্বাস্তুরা একটি জবরদখল কলোনি গড়ে তোলে। মালিকের গুণ্ডাসহ পুলিশ এসে তাদের সব কুঁড়েঘর গুঁড়িয়ে দেয়। পুলিশ চলে যাওয়ার পর রাত্রিতে আবার উদ্বাস্তুরা কুঁড়েঘর তৈরি করে ফেলে। এরপর আবার যখন পুলিশ ঘর ভেঙে দিতে আসে, তখন তারা সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের মুখে পড়ে। পুলিশ জবরদখলকারী উদ্বাস্তুদের ওপর লাঠিচার্জ করে, কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়ে। বরানগরের ছাত্রনেতা অরুণ সেনের নেতৃত্বে উদ্বাস্তুরা পুলিশের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলে। উদ্বাস্তুরা তিনটি সারিতে বিভক্ত হয়ে পুলিশের মুখোমুখি দাঁড়ায়। প্রথম সারিতে মেয়েরা, দ্বিতীয় সারিতে পুরুষবাহিনী এবং তৃতীয় সারিতে কিশোর-কিশোরী ও শিশুরা। মাহেশে উদ্বাস্তু কলোনির নারী ও শিশুর ওপব পুলিশি নির্যাতনের খবর কলকাতার কাগজে প্রকাশিত হয়। প্রায় তিন মাস ধরে পুলিশ ও উদ্বাস্তুদের লড়াই চলতে থাকে। প্রায় সাড়ে তিন মাস পরে বিষয়টি আদালতে নিয়ে যাওয়া হয়। আদালত যে রায় দিল তাতে পরিস্থিতি পুরোপুরি পরিবর্তিত হয়ে গেল। আদালতের রায়ে বলা হল যে, যদি কোনো ব্যক্তি দখল করা জমি অথবা বাড়িতে একটানা তিনমাস বসবাস করে, তবে তার বিরুদ্ধে কোনো ফৌজদারি মামলা দায়ের করা যাবে না। তার বিরুদ্ধে শুধু দেওয়ানি মামলাই করা যাবে। সুতরাং দখলীজমি অথবা বাড়িতে তিন মাস পরে আর পুলিশি হস্তক্ষেপের প্রশ্নই ওঠে না।

আদালতের এই রায় জমির মালিকদের হতাশ করল। কারণ, দেওয়ানি মামলা

করলে জমির মোট মূল্যের শতকরা সাড়ে বারো টাকা কোর্ট ফি দিতে হবে। মামলা চলবে অন্তত চার বছর। ফলে উকিলের পেছনেও অনেক ব্যয় হবে। অতএব মামলা করতে যা খরচ হবে, তা জমির মোট মূল্যের বেশি দাঁড়াবে। তাছাড়া মামলা করার জন্য প্রত্যেক জমি-দখলকারীর নাম সংগ্রহ করাও প্রায় অসম্ভব ছিল। অতএব তিনমাস পুলিশি হামলার বিরুদ্ধে কোনোক্রমে টিকে থাকতে পারলে আদালতের রায়ের ফলে দখলীকৃত জমি দখলকারীর অধিকারভুক্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিল। এই রায় জমির মালিক ও সরকারকে সংকটে ফেলল। এই রায়ের সরকারি প্রতিক্রিয়া হল একটি আইনের খশড়া যা সাধারণভাবে উচ্ছেদ আইন নামে পরিচিত, পরবর্তীকালে সংশোধনের ফলে এই আইনের নাম হয় ১৯৫১-র Act XVI। এই খশড়া আইনে বলা হল জমির মালিক ৫০ পয়সা কোর্ট ফি দিয়ে যোগ্য কর্তৃপক্ষের আদালতে বে-আইনি জমি দখলকারীর বিরুদ্ধে মামলা-দায়ের করতে পারবে। যোগ্য কর্তৃপক্ষের আদালতের পরিদর্শকেরা জবরদখলকারীদের নাম সংগ্রহ ও তাদের দখলীকৃত জমির পরিমাণ নির্ধারণ করবে। যতকাল জমি বে-আইনিভাবে দখলীকৃত হয়ে থাকবে, সেই সময়ের জমির মালিককে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থাও খশড়া আইনে করা হল। এক কথায় বলা চলে যে এই খশড়া আইনে জমির বে-আইনি দখলকারীদের উচ্ছেদের দায়দায়িত্ব জমিদারদের রইল না। তা সরকারের ওপর বর্তাল।

উচ্ছেদের আইনে প্রথম যে খশড়া করা হয়েছিল তার নাম দেওয়া হয়েছিল 'অবৈধভাবে জমি দখলকারীদের উচ্ছেদের আইনের খশড়া'। বিধানসভায় এই খশড়া আইনটি পেশ করার কয়েকদিন আগে ১৯৫১-র ২০ মার্চ একটি সাংবাদিক সম্মেলনে ডঃ রায় এই খশড়া আইনের প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করেন।[৪] বে-সরকারি এবং রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের জমি অবৈধভাবে দখল করার যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে প্রচলিত আইনের দ্বারা তার সমাধান সম্ভব নয়। ভারতের সংবিধানে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অলঙ্ঘনীয়তা স্বীকৃত। বে-আইনিভাবে জমি দখল করে উদ্বাস্তুরা তা অমান্য করেছে। অথচ দীর্ঘস্থায়ী মামলা না করে এদের উচ্ছেদ করার মতো কোনো আইন নেই। ডঃ রায় স্বীকার করেন যে উদ্বাস্তুদের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ স্বাভাবিক। এই ক্ষোভ পশ্চিমবঙ্গবাসীর বিরুদ্ধে, ভারতবাসীর বিরুদ্ধে, এমনকী ভাগ্যের বিরুদ্ধে। কেন তাদের উপড়ে ফেলা হল, কেন তাদের জীবনে উদ্বাস্তু জীবনের অভিশাপ নেমে এল, এই প্রশ্নের কোনো উত্তর পায়নি। খশড়া আইনে দখলীকৃত জমিকে দুভাগে ভাগ করা হল : কমদামি জমি ও বেশিদামি জমি। কমদামি জমির মালিকদের সঙ্গে বোঝাপড়া করে সেই জমি দখলকারীদের কাছে বিক্রি করা যেতে পারে। কিন্তু বেশিদামি জমি থেকে জবরদখলকারীদের তুলে দেওয়া হবে। কারণ বেশিদামি জমি কিনে নেবার সঙ্গতি উদ্বাস্তুদের অথবা সরকারের ছিল না। অতএব উচ্চমূল্যের দখলীকৃত জমি ছেড়ে দিতেই হবে। অবশ্য দখলীকৃত জমির কাছাকাছি তাদের জন্য বিকল্প জমির ব্যবস্থা করা হবে। কাছাকাছি বিকল্প জমি দেওয়া হবে যাতে তারা যে কাজ করে অন্নসংস্থান করছিল, সেই কাজ যেন তারা তাদের বিকল্প আবাস থেকে করতে পারে।

১৫ মার্চ বিধানসভায় উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে সরকারি নীতি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ডঃ রায় অকপটে স্বীকার করেন যে উদ্বাস্তুপ্রবাহের প্রকৃতি ও সংখ্যা সম্পর্কে তাঁর ও কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো ধারণাই ছিল না। তাই উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে সরকারের কোনো স্থির নীতি ছিল না। কেন্দ্রীয় সরকারের এই স্থির বিশ্বাস ছিল যে উদ্বাসন সাময়িক এবং

পরিস্থিতির উন্নতি হলেই উদ্বাস্তুরা দেশে ফিরে যাবে। অতএব এতকাল কেন্দ্রীয় সরকার উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের কথা ভাবেনি। ১৯৪৮ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের এই বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে পূর্ব-পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের জন্য সাময়িক ত্রাণদানের চেয়ে বেশি কিছু করার নেই। উদ্বাস্তুদের শুধু ত্রাণ নয়, পুনর্বাসনও দিতে হবে, এই সহজ সত্যটি মেনে নিতে কেন্দ্রীয় সরকারের অনেক সময় লেগেছিল। এই ভাষণে ডঃ রায় খোলাখুলিভাবে একথা স্বীকার করলেন যে এতকাল উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে বিশেষ কোনো তথ্যই তাঁর কাছে ছিল না। সম্প্রতি রাজ্য পরিসংখ্যান আধিকারিকের উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন তাঁর হাতে এসেছে। অতএব উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের ব্যাপারে তিনি এখন অগ্রসর হতে পারবেন। প্রথম পুনর্বাসন দেওয়া হবে সরকারি ক্যাম্পের উদ্বাস্তুদের।[৫]

উচ্ছেদের খশড়া আইনে কিন্তু ডঃ রায়ের এই মহৎ উদ্দেশ্য প্রতিফলিত হয়নি। উচ্ছেদের আইনের খশড়ার একমাত্র লক্ষ্যই ছিল যেসব উদ্বাস্তু আইন নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছে, তাদের উচ্ছেদ করা। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি এই খশড়ার প্রতিটি ধারার বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছন যে শুধুমাত্র আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি বিচার করলে ভুল হবে। কারণ কোনো সরকারের পক্ষেই লক্ষ লক্ষ মানুষকে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া সম্ভব নয়। তা বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলা নিয়ে আসবে। খশড়াটি একদেশদর্শী। এতে জমির মালিকদের অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছে। খশড়ার শুধু একটি ধারাই ছিল যাতে উদ্বাস্তুদের কিছুটা আশ্বস্ত করা হয়েছিল। ধারাটি হল : দখলীকৃত জমি থেকে উচ্ছেদের আগেই তাদের বিকল্প আশ্রয় দেওয়া হবে।[৬]

ডঃ মুখার্জির মতে মূল প্রশ্নটি ছিল এই : জমির জবরদখল মেনে নেওয়া চলে না। অন্যদিকে যে পরিস্থিতিতে লক্ষ লক্ষ সর্বহারা মানুষ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায়, বিশেষত কলকাতার শহরতলীতে, জমি বে-আইনি দখল করে স্থিতিলাভ করেছে, তাও উপেক্ষা করা চলে না। সব হারিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ এদেশে চলে এসেছে। ভাঙা শরীর ও মন নিয়ে মুহ্যমান মানুষগুলি আবার আশায় বুক বেঁধে পতিত, জোলো জমি পুনরুদ্ধার করে ঘর বেঁধেছে, রাস্তাঘাট তৈরি করেছে, স্কুল, কলেজ, গ্রন্থাগার নির্মাণ করেছে। কলকাতার শহরতলীতে ছোট ছোট উপনগরী গড়ে তুলেছে। তারা জমির মালিক ও ফাটকাবাজদের গুণ্ডাবাহিনী এবং পুলিশি হামলা প্রতিরোধ করেছে, স্থানীয় অধিবাসীদের বিরূপতা সহ্য করেছে, চারদিকের অবজ্ঞা ও ঘৃণার পরিমণ্ডলকে পেরিয়ে এসেছে। সরকার এদের জন্য কিছুই করেনি। এরা নিজেরাই নিজেদের পুনর্বাসন দিয়েছে। আর ঠিক যখন তারা এক ধরণের স্থিতিলাভ করেছে, তখন আবার তাদের পথের কুকুরের মতো রাস্তায় বার করে দেওয়া হয়েছে। কোনো মনুষ্যগোষ্ঠী আইন লঙ্ঘন করলে সরকার তা মেনে নিতে পারে না, একথা ঠিক। কিন্তু যন্ত্রণায় কাতর কয়েক লক্ষ অসহায় মানুষের প্রতি দায়িত্ব পালন করেনি সরকার। এদের আশ্রয় ও অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করা উচিত ছিল সরকারের। কিন্তু এদের দিকে মুখ ফিরিয়ে ছিল সরকার। আজ যখন প্রচণ্ড উদ্যম মৃত্যুর মুখ থেকে তাদের জীবনের পথে নিয়ে এসেছে, তখন আবার তাদের নিরাশ্রয় করে পথে বার করে দিলে দেশে যে অরাজকতার সৃষ্টি হবে, তার মোকাবিলা করা সরকারের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির মতে মালিকদের সঙ্গে উদ্বাস্তু সংগঠনসমূহের আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে জবরদখল কলোনি সমস্যার সমাধানের জন্য চেষ্টা করা উচিত। উচ্ছেদের আইনের খশড়ায় কিছুটা অসঙ্গতির দিকেও তিনি অঙ্গুলি নির্দেশ করেন। সরকার খশড়ায় এই আশ্বাস দিয়েছে যে বেশিদামি জমি

থেকে যাদের উচ্ছেদ করা হবে, তাদের এই জমির কাছাকাছি কমদামি জমি দেওয়া হবে। কিন্তু কমদামি জমির জন্য কলকাতা থেকে বেশ খানিকটা দূরে যেতে হবে। কিন্তু কলকাতা থেকে দূরে গেলে তারা যে কাজ করে দিন গুজরান করছে, তা করা সম্ভব হবে না। অর্থাৎ তাতে আশ্রয় মিলবে, কিন্তু পেট ভরবে না। কিন্তু বর্তমান জবরদখল কলোনির কাছাকাছি কমদামি জমি পাওয়া যাবে কী করে? সরকারকে এই প্রশ্নের জবাব দিতে হবে।

তাঁর বিবৃতিতে ডঃ রায় জানান যে ক্যাম্পের উদ্বাস্তুরাই হচ্ছে সরকারের প্রাথমিক দায়িত্ব। অথচ তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করে সরকার যেসব উদ্বাস্তু তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নিজেরাই করে নিয়েছে, তাদেরই আবার পথের ভিখারি করে দিতে উদ্যোগী হয়েছে। উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দেওয়ার প্রথম সরকারি উদ্যোগ হল উদ্বাস্তু উচ্ছেদের আইন। এর চেয়ে আর আশ্চর্যের ব্যাপার কি হতে পারে!

এই পরিস্থিতিতে সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন করা ছাড়া উদ্বাস্তুদের সামনে আর অন্য কোনো পথ খোলা ছিল না। তারা তিন বছর অপেক্ষা করেছে। এই সময়টা সরকার তাদের দেখেও দেখেনি। যদি দেখে থাকে তবে দেখেছে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে। কিন্তু যখন তারা নিজেরা নিজেদের মাথা গুজবার ঠাঁই করে নেওয়ার চেষ্টা করল, তখন সরকার উচ্ছেদের আইন তৈরি করে তাদের দ্বিতীয়বার উচ্ছেদ করার হুমকি দিল। কিন্তু সরকারের তখনো ধারণা ছিল না কোন মৌমাছির চাকে সে ঢিল মারছে। সরকার ভেবে দেখেনি যে বিরাট দাহ্য জনগোষ্ঠীকে সে উচ্ছেদ করার চেষ্টা করছে, তাদের অন্তরে কী ঘটছিল। উদ্বাস্তুরা দুরন্ত পদ্মার সন্তান। পূর্ববঙ্গের অসংখ্য নদীনালা, খালবিল একটি প্রচণ্ড জলপ্রবাহের-পদ্মার-রূপ পরিগ্রহ করে তাদের কল্পনাকে ছেয়ে আছে। অনন্ত, অভাবনীয় এই পদ্মা কখনো ভাঙছে, কখনো সৃষ্টির আবেগে বেপথুমান, কখনো ফেনিল ক্রোধে অধীর, কখনো ইস্পাতের মতো শীতল। জীবনের অনিশ্চয়তাকে শান্তভাবে গ্রহণের ক্ষমতা ও অস্থিরতা—দুই-ই পদ্মা তাদের মধ্যে সংক্রামিত করেছে। অবিস্মরণীয় এই পদ্মা, সর্বদাই তাদের সঙ্গে। পদ্মা তাদের ভাঙে, গড়ে। যে পদ্মাকে তারা ফেলে এসেছিল, সেই পদ্মা এখন তাদের রক্তে মিশে গেছে। সেই পদ্মাই তাদের শিরায় শিরায় বইছে। গঙ্গা পবিত্র। কিন্তু গঙ্গা তাদের তৃপ্ত করে না। গঙ্গা পদ্মার মতো সীমাহীন নয়, গভীর নয়। তার সেই বিস্তার নেই। গঙ্গা বড় সীমাবদ্ধ। গঙ্গা বশীভূত, নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে সে প্রবহমান। হিমালয় থেকে ছাড়া পেয়ে সে কয়েক হাজার মাইল বয়ে গিয়ে সাগরে মিশেছে। তার দুই তীরে কত নগর, শহর, গ্রাম, প্রাসাদ, মন্দির, স্নানের ঘাট। মানুষের ইচ্ছার কাছে এই নদী বশীভূত। সভ্যতার প্রয়োজন মেটাতে সে নিজেকে উৎসর্গ করেছে, সমতলভূমিকে যে উর্বর করেছে, বয়স্ক সভ্যতার সব নোংরা আবর্জনা সে বয়ে নিয়ে গিয়েছে সমুদ্রে। সেইখানে তার মুক্তি। কিন্তু পদ্মায় স্থায়িত্বের কোনো বিভ্রম নেই। পদ্মা গর্জন করছে, আক্রোশে ফুলছে, গিলছে, উগরে ফেলছে, ধ্বংস করছে, সৃষ্টি করছে। সে নির্মম, মুক্ত। তার তীরে কোনো প্রাচীন নগর নেই, সভ্যতা নেই। শুধু সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া, নিরন্তর পরিবর্তমানতা, নদী ও সময়ের দ্রুত প্রবহমানতা।

তারা নদীকে ফেলে চলে এসেছে। কিন্তু নদীর স্মৃতি আতুরতা কখনো তাদের চেতনা থেকে মুছে যায়নি। তারা আক্রান্ত হয়ে পশুর মতো পালিয়ে এসেছে। প্রায় আড়াই লক্ষ একর পতিত ও বন্ধ্যা জমি দখল করে তারা অন্ধকারে ঝাঁপ দিয়েছে। বুর্জোয়া সমাজের

ভিত্তি ব্যক্তিগত সম্পত্তির অলঙ্ঘনীয়তা। তারা তাই লঙ্ঘন করেছে, বুর্জোয়া সরকারও তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নিয়েছে। এখন আর এই সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই ছাড়া অন্য কোনো পথ খোলা নেই। এই সরকারকে আঘাত করতে হবে। তারা তিন বছর অপেক্ষা করেছে। এই সরকার তাদের কিছু দেয়নি। তাদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছে। অথচ সেই মুহূর্তে তারা তাদের মাথার ওপর আচ্ছাদনের ব্যবস্থা করেছে, যখন দিনরাত খেটে কোনোক্রমে অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে, ঠিক তখনই সরকারের টনক নড়েছে, সে অস্ত্র তুলছে আবার তাদের পথে ঠেলে দেওয়ার জন্য।

এই পরিস্থিতিতে উদ্বাস্তুদের সংগঠন ইউ সি আর সি (সংযুক্ত বাস্তুহারা পরিষদ) সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রস্তুতির জন্য প্রচারাভিযান শুরু করে। ইউ সি আর সি-র সংগ্রামের কৌশল ছিল দ্বিবিধ: (১) সরকারের কাছে স্মারকপত্র দেওয়া এবং আইনের খশড়া যাতে বিধানসভায় পাশ না হয় সেজন্য সহানুভূতিশীল বিধানসভার সদস্যদের সাহায্য গ্রহণ; (২) উদ্বাস্তুরা যে নতুন ঘর বেঁধেছে, তা রক্ষা করার জন্য উদ্বাস্তুদের সংগঠিত প্রতিরোধ গড়ে তোলা এবং উচ্ছেদের আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের জন্য উদ্বাস্তুদের পথে নামানো।

ইউ সি আর সি-র নেতারা অত্যন্ত ব্যাপকভাবে উদ্বাস্তুদের সংগঠিত প্রতিরোধ গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। উদ্বাস্তুদের বোঝাতে লাগলেন যে সংগঠিত প্রতিরোধ গড়ে না তুললে তাদের নতুন ঘরদোর ছেড়ে পথে দাঁড়াতে হবে। ইউ সি আর সি-র নেতারা জানতেন যে তাদের দীর্ঘস্থায়ী, সুপরিকল্পিত আন্দোলনে নামতে হবে। একটি ভুল পদক্ষেপের মারাত্মক মূল্য দিতে হবে। ধারাবাহিক আন্দোলন করতে হবে তাতে সন্দেহ ছিল না। কিন্তু আন্দোলনের প্রকৃতি ও কৌশল কী হবে তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল। আন্দোলন কি সাংবিধানিক নিয়মনীতির কাঠামোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে? অথবা নিয়মনীতির বেড়া ভেঙে এই আন্দোলন হিংসাত্মক পথে যাবে? নেতারা জানতেন যে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তরের ওপরেই আন্দোলনের সাফল্য নির্ভর করছে।

জবরদখল কলোনি প্রতিষ্ঠার প্রথম পর্যায়ের আন্দোলনে—অর্থাৎ অক্টোবর ১৯৪৯ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত আন্দোলন মুখ্যত নিম্নমধ্যবিত্ত উদ্বাস্তুদের কীর্তি। তাদের এই নতুন অর্জিত বাস্তুভিটা রক্ষার জন্যও একটা নির্দিষ্ট গণ্ডির বাইরে এরা যেতে প্রস্তুত ছিল না। ব্যক্তিগত সম্পত্তির অলঙ্ঘনীয়তার বোধ তাদের প্রকৃতিতে এমন গভীরভাবে নিহিত ছিল যে তারা চরম হিংসাত্মক আন্দোলনের দ্বারা তাদের দখলীকৃত জমির ওপর তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চায়নি। জোর করে দখল করা জমিকে তারা বৈধভাবে অর্জিত জমিতে পরিবর্তিত করতে চেয়েছিল। খশড়া আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের পরিকল্পনা করার সময় নিম্নমধ্যবিত্ত উদ্বাস্তুদের এই মানসিকতা বিশেষভাবে মনে রাখতে হয়েছিল। নেতারা জানতেন যে এই আন্দোলন ফলপ্রসূ করতে হলে অনেক ভেবেচিন্তে প্রত্যেকটি পা ফেলতে হবে। তাঁদের প্রত্যেকটি পদক্ষেপ হতে হবে সরকারি ক্রিয়ার সুনিশ্চিত প্রতিক্রিয়া। জমির ব্যাপক জবরদখল মুক্তাঞ্চল সৃষ্টির আন্দোলন নয়। খশড়া আইন বিধানসভায় পেশ করার পর জমি জবরদখল করার আন্দোলন বৈধভাবে লব্ধ জমিতে রূপান্তরিত করার আন্দোলনে পরিণত হল।

ইউ সি আর সি নেতারা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে তাঁদের আন্দোলনকে একটি পূর্বনির্দিষ্ট সীমার মধ্যে রাখতে হবে। তৎকালীন পরিস্থিতি ও মানবিক উপাদান এই দুইয়ের প্রয়োজনই এই সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল। জবরদখল কলোনির উদ্বাস্তুদের

শ্রেণী বিন্যাসের কথা মনে রেখেই আন্দোলনকে একটি নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে বেঁধে রাখা আবশ্যিক ছিল। এই আন্দোলনে চরমপন্থী প্রবণতার প্রশ্রয় দিলে তা শেষ পর্যন্ত অনর্থ পরাজয়ে পর্যবসিত হতে পারত। উদ্বাস্তুদের সাংগঠনিক হাতিয়ার ইউ সি আর সি ইতিমধ্যেই তৈরি করা হয়েছে। ইউ সি আর সি কতটা নির্ভরযোগ্য তা পরীক্ষা করার ক্ষেত্রও এখন প্রস্তুত। কিন্তু ইতিমধ্যেই উদ্বাস্তুদের মধ্যে ভাঙনের সূত্রপাত হয়েছে। ইউ সি আর সি ছাড়াও আরো একটি প্রতিদ্বন্দ্বী উদ্বাস্তু সংগঠন ছিল আর সি আর সি); (Refugee Central Rehabilitation Council—কেন্দ্রীয় উদ্বাস্তু পুনর্বাসন পরিষদ)। এই আর সি আর সি-র অন্তর্গত ছিল রেভলিউশনারি সোস্যালিস্ট পার্টি (আর এস|পি), কৃষক মজদুর প্রজাপার্টি (কে এম পি পি), ফরওয়ার্ড ব্লক (লীলা রায় গোষ্ঠী), রেভলিউশনারি কমিউনিস্ট পার্টি অভ্ ইন্ডিয়া (আর সি পি আই—সৌম্যেন ঠাকুর গোষ্ঠী), সোস্যালিস্ট পার্টি (এস পি)। আগেই বলা হয়েছে ইউ সি আর সি ও বিভিন্ন পার্টি নিয়ে গঠিত যৌগিক পার্টি। সিপিআই এই সংগঠনের মুখ্য অংশমাত্র। এই সংগঠন সিপিআই-এর কর্তৃত্বাধীন ছিল না। সুতরাং এই সংগঠনের পরিচালনার ব্যাপারে সিপিআই-কে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হত। অনেক ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিতে হত। তাছাড়া ইউ সি আর সি-র পরিচালনার আরো একটি উপাদান ছিল উদ্বাস্তুদের বিশিষ্ট মানসিকতা। জবরদখল কলোনি গঠন করে উদ্বাস্তুরা কিছুটা সন্ত্রস্ত হয়েছিল। ভয় ছিল, যে কোনো মুহূর্তে তাদের ওপর হয়তো সরকারের খড়্গ নেমে আসবে। তাছাড়াও ছিল স্থানীয় অধিবাসীদের নিষ্ক্রিয় অমিত্রসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি এবং জমিদারদের ও সরকারের সক্রিয় শত্রুতা। রাজ্য সরকার ও জমিদারদের যোগসাজশ তাদের দখলীকৃত জমি থেকে উৎখাত করতে উদ্যত; কেন্দ্রীয় সরকারও এই উচ্ছেদ অভিযানের সঙ্গে যুক্ত। দখলীকৃত জমির অধিকাংশই ছিল কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার, বড় জমিদার ও জমির ফাটকাবাজদের। কিন্তু অল্প কিছু জমি পশ্চিমবঙ্গের স্বল্পবিত্ত মানুষ ও মুসলমানদেরও ছিল। সুতরাং ইউ সি আর সি যদি বিনা ক্ষতিপূরণে জমি স্থায়ীভাবে দখল করার ডাক দিত, তাহলে হয়তো পশ্চিমবঙ্গব্যাপী এমন শোরগোল উঠত যে উচ্ছেদ এড়ানো যেত না। সুতরাং উচ্ছেদ আইনের খশড়ার বিরুদ্ধে আন্দোলনকে পূর্বনির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখা প্রয়োজন। বল্গাহীন আন্দোলনের প্রশ্নই ছিল না। অনেক বাধা বিপত্তি ছিল যা আন্দোলনের প্রকৃতি ও পরিধিকে একটি পূর্বনির্ধারিত ছকের মধ্যে রাখা বাধ্যতামূলক করেছিল। নিছক বেঁচে থাকার তাগিদেই তারা জোর করে জমি দখল করেছে, পুলিশের হামলা প্রতিহত করেছে। কিন্তু উচ্ছেদের আইন পাশ হলে আইনের সব শক্তি এবং রাষ্ট্রের নিপীড়নমূলক যন্ত্র তাদেব বিরুদ্ধে নিয়োজিত হবে। শুধু তাই নয়, রাষ্ট্রের বিধিসঙ্গত নিপীড়নের পেছনে পশ্চিমবঙ্গেব সাধারণ মানুষের একটি বড় অংশের সমর্থনও থাকবে। তাছাড়া উদ্বাস্তুরা জমি জোর করে কেড়ে নিতে চায়নি। জবরদখল জমিতে বাস করে তাদের অস্বস্তি হচ্ছিল। তারা জানত যে যতদিন এই জবরদখল করা জমি তাদের বৈধ সম্পত্তিতে পরিণত না হবে, ততদিন তাদের এই পরস্বাপহরণের অস্বস্তি থাকবেই।

অতএব ইউ সি আর সি-র নেতৃত্বের কাজ সহজ ছিল না। উচ্ছেদ আইনের খশড়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য উদ্বাস্তুদের প্রস্তুত করতে হবে। জবরদখলকারী উদ্বাস্তুদের একথা বোঝাবার প্রয়োজন ছিল যে দখলীকৃত জমির ওপর তাদের বৈধ অধিকার না থাকলেও নৈতিক অধিকার আছে। তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে হয়েছিল যে দেশবিভাজনের আগে নেতারা তাদের আশ্বাস দিয়েছিলেন যে পাকিস্তানে তাদের পক্ষে থাকা সম্ভব না হলে,

তারা এদেশে তাদের বসবাসের ব্যবস্থা করবেন। তারা জমি দখল করেছে নিরুপায় হয়ে, কংগ্রেসি নেতারা তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছেন বলে, সরকার তাদের পুনর্বাসনের কোনো ব্যবস্থাই করেনি। তারা এদেশে আসার সঙ্গে সঙ্গে জমির দাম আকাশছোঁয়া হয়ে যায়। তারা তো জমি কিনে নিতেই চেয়েছিল। কিন্তু আকস্মিকভাবে জমির দাম বেড়ে যাওয়ায় জমি কেনার মতো আর্থিক সঙ্গতি তাদের আর থাকেনি। তারা এই বিশেষ পরিস্থিতি সৃষ্ট মানুষ। এই পরিস্থিতিই তাদের জন্য এই সুযোগ সৃষ্টি করে যা তারা দুহাতে আঁকড়ে ধরে। তাতে তারা দেশবিভাজনের আগেকার পুববাংলার শান্তিপূর্ণ স্থির জীবন ফিরে পায়নি। তবু তারা এখন আর ভেসে-যাওযা আবর্জনার মতো মানুষ নয়। জবরদখল কলোনি গড়ে তুলে তারা যা পেয়েছে, তা পুরোনো শান্ত নীড় নয়। তবু মাথা গোঁজার মতো একটা আশ্রয় তারা তৈরি করে নিয়েছে। কলোনি গড়ে তোলার আগে তারা ছিল পুরোপুরি সর্বহারা। এখন অন্তত একটুকরো জমি ও একটা কুঁড়েঘর তাদের আয়ত্তাধীন। আর তারা ডুবে যাওয়া জাহাজের ভাসমান যাত্রী নয়। অবৈধ ভাবে হলেও এখন তারা পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে প্রোথিত। অবৈধভাবে দখলীকৃত জমি ঠিকই। কিন্তু তবু এখন আর তারা সভ্যসমাজের বাইরে ভাসমান ভিখিরির দল নয়। তারা ডাঙ্গায় উঠেছে। তাদের স্বপ্নের দেশের মাটি নয়। তবু ডাঙ্গা। এই ডাঙ্গা তারা দখল করেছে এবং যা ঘটে ঘটুক এই মাটির ওপর অধিকার তারা ছাড়বে না। এদের ওপর নেতৃত্ব বজায় রাখতে হলে ইউ সি আর সি-কে দেখতে হবে যে এই মাটি তাদের পায়ের তলা থেকে সরে না যায়। কেননা, ইউ সি আর সি-র শক্তির সুনিশ্চিত ভিত্তি হল জবরদখল কলোনির প্রায় দেড় লক্ষ উদ্বাস্তু। ইউ সি আর সি-র নেতৃত্ব জানতেন যে উচ্ছেদের খশড়া আইনের বিরুদ্ধে সফল সংগ্রামের জন্য জবরদখল কলোনির এই দেড় লক্ষ মানুষকেই এই সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। কিন্তু এইসব মানুষকে আন্দোলনের মধ্যে নিয়ে আসতে পারলেও একটা প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছিল। আন্দোলনের প্রকৃতি কী হবে? উচ্ছেদের খশড়া আইন সরকারকে তুলে নিতে বাধ্য করার জন্য নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন হবে? অথবা প্রয়োজন হলে ইউ সি আর সি সরকারের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নামবে? হিংসাত্মক সংঘর্ষের পথে যাওয়ার প্রলোভন খুব বেশি ছিল। কেননা উচ্ছেদের আইনের খশড়া উদ্বাস্তুদের কাছে দ্বিতীয়বার উচ্ছেদের হুমকির মতো এসেছিল। দুঃসাহসিক স্পর্ধায় তারা যে জমি অধিকার করেছিল তা যাতে হাতছাড়া না হয়ে যায় সেজন্য তারা অনেকদূর পর্যন্ত যেতে রাজি ছিল।

ইউ সি আর সি-র নেতৃত্ব জানত যে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তরের ওপরই আন্দোলনের সাফল্য অথবা ব্যর্থতা নির্ভরশীল। আইনের বিরুদ্ধে একটি ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য উদ্বাস্তুদের সমবেত করে এই আন্দোলনের পরিধি নির্দিষ্ট করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন নেতৃবৃন্দ। স্থির হল উচ্ছেদের আইন তুলে নেওয়া উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য উদ্বাস্তু আন্দোলন নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। সরকারের বিরুদ্ধে মুখোমুখি সংঘর্ষেব নীতির্র বিপরীত ফল হবে। তাতে সরকারের হাতই শক্তিশালী হবে।

ইউ সি আর সি নেতৃত্বের এই সুনিশ্চিত প্রত্যয় ছিল যে উদ্বাস্তুদের বিপুল সংখ্যা ইউ সি আর সি-কে একটি শক্তির কেন্দ্রে পরিণত করেছে। তথাপি নেতৃবৃন্দ জানতেন যে উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানের জন্য তাঁদের বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু আন্দোলনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল উদ্বাস্তু জনসংখ্যার সমষ্টিমনের ওপর

সুনিশ্চিত আধিপত্য। এই ক্ষেত্রেই ইউ সি আর সি নেতৃবৃন্দ অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। বাস্তবধর্মী বিশেষজ্ঞের মতো তারা বিপুলসংখ্যক অস্থির উদ্বাস্তুর ব্যবস্থাপনা, সমাবেশ ও পরিচালনা করেছিলেন। সচেতনভাবে না হলেও উদ্বাস্তু জনতার আন্দোলন পরিচালনার ব্যাপারে তাঁরা রণক্ষেত্রে সৈনাপত্যের নীতির প্রয়োগ করেছিলেন। উচ্ছেদের খশড়া আইনের বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনকে তারা সরকারের বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী শক্তিক্ষয়কারী যুদ্ধের রূপ দিয়েছিলেন। তাঁদের রণকৌশল ছিল কলকাতাকে একটি স্থায়ী অবরুদ্ধ নগরীতে পরিণত করা এবং সেজন্য প্রায় প্রতিদিন দলবদ্ধভাবে উদ্বাস্তুদের কলকাতার রাজপথে এনে কলকাতায় একটা আপৎকালীন অবস্থার সৃষ্টি করা। সরকারের ওপর নিরন্তর চাপ সৃষ্টি করা। উদ্বাস্তুরাই কলকাতাকে মিছিলের নগরী, নেহরুর দুঃস্বপ্নের নগরীতে পরিণত করল। মিছিল, বিক্ষোভ, মিটিং, যানজট, ইষ্টকবৃষ্টি, কাঁদানে গ্যাস, লাঠিচার্জ, ট্রাম-বাসে আগুন এবং মাঝে মাঝে পুলিশের গুলি—কলকাতা শহরের এই হল বিশিষ্ট চেহারা। আজাদ হিন্দ বাহিনীর নেতাদের বিচারের সময় অতিকায় মিছিল, বিক্ষোভ, সভা, কাঁদানে গ্যাস, লাঠিচার্জ, পুলিশের গুলির অভিজ্ঞতা হয়েছিল নেশায়-পাওয়া কলকাতার। কিন্তু কোনোদিনই মিছিল, বিক্ষোভ, পুলিশের গুলি ইত্যাদি কলকাতার প্রাত্যহিক ব্যাপার হয়ে ওঠেনি। উচ্ছেদের আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সময় ইউ সি আর সি-র নেতৃবৃন্দ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে কলকাতাকে মিছিল, বিক্ষোভ ইত্যাদি নিয়েই টিকে থাকতে হবে। হাজার হাজার নোংরা, ক্ষুধার্ত মানুষকে প্রতিদিন দেখতে হবে কলকাতাকে। হাজার হাজার আর্ত, পীড়িত পুরুষ, নারী ও শিশুর তীক্ষ্ণ, আর্ত স্লোগান শুনতে হবে কলকাতাকে যাতে কলকাতা উদ্বাস্তুদের ভুলে না যায়। আত্মপ্রত্যয়দৃপ্ত একটি স্লোগান শোনাতে হবে কলকাতাকে—"আমরা কারা? বাস্তুহারা।" কলকাতার সব রাজপথ ঘুরে ঘুরে এরা শহিদমিনারে যাবে, মিটিং করবে, আবার কলকাতার রাজপথ ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠবে গগনভেদী এই স্লোগানে। এরা ফিরে যাবে এদের জবরদখল কলোনির হোগলা অথবা দরমার কুঁড়েঘরে। 'আমরা কারা? বাস্তুহারা' এই স্লোগান বুঝিয়ে দিল উদ্বাস্তুরা এসেছে, থাকবে।

এই মিছিলগুলি ঠিক কলক'তার শহরের উদ্বাস্তুদের ছিল, একথা বলা চলে না। এরা সবাই আসত কলকাতার বাইরে থেকে। মধ্যবিন্দু কলকাতার ৫০ মাইল ব্যাসার্ধের অন্তর্গত অঞ্চল থেকে এরা আসত। এই অঞ্চলের মধ্যেই প্রথমদিকে অধিকাংশ জবরদখল কলোনি স্থাপিত হয়েছিল। প্রথমদিকে এরা আসত কলকাতার উত্তর ও দক্ষিণ শহরতলী থেকে। ক্রমে ইউ সি আর সি-র আধিপত্য যত বিস্তৃত হতে লাগল, ততই দূর দূর থেকে উদ্বাস্তুরা কলকাতার মিছিলে, ময়দানের সভায় আসতে লাগল। তারা ট্রেনে, বাসে, ট্রাকে আসত। শহরে ছড়িয়ে পড়ার আগে কলকাতার দ্বারপ্রান্তে কয়েকটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে এসে তারা জমা হত। সেখানে ইউ সি আর সি-র নেতাদের তত্ত্বাবধানে মিছিল সংগঠিত হত। তারপর এই মিছিলগুলির রাজপথ পরিক্রমা শুরু হত। সাপের মতো এঁকেবেঁকে কলকাতার রাজপথ পরিক্রমা করে এই সব মিছিল সমবেত হত ময়দানে। মিছিলের সব মানুষই জবরদখল কলোনির সুসংগঠিত হলে এবং উপযুক্ত নেতৃত্ব পেলে শুধু বিপুল সংখ্যা থেকেই কি প্রচণ্ড শক্তির উৎসার হতে পারে, এই উদ্বাস্তু মিছিল ও সমাবেশগুলিই তার প্রমাণ।

পুনর্বাসনের জন্য উদ্বাস্তুদের নিয়ে একটি দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন চালাতে হলে একটি

শক্ত সাংগঠনিক কাঠামো আবশ্যিক। এই কাঠামো এমন মজবুত ও নমনীয় হবে যাতে অত্যল্পকালের মধ্যেই অন্তত লাখখানেক মানুষের সমাবেশ ও তাদের নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার অনায়াসে হতে পারে। একটি ক্ষয়কারী রণকৌশলের প্রয়োজন মেটাতে পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী আন্দোলনের যে বিশিষ্ট চেহারা আমাদের চোখে পড়ে, ইউ সি আর সি নেতারাই উদ্বাস্তু আন্দোলনের জন্য সেই বিশিষ্ট রূপটি উদ্ভাবন করেছিলেন।

আন্দোলনের দৃষ্টিকোণ এমনভাবে করা হয়েছিল যাতে আন্দোলন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে এখন সামগ্রিকভাবে উদ্বাস্তুরা অংশভাক্ হতে পারে। অর্থাৎ উদ্বাস্তু আন্দোলন সম্পর্কিত কোনো সিদ্ধান্তই ইউ সি আর সি নেতারা উদ্বাস্তুদের ওপর থেকে চাপিয়ে দেবেন না। সব সিদ্ধান্তই নেবে সাধারণ উদ্বাস্তুরা। জবরদখল কলোনির কয়েক লক্ষ উদ্বাস্তুর সম্মিলিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিলেন ইউ সি আর সি নেতৃবৃন্দ। আগেই বলা হয়েছে যে এই পদ্ধতি আসলে মাও-জে-ডঙ-এর মাস লাইনের পদ্ধতি যা (From the masses and to the masses) জনসাধারণের থেকে এবং জনসাধারণের কাছে—এভাবে সূত্রবদ্ধ করা হয়েছে। ইউ সি আর সি নেতৃত্বের পদ্ধতি ছিল এইরকম : প্রত্যেক কলোনি কমিটির বিবেচনার জন্য ইউ সি আর সি নেতৃত্ব একটি আন্দোলনের পরিকল্পনা পাঠিয়ে দিতেন। প্রত্যেক কলোনি কমিটি মিটিং করে এই পরিকল্পনা বিশদভাবে বিচার ও বিশ্লেষণ করে দেখত। কলোনি কমিটি এই পরিকল্পনা পরিবর্তন অথবা সংশোধন করতে পারত। এভাবে বিচার করে কমিটি তার মতামতসহ পরিকল্পনাটি বিভিন্ন অঞ্চলে কলোনি কমিটির প্রতিনিধিদের যে কমিটি ছিল সেখানে পাঠিয়ে দিত। এইসব আঞ্চলিক কমিটি কলোনি কমিটিগুলির মতামত বিচার বিবেচনা করে তাদের নিজস্ব বক্তব্য ইউ সি আর সি-র কার্যনির্বাহী কমিটিতে পাঠিয়ে দিত। অবশেষে পিরামিডের মতো ইউ সি আর সি-র সাংগঠনিক কাঠামোর শীর্ষে অবস্থিত কার্যনির্বাহী কমিটি একটি সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছত এবং এই সিদ্ধান্তটি আবার কলোনি কমিটিগুলির অনুমোদনের জন্য ফেরত পাঠাত। সর্বসম্মত সিদ্ধান্তটি যখন কলোনি কমিটিগুলির কাছে ফিরে আসত, তখন এই কমিটিগুলির মনে হত যে এই সিদ্ধান্তটি তারাই নিয়েছে। মাও-জে-ডঙের মাস লাইনের—(From the masses and to the masses) আসল তাৎপর্য হল এই। সূত্রটি সামান্য পালটে দিলেই তা উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। যথা From the refugees of the colonies and to the refugees of the colonies (কলোনির উদ্বাস্তুদের থেকে এবং কলোনি উদ্বাস্তুদের কাছে)।

কলোনি কমিটিগুলির সাংগঠনিক কাঠামো ও তাদের সক্রিয়তার কথা মনে রাখলে মাস লাইনের তাৎপর্য আরো বেশি স্পষ্ট হবে। কলোনি কমিটিগুলিকে উদ্বাস্তু আন্দোলনের মূল চালিকাশক্তি বললে হয়তো অত্যুক্তি হবে না। জবরদখল কলোনির দৈনন্দিন সমস্যাবলীর মোকাবিলা করার প্রয়োজনীয়তা থেকেই এই কমিটিগুলি গড়ে ওঠে। প্রত্যেক জবরদখল কলোনির একটি কমিটি ছিল। প্রাপ্তবয়স্ক উদ্বাস্তুদের ভোটে এই কমিটির সদস্যরা নির্বাচিত হতেন। কলোনি কমিটিগুলিই জবরদখল কলোনির উদ্বাস্তুদের একটি সুসংহত গোষ্ঠীতে পরিণত করে। কমিটির সদস্যদের কাজ ছিল কলোনির প্রত্যেকটি পরিবারের খবরাখবর নেওয়া, তাদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করা, সরকার জমিদার ও স্থানীয় জনসাধারণের সঙ্গে জবরদখল কলোনির উদ্বাস্তুদের সম্পর্কের নীতি নির্ধারণ করা। ক্রমে কলোনিগুলিতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ও কলোনিভুক্ত বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে ঝগড়াবিবাদ মেটাবার ও সম্প্রীতি বজায় রাখার ভারও কলোনি

কমিটিগুলির ওপর এসে পড়ল। প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত কলোনি কমিটিগুলি পুরোপুরি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিল কলোনিগুলিতে। বলা যেতে পারে, প্রত্যেকটি কলোনিতে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কলোনির প্রত্যেকটি পরিবারকে নিয়ন্ত্রণ করত এই কমিটি। কমিটির রাজনৈতিক প্রবণতা কলোনির সব পরিবারের আচরণে প্রতিফলিত হত। কমিটিতে যে রাজনৈতিক দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকত, কলোনি সেই রাজনৈতিকদলের প্রভাবাধীন বলে ধরে নেওয়া হত। সুতরাং কলোনি কমিটিগুলিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য বিভিন্ন বামপন্থী রাজনৈতিক দলের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘাত হত। কমিটির সদস্যদের নির্বাচনে প্রচণ্ড উত্তেজনা দেখা যেত। কলোনি প্রতিষ্ঠায় যারা অগ্রণী ভূমিকা নিতেন, প্রথম দিকে কলোনি কমিটি তারাই পরিচালনা করতেন। পরে বিধিসঙ্গত নির্বাচনের মাধ্যমে কলোনি কমিটি গঠিত হয়।

বস্তুত জবরদখল কলোনির প্রতিষ্ঠা এবং কলোনিগুলিকে বৈধ উপনিবেশে পরিণত করায় কলোনি কমিটিগুলির অবদান অসামান্য। প্রথমদিকে জবরদখল কলোনিগুলি পশ্চিমবঙ্গের বুকে একটি অশ্রুতপূর্ব ব্যাপার। প্রথমপর্বের ১৪৯টি কলোনির দেড়লক্ষ মানুষ পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীন বৈধ সমাজব্যবস্থা বহির্ভূত উদ্ভট মানুষ হিশেবেই গণ্য হত। এমনকী যেসব সচ্ছল উদ্বাস্তু দেশবিভাজনের পরে পরেই এদেশে এসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, তাঁরাও জবরদখল কলোনির মানুষজনের কথা উঠলে নাক সিঁটকাতেন। বর্তমান লেখকের সেই অভিজ্ঞতা আছে। জবরদখল কলোনির উদ্বাস্তুরাই প্রকৃত বাঙাল। এক ধরণের উদ্ভট জন্তু।

কিন্তু জবরদখল কলোনির উদ্ভট জন্তুরাই পশ্চিমবঙ্গের বদ্ধ জলাভূমিতে প্রবল প্রবহমানতা এনে দিয়েছিল। নিছক টিকে থাকার জন্য জবরদখল কলোনির উদ্বাস্তুদের মধ্যে যে সংগ্রামী চেতনা সংক্রামিত হয়েছিল, তা তাদের একটি গুটানো স্প্রিং-এর মতো করে তুলেছিল। আঘাত হানার প্রচণ্ড ক্ষমতা হয়েছিল তাদের মধ্যে। উদ্বাস্তুদের সংগ্রামী চেতনা এবং আঘাত হানার ক্ষমতা এনে দিয়েছিল এই কলোনি কমিটিগুলি। জবরদখল কলোনি প্রতিষ্ঠার আন্দোলন পরিচালনা করে এই কমিটিগুলি। যখন উচ্ছেদের খশড়া আইন এবং পুলিশ ও জমির মালিকদের ভাড়াটে গুণ্ডার বিরুদ্ধে নিরন্তর প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু হল, তখন কলোনি কমিটিগুলি উদ্বাস্তুদের সংঘবদ্ধ আন্দোলন পরিচালনা করেছিল। সুতরাং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে কলোনি কমিটিগুলি দখলের লড়াই চলত নিরবচ্ছিন্নভাবে। প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচনের মাধ্যমে কলোনিকমিটির সদস্যরা নির্বাচিত হতেন। তাই কলোনি কমিটিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের অর্থ ছিল, কলোনির ওপর দলের আধিপত্য লাভ। এ সময়ে কলোনি কমিটির ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে ক্রমাগতই সংঘাত চলেছে।

উচ্ছেদের আইনের খশড়ার বিরুদ্ধে আন্দোলন কলোনি কমিটিগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। এই কমিটিগুলিই ছিল ইউ সি আর সি-র মাস লাইন প্রয়োগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। খশড়া আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ছক কার্যকর করার জন্য ইউ সি আর সি যে পর পর পদক্ষেপ নেয় তাতে কলোনি কমিটিগুলির ভূমিকা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। প্রথমত, উদ্বাস্তুরা যাতে স্বেচ্ছায় আন্দোলনে যোগ দেয় সেজন্য তাদের মানসিকভাবে প্রস্তুত করে তুলতে তীব্র প্রচার অভিযান চালানো হত। মুদ্রিত প্রচারপত্র বিলি করে উদ্বাস্তুদের বোঝানো হত যে উদ্বাস্তু সমস্যা সম্পর্কে সরকারি

উদাসীনতার ফলে আন্দোলনে নামা ছাড়া গত্যন্তর নেই। জবরদখল কলোনিগুলিতে ক্রমাগত মিটিং করে ইউ সি আর সি-র খশড়া কর্মসূচি ব্যাখ্যা করা হত। তারপর কলোনিগুলির সংশোধনীসহ কর্মসূচি আঞ্চলিক কমিটি হয়ে ইউ সি আর সি-র কার্যনির্বাহী কমিটিতে চলে যেত এবং অবশেষে একটি সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত কলোনি কমিটিগুলিতে ফিরে আসত। এতে আন্দোলনের বিস্তৃত কর্মসূচি থাকত। কলকাতায় কবে ও কোথায় উদ্বাস্তু জমায়েত হবে এবং কলকাতায় কোন কোন রাস্তা পরিক্রমা করে উদ্বাস্তু মিছিল শহিদমিনারের পাদদেশে যাবে, কোন কলোনি কত উদ্বাস্তু পাঠাবে, কত শিশু ও নারী থাকবে, সব কিছুর নির্দেশ থাকত। কলকাতায় উদ্বাস্তু জমায়েতের চারটি স্থান নির্দিষ্ট ছিল। হাওড়া, শিয়ালদহ, শ্যামবাজার ও যাদবপুর। জমায়েতের সময় ঠিক করে দিত আঞ্চলিক কমিটিগুলি। হেঁটে, ট্রেনে, বাসে ও অন্যান্য যানে উদ্বাস্তুরা নির্দিষ্ট দিনে, সময়ে এক-একটি স্থানে জড়ো হত। বিভিন্ন স্থানে ইউ সি আর সি-র প্রতিনিধিরা উপস্থিত থেকে উদ্বাস্তু জমায়েতগুলিকে মিছিলের রূপ দিত। মিছিল কোন পথে যাবে, কী স্লোগান দেবে তা ইউ সি আর সি-র প্রতিনিধিরা ঠিক করে দিতেন। মিছিলের ওপর পুলিশের হামলা হতে পারে, তা জেনেশুনেই উদ্বাস্তুরা আসত। যারা অনেক দূর থেকে আসত ইউ সি আর সি তাদের জন্য রাত্রিতে খাওয়ার ও প্রয়োজন হলে থাকার বন্দোবস্ত করত। মিছিলের তদারকির জন্য উদ্বাস্তুদের নিয়েই একটি স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী গড়ে তোলা হয়েছিল। তারা বাড়ি বাড়ি ঘুরে মিছিলের ক্ষুধার্ত মানুষের জন্য আটার রুটি, আলুর দম, চিঁড়া, গুড় ইত্যাদির প্যাকেট তৈরি করে ময়দানে নিয়ে আসত। পুলিশের গুলি অথবা লাঠিতে আহত উদ্বাস্তুদের চিকিৎসার জন্য থাকত চিকিৎসক দল ও অ্যাম্বুলেন্স এবং পুলিশ যাদের গ্রেপ্তার করত, তাদের জামিনে ছাড়িয়ে আনার ব্যবস্থা ও বিভিন্ন সংবাদপত্রে যাতে উদ্বাস্তু মিছিল, সভা ও তাদের দাবিদাওযার খবর প্রচারিত হয়, তারও উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকত। উদ্বাস্তু জমায়েত, মিছিল ও সভা পরিচালনার সামগ্রিক দায়িত্ব ইউ সি আর সি-র। কিছুদিন পর পরই একটি নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট কিছু দাবির ভিত্তিতে উদ্বাস্তুদের মিছিল ও সভা হত। কলকাতার শহরতলী থেকে একটির পর একটি এই ধরণের উদ্বাস্তু দিবসের তরঙ্গ এসে কলকাতার বুকে আছড়ে পড়ত। সন্ধ্যায় এই তরঙ্গ আবার ফিরে যেত। এভাবে তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসতে লাগল, ফিরে যেতে লাগল। কলকাতার বুকে এই অভিঘাত শহরতলীর উদ্বাস্তু জনসমুদ্রের প্রবল আত্মঘোষণা। তাই 'আমরা কারা, বাস্তুহারা' স্লোগানের মধ্যে উচ্চারিত। উদ্বাস্তুরা এসেছে, তারা আর ফিরে যাবে না। আপাতত তাদের অবস্থান পশ্চিমবঙ্গের সমাজ ও সংস্কৃতির বাইরে। এরা পশ্চিমবঙ্গের সুস্থিত, ভদ্র মানুষ থেকে আলাদা। নিজেদের আবার নতুন করে প্রতিষ্ঠা করার বর্বর উন্মাদনা আছে এদের মধ্যে। এই অর্থে টয়েনবি সুসভ্য রোমান সাম্রাজ্যের বাইরে যে বর্বর জার্মান উপজাতিদের **'external proletariat'** বা 'বাইরের সর্বহারা' বলেছেন, তাদের সঙ্গে এই উদ্বাস্তু সর্বহারাদের সুস্পষ্ট মিল চোখে পড়ে। মৃতপ্রায় যে মানুষগুলি বলির পশুর মতো শিয়ালদহ স্টেশনে নেমেছিল, যারা সেখানে দিনের পর দিন পশুর জীবনই যাপন করেছে, জবরদখল কলোনি প্রতিষ্ঠা করে সেই মানুষগুলিই আবার তাদের রক্তে প্রমত্ত পদ্মাকে ফিরে পেয়েছে। তার সন্তানদের রক্তে পদ্মা অমিত তেজ সঞ্চার করেছে।

ইউ সি আর সি নেতৃত্বের দায়িত্ব হল এই বিপুল জনসমষ্টিকে সঠিক পথে পরিচালিত করা; তারা যাতে পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক কাঠামোর অন্তর্গত হয়ে পশ্চিমবঙ্গবাসী

মানুষের সঙ্গে এক নতুন জীবনের পথে যাত্রা করতে পারে তার ব্যবস্থা করা। ইউ সি আর সি প্রায় দশটি বামপন্থীদলের সংযোগে সৃষ্ট একটি অনন্য সংগঠন সারাভারতে যার কোনো তুলনা ছিল না। কিন্তু বামপন্থী হওয়া সত্ত্বেও ইউ সি আর সি-র উদ্বাস্তু নেতারা কখনোই ভোলেননি যে ইউ সি আর সি উদ্বাস্তু সংগঠন এবং এর প্রধান কাজ উদ্বাস্তুদের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের জন্য আন্দোলন, নিছক বামপন্থী আন্দোলন নয়। অর্থাৎ উদ্বাস্তুদের কাঁধে বন্দুক রেখে বামপন্থী আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া নয়, রাজনৈতিক দাবার বোড়ে হিশেবে এদের গণ্য করা নয়। উদ্বাস্তু আন্দোলন মুখ্যত ত্রাণ ও পুনর্বাসনের আন্দোলন। কিন্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসনের প্রাথমিকতা মেনে নিয়েও এই আন্দোলনকে নিপুণভাবে পরিচালিত করলে এর মধ্যে বামপন্থী প্রবণতা সংক্রামিত করা সম্ভব।

ইউ সি আর সি পরিচালিত উদ্বাস্তু আন্দোলনের গতি ও প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করলে লক্ষ করা যায় যে ত্রাণ ও পুনর্বাসনের মুখ্য দাবির সঙ্গে কিছু কিছু বামপন্থী দাবি বিস্ময়করভাবে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। উচ্চনিনাদী ত্রাণ ও পুনর্বাসনের দাবির সঙ্গে নিম্নকণ্ঠে বামপন্থী দাবি উচ্চারিত। ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে উদ্বাস্তুরা কী স্লোগান দেবে, তা স্থির করতেন ইউ সি আর সি নেতৃবৃন্দ। ইউ সি আর সি-র নেতৃত্বে উদ্বাস্তুদের মিছিলের স্লোগানগুলি বিশ্লেষণ করলে এই সত্যটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে। দৃষ্টান্ত হিশেবে ১৯৫১-এর ১৮ ফেব্রুয়ারি কলকাতা ময়দানে উদ্বাস্তুদের যে সভা হয়, তার বিবরণ নীচে দেওয়া হল : এই সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন জ্যোতি বসু। উদ্বাস্তুদের জমায়েতের নির্দিষ্ট স্থান থেকে দশটি মিছিলের সমাবেশ ঘটে ময়দানে। প্রত্যেকটি মিছিলের একই স্লোগান ছিল :

(১) জবরদখল কলোনির স্বীকৃতি দিতে হবে।
(২) উদ্বাস্তু উচ্ছেদ করা চলবে না।
(৩) উদ্বাস্তুদের ভোটাধিকার দিতে হবে।
(৪) জমিদারি প্রথা বাতিল কর।
(৫) ভারত সরকার কমনওয়েল্থ ছেড়ে বেরিয়ে এসো।
(৬) এশিয়া থেকে সাম্রাজ্যবাদ দূর হটো।
(৭) যুদ্ধ চাই না, শান্তি চাই।
(৮) ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক।

সবশেষে ৪০০০ মানুষের একটি মিছিল শহর পরিক্রমা করে হ্যারিসন রোড (মহাত্মা গান্ধী রোড) ও কলেজ স্ট্রিটের সংযোগস্থলে পৌঁছোয়। সেখানে মিছিল বিভক্ত হয়ে যায়। একভাগ শিয়ালদহ, একভাগ উত্তর কলকাতা এবং এক ভাগ হাওড়া চলে যায়। মিটিং-এ উপস্থিত ছিল ১০ হাজার মানুষ। এই দশ হাজার উদ্বাস্তুর মধ্যে ছিলেন বারোশো মহিলা। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ইউ সি আর সি-ই প্রথম মহিলাদের কলকাতার রাজপথের মিছিলে নিয়ে আসে।

ইউ সি আর সি-র ব্যারাকপুর আঞ্চলিক কমিটি কলকাতার উত্তর শহরতলীতে কলোনিগুলিকে উচ্ছেদের খশড়া আইন প্রত্যাহারের দাবিতে সংঘবদ্ধ করার জন্য ১৮ জন সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে। এই কমিটি গঠনের আরো একটি উদ্দেশ্য ছিল। তা হল স্থানীয় জনসাধারণকে উদ্বাস্তু আন্দোলনের মধ্যে নিয়ে আসা এবং উদ্বাস্তু আন্দোলনকে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মূল স্রোতে পরিণত করা। ইতিমধ্যে দক্ষিণ কলিকাতা শহরতলী বাস্তুহারা সংহতি (DKSBS) স্থানীয়

জনসাধারণকে উদ্বাস্তু আন্দোলনের অঙ্গীভূত করার জন্য পাঁচ জন সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করেছিল। ইউ সি আর সি লক্ষ রেখেছিল যাতে উদ্বাস্তু আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন আন্দোলন হয়ে না দাঁড়ায়। উদ্বাস্তু আন্দোলন ও পশ্চিমবঙ্গের মানুষের গণতান্ত্রিক আন্দোলন যুক্ত হয়ে একটি সার্বিক আন্দোলন হয়ে উঠবে যার মূল লক্ষ্য হবে জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ ও কৃষকদের মধ্যে জমির বণ্টন। ইউ সি আর সি-র নেতৃত্বাধীন জবরদখল কলোনির উদ্বাস্তুরা অবৈধভাবে জমি দখল করে নিলেও তারা ন্যায্যদামে এই জমি কিনে নিতে চেয়েছিল। অবৈধভাবে দখলীকৃত জমি বৈধ সম্পত্তিতে পরিণত করতে চেয়েছিল। সুতরাং জবরদখল কলোনির আন্দোলন মূলত অবৈধভাবে জমি কেড়ে নেওয়ার আন্দোলন নয়; ন্যায্যমূল্যে জমিদারদের এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের পতিত জমি কিনে নেওয়ার আন্দোলন। এক কথায় ন্যায্যমূল্যে উদ্বৃত্ত জমির পুনর্বণ্টনের আন্দোলন যে আন্দোলনে পশ্চিমবঙ্গের ভূমিহীন মানুষও শরিক হতে পারে। উদ্বাস্তুদের আন্দোলন যদি এভাবে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করতে পারত, তাহলে উদ্বাস্তু আন্দোলন আর পশ্চিমবঙ্গের সমাজবহির্ভূত কয়েক লক্ষ অবজ্ঞেয় মানুষের আন্দোলন হিশেবে তাচ্ছিল্যের ব্যাপার হয়ে থাকত না। এ সময়েই উদ্বাস্তুদের দুঃখ দুর্দশা নিয়ে 'ছিন্নমূল' নামে একটি ছবি কলকাতার বিভিন্ন সিনেমাহলে দেখানো হয়। এই ছবি তথাকথিত বুদ্ধিজীবী এলিট মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। হয়তো বুদ্ধিজীবীদের মনে কিছুটা সহানুভূতির সঞ্চার করেছিল, অবশ্য যদি ধরে নেওয়া যায় এই বুদ্ধিজীবীদের মন বলে কোনো পদার্থ ছিল। শিয়ালদহ স্টেশনে কালিঝুলি মাখা এই মানুষকীটদের দিকে এরা তাকিয়ে দেখেনি। এদের সহানুভূতির জন্য একটি ফিল্মের প্রয়োজন ছিল। আর প্রয়োজন ছিল ছবিটির রুশদেশে প্রশংসিত হওয়ার।

ঠিক যেই মুহূর্তে উদ্বাস্তু আন্দোলন সরকারের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আঘাতের জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠছিল, তখনই উদ্বাস্তুদের মধ্যে প্রচণ্ড ভাঙন দেখা দিল। আর এস পি নেতৃত্বাধীন আর সি আর সি (উদ্বাস্তু কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন পরিষদ) একটি উদ্বাস্তু উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি (আর ই আর সি) গঠন করে এবং উচ্ছেদের খশড়া আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা করে উদ্বাস্তুদের সংঘবদ্ধ করতে শুরু করে।

ইউ সি আর সি ও আর সি আর সি এই দুইটিই উদ্বাস্তু সংগঠন, এদের দাবিও অভিন্ন। কিন্তু উদ্বাস্তুদের স্বার্থে এই দুটি সংগঠন যুক্তভাবে কাজ করতে পারেনি। অথচ ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের দ্বারা এই দুটি সংগঠন সরকারের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আঘাত হানতে পারত। তাতে হয়তো সরকার উচ্ছেদের খশড়া আইন বিধানসভা থেকে তুলে নিত। উচ্ছেদের খশড়া আইনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সব বিরোধী বাম ও গণতান্ত্রিক দল ঐক্যবদ্ধ হলে এই আন্দোলনের মধ্যে সমগ্র উদ্বাস্তু মানুষকে নিয়ে আসা যেত। কিন্তু তা হল না। কারণ উদ্বাস্তুদের সর্বত্র উপস্থিতি ও ইউ সি আর সি-র দ্রুত বিস্তৃতি অস্তিত্বের পক্ষে বিপজ্জনক হতে পারে, এই ভয় ছিল আর সি আর সি-র। কমিনফর্ম সিপিআই-এর জন্য যে নতুন পথ নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল, তাতে সিপিআই-এর বামমার্গী সংকীর্ণতা কিছুটা প্রশমিত হয়েছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু এতে সিপিআই-এর ছোঁয়াছুঁয়ি বিচার যে দূর হয়নি, তা বোঝা যায় সিপিআই-এর প্রাদেশিক সাংগঠনিক কমিটির (POC) একটি বিজ্ঞপ্তি থেকে। তাতে বলা হয়েছিল যে পার্টির উদ্বাস্তু ফ্র্যাকশন (Fraction) যেন গোপনে উদ্বাস্তুদের থেকে পার্টি সদস্য সংগ্রহ করতে থাকে।

প্রথম দিকে আর সি আর সি-ই উদ্বাস্তুদের আনুগত্য লাভ করেছিল। আর এস পি সৃষ্ট—উদ্বাস্তু উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটিতে—কৃষক মজদুর প্রজা পার্টির ডঃ পি সি ঘোষ ও ডঃ এস সি ব্যানার্জি উচ্ছেদ বিরোধী আন্দোলনের মুখ্য প্রবক্তা হয়ে ওঠেন। কিন্তু ইউ সি আর সি-র প্রতিটি পদক্ষেপই ছিল অত্যন্ত সতর্ক। জবরদখল কলোনির উদ্বাস্তুরা সহজেই আতঙ্কিত হয়ে উঠত। উদ্বাস্তুদের মতিগতির ওপর সাবধানী দৃষ্টি ছিল তাদের। ইউ সি আর সি চেয়েছিল ধীরে ধীরে আন্দোলন গড়ে তুলতে যাতে একসময় আপনা থেকেই আন্দোলনে বেগের আবেগ সঞ্চারিত হয় এবং যাতে যথাসময়ে আন্দোলন স্বয়ংচালিত হয়ে অগ্রসর হয়। ইউ সি আর সি-র সাংগঠনিক কাঠামো আর সি আর সি-র কাঠামোর চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী ছিল। জবরদখল কলোনিগুলির অধিকাংশ কলোনি কমিটিই ইউ সি আর সি-র নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। উদ্বাস্তুদের কল্যাণে একান্তভাবে নিবেদিত প্রাণ কর্মীর সংখ্যাও ইউ সি আর সিতেই বেশি ছিল। তারা উঠে এসেছিল উদ্বাস্তু জনসমষ্টির মধ্য থেকেই।

ইউ সি আর সি-র সঙ্গে আর সি আর সি-র তুলনা করলে বলা যেতে পারে যে আর সি আর সি-র সাংগঠনিক কাঠামো দুর্বলতর ছিল। যখন কোনো বিশেষ সমস্যায় উদ্বাস্তুরা আন্দোলিত হত, তখনোই আর সি আর সি-র উপস্থিতি বোঝা যেত। উচ্ছেদের বিরুদ্ধে আন্দোলন উদ্বাস্তুদের পক্ষে ছিল পুরোপুরি টিকে থাকার আন্দোলন। আর সি আর সি এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয় এবং এই আন্দোলনকে সরকারের বিরুদ্ধে সম্মুখ সংঘাতের পথে নিয়ে যায়। উদ্বাস্তুদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের সুদৃঢ় সমর্থনের ভিত্তি তাদের ছিল না। এই ধরণের আন্দোলনে ঝাঁপ দেওয়ার জন্য উদ্বাস্তু জনতার তৃণমূলে যে পূর্বপ্রস্তুতি আবশ্যিক তা আর সি আর সি-র আদৌ ছিল না। উদ্বাস্তু উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটিতে (আর ই আর সি) আর সি আর সি-র বিভিন্ন শরিক একটি কংগ্রেসি ধাঁচের বিক্ষোভ আন্দোলন পরিচালনা করতে চেয়েছিল। উচ্ছেদের খশড়া আইনের প্রতিরোধের আহ্বানে উদ্বাস্তু জনতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দেবে, এই বিশ্বাস ছিল আর ই আর সি-র। আশা ছিল যে জবরদখল কলোনিতে তাদের দরমা ও টালির ঘর যাতে সরকার গুঁড়িয়ে দিতে না পারে, তার জন্য তারা প্রাণপণ লড়বে। শেষ পর্যন্ত সরকার একটা বোঝাপড়া করতে বাধ্য হবে। এই আশা একেবারে ব্যর্থ হয়নি। আর ই আর সি-র আন্দোলন তুবড়ির মতো একটা আকস্মিক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল। কিন্তু তুবড়ির মতোই এই বিস্ফোরণ নিমেষেই মিলিয়ে গিয়েছিল। তার ফলশ্রুতি একটি মিথ্যা সমঝোতা।

সিপিআই সংগোপনে বামমার্গী সংকীর্ণতার পথ অনুসরণ করছিল, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু একথাও সত্য যে উচ্ছেদের খশড়া আইনের প্রতিরোধ একটি ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের চেষ্টা করছিল। সিপিআই চাইছিল সাময়িকভাবে হলেও এই দুটি সংগঠনের সম্মিলিত প্রয়াস আন্দোলনের সাফল্যের জন্য অত্যন্ত জরুরি। আই ই আর সি, ইউ সি আর সি-র এই সহযোগিতার হাত প্রত্যাখ্যান করেছিল।

ফলত দুটি সংগঠনই পৃথকভাবে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সভা করতে লাগল। উচ্ছেদের খশড়া আইন তুলে নেওয়ার দাবি জানাল। কিন্তু সমগ্র উদ্বাস্তু জনতা এই দুটি সংগঠনের মধ্যে বিভক্ত হয়ে গেল।

২৮ মার্চ সরকার বিধানসভায় উচ্ছেদের খশড়া আইন পেশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। ওই দিনই ইউ সি আর সি মনুমেন্টের নীচে এবং আর ই আর সি ওয়েলিংটন স্কোয়ারে পৃথকভাবে উদ্বাস্তু সমাবেশের ডাক দেয়। সরকার ১৪৪ ধারা জারি করেছিল। আর ই

আর সি ১৪৪ ধারা লঙ্ঘন করে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে বিধানসভা অভিযানের সিদ্ধান্ত নেয়। এবং ইউ সি আর সিকেও এই অভিযানে যোগ দিতে অনুরোধ করে। ইউ সি আর সি-র কমিউনিস্ট নেতৃত্ব এই আবেদন গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেনি; যদিও সিপিআই ছাড়া অন্যান্য বামপন্থী দলের উদ্বাস্তু নেতারা এই প্রস্তাবে রাজি ছিলেন। ইউ সি আর সি-র সিপিআই নেতাদের যুক্তি ছিল এই যে উদ্বাস্তুদের এভাবে সরাসরি লাঠি-গুলির মুখে দাঁড় করানো সঠিক কাজ হবে না। কারণ সরকারের বিরুদ্ধে মুখোমুখি উদ্বাস্তুদের দাঁড় করানোর আগে সরকারি দমননীতি সামলানোর জন্য একটি শক্তিশালী সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তোলা প্রয়োজন।

২৮ মার্চ একই সময়ে যুগপৎ দুটি সভা হল। ইউ সি আর সি-র সভা হল শহিদ মিনারের নীচে; আর ই আর সি-র সভা হল ওয়েলিংটন স্কোয়ারে। আর ই আর সি-র সভায় ডঃ এস সি ব্যানার্জি, রামমনোহর লোহিয়া, লীলা রায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দ খশড়া আইনের তীব্র নিন্দা করে বক্তৃতা দিলেন। খশড়া আইন প্রত্যাহারের দাবি জানালেন। সভাশেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল বিধানসভার দিকে এগিয়ে চলল। মিছিলের অগ্রগতি রোধ করার জন্য ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট ও এসপ্ল্যানেড ইস্টের সংযোগস্থলে নিশ্ছিদ্র পুলিশি ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তিনটি সারিতে পুলিশবেষ্টনী গড়ে তোলা হয়েছিল। প্রথম সারিতে মহিলা পুলিশ বাহিনী। কারণ মিছিলের পুরোভাগেও মহিলারাই ছিলেন। তাদের দায়িত্ব ছিল মিছিলের মহিলাদের ছত্রভঙ্গ করা। দ্বিতীয় সারিতে রাখা হয়েছিল লাঠিধারী পুলিশ এবং তার পেছনের সারিতে ছিল অশ্বারোহী পুলিশ, ওয়ারলেস ও প্রিজন ভ্যান।

মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন লীলা রায় ও তাঁর নারী সহযোগীরা। তাঁরা পুলিশবেষ্টনী ভেঙে এগোবার চেষ্টা করলে তাদের লাঠিচার্জ করে ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া হয়। কিন্তু পেছনের পুরুষ বিক্ষোভকারীরা লাঠিচার্জ সত্ত্বেও অটল থাকে। অনেকে আহত হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও মিছিল ছত্রভঙ্গ হয়নি। এবার পুলিশ ডঃ এস সি ব্যানার্জি, লীলা রায় ও চারু রায়কে গ্রেপ্তার করে। ঠিক এই মুহূর্তে ডঃ পি সি ঘোষ বিধানসভা থেকে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে খবর দেন যে সরকার উচ্ছেদের খশড়া আইন বিধানসভায় পেশ করার দিন পিছিয়ে দিয়েছে। অতএব বিক্ষোভকারীদের জয় হয়েছে। তারা এবার ফিরে যেতে পারে। ২৯ মার্চ ছাত্র ধর্মঘট হবে এবং পরবর্তী আন্দোলনের কর্মসূচি শীঘ্রই ঘোষণা করা হবে।

আর ই আর সি-র মিছিলের ওপর যখন লাঠিচার্জ হচ্ছিল, তখন ইউ সি আর সি-র সভা হচ্ছিল শহিদমিনারের নীচে। বক্তৃতা দিচ্ছিলেন সত্যপ্রিয় ব্যানার্জি, জ্যোতিষ জোয়ারদার, অম্বিকা চক্রবর্তী, জ্যোতি বসু ও আরো অনেকে। এঁরা প্রত্যেকেই আর ই আর সি-র মিছিলের ওপর লাঠিচার্জের নিন্দা করছিলেন, ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের কথা বলছিলেন। সভাশেষে তাদের মিছিল যেপথে এসেছিল সেই পথেই ফিরে যায়। ২৮ মার্চের দুটো সভা উদ্বাস্তুদের দুটো দলে বিভক্ত করে দেয়। সকলের মনে এই ধারণাও জন্মায় যে উদ্বাস্তুদের প্রকৃত সংগঠন আর ই আর সি এবং এই সংগঠনই উচ্ছেদের খশড়া আইনের প্রত্যাহারের জন্য দ্রুত আন্দোলনে নামতে সক্ষম।

ময়দানের সভার পর খশড়া আইনের বিরুদ্ধে যৌথ আন্দোলন গড়ে তোলার প্রস্তাব নিয়ে ইউ সি আর সি-র কয়েকজন নেতা আর ই আর সি-র নেতৃবৃন্দের কাছে এসেছিলেন। কিন্তু আর ই আর সি নেতৃবৃন্দ তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে রাজি হয়নি। আর ই আর সি ২৯ মার্চ এক সভা ডেকে ইউ সি আর সি-র প্রতি তাদের মনোভাব ব্যাখ্যা

করে—"ইউ সি আর সি-র সঙ্গে আর ই আর সি কোনো সম্পর্ক রাখবে না।" কিন্তু তা সত্ত্বেও ইউ সি আর সি, আর ই আর সি-র সঙ্গে যৌথ আন্দোলনের চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে। জ্যোতি বসু ও সত্যপ্রিয় ব্যানার্জি ২৪নং কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটে আর ই আর সি-র নেতাদের সঙ্গে দেখা করেন। আর ই আর সি-র মুখপাত্র সৌম্যেন ঠাকুর তাঁদের সরাসরি আক্রমণ করে বলেন, "সিপিআই-এর আনুগত্য অতিরাজ্যিক, তারা সোভিয়েত রাশিয়ার দালাল। তাদের সঙ্গে যৌথ আন্দোলনের প্রশ্ন ওঠে না।

৩১ মার্চ ডঃ এস সি ব্যানার্জি এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই ইঙ্গিত দেন যে আর ই আর সি সরকারের সঙ্গে একটা সমঝোতায় রাজি। তিনি খশড়া আইনের কোনো কোনো ধারা সংশোধনের কথা বলেন। সঙ্গে সঙ্গে ডঃ রায় ডঃ ব্যানার্জির প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার জন্য বিধানসভার বিরোধী সদস্যদের সঙ্গে একটি বৈঠকের আয়োজন করেন। এই বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে একটি সাধারণ সূত্র গৃহীত হল। জ্যোতি বসু সহ বিরোধীদলের সকল সদস্যই এই সূত্র মেনে নিলেন। উচ্ছেদের খশড়া আইনের যে সর্বসম্মত সূত্র গৃহীত হল তা এই রকম :

(১) ১৯৪৬-এর অক্টোবরের নোয়াখালির দাঙ্গার সময় থেকে ১৯৫০-এর ডিসেম্বরের মধ্যে যারা এদেশে এসেছে তারা বৈধ উদ্বাস্তু বলে গণ্য হবে।

(২) আইনেরর খশড়ায় যোগ্য কর্তৃপক্ষ গঠনের কথা বলা হয়েছে। যোগ্য কর্তৃপক্ষ হবেন বিচার বিভাগীয় অফিসার। হাইকোর্টের অনুমোদন সাপেক্ষে সরকার তাঁকে নিয়োগ করবেন।

(৩) খশড়া আইনের ৪নং ধারায় বলা হল : ১৯৫০-এর ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত অবৈধভাবে দখলীকৃত জমির জন্য উদ্বাস্তুরা যদি গ্রহণযোগ্য মূল্য দেয়, তবে সেই জমি তাদের অধিকারেই থাকবে। মূল্য নির্ধারণ করবেন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ। তাছাড়া কলকাতার কাছাকাছি বসবাসযোগ্য উপযুক্ত স্থান না দেওয়া পর্যন্ত তাদের জমি থেকে উৎখাত করা যাবে না। উপুযুক্ত কর্তৃপক্ষের আদেশের বিরুদ্ধে একটি ট্রাইবুন্যালে আপিল করা যাবে।

২ এপ্রিল আব ই আর সি জনসভা ডেকে জানিয়ে দিল যে সরকার উচ্ছেদ বিলের ৪নং ধারা সংশোধনী রাজি হওয়ায় উদ্বাস্তুদের জয় হয়েছে।

বাস্তবিকপক্ষে এই আপোস-রফা উচ্ছেদের খশড়া আইনের কোনো মৌলিক পরিবর্তন ঘটায়নি। জয়ী হওয়ার জন্য ডঃ রায় একটু নুয়েছিলেন মাত্র। তিনি যে সমঝোতা চেয়েছিলেন, তাই তিনি পেয়েছিলেন। এই সমঝোতার মধ্যে তিনি জ্যোতি বসুকেও টেনে নিয়েছিলেন।

জয় হয়েছিল ডঃ রায়ের। কিন্তু জ্যোতি বসু 'স্বাধীনতা'য় বিবৃতি দিলেন, এই আপোস-রফায় জয় হয়েছে উদ্বাস্তুদের। 'স্বাধীনতা'য় সম্পাদকীয়তে বলা হল যে, সরকার বিরোধীপক্ষের মত অনেকটা মেনে নিয়েছে। আসলে খশড়া আইনের কয়েকটি ধারার ভাষার পরিবর্তন হয়েছিল মাত্র। 'পশ্চিমবঙ্গ' নামক একটি কাগজে ইউ সি আর সি-র দুজন নেতা জ্যোতি বসুর বিবৃতির প্রতিবাদ করলেন। এই নিয়ে পার্টিমহলে বিরাট শোরগোল হল। বিখ্যাত আইনজ্ঞ ডঃ রাধাবিনোদ পালের অভিমত নিয়ে জানা গেল যে, ইউ সি আর সি নেতারা যা বলেছেন তাই সঠিক। কিন্তু তা সত্ত্বেও খশড়া আইনকে আর প্রতিরোধ করা সম্ভব ছিল না।

এভাবেই খশড়া আইনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন শেষ হল। খশড়া আইন

বিধানসভায় পাশ হয়ে গেল। এই আইনের নাম হল ১৯৫১-র আইন নং ষোলো (Act XVI)। এরপর উদ্বাস্তু আন্দোলনের নতুন অধ্যায় শুরু হল।

১ সেন্সাস, ১৯৫১
২ অনিল সিংহ, জবরদখল উদ্বাস্তু উপনিবেশ পৃ ৪
৩ Saroj Chakraborti, with Dr. B. C. Roy and other Chief Ministers Vol I P. 121
৪ অমৃতবাজার পত্রিকা ২১ মার্চ, ১৯৫১
৫ তদেব, ১৬ মার্চ, ১৯৫১
৬ তদেব, ২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫১

**ষষ্ঠ অধ্যায়**

# উচ্ছেদ বিরোধী আন্দোলন ও ইউ সি আর সি

উচ্ছেদের আইনের খশড়া আইনে পরিণত হওয়ায় জবরদখল কলোনিগুলি প্রতিবাদে ফেটে পড়ল। ইউ সি আর সি-র নেতৃত্বে ক্রমাগত প্রতিবাদসভা হতে লাগল। প্রতিবাদসভাসমূহের আলোচ্য বিষয় ছিল একটি : উদ্বাস্তুদের মধ্যে বিভেদের সুযোগ নিয়ে কংগ্রেস তার পাশব সংখ্যাগরিষ্ঠতা কাজে লাগিয়েছে। উচ্ছেদের আইন পাশ করে জবরদখল কলোনি ভেঙে দেওয়ার উপযুক্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। এই আইনের একমাত্র লক্ষ্য হল জমিদার ও জমির ফাটকাবাজদের স্বার্থরক্ষা করা। উদ্বাস্তুদের সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে যাতে সরকার এই আইন কার্যকর না করতে পারে।

কলোনিতে কলোনিতে সভার পর সভা হতে লাগল যাতে এই আইনের মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কে উদ্বাস্তুরা সচেতন হয় এবং যাতে তারা সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য কোমর বাঁধে। পুববাংলার মুসলমান ও সরকারের হিংস্র আক্রমণ তাদের দেশছাড়া করেছে; এবার এদেশে তাদের স্বদেশী সরকারের হিংস্র আইন তাদের ঘরছাড়া করতে উদ্যত। কিন্তু এবার তারা লড়বে। ক্রমাগত সভা, ভ্রাম্যমাণ ইউ সি আর সি-র নেতাদের প্রচারাভিযান এবং সরকারের অতিশয় স্বচ্ছ উদ্বাস্তুবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গিপ্রসূত শঙ্কা উদ্বাস্তুদের মধ্যে সংগ্রামের মানসিকতা সৃষ্টি করেছিল। তাদের সংগ্রামের জন্য উন্মুখ করে তুলেছিল বললেই হয়তো সঙ্গত হবে।

সরকারের প্রতি অবিশ্বাসের সবচেয়ে বড় কারণ আইনের একটি ধারা। এই ধারাতে আছে বেশিদামি জমি থেকে উদ্বাস্তুদের উচ্ছেদ করা হবে : কিন্তু উচ্ছেদের আগে তাদের কাছাকাছি এমন জায়গায় বিকল্প জমি দিতে হবে যাতে তাদের জীবিকার্জনের পথে কোনোপ্রকার বিঘ্ন না দেখা দেয়। তাই ধারাটি কার্যকর করা কঠিন ছিল। এমনকী অসম্ভব ছিল বললেও অত্যুক্তি হবে না। কাছাকাছি বিকল্প জমি পাওয়া প্রায় অসম্ভব তো ছিলই। কিন্তু জমি পাওয়া গেলেও জবরদখল কলোনির লক্ষাধিক লোককে অন্যত্র স্থানান্তরিত করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক কাঠামো সরকারের ছিল না।

উচ্ছেদ আইন পাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ হিশেবে নিযুক্ত অফিসারের কাছে জমির মালিকদের অবৈধভাবে দখলীকৃত জমি ও বাড়ির ক্ষতিপূরণের দাবি সম্বলিত আবেদনপত্র জমা পড়তে লাগল। অগস্ট মাস নাগাদ সব আবেদন জমা পড়লেই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রত্যেক জবরদখলকারীর কাছে ক্ষতিপূরণ নোটিশ যেতে শুরু করবে। সমস্যা দেখা দিল এখানেই। আইনের চোখে কলোনি কমিটিগুলির কোনো বৈধ অস্তিত্ব নেই। আইন শুধুমাত্র জবরদখলকারী ব্যক্তির স্বীকৃতি

দিতে পারে। প্রত্যেকটি কলোনি কমিটি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গঠিত হয়েছে। কলোনি কমিটিগুলি উদ্বাস্তুদের সংঘবদ্ধ করে জবরদখল কলোনি প্রতিষ্ঠা করেছে। জবরদখল কলোনিতে ব্যক্তিকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করলে এই ধরণের কলোনির ইতিহাসকেই অস্বীকার করা হবে। প্রত্যেকটি কলোনিই কলোনি কমিটির নেতৃত্বাধীন। একথা সত্য যে আইনের চোখে কলোনি কমিটির কোনো অস্তিত্ব নেই। একটি কলোনি শুধু কিছু উদ্বাস্তুর বাসস্থান নয়। কলোনিগুলি সদ্য গড়ে ওঠা উদ্বাস্তু ঔপনিবেশিক সমাজ। কলোনি কমিটিগুলিই এই সমাজকে একটি সুনির্দিষ্ট আকার ও স্থায়িত্ব দিয়েছে, সমন্বিত করেছে। কলোনি কমিটি এই নতুন ঔপনিবেশিক সামাজিক বেষ্টনীর এক একটি আংটা। এই আংটা ভেঙে ফেললে এই সদ্যোজাত উপনিবেশে নৈরাজ্য আসবে। এই আংটাগুলিকে কঠিন শৃংখলে যুক্ত করে রেখেছিল ইউ সি আর সি। এইসব আংটা খসে গেলে উদ্বাস্তুদের ঐক্য বিনষ্ট হবে এবং সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তারা তাদের একমাত্র অস্ত্র তাদের সংগঠন ইউ সি আর সি-কে হারাবে।

যোগ্য কর্তৃপক্ষ যেভাবে কলোনি কমিটিগুলির অস্তিত্বকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে উচ্ছেদের আইনকে প্রয়োগ করতে উদ্যত হল, তা থেকে স্পষ্টই বোঝা গেল যে সরকার জবরদখল কলোনি ও কলোনি কমিটির সংশ্লেষ ভেঙে দিতে চায়। কলোনি কমিটির ইস্পাতের বেষ্টনী ভেঙে গেলে ইউ সি আর সি-র অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়বে। তার অর্থ উদ্বাস্তু ঔপনিবেশিক সমাজের অস্তিত্বের সংকট। ইউ সি আর সি তা মেনে নিতে পারে না। অতএব ইউ সি আর সি-র পক্ষে টিকে থাকার একমাত্র উপায় ছিল উচ্ছেদের আইনকে কার্যকর হতে না দেওয়া। সেজন্য ইউ সি আর সি সে কৌশল উদ্ভাবন করল, সরকারের হাতে তার কোনো জবাব ছিল না।

সরকার যে সত্যটি বুঝতে পারেনি, ইউ সি আর সি-র কাছে তা স্পষ্টভাবে ধরা দিয়েছিল। ইউ সি আর সি বুঝতে পেরেছিল যে পশ্চিমবঙ্গের সমকালীন ইতিহাসের সবচেয়ে জটিল সমস্যা শুধু একটি আইন-প্রণয়ন করে সমাধান করা যায় না। ইউ সি আর সি এই সমস্যা সমাধানের জন্য কয়েকটি প্রস্তাব উপস্থাপিত করল : (১) জবরদখল কলোনিগুলির স্বীকৃতি এবং যুদ্ধপূর্ব মূল্যে জবরদখল কলোনির উদ্বাস্তুদের জমি বণ্টন এবং কিস্তিতে কিস্তিতে এই মূল্য পরিশোধের ব্যবস্থা; (২) পতিত ও অনাবাদী জমি উদ্বাস্তুদের মধ্যে বণ্টন। যুদ্ধপূর্ব মূল্যে এই জমি বিক্রয় করা হবে এবং এর দাম কিস্তিতে কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য হবে; (৩) ন্যায্য ভাড়ায় পরিত্যক্ত সামরিক ব্যারাক ও শূন্য গৃহে উদ্বাস্তুদের বাস করার অনুমতি দিতে হবে; (৪) সর্বস্বান্ত উদ্বাস্তুদের জমির দাম ও ঘর ভাড়ার জন্য সরকারি অনুদান দিতে হবে এবং নিঃসহায় ও দরিদ্র উদ্বাস্তুদের সরকারি ব্যয়ে পুনর্বাসন দিতে হবে।

কিন্তু এই কয়েকটি প্রস্তাব উপস্থাপিত করেই ইউ সি আর সি চুপ করে বসে থাকেনি। সে জানত এই সব প্রস্তাব যাতে সরকার মেনে নিতে বাধ্য হয় সে জন্য তাকে নিরন্তর সংগ্রাম করে যেতে হবে। কিন্তু শুধু উদ্বাস্তুদের সমর্থনেই এই সংগ্রামে সফল হওয়া যাবে না। সাফল্যের জন্য পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের সমর্থন আবশ্যিক। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের সমর্থন যাতে পাওয়া যায় সেজন্য খুব সাবধানে অগ্রসর হতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কলোনির উদ্ভট বাঙালগুলির প্রতি অবজ্ঞা ও বিতৃষ্ণা জবরদখল কলোনির আন্দোলন শুরু হওয়ার পর থেকে জমা হচ্ছিল। বড় জমিদার ও জমির

ফাটকাবাজরা তো ক্রোধে ফেটে পড়ছিল। মুখ্যত জবরদখল কলোনির উদ্বাস্তুরা রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের এবং জমিদার ও জমির ফাটকাবাজদের পতিত ও অনাবাদী জমি দখল করেছিল। কিন্তু এই জমির মধ্যে কিছু জমি ছিল যা মধ্য ও নিম্নমধ্যবিত্ত হিন্দু ও মুসলমানের। ইউ সি আর সি প্রথম থেকে বলছিল যে অন্যত্র জমি পেলেই উদ্বাস্তুরা তাদের জমি ছেড়ে দেবে। শুধু তাই নয়, ইউ সি আর সি-র সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দাবি ছিল জমিদারি প্রথার বিলোপ। জমিদারিপ্রথার বিলোপ শুধু উদ্বাস্তুদের দাবি হতে পারে না। পশ্চিমবঙ্গে সব ভূমিহীন মানুষের এই দাবি। তাছাড়া এই দাবি সিপিআই ও অন্যান্য বামপন্থী দলেরও। ক্রমে এই দাবির সঙ্গে এমন আরো অনেক দাবি যুক্ত করা হল যা শুধু এককভাবে উদ্বাস্তুদেরই দাবি নয়, পশ্চিমবঙ্গের নিম্নবিত্ত, কৃষক ও শ্রমিকেরও দাবি। শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সর্বস্বান্ত উদ্বাস্তুদের আন্দোলন যাতে সমস্ত পশ্চিমবঙ্গবাসী দরিদ্র সাধারণ মানুষের যুক্ত আন্দোলনে পরিণত হয়, সেদিকে লক্ষ রেখেই ইউ সি আর সি উদ্বাস্তু আন্দোলন পরিচালনা করতে অগ্রসর হয়েছিল। কারণ সে জানত যে পশ্চিমবঙ্গবাসীর সক্রিয় সমর্থন ছাড়া ঘুণধরা প্রশাসনের পক্ষে কোনোমতেই লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুকে জবরদখল কলোনি থেকে উচ্ছেদ করা সম্ভব হবে না।

অপেক্ষাকৃত স্বল্পপরিসর স্থানে ঘনীভূত বাস্তুহারা বিপুল জনসমষ্টির ওপর ইউ সি আর সি-র নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং তা সম্ভব হয়েছিল জবরদখল কলোনি আন্দোলনের কুশলী পরিচালনার ফলে। এতে ইউ সি আর সি পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে এমন একটি স্থানে অধিষ্ঠিত হয়েছিল যাতে তার পক্ষে পশ্চিমবঙ্গে সক্রিয় সামাজিক পরিবর্তনের শক্তি হিশেবে কাজ করা সম্ভব হয়েছিল। জবরদখল কলোনিগুলির উচ্ছেদের প্রয়াস যদি ব্যর্থ হয় এবং কলোনিগুলি যদি সরকারের স্বীকৃতি লাভ করে, অর্থাৎ এ ব্যাপারে ইউ সি আর সি যা চাইছে, তাই হয়, তাহলে প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি ও সাংগঠনিক শক্তি কী অসাধ্যসাধন করতে পারে, এই কলোনিগুলি তার দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। এই দৃষ্টান্ত অন্যভাবেও ফলপ্রসূ হতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষও জমিদারদের পতিত ও অনাবাদী জমি দখল করে নিতে পারে। জমিদারি প্রথা বিলোপের যে মিথ্যা আশ্বাস কংগ্রেস দিয়েছে, তা এইভাবে কার্যকর হতে পারে। পক্ষান্তরে জবরদখল কলোনির সরকারি উচ্ছেদাভিযানের বিরুদ্ধে ইউ সি আর সি-র নেতৃত্বাধীন উদ্বাস্তুদের লড়াই যদি অচলাবস্থার সৃষ্টি করে, তাহলে ইউ সি আর সি পশ্চিমবঙ্গের প্রচলিত সমাজব্যবস্থার অস্থিরীকরণের মাধ্যম হয়ে উঠতে পারে।

অতএব জবরদখল কলোনি আন্দোলন উদ্ভূত পরিস্থিতির কেন্দ্রে উঠে এল ইউ সি আর সি। ইউ সি আর সি-র নেতারা বুঝতে পেরেছিলেন যে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে যে নতুন নাটকের যবনিকা উন্মোচিত হয়েছে, তাতে নায়কের ভূমিকা ইউ সি আর সি-র। এ সময়ের পশ্চিমবঙ্গের বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে এই সংগঠনের নেতাদের স্বচ্ছদৃষ্টি বিশেষভাবে চোখে পড়ে। তাদের চাতুর্য, আত্মবিশ্বাস, সাহস ও ক্ষমতা ব্যবহারের দক্ষতা পশ্চিমবঙ্গের জটিল রাজনীতিতে তাদের কুশলী খেলোয়াড়ে পরিণত করেছিল। ফলে অল্পকালের মধ্যেই তাঁরা পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার অতিশয় দৃশ্যমান বিরোধিতার কেন্দ্র হয়ে উঠল। পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে একমাত্র তাঁরাই জানতেন তাঁরা কি চান এবং কিভাবে তা অর্জন করতে হবে তাও তাঁরা জানতেন। ভিত্তি থেকে শীর্ষ পর্যন্ত পর পর কয়েকটি স্তরে বিন্যস্ত পিরামিডের মতো সংগঠন, অত্যন্ত কার্যকর যোগাযোগ ব্যবস্থা, নিবেদিতপ্রাণ একদল কর্মী এবং কয়েক লক্ষ মানুষের সক্রিয়

সমর্থন—ইউ সি আর সি আন্দোলনের এই ছিল মুখ্য উপাদান। বার বার প্রয়োগের ফলে ইউ সি আর সি এই আন্দোলনকে একটি শাণিত যন্ত্রে পরিণত করে।

এই শাণিত হাতিয়ার সাফল্যলাভ করেছিল তার অসামান্য প্রয়োগকৌশলের জন্য। এই সাফল্যের মূলে ছিল আরো দুটি উপাদান : (১) ইউ সি আর সি এই আন্দোলন সীমাবদ্ধ রেখেছিল একটি স্বল্পপরিসর ক্ষেত্রে—কলকাতা ও তার শহরতলীতে; (২) দেশ ছাড়া হওয়ার প্রচণ্ড অভিঘাত উদ্বাস্তু জনসমষ্টিকে সাময়িকভাবে হলেও একটি অখণ্ড মানসিকতা দিয়েছিল এবং ইউ সি আর সি নেতৃবৃন্দের জানা ছিল তাদের কোন পদক্ষেপে উদ্বাস্তু মনের কী প্রতিক্রিয়া হবে। ইউ সি নেতারা নিজেরাও উদ্বাস্তু। উদ্বাস্তুমনের ভাবনার কথা তারা নিজেদের জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারতেন। একটি সর্বস্বান্ত সর্বহারা গতিশীল উদ্বাস্তু জনসমষ্টি এবং ইউ সি আর সি-র উদ্বাস্তু নেতৃবৃন্দ ও উদ্বাস্তু জনসমষ্টির মধ্যে ঘনিষ্ঠ, অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ইউ সি আর সি উদ্ভাবিত নতুন রাজনৈতিক আন্দোলনের কৌশল এই আন্দোলনকে অসামান্য সাফল্য এনে দেয়।

বারবার প্রয়োগ করার ফলে শেষ পর্যন্ত ইউ সি আর সি-র আন্দোলন একটি নির্দিষ্ট ছাঁচে পরিণত হয়। ছাঁচটি এই রকম : সরকারের সঙ্গে কোনো সংঘাতের সম্ভাবনা দেখা দিল, কোথায়ও পুলিশের গুলি চলল। আর ইউ সি আর সি-র তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হল শহরতলীর সব কলোনিতে মিটিং করা এবং স্লোগানে মুখরিত মিছিল করে কলকাতা পরিক্রমা করা। ঠিক তার পরেই ইউ সি আর সি-র কার্যনির্বাহী সমিতির বৈঠক হত এবং ময়দানে বিশাল উদ্বাস্তু সমাবেশ হত। অবশেষে ইউ সি আর সি কলোনিতে, ক্যাম্পে বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়ে কলোনি ও ক্যাম্পের প্রতিনিধিদের সম্মেলন আহ্বান করত। এই সম্মেলনে আলাপ-আলোচনার পর যে প্রস্তাব গ্রহণ করা হত তা কলোনি ও ক্যাম্পে বিতরণ করা হত এবং সংবাদপত্রে পাঠানো হত। পরিশেষে নেতৃবৃন্দের একটি প্রতিনিধিদল সরকারকে এই প্রস্তাব দিয়ে আসতেন অথবা প্রয়োজনবোধ করলে বিধানসভায় একটি মুলতুবি প্রস্তাব আনা হত। আপাতত এখানেই একটি আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটত। অন্যভাবে বলা যেতে পারে, এই হল আন্দোলনের একটি তরঙ্গ। এভাবেই সরকারের সঙ্গে সংঘাতের কোনো প্রশ্ন দেখা দিত অথবা সংঘাতের কোনো ঘটনা ঘটত এবং সঙ্গে সঙ্গেই আন্দোলনের অনুরূপ একটি তরঙ্গ এসে আছড়ে পড়ত।

ইউ সি আর সি নেতৃবৃন্দ আন্দোলনকে এই ছকের মধ্যে বেঁধে রাখতেন। বল্গাহারা, উদ্দাম ও হিংসাত্মক পথে কখনোই আন্দোলনকে যেতে দেননি। সরকারের সঙ্গে মুখোমুখি হিংসাত্মক সংঘর্ষ কখনোই নয়। কিন্তু কখনোই আন্দোলনকে থেমে যেতে দেওয়াও নয়। উদ্বাস্তু আন্দোলনের খরশান প্রবাহ যাতে স্তিমিত না হয়, উদ্বাস্তুরা যাতে নিশ্চিন্ত আলস্যে ডুবে না যায়, কলকাতা যাতে উদ্বাস্তুদের ভুলে না যায়, সেজন্য মাঝে মাঝেই ইউ সি আর সি পরিচালিত এই আন্দোলনের তরঙ্গ কলকাতায় এসে আছড়ে পড়ত। একটি পরিসংখ্যান থেকে ইউ সি আর সি-র অবিরাম সক্রিয়তা স্পষ্ট হবে। ১৯৫১-র ডিসেম্বর থেকে ১৯৫২-র ডিসেম্বরের মধ্যে ইউ সি আর সি ও দক্ষিণ কলিকাতা শহরতলী বাস্তুহারা সমিতির কার্যনির্বাহী সমিতির মিটিং হয়েছিল ২২টি, ময়দানে সমাবেশ হয়েছিল ৬টি এবং সম্মেলন ৪টি। যতদিন সরকার উদ্বাস্তুদের দাবি না মেনে নিচ্ছে, ততদিন উদ্বাস্তু আন্দোলনের অবিচ্ছিন্ন প্রবহমানতা বজায় রাখার দৃঢ়সংকল্প ছিল ইউ সি আর সি-র।

এই আন্দোলন সম্পর্কে সরকারের প্রতিক্রিয়াও অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। শান্তিপূর্ণ

থাকলে উদ্বাস্তু মিছিল, বিক্ষোভ ও ময়দানে সমাবেশ নিয়ে সরকারের কোনো শিরঃপীড়া ছিল না। বস্তুত কিছুদিন পরে পরেই উদ্বাস্তু মিছিল সমাবেশ সম্পর্কে সরকারের অবস্থানকে প্রায় নিষ্ক্রিয়তা বললে অত্যুক্তি হবে না। অবশ্য মাঝে মাঝে সরকারের পুলিশ ছোটখাটো লাঠিচার্জ করত, আকাশে গুলি ছুঁড়ত, দু-চারজনের মাথা ফাটাত। কিছু লোককে গ্রেপ্তার করে জেলগেটে ছেড়ে দিত—যা ধর্তব্যের মধ্যেই ছিল না। উদ্বাস্তু আন্দোলনের তরঙ্গ সম্পর্কে এই ধরণের সরকারি প্রতিক্রিয়া থেকে মনে হয় ইউ সি আর সি ও সরকারের মধ্যে যাকে 'ভদ্রলোকের সমঝোতা' (Gentleman's agreement) বলে তাই হয়তো ছিল : সরকার উদ্বাস্তু মিছিল-সমাবেশ দেখেও দেখবে না এবং ইউ সি আর সি শান্তি ও শৃঙ্খলা অক্ষুণ্ন রাখবে। এমনকী যখন ১৪৪ ধারা জারি করত এবং ইউ সি আর সি তা ভাঙার কথা ঘোষণা করত, তখন শেষ পর্যন্ত কী ঘটতে চলেছে দুইপক্ষই আগে থেকেই জানত : যেখানে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে, সেখানে বিক্ষোভকারীরা স্লোগান দিতে দিতে পুলিশ বেষ্টনী ভাঙতে চেষ্টা করত; পুলিশ লাঠিচার্জ করত, কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়ত, কিছু নেতাকে গ্রেপ্তার করত। অবশেষে বিক্ষোভকারীরা সুশৃঙ্খলভাবে ফিরে যেত। যাদের গ্রেপ্তার করা হত, তাদেরও সেইদিনই মুক্তি দেওয়া হত। পরবর্তীকালে সরকারের সঙ্গে সমঝোতা করে বামপন্থী বিক্ষোভের এই বৈশিষ্ট্য মার্কাস ফ্র্যান্ডা লক্ষ করেছেন। প্রত্যেক মিছিল সমাবেশের আগে পুলিশ কর্তৃপক্ষের অনুমতি নেওয়া হত। কিন্তু ফ্র্যান্ডার ধারণা এই ধরণের মিছিল সমাবেশের উদ্ভাবন করেছিল সিপিআই। তা ঠিক নয়। বিক্ষোভ প্রদর্শনের বিশিষ্ট পদ্ধতি ইউ সি আর সি উদ্ভাবিত।

ইউ সি আর সি আন্দোলনের আর-একটি বৈশিষ্ট্যও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। আন্দোলনের প্রত্যেক পর্যায়েই আন্দোলন শুরু করার আগেই ইউ সি আর সি সরকারের কাছে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের গঠনমূলক প্রস্তাব পেশ করত। কঠিন পরিশ্রম করে প্রামাণিক তথ্য সম্বলিত হত এই প্রস্তাব। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে এসময়ে বিধানসভার বাজেট অধিবেশনে ইউ সি আর সি একটি বৈধ পরিসংখ্যান লব্ধ তথ্যভিত্তিক প্রস্তাব প্রস্তুত করে। এই প্রস্তাব প্রস্তুত করার জন্য জবরদখল কলোনি ও কলোনি কমিটির সম্পাদকদের কলোনিগুলি সম্পর্কে অনুপুঙ্খ বিবরণ সংগ্রহ করার নির্দেশ দেয়। এতে কলোনির প্রত্যেক উদ্বাস্তুর সংখ্যা, তার অধিকৃত বাস্তুজমির পরিমাণ, আয়, পেশা এবং কলোনিতে স্কুল, কলেজ, রাস্তাঘাট ও পয়ঃপ্রণালী নির্মাণের জন্য ব্যয়ের পরিমাণ সম্বলিত বিবৃতি তৈরি করা হয়। বিভিন্ন সরকারি ক্যাম্প থেকেও অনুরূপ তথ্য সংগ্রহ করা হয়। তাছাড়াও ক্যাম্পে চিকিৎসার বন্দোবস্ত, মৃত্যুহার সম্পর্কেও ব্যাপক নিরীক্ষা করা হয়। সরকার এতদিনেও কোনো উদ্বাস্তু পুনর্বাসন পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে পারেনি এবং যেহেতু উদ্বাস্তুদের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে সরকারের কাছে বিশেষ কোনো তথ্যই ছিল না, তাই এতকাল সরকার পুনর্বাসন খাতে যে অর্থ ব্যয় করেছে, তা নষ্ট হয়েছে।

এ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সম্পর্কে ইউ সি আর সি-র দ্বিমুখী দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। উচ্ছেদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের প্রারম্ভিক পর্ব থেকেই ইউ সি আর সি সরকারের সঙ্গে সহযোগিতায় আগ্রহী ছিল। সরকারের কাছে জবরদখল কলোনির সমস্যার সমাধানের জন্য উদ্বাস্তুদের প্রতিনিধি, জমির মালিক ও সরকারের প্রতিনিধিদের মধ্যে একটি ত্রিপক্ষীয় বৈঠকের কথা বারবার বলেছে ইউ সি আর সি। বিকল্প বাসস্থান পেলেই উদ্বাস্তুরা স্বল্পবিত্ত জমির মালিকদের এবং বাস্তুচ্যুত মুসলমানদের

জমিও ছেড়ে দেওয়ার কথা বলেছে বারবার। যুদ্ধপূর্ব হারে দখলীকৃত জমির দাম এবং দখলীকৃত বাড়ির স্বল্পহারে ভাড়া দেওয়ার কথা বলেছে। এব্যাপারে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষ আলাদা ছিল বলা চলে না। কিন্তু একটা ব্যাপারে উদ্বাস্তুরা একেবারে অনড় ছিল। বড় জমিদার অথবা ফাটকাবাজদের বেশিদামি জমি তারা ছাড়বে না। জমিদার ও ফাটকাবাজদের প্রচণ্ড চাপ ছিল সরকারের ওপর। তাই সরকারের পক্ষে এব্যাপারে আপোস করা সম্ভব ছিল না। স্মারকলিপির বক্তব্য ছিল উদ্বাস্তুরা নিজেদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নিজেরাই করেছে। সরকারি ক্যাম্পের উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবঙ্গেই পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য কতটা পতিত জমি প্রয়োজন তার হিশেব করে কোথায় তা পাওয়া যেতে পারে তারও সন্ধান দিয়েছিল ইউ সি আর সি।

আসলে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের কোনো পরিকল্পনাই ছিল না সরকারের। অথচ আইন করা সত্ত্বেও দেড় লক্ষ মানুষকে তাদের ভিটে থেকে উৎখাত করে রাস্তায় বার করে দেওয়া যাবে না। এ বিষয়েও সরকারের কোনো সচেতনতা ছিল না, তাও বলা চলে না। এই উভয় সংকট থেকে উদ্ধার পাওয়ার একটাই পথ ছিল। তা হল ইউ সি আর সি-র সঙ্গে আলোচনা করে এই সমস্যার সমাধান করা। কিন্তু জমির মালিকদের চাপের ফলে তাও সম্ভব ছিল না। স্পষ্টতই উচ্ছেদের আইন পাশ করার পর এই আইন কার্যকর করা স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু ইউ সি আর সি-র প্রতিরোধের ফলে এই আইন কার্যকর করা অত্যন্ত কঠিন, প্রায় অসম্ভব ছিল। কিন্তু এই অসম্ভব সম্ভব হলেও শুধু উদ্বাস্তু সমস্যা জটিলতর হত তাই নয়, দেড় লক্ষ লোক ভিটে থেকে উৎখাত হয়ে কলকাতার পথে পথে ঘুরে বেড়ালে অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হত।

সুতরাং উচ্ছেদের আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে ইউ সি আর সি-র এই সুবিধা ছিল যে বিপুল উদ্বাস্তু জনসমষ্টিকে কিভাবে পুনর্বাসন দেওয়া যেতে পারে, সে বিষয়ে কোনো পরিকল্পনা ছিল না সরকারের। অথচ শুধুমাত্র লাঠ্যৌষধির দ্বারাও সমস্যা সমাধানের কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। তাতে অনিবার্যভাবেই দেশময় অরাজকতা সৃষ্টি হত। অতএব তাড়াহুড়ো করে উচ্ছেদের আইন পাশ করে সরকার সমস্যা সমাধানের পথে একপা-ও এগোতে পারেনি। সমস্যা সমাধানের জন্য একটি প্রশ্নের উত্তর প্রয়োজন ছিল। উচ্ছেদের আইনের খশড়া নিয়ে বিতর্কের সময় প্রচণ্ড উত্তাপ সৃষ্টি হয়েছিল। উদ্বাস্তুদের দখলীকৃত জমি থেকে উপড়ে ফেলে দেওয়ার জন্য বিধানসভায় পশ্চিমবঙ্গের জমির মালিকদের হিন্দু ও মুসলমান প্রতিনিধিরা যে দাবি করেছিল, তার উত্তরে ডঃ বিধান রায় আত্মগতভাবে একটি প্রশ্ন করেছিলেন, "কিন্তু এরা যাবে কোথায়?" আসল প্রশ্ন ছিল এইটেই। কয়েক লক্ষ লোককে রাষ্ট্রের সব শক্তি প্রয়োগ করে জবরদখল কলোনি থেকে উপড়ে ফেলে দেওয়া যায়। কিন্তু যেহেতু মানুষগুলোকে হত্যা করে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়া যাবে না, তাই নতুন করে বাস্তুচ্যুত এইসব মানুষ সারা কলকাতার শহরতলীতে ছড়িয়ে পড়বে তাতে গোটা পশ্চিমবঙ্গ শিথিলমূল হয়ে পড়ার সম্ভাবনা। বিভাজনের প্রচণ্ড আঘাতের পর লক্ষ লক্ষ আশ্রয়হীন মানুষের শুধুমাত্র টিকে থাকার ভয়ংকর তাগিদ পশ্চিমবঙ্গ সহ্য করবে কী করে? ইংরেজ দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষকে মেরে ফেলেছিল। কিন্তু যা ইংরেজের পক্ষে সম্ভব ছিল, অথবা যা পূর্ব-পাকিস্তানের সরকারের পক্ষে সম্ভব, ডঃ রায় তো তা করতে পারবেন না। অতএব শেষ পর্যন্ত উচ্ছেদের আইন কতটা কার্যকর করা যাবে সে বিষয়ে ডঃ রায় সুনিশ্চিত ছিলেন বলে মনে হয় না। তাঁর মনে দ্বিধা ছিল।

পক্ষান্তরে ইউ সি আর সি নেতৃত্বের মনে এই নিশ্চিতি ছিল যে এই আইনকে কিছুতেই কার্যকর করতে দেওয়া হবে না। সেজন্য তাদের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনাও ছিল। এই আইনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ইউ সি আর সি প্রথমেই সরকারের বিরুদ্ধে সম্মুখ সংঘর্ষে যাবে না। আইন যাতে কার্যকর না হয় তার জন্য বারবার বাধার প্রাচীর তুলে দেবে। তাতে কালহরণ করবে। সরকার উচ্ছেদের আইন করেছে। আইনের প্যাঁচেই উচ্ছেদের আইনকে ঠেকিয়ে রাখতে হবে। এভাবে সরকারকে শেষ পর্যন্ত একটা আপোস-রফার পথে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। যদি তা সম্ভব না হয় তবে ঐক্যবদ্ধ উদ্বাস্তুদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করে সরকারকে রুখতে হবে।

ঐক্যবদ্ধ উদ্বাস্তুরাই ইউ সি আর সি-র সবচেয়ে বড় শক্তি। অধিকাংশ কলোনি কমিটি ইউ সি আর সি-র অনুগত হওয়ায় কলোনিগুলির ওপর ইউ সি আর সি-র প্রভাব ছিল অপ্রতিহত। জবরদখল কলোনির সমগ্র জনসমষ্টি ইউ সি আর সি ও আর সি আর সি-র নিয়ন্ত্রণাধীনে ছিল। কিন্তু উচ্ছেদের আইনের খশড়ার বিরুদ্ধে আন্দোলনের ফলে যে আপোস-রফা হয়, তারপর আর সি আর সি আন্দোলনের পথ থেকে সরে যায়। সুতরাং উচ্ছেদের আইনের প্রতিরোধ আন্দোলনের নেতৃত্বের ভার এসে পড়ে ইউ সি আর সি-র ওপর।

ইউ সি আর সি-র এই সুদৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে উচ্ছেদের আইনের বিরুদ্ধে কলোনি কমিটিগুলির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শহরতলীতে কলোনি গড়ে ওঠার পর এক বছর কেটে গেছে। এই এক বছরে প্রত্যেকটি কলোনির মানুষ এক ধরণের একাত্মতা লাভ করেছে, তাদের একটা সমষ্টিগত মন গড়ে উঠেছে। এই সমষ্টিগত মনকেই কলোনি কমিটি বলা যেতে পারে। কলোনি কমিটির মন কলোনির উদ্বাস্তুদের মন। এই কমিটির ইচ্ছা কলোনির উদ্বাস্তুদের ইচ্ছা। কিন্তু উচ্ছেদের আইনে কলোনি কমিটির কোনো স্বীকৃত নেই।

ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে প্রত্যেকটি কলোনি কমিটি কলোনির প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের দ্বারা নির্বাচিত হত। কলোনি কমিটির ওপর কলোনির প্রশাসনিক দায়িত্বভার ছিল বললে অত্যুক্তি হবে না। সুতরাং কলোনি কমিটিগুলিকে বাদ দিয়ে ব্যক্তিগতভাবে কলোনির উদ্বাস্তুরা যদি উচ্ছেদের আইনসৃষ্ট যোগ্য কর্তৃপক্ষের নোটিশে সাড়া দেয়, তাহলে যে সাংগঠনিক কাঠামো কলোনির উদ্বাস্তুদের একীভূত করে রেখেছে, তা ভেঙে যাবে। কলোনিগুলি আবার প্রাথমিক অবস্থায় ফিরে যাবে। তাতে উচ্ছেদের পথ প্রশস্ত হবে। আইনের এই ধারার বিরুদ্ধে ইউ সি আর সি-র উত্তর হল যোগ্য কর্তৃপক্ষের নোটিশের কোনো সাড়া না দেওয়া। কেননা, ব্যক্তিগতভাবে কলোনির উদ্বাস্তুরা নোটিশের সাড়া না দিলে আইনের ধারা অনুযায়ীও তাদের উচ্ছেদ করা কঠিন। উচ্ছেদের আইনটি যেভাবে পাশ হয়েছে, তাতে এই আইনের কর্তব্য প্রাথমিকভাবে পুনর্বাসন এবং পরবর্তী পর্যায়ে উচ্ছেদ। তাছাড়া উচ্ছেদের সঙ্গে বিকল্প বাসস্থান অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। সুতরাং ব্যক্তিগতভাবে কোনো উদ্বাস্তু যদি যোগ্য কর্তৃপক্ষের নোটিশের উত্তর না দেয়, তবে যোগ্য কর্তৃপক্ষ তাকে পুলিশ পাঠিয়ে উচ্ছেদ করতে পারে। কিন্তু তাতে সামগ্রিকভাবে আইন লঙ্ঘিত হয় এবং এই ধারণাই হয় যে এই আইন জমিদারদের স্বার্থে প্রণীত হয়েছে। ইউ সি আর সি সরকারের কাছে কলোনি কমিটির স্বীকৃতি দাবি করে; কিন্তু সরকার তা মেনে নেয়নি। অতএব ইউ সি আর সি উদ্বাস্তুদের যোগ্য কর্তৃপক্ষকেই অস্বীকার করার নির্দেশ দেয়। অবশ্য নোটিশের উত্তর না দিলে যোগ্য কর্তৃপক্ষ

উদ্বাস্তুদের উচ্ছেদের আদেশ দিতে পারত। কিন্তু কোনো বিকল্প বাসস্থান ও কর্মের ব্যবস্থা না করে দেড় লক্ষ মানুষকে রাস্তায় ছুঁড়ে দিয়ে অরাজকতা ডেকে আনতে পারে না কোনো সরকার। সরকারি ক্যাম্পের এবং শিয়ালদহ স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের উদ্বাস্তুদের নিয়ে সরকার হাবুডুবু খাচ্ছিল। অতএব ইউ সি আর সি জানত যে জবরদখল কলোনির উদ্বাস্তুদের উচ্ছেদ করা সরকারের সাধ্যাতীত। ক্যাম্পের উদ্বাস্তুদের বছরের পর বছর ডোল দিয়ে সেখানে রাখছে কেন সরকার? শিয়ালদহ স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম উদ্বাস্তু আকীর্ণ হয়ে থাকছে কেন? তার কারণ সরকারের উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের কোনো পরিকল্পনা ছিল না। কোনো কর্মসূচি ছিল না। জবরদখল কলোনির উদ্বাস্তুদের নিয়েও সরকারের কোনো মাথাব্যথা থাকত না যদি জমিদার ও জমির ফাটকাবাজদের চাপ সরকারের ওপর না থাকত।

ব্যক্তিগতভাবে উদ্বাস্তুদের কাছে উচ্ছেদের নোটিশ আসছিল। তা থেকে উদ্বাস্তুদের কাছে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠছিল যে সরকার তাদের উচ্ছেদ করতে চাইছে, তাদের পুনর্বাসনের কথা ভাবছে না। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য ইউ সি আর সি ১৯৫১-র ডিসেম্বরে দেশবন্ধুনগরে (নাগের বাজার, দমদম) একটি উদ্বাস্তু সম্মেলন আহ্বান করে। উদ্বাস্তু কলোনি, ক্যাম্প, ব্যারাক ও বস্তির ১৫০ জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগ দেয়। ইউ সি আর সি এই সম্মেলনে যে প্রস্তাব পেশ করে, তা কিছুটা সংশোধিত আকারে গৃহীত হয়।।

এই প্রস্তাবে জবরদখল কলোনি সম্পর্কে সরকারের সঙ্গে একটা আপোসরফার কথা বলা হয়। তাছাড়া এতে পশ্চিমবঙ্গবাসীর কাছে উদ্বাস্তুদের পরিস্থিতির পরিসংখ্যান বিশদতথ্য সহ একটি বিবৃতি বিতরণের কথা বলা হয়। কেননা, পশ্চিমবঙ্গবাসীকে একথা জানাবার প্রয়োজন ছিল যে উদ্বাস্তুরা সমস্যার ন্যায্য সমাধান চায় এবং তারা সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে চায়।

সম্মেলনে প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর কয়েকটি নির্দেশ দিয়ে ইউ সি আর সি তার বিখ্যাত বিজ্ঞপ্তি (নং ১১/৫১) বিভিন্ন কলোনি কমিটির কাছে পাঠিয়ে দেয়। এই নির্দেশগুলি হল :

(১) দেশবন্ধুনগরের গৃহীত প্রস্তাবের মুদ্রণ ও বিতরণ।
(২) উদ্বাস্তুদের জনসভা।
(৩) বিভিন্ন গণতান্ত্রিক সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে সভা।
(৪) পরিসংখ্যানসহ উদ্বাস্তু পরিস্থিতির মুদ্রিত বিবরণের বিতরণ।
(৫) প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহ।

এই বিজ্ঞপ্তির সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ অংশ ছিল এর উপসংহার। এতে ছিল উদ্বাস্তু জনসমষ্টির প্রতি একটি গুরুত্বপূর্ণ আবেদন। নীচে তার সম্পূর্ণ উদ্ধৃতি দেওয়া হল :

বন্ধুগণ, সাধারণ নির্বাচন (১৯৫২) এগিয়ে আসছে। এই নির্বাচন আমাদের দাবি আদায়ের একটি অনন্য সুযোগ এনে দিয়েছে। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে হবে আমাদের। এই সুযোগের পুরো সুবিধা যদি আমরা আদায় করতে ব্যর্থ হই তবে তা আত্মহত্যার নামান্তর হবে।

দেশে গণতান্ত্রিক সরকার থাকলে আমাদের দাবি পূর্ণ হত। কিন্তু বর্তমান কংগ্রেস সরকার আমাদের দাবি গ্রাহ্য করেনি এবং ভবিষ্যতেও করবে না। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দলের একটি কোয়ালিশন সরকার প্রতিষ্ঠার সুযোগ এনে দিয়েছে আসন্ন

নির্বাচন। যদি গণতান্ত্রিক দলগুলি নির্বাচনে জয়ী হয়, তবে এই দলগুলির সম্মিলিত জোট কংগ্রেস সরকারের পরিবর্তে ক্ষমতায় আসবে। তাহলে আমাদের সমস্যার একটি ন্যায্য সমাধানের আশা আছে। কিন্তু কংগ্রেস জয়ী হলেও তার পক্ষে আর আমাদের দাবি অগ্রাহ্য করা সম্ভব হবে না। এই নির্বাচনে আমাদের উদ্যম আমাদের নতুন শক্তি ও ক্ষমতা দেবে।

বর্তমান পরিস্থিতির কথা মনে রেখে ইউ সি আর সি সব উদ্বাস্তু ও উদ্বাস্তু সংগঠনকে এভাবে অগ্রসর হওয়ার ডাক দিচ্ছে : নির্বাচনের সময় উদ্বাস্তুরা স্থানীয় প্রার্থীর কাছে যাবে এবং তাঁকে অনুরোধ করবে যে তিনি যেন তাদের সমর্থনে বিবৃতি দেন এবং প্রত্যেক নির্বাচনী সভায় তাদের দাবির সমর্থন করেন। ইউ সি আর সি-র পুনর্বাসনের নীতি যাতে সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় সেজন্য তারা নির্বাচনী জনসভায় অংশগ্রহণ করবে। গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা যাতে নির্বাচিত হন সেজন্য তাদের সব শক্তি সংহত করবে।

১১/৫১নং বিজ্ঞপ্তির গোটা কর্মসূচি দুটি স্লোগানের মধ্যে ব্যক্ত হয়েছিল—সব উদ্বাস্তু ঐক্যবদ্ধ হও এবং পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সঙ্গে ঐক্য গড়ে তোল। এই দুটি স্লোগান এখন উদ্বাস্তু কলোনি ও ক্যাম্পের মানুষের মুখে মুখে ঘুরে বেড়াবে এবং ক্রমশ উদ্বাস্তু মনের অন্তর্গত হয়ে যাবে। ঘটি-বাঙাল সম্পর্কের তিক্ততাও এতে কমে আসবে।

এই বিজ্ঞপ্তিতে ইউ সি আর সি-র নীতির যে বিবৃতি সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয় তার ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। এই বিবৃতিতে ইউ সি আর সি-র আত্মবিশ্বাসের স্পষ্ট চিহ্ন ধরা পড়ে। ইউ সি আর সি-র নেতাদেরও সাধারণ উদ্বাস্তুদের জীবনে যন্ত্রণার অভিজ্ঞতা ছিল। উদ্বাস্তু জীবনের প্রাত্যহিক দুঃখ ও যন্ত্রণার অংশভাক ছিলেন বলেই উদ্বাস্তুদের পরিচালনা করার অভ্রান্ত কৌশল উদ্ভাবন করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। শুধু উদ্বাস্তুদের পরিচালনার কৌশলই নয়, সরকারের বিরুদ্ধে প্রত্যাঘাতের সঠিক পথও তারা খুঁজে বার করতে পেরেছিলেন।

উচ্ছেদের আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন ইউ সি আর সি-র সাংগঠনিক কাঠামোকে দৃঢ়সম্বদ্ধ করে তাকে অধিকতর শক্তিশালী করে তুলেছিল। এই বিজ্ঞপ্তিতে নেতৃবৃন্দের নিজস্ব শক্তির চেতনা লক্ষণীয়ভাবে ফুটে উঠেছে। ইউ সি আর সি-র পেছনে এখন লক্ষ লক্ষ মানুষের সমর্থন। এতকাল পরে ইউ সি আর সি উদ্বাস্তু পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে। যে পথে তাদের যেতে হবে, যে লক্ষ্যে তারা পৌঁছবে তা নিয়ে আর কোনো অনিশ্চয়তা নেই। সেই লক্ষ্য হল উদ্বাস্তু অনুগামীদের একটি বামপন্থী জনগোষ্ঠীতে পরিণত করা এবং পথ হল পশ্চিমবঙ্গের সব গণতান্ত্রিক সংগঠনকে সঙ্গে নিয়ে সম্মিলিত আন্দোলন।

অবশ্য একথা সত্য উচ্ছেদের নোটিশ উদ্বাস্তুদের মধ্যে একটি ভীতির পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু উচ্ছেদের ভয় উদ্বাস্তুদের ঐক্যবদ্ধ করেছিল। উচ্ছেদের আইনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সময় উদ্বাস্তুদের মধ্যে যে ভাঙনের সৃষ্টি হয়েছিল, সেই ভাঙন আর নেই। উচ্ছেদের আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের পর আর সি আর সি দূরে সরে দাঁড়িয়েছে। ইউ সি আর সি এখন উদ্বাস্তু আন্দোলনের একমাত্র হাতিয়ার।

অতএব এবার ইউ সি আর সি-র সাংগঠনিক কাঠামো উদ্বাস্তুদের একটি ঐক্যবদ্ধ জনগোষ্ঠীতে পরিণত করল। যে জমিতে তারা বসবাস করতে শুরু করেছে, সেই জমি রক্ষার জন্য তারা এখন আমৃত্যু লড়াই করতে প্রস্তুত। শেষ পর্যন্ত উদ্বাস্তুদের সংগঠিত

শক্তি সরকারকে উচ্ছেদের আইনের প্রয়োগ করা স্থগিত রাখতে বাধ্য করে। কিন্তু ইউ সি আর সি এখানেই থামেনি। জবরদখল কলোনিগুলির সরকারি স্বীকৃতি ও নিয়ামনের জন্য সে লড়াই চালিয়ে যেতে থাকে।

নতুন শক্তির যে চেতনা এ সময়ে ইউ সি আর সি নেতৃবৃন্দের মনে কাজ করছিল, তার মূলে ছিল একটি নতুন উপাদান। উদ্বাস্তুরা নাগরিকত্ব অর্জন করেছিল। অতএব তাদের হাতে সোনার আপেল—ভোট আসছিল। লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু ভোটার ইউ সি আর সি-র অনুগামী। অতএব ১৯৫২-র সাধারণ নির্বাচনে ইউ সি আর সি-র একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ইউ সি আর সি-র নির্দেশ অনুযায়ী যদি উদ্বাস্তুরা ভোট দেয় তাহলে যেসব জায়গায় উদ্বাস্তুদের ঘনীভূত অস্তিত্ব রয়েছে সেখানে নির্বাচনের ফলাফল নিশ্চিতভাবে প্রভাবিত হবে। কোনো বিশেষ প্রার্থীকে যদি ইউ সি আর সি সমর্থন করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং কলোনি কমিটিগুলি যদি এই সিদ্ধান্ত মেনে নেয়, তাহলে সেই প্রার্থী প্রত্যেকটি উদ্বাস্তু-ভোট পাবে, তাতে কোনো সন্দেহ ছিল না। ইউ সি আর সি-র ক্রমিকস্তরে বিন্যস্ত সাংগঠনিক কাঠামো এমন একটি নিখুঁত ও স্থায়ী যন্ত্র হিশেবে গড়ে উঠেছিল যাকে যে কোনো সময়ে নির্বাচনের কাজে লাগানো যেত। পশ্চিমবঙ্গের কোনো রাজনৈতিক দলেরই এই ধরণের স্থায়ী নির্বাচনী যন্ত্র ছিল না। তার কারণ ছিল এই যে কলোনি কমিটির সদস্যরা অত্যন্ত কুশলী নির্বাচনী কর্মকর্তায় পরিণত হয়েছিলেন। কলোনির প্রত্যেক ভোটারকে তারা চিনতেন। প্রত্যেক ভোটার ভোটও দিতেন কলোনি কমিটির সদস্যদের নির্দেশে। অতএব নির্বাচনের আগেই ইউ সি আর সি জানত ঠিক কত ভোট তার হাতে আছে। সুতরাং যে নির্বাচন কেন্দ্রে উদ্বাস্তুরা ঘনীভূত হয়ে বাস করত, সেই কেন্দ্রে যে প্রার্থী ইউ সি আর সি-র সমর্থন পেত নির্বাচনে তার জয় অবধারিত ছিল। শেষ পর্যন্ত উচ্ছেদের আইনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য গড়ে-তোলা সাংগঠনিক কাঠামো এবং ঐক্যবদ্ধ উদ্বাস্তু জনসমষ্টির আনুগত্য—এই দুইয়ের সুপরিকল্পিত ব্যবহারের দ্বারা পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক শক্তির খেলায় ইউ সি আর সি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

১১/৫১নং বিজ্ঞপ্তি থেকে বোঝা যায় যে পশ্চিমবঙ্গে ভোটের লড়াইয়ে নিজস্ব ভূমিকা সম্পর্কে ইউ সি আর সি-র সুস্পষ্ট ধারণা ছিল। এই বিজ্ঞপ্তির দ্বারা উদ্বাস্তুদের খোলাখুলিভাবে জানিয়ে দেওয়া হয় যে দাবি আদায়ের জন্য সাধারণ নির্বাচনের পূর্ণ সুযোগ তাদের নিতে হবে। উদ্বাস্তুরা জানত যে শাসকদলের কাছ থেকে তাদের কিছু পাওয়ার আশা নেই। যদি বামপন্থী দলের কোয়ালিশন সরকার ক্ষমতায় আসে, তবেই তারা কিছু সুযোগ-সুবিধা আশা করতে পারে। ইউ সি আর সি-র কার্যনির্বাহী সমিতিতে বিভিন্ন বাম রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা ছিলেন। তাঁরাও চেষ্টা করেছিলেন উদ্বাস্তুদের মধ্যে বামপন্থী মানসিক প্রবণতা নিয়ে আসতে। ইতিপূর্বে লক্ষ করা গেছে যে সেই কারণেই উদ্বাস্তুদের মিছিলে উদ্বাস্তু দাবির স্লোগানের সঙ্গে বামপন্থী রাজনৈতিক স্লোগান মিশিয়ে দেওয়া হত। কিন্তু সেই সব স্লোগান উদ্বাস্তুদের মুখের বুলি হয়েই ছিল। তাদের মনে বাসা বাঁধেনি। ১১/৫১নং বিজ্ঞপ্তি প্রথম উদ্বাস্তুদের সক্রিয়ভাবে নির্বাচনী অভিযানে অংশগ্রহণ করতে নির্দেশ দিল। উদ্দেশ্য কংগ্রেস সরকারের অপসারণ ও বাম কোয়ালিশন সরকারের প্রতিষ্ঠা। এই নতুন সরকার উদ্বাস্তুদের দাবির প্রতি সহানুভূতিশীল হবে। নির্বাচনী অভিযানে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের অর্থ সক্রিয়ভাবে রাজনৈতিক মঞ্চে অবতীর্ণ হওয়া। কিন্তু তা সত্ত্বেও উদ্বাস্তুদের লক্ষ্য রাজনীতি নয়, তাদের বিশেষ সমস্যার উপযুক্ত সমাধান।[৮] উদ্বাস্তু নেতারা জানতেন যে ১৯৫২-র

নির্বাচনে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নির্বাচনী যুদ্ধে যোগ দিয়ে কংগ্রেসকে পরাজিত করা যাবে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা নির্বাচনী লড়াইয়ে যোগ দেওয়া আবশ্যিক বলে মনে করেছিলেন। কেননা একমাত্র নির্বাচনী লড়াইয়ে যোগ দিয়েই তারা সমাজের বাইরে অবস্থিত কলোনির খোলশ ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারবে এবং পশ্চিমবঙ্গের অখণ্ড সমাজের অন্তর্গত হতে পারবে। অন্যভাবে বলা যায় যে তারা এই সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি কেন্দ্রে পরিণত হতে পারবে। কোনো সরকারের পক্ষে আর তাদের উপেক্ষা করা সম্ভব হবে না।

কিন্তু ১৯৫২-তে উদ্বাস্তু নেতারা রাজনৈতিক ক্ষমতার কথা ভাবছিলেন না। আপাতত উদ্বাস্তু স্বার্থরক্ষার দিকেই তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। দেড় বছরের বেশি হয়নি ইউ সি আর সি-র জন্ম হয়েছে। কিন্তু এরই মধ্যে সে অনেকটা পথ এগিয়েছে। সে অধিকাংশ বামপন্থী দলের সমন্বিত গোষ্ঠী হিশেবে ঐকমত্যের ভিত্তিতে কাজ করে দেখিয়েছে যে পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী দলগুলির একটি সম্মিলিত ফ্রন্ট গঠন করা সম্ভব। সে উচ্ছেদের আইনের বিরুদ্ধে উদ্বাস্তু ঐক্যবদ্ধ করেছে, এই আইনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করেছে৷ তার সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যে উদ্বাস্তু জনসমষ্টিকে সংহত করে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনের রাজনীতিতে প্রভাবিত করেছে।

শুধু কলোনি রক্ষার অথবা নির্বাচনী লড়াই নয়, ইউ সি আর সি জবরদখল কলোনি কমিটিগুলিকে গঠনমূলক কাজে অনুপ্রাণিত করেছে। কলোনি কমিটিগুলি রাস্তাঘাট, পয়ঃপ্রণালী, নলকূপ তৈরি করেছে, বিদ্যালয়, হাসপাতাল, এমনকী কলেজও গড়ে তুলেছে। সবচেয়ে বড় কথা হল এই যে লক্ষ লক্ষ মানুষ যারা ঘরছাড়া, ছন্নছাড়া, যারা প্রায় ভিখিরিতে পরিণত হয়েছিল, তাদের আবার সুস্থ, সভ্য সমাজজীবনে ফিরিয়ে এনেছে ইউ সি আর সি। তারা যখন এদেশে চলে আসতে বাধ্য হয়, তখন এদেশের মানুষ ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। তারা রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মে, রাস্তায়, পাটগুদামে শুটকিমাছের মতো জড়ো হয়ে থেকেছে। যে নোংরা পরিবেশে থেকেছে, যে খাবার খেয়েছে, তা অবিশ্বাস্য। এমন হতাশা তাদের বুকে বাসা বেঁধেছিল যা মানুষকে দিনের পর দিন কুরে কুরে খায়।চোখের সামনে বিনা চিকিৎসায় হাজার হাজার পুরুষ, স্ত্রী ও শিশু মারা গেছে, শত শত যুবতী নারী দেহ বেচতে বাধ্য হয়েছে। পুরোপুরি হারিয়ে যাওয়ার আগে এই মানুষগুলিকে আবার সুস্থ, সভ্য সমাজজীবনে ফিরিয়ে এনেছিল ইউ সি আর সি।

এরা সুস্থ সমাজজীবনে ফিরে এসেছিল একথা বললেই যথেষ্ট হল না। ১৯৫২-তে তারা আবার নিজেদের ফিরে পেয়েছিল। পদ্মার সন্তানেরা মৃত্যুর দেশ থেকে ফিরে এসেছিল। তারা তাদের জীবনের লক্ষ্য খুঁজে পেয়েছিল। ভেতরের কোনো রুদ্ররোষ যেন ভূতে-পাওয়া মানুষের মতো তাদের তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিল। তাদের কাছে নির্বাচন পাঁচ বছর পর পর নতুন বিধানসভা ও মন্ত্রিপরিষদ গঠনের প্রক্রিয়ামাত্র নয়। মনোনীত প্রার্থীর জন্য তাদের প্রচারাভিযান একটি নতুন মাত্রা পেয়েছিল। প্রচারাভিযান নয়, ক্রুসেড। এই ক্রুসেডের দ্বারা তারা এমন কিছু জয় করতে চেয়েছিল, যা তারা চিরকালের জন্য হারিয়েছিল, অথচ যা সেই মুহূর্তে তাদের নাগালের মধ্যে এসে গিয়েছিল। বিদেশ-বিভূঁইয়ে তারা নির্বাসিত মানুষের মতো ছিল। বিচ্ছিন্নতাবোধ তাদের দেহে মনে-প্রাণে সংক্রামিত হয়েছিল, গর্তের মূষিকের জীবন দিয়েছিল তাদের। সাধারণ নির্বাচন আকস্মিকভাবে তাদের বুঝিয়ে দিল যে দেশের সমাজ তাদের দিকে ফিরেও

তাকাত না, সেই সমাজ দুর্ভেদ্য নয়, বরং অনায়াসভেদ্য। নির্বাচন তাদের এই সমাজকে ভেদ করার সুযোগই এনে দিয়েছিল।

এ সময়ে কলোনিতে এমন কেউ ছিল না যারা নির্বাচনের কাজে লাগেনি। এমনকী কিশোর-কিশোরীরাও দিনরাত অবিরাম খেটেছে। তাদের সঙ্গে ছিলেন ইউ সি আর সি-র নেতারা। ইউ সি আর সি সমর্থিত প্রার্থীর নির্বাচনে বিপুল অর্থব্যয়ের প্রয়োজন নেই। বামপ্রার্থীদের জন্য রাস্তার মোড়ে, স্টেশন প্ল্যাটফর্মে, বাসস্টপে দাঁড়িয়ে উদ্বাস্তু কিশোর-কিশোরীরা ওপরে ফুটো-অলা সিল করা কৌটো নেড়ে বামপন্থী প্রার্থীর নির্বাচনী প্রচারের টাকা আসত সিল করা কৌটোয় যে সিকি দোয়ানি, টাকা আধুলি পড়ত তা থেকে। কাগজে, দেওয়ালে পোস্টার লেখা, ছবি আঁকা সব বিনি পয়সায়। উদ্বাস্তু যৌবনের নিশ্ছিদ্র উন্মাদনা ছিল। দুবেলা দুমুঠো ভাতের জোগাড় হলেই হত। আর কিছুর দরকার ছিল না। ভাতের জন্যও পয়সা লাগত না। এবাড়ি-ওবাড়ি চাইলেই ডালভাত পাওয়া যেত। একটি অখণ্ড, অবিভাজ্য ইচ্ছাশক্তি উদ্বাস্তুদের মধ্যে যে প্রচণ্ড আলোড়ন নিয়ে এসেছিল, তা ১৯৫২-র নির্বাচনকে একটি নতুন মাত্রা দিয়েছিল। ইতিপূর্বে তা পশ্চিমবঙ্গের কোনো নির্বাচনে দেখা যায়নি। যে পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয়েছিল, তা এই নির্বাচনকে এক প্রমত্ত উৎসবের রূপ দিয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের নিম্নবিত্তদের একাংশকেও আত্মসাৎ করেছিল এই উৎসব।

১৯৫২-র সাধারণ নির্বাচনের সময় থেকেই উদ্বাস্তুদের মনে এই দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছিল যে ওরা এদেশেরই লোক। বামপ্রার্থীদের জন্য যে উদ্বাস্তুরা কাজ করছিল তাদের সঙ্গে বামরাজনৈতিক দলের এদেশীয় শিক্ষিত কর্মীদের আর আলাদা করা যাচ্ছিল না। উদ্বাস্তুরা সরকার বিরোধীদের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গে আর তারা পরবাসী নয়, এদেশ তাদেরই দেশ এই উল্লাস তাদের নির্বাসিতের মানসিকতাকে দূর করল। কলোনির খোলশ ভেঙে তারা জীবনের উন্মুক্ত প্রান্তরে বেরিয়ে এল।

উচ্ছেদের আইনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও ১৯৫২-র নির্বাচনী অভিযানে অংশগ্রহণকে উদ্বাস্তু জনগোষ্ঠীর বৈপ্লবিক রূপান্তরের প্রক্রিয়ার দুটি পরস্পর সম্বদ্ধ দিকচিহ্ন বলা যেতে পারে। ১৯৫১-র মে থেকে ১৯৫২-র ফেব্রুয়ারি এই দশ মাসের মধ্যে কলোনি ব্যারাক ও বস্তির উদ্বাস্তু জনসমষ্টি বামপন্থার দিকে একটি লক্ষণীয় মোড় নিয়েছিল। এই ছিন্নমূল জনসমষ্টির কংগ্রেসের প্রতি যে সমর্থন ছিল তা ক্রমশ বিতৃষ্ণায় পরিণত হচ্ছিল এবং সময়ের এই বিন্দু থেকেই এরা বামে ঘুরে দাঁড়ায়। তার প্রমাণ হল এই যে যেখানেই উদ্বাস্তুরা যথেষ্ট সংখ্যায় কেন্দ্রীভূত ছিল, সেখানেই বামপন্থী প্রার্থীরা সাফল্যলাভ করেছিল। সাধারণ নির্বাচনে উদ্বাস্তু কর্মীরা যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল, সিপিআই রাজ্যকমিটি তা স্বীকার করেছিল। নির্বাচনে উদ্বাস্তু স্বেচ্ছাসেবকেরা পার্টির সদস্যদের চেয়েও বেশি সক্রিয় ছিল। অতএব তাদের অবিলম্বে পার্টির সদস্যপদ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।

## ১৯৫২-র ১৫ জুনের লালবাগান উদ্বাস্তু সম্মেলন

ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে উদ্বাস্তু আন্দোলনের এক একটি তরঙ্গ শুরু হত কলকাতায় মিছিল দিয়ে এবং শেষ হত একটি উদ্বাস্তু সম্মেলন দিয়ে। লালবাগান সম্মেলনে

পুনর্বাসনের সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য যে কথা বলা হয় তা হল :

(১) এমন জায়গায় জবরদখলকারীদের বিকল্প বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে যেখান থেকে তারা তাদের জীবিকা নির্বাহের বর্তমান পেশা চালিয়ে যেতে পারবে।

(২) উদ্বাস্তু, স্থানীয় জনসাধারণ ও সরকারের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি ত্রিপাক্ষিক কমিশন গঠন করতে হবে এবং এই কমিশনের মাধ্যমে সরকারের ও বড় জমিদারদের জমি অধিগ্রহণ করে তা উদ্বাস্তু ও পশ্চিমবঙ্গের ভূমিহীন মানুষদের মধ্যে বণ্টন করে দিতে হবে।

(৩) উদ্বাস্তুদের উপযুক্ত গৃহনির্মাণের ঋণ দিতে হবে।

(৪) উদ্বাস্তু কৃষিজীবীদের শস্যবীজ ও চাষের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিসহ চাষের জমি দিতে হবে।

(৫) সরকারি সমবায় ব্যাংক থেকে উদ্বাস্তুদের ব্যবসার জন্য ঋণ দিতে হবে।

(৬) বিদেশী রাষ্ট্র কর্তৃক দেশের শোষণ বন্ধ করতে হবে এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে রাশিয়া ও চীনের বিরুদ্ধে পক্ষপাতদুষ্ট ব্যবহাব বন্ধ করতে হবে।

(৭) দেশজ বৃহৎ শিল্পের উন্নয়নের জন্য রাশিয়া থেকে যন্ত্রপাতি আমদানি করতে হবে।

(৮) বেকারদের বেকারভাতা দিতে হবে।

সিপিআই-এর কর্মীরা যে লালবাগান সম্মেলনে বিশেষভাবে সক্রিয় ছিল, তা বোঝা যায় এই সম্মেলনের প্রস্তাবের শেষ তিনটি দফা থেকে। এই তিনটি দফা সোজা সিপিআই-এর কর্মসূচি থেকে তুলে আনা হয়েছিল, একথা বললে অন্যায় হবে না।

লালবাগান সম্মেলনের পর কলোনিতে কলোনিতে অসংখ্য মিটিং করা হয়। এইসব মিটিং-এর উদ্দেশ্য ছিল লালবাগান সম্মেলনের প্রস্তাব সাধারণ উদ্বাস্তুদের জানিয়ে দেওয়া। ১৭ আগস্ট দেশবন্ধুনগরে আর-একটি সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে সরাসরি দাবি করা হয় :

(১) জবরদখল কলোনির স্বীকৃতি নয়, নিয়মিতকরণ।

(২) একটি ত্রিপাক্ষিক বৈঠক।

(৩) ১৯৫১-র ষোলো নং আইনের প্রয়োগ বন্ধ রাখা।

দেশবন্ধুনগরের সম্মেলনের পর ইউ সি আর সি-র আহ্বানে বিশাল উদ্বাস্তু সমাবেশ হয় ময়দানে। এই সমাবেশে ইউ সি আর সি পশ্চিমবঙ্গের সব রাজনৈতিক দলকে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ হবার ডাক দেয়। সমাবেশে যে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় তাতে সরকারের পুনর্বাসন নীতির আমূল পরিবর্তনের এবং পশ্চিমবঙ্গের ৫৭ লক্ষ একর পতিত জমি উদ্বাস্তুদের মধ্যে বণ্টনের দাবি জানানো হয়।

ডিসেম্বরে আর একটি উদ্বাস্তু সম্মেলন হয় বান্ধবনগরে (নাগের বাজার, দমদম)। সেখানে ২০০ উদ্বাস্তু পরিবারকে উচ্ছেদের নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল এই সব উদ্বাস্তু পরিবারের উচ্ছেদের প্রতিরোধ করা এবং জবরদখল কলোনির নিয়মিতকরণের পরীক্ষামূলক সরকারি পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা। যেহেতু বান্ধবনগরের দুশো পরিবারকে উচ্ছেদের নোটিশ দেওয়া হয়েছিল তাই বান্ধবনগরেই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। এই সম্মেলন করে ইউ সি আর সি সরকারকে জানিয়ে দিল যে বান্ধবনগর ইউ সি আর সি-র অঙ্গীভূত এবং এখানে উচ্ছেদের চেষ্টা হলে ইউ সি আর সি তা প্রতিরোধ করবে। সম্মেলনে যে প্রস্তাব গৃহীত হল তাতে ষোল

নং আইন নাকচ করার দাবি জানানো হল এবং বলা হল যে পরীক্ষামূলক কোনো পরিকল্পনা সমস্যার সমাধান করতে পারবে না।

১৯৫৩-র ১৫ মার্চ টালিগঞ্জে আর-একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। এই সম্মেলনে যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তা নীচে দেওয়া হল :

(১) সরকারকে অবিলম্বে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।

(২) কোনো উদ্বাস্তুকে কলোনি থেকে উচ্ছেদ করা চলবে না।

(৩) উদ্বাস্তুরা যেসব কলোনিতে স্কুল গড়ে তুলেছে, সেই সব স্কুলে সরকারি সাহায্য দিতে হবে।

(৪) টালিগঞ্জের সব কলোনিকে টালিগঞ্জ পৌরসভার অন্তর্গত করতে হবে।

(৫) ১৯৫১-র ষোলো নং আইনকে রদ করে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য একটি নতুন আইন পাশ করতে হবে।

(৬) ২৭ মার্চ কলকাতা ময়দানে কেন্দ্রীয় সমাবেশ হবে।

(৭) ২৫০টি জবরদখল কলোনির মধ্যে ৯৩টি কলোনিকে নিয়মিতকরণের প্রতিশ্রুতি সরকার দিয়েছে—প্রস্তাবে একথা বলা হল।

পরে কেন্দ্রীয় সমাবেশের দিন পালটে ৭ এপ্রিল করা হয়। স্থির করা হয় যে ময়দানে সভার পর উদ্বাস্তুদের একটি মিছিল বিধানসভার দিকে অগ্রসর হবে এবং বিক্ষোভ প্রদর্শন করবে।

৭ এপ্রিল বিকেলে ছোটবড় অসংখ্য মিছিল সমাবেশের বিভিন্ন বিন্দু থেকে মনুমেন্ট ময়দানে গিয়ে পৌঁছয়। বিকেল সাড়ে চারটায় ৭০০০ পুরুষ ও ১০০০ নারীর একটি মিলিত মিছিল বিধানসভার দিকে অগ্রসর হয়। মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন সত্যপ্রিয় ব্যানার্জি ও অম্বিকা চক্রবর্তী। বিধানসভায় পৌঁছে মিছিলের মানুষেরা ছড়িয়ে পড়ে এবং বিধানসভার পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণের গেটের সামনে বসে পড়ে। ৫-১০ মিনিটের সময় সত্যপ্রিয় বানার্জি এসে বিক্ষোভকারীদের জানিয়ে যান যে তাদের স্মারকলিপি ও দাবির সনদ বিধানসভায় পেশ করা হয়েছে। জ্যোতি বসু ও অন্যান্য বাম এমএলএ-এরা এসে বিক্ষোভকারীদের কাছে বক্তৃতা করেন। জ্যোতি বসু উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানে সরকারি অবহেলার নিন্দা করেন এবং বিক্ষোভকারীদের গেট অবরোধ করে বসে থাকতে বলেন যাতে মন্ত্রী বা এমএলএ-রা বিধানসভা ছেড়ে চলে যেতে না পারেন। তিনি বিভিন্ন বামদলের প্রতিনিধিসহ একটি পরামর্শদাতা সমিতি গঠনের দাবি করেন। হেমন্ত বসু ও অন্যান্য বাম এমএলএ-রাও বক্তৃতা করেন। তারা যখন বক্তৃতা করছিলেন তখন কংগ্রেসি এমএলএ-রা উদ্বাস্তুদের বন্ধনী ভেঙে গেট পেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু তারা সফল হননি।

উদ্বাস্তুরা বিধানসভা থেকে বেরোবার সব পথ আটকে ৬-৪৫ মিঃ পর্যন্ত বসে থাকে। ৬-৪৫ মিঃ-এ সত্যপ্রিয় বানার্জি এসে জানান যে উদ্বাস্তুদের বিক্ষোভ সফল হয়েছে। কারণ তারা পৌনে সাতটা পর্যন্ত মন্ত্রী ও এমএলএ-দের বিধানসভা থেকে বেরোতে দেননি। সুতরাং তখন তারা যেন আবার সুশৃঙ্খলভাবে ময়দানে ফিরে যান। সেখানে আবার সভা হবে এবং পরবর্তী কার্যক্রম স্থির করা হবে।

আবার মিছিল ফিরে এল ময়দানে। সেখানে ইউ সি আর সি-র দুই নেতা অম্বিকা চক্রবর্তী ও জ্যোতিষ জোয়ারদার জানালেন যে তাদের ঐক্যবদ্ধ বিক্ষোভ প্রদর্শন সফল হয়েছে এবং ইউ সি আর সি-র কার্যনির্বাহী সমিতি কয়েকদিনের মধ্যেই পরবর্তী কর্মসূচি

জানিয়ে দেবে। এরপর সমবেত উদ্বাস্তুরা আবার মিছিল করে শান্তিপূর্ণভাবে তাদের কলোনিতে ফিরে গেল।

এই বিক্ষোভ প্রদর্শন সাফল্যলাভ করেছিল এই অর্থে যে বিক্ষুব্ধ উদ্বাস্তুরা সারাদিন মন্ত্রী ও বিধায়কদের বিধানসভায় আবদ্ধ রাখতে সক্ষম হয়েছিল। তাই আন্দোলন পরিচালনায় ইউ সি আর সি নেতৃত্বের বিচারবুদ্ধিও প্রশংসনীয়। নেতারা বিক্ষোভকে সরকারের সহনসীমাকে অতিক্রম করতে দেননি। তাঁরা লক্ষ রেখেছিলেন যে বিক্ষোভ যেন রক্তাক্ত সংগ্রামে পরিণত না হয়। এই বিক্ষোভ সংগঠিত করে তাঁরা ঐক্যবদ্ধ উদ্বাস্তুদের শক্তির প্রমাণ দিতে চেয়েছিলেন এবং তাতে তাঁরা সক্ষম হয়েছিলেন।

এই বিক্ষোভ মিছিলের গুরুত্বপূর্ণ দাবিগুলির মধ্যে ছিল :

(১) সরকারের পুনর্বাসন নীতির পুনর্মূল্যায়ন।

(২) সব দল নিয়ে একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন।

(৩) জমির মালিক, সরকার ও উদ্বাস্তুদের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি ত্রিপাক্ষিক সম্মেলনের মাধ্যমে জমির মূল্য নির্ধারণ।

(৪) ব্যারাক, ও পতিত বাড়িতে বসবাসকারী উদ্বাস্তুদের বিকল্প বাসস্থান দিতে হবে।

(৫) জবরদখলকারীদের ওপর যে উচ্ছেদের নোটিশ জারি করা হয়েছে, তা প্রত্যাহার করতে হবে। ১৯৫১-র ষোলো নং আইন (উচ্ছেদের আইন) বাতিল করতে হবে।

(৬) বাস্তুহারা মুসলমানদের পুনর্বাসন ও অন্তর্বর্তীকালীন ত্রাণ দিতে হবে।

(৭) পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক সংস্কার ও শিল্পায়নের দ্বারা উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দিতে হবে।

(৮) সরকারি আশ্রয়শিবিরের উদ্বাস্তুদের দ্রুত পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে এবং এই সব শিবিরের প্রশাসনিক ব্যবস্থার দিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

(৯) উদ্বাস্তু শিবিরের পার্শ্ববর্তী এলাকায় উদ্বাস্তুদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।

(১০) বেকার উদ্বাস্তুদের বেকারভাতা দিতে হবে।

(১১) উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের পরই উদ্বাস্তুদের প্রদত্ত ঋণ পরিশোধের প্রশ্ন উঠবে।

সরকার যাতে উদ্বাস্তুদের দাবির এই সনদ মেনে নেয় সেজন্য ইউ সি আর সি সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। সরকারকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয় যে এই দাবি মেনে না নিলে ইউ সি আর সি সরকারের সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষের পথে নামবে। শুধু তাই নয়, ইউ সি আর সি ভবিষ্যতের কথা ভাবছিল। পশ্চিমবঙ্গের নিম্নমধ্যবিত্ত, কৃষক, শ্রমিক ও উদ্বাস্তুদের মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলার কথা ভাবছিল।

ইউ সি আর সি-র তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হলে ১৯৫৩-র ১৩ আগস্ট। জন্মলগ্ন থেকে ১৯৫৩ পর্যন্ত সংগঠনের সাফল্য ব্যাখ্যা করেন সম্পাদক অম্বিকা চক্রবর্তী। দক্ষিণ কলিকাতা বাস্তুহারা সংহতির তৃতীয় সম্মেলনের গৃহীত প্রস্তাবে ইউ সি আর সি-র সাফল্যের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়। কলোনিবাসীরা বন কেটে বসত করেছে, পতিত জমি উদ্ধার করেছে, কলোনিগুলির উন্নয়ন কর্মে তিন কোটিরও বেশি টাকা ব্যয় করেছে। প্রস্তাবে কলোনির উদ্বাস্তুদের প্রয়াসের কথা উল্লেখ করে বলা হয় যে ইউ সি আর সি-র নেতৃত্বে কলোনিবাসীদের সম্মিলিত আন্দোলনের ফলে উচ্ছেদ প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছে। ১৯৫৪-র মন্ত্রিকমিটির প্রতিবেদনে ইউ সি

আর সি-র কিছু গুরুত্বপূর্ণ দাবি মেনে নেওয়া হয়। এই প্রতিবেদনে বলা হয় যে কলোনি থেকে জবরদখলকারীদের উচ্ছেদ করাকে সমর্থন করা চলে না এবং বিকল্প বাসস্থান না দিয়ে তাদের উচ্ছেদ করা অমানবিক কাজ। বে-আইনিভাবে জমি দখল করে যেসব কলোনি গড়ে উঠেছে তাদের স্বীকৃতিদানের সুপারিশ করে এই প্রতিবেদন। দখলীকৃত জমি প্রচলিত বাজারদর অনুযায়ী কিনে নেওয়ার জন্য পরিবার পিছু অন্যূন ১২৫০ টাকা ঋণদানের কথা বলা হয়। প্রচলিত বাজারদর ১২৫০ টাকার বেশি হলে সরকারের উচিত হবে জমিদারদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে উদ্বাস্তুদের দখলীকৃত জমিতেই বসবাসের ব্যবস্থা করে দেওয়া। প্রতিবেদনের এই সুপারিশটিকে ইউ সি আর সি সমস্যা সমাধানের জন্য যে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের দাবি জানিয়েছিল, তাই মেনে নেওয়া বলা যেতে পারে। প্রচলিত মূল্যের পরিবর্তে দখলীকৃত জমির একটি যুক্তিসহ মূল্য নির্ধারণের যে দাবি ইউ সি আর সি জানিয়েছিল, এই প্রতিবেদনে সেই দাবিকেও মেনে নেওয়া হয়। জমির যুক্তিসহ মূল্য নির্ধারণ করতে হলে জমি অধিগ্রহণ করতে হয়। কিন্তু বাজারে প্রচলিত মূল্যের চেয়ে কম দামে জমি অধিগ্রহণ করতে হলে, সংবিধান সংশোধন আবশ্যিক ছিল। কারণ, ১৮৯৪-এর জমি অধিগ্রহণ আইন (Land Acquisition Act, 1894) অনুযায়ী বাজারে প্রচলিত মূল্যেই সরকারের পক্ষে জমি অধিগ্রহণ সম্ভব। বাজারে প্রচলিত মূল্যের চেয়ে কম হারে জমি অধিগ্রহণ করতে হলে সংবিধানের ৩১নং ধারার পরিবর্তন করতে হবে। ইউ সি আর সি বারবার একথা বলেছে যে উদ্বাস্তুরা দখলীকৃত জমির যুদ্ধপূর্ব মূল্য দিতে রাজি আছে। জমি অধিগ্রহণের জন্য সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করে নেওয়ার অর্থ বাজারে প্রচলিত দামে জমির অধিগ্রহণ অনুচিত বলে ইউ সি আর সি-র বক্তব্যকে স্বীকার করে নেওয়া। বাস্তুহারা শব্দটির সংজ্ঞা ব্যাপকতর করার যে দাবি ইউ সি আর সি করেছিল, তাও এই প্রতিবেদনে মেনে নেওয়া হয়। এতে বলা হয় ১৯৫৪-র ডিসেম্বর পর্যন্ত যারা পূর্ব-পাকিস্তান থেকে পশ্চিমবঙ্গে চলে এসেছে, যারা দেশবিভাগের আগে থেকেই পূর্ব-পাকিস্তানের বাইরে বসবাস করত এবং যে সমস্ত পরিবার দেশবিভাগের ফলে বাধ্য হয়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে এসেছে, তারা সবাই বাস্তুহারা হিশেবে গণ্য হবে। ইউ সি আর সি-র নেতৃত্বাধীন উদ্বাস্তু আন্দোলনের চাপেই বাস্তুহারার এই ব্যাপকতর সংজ্ঞা সরকার স্বীকার করে নিয়েছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

১৯৫৪-র ১৭ জুলাই ইউ সি আর সি-র প্রতিনিধিরা কেন্দ্রীয় পুনর্বাসনমন্ত্রী এ পি জৈনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি ১৯৫০-এ প্রতিষ্ঠিত জবরদখল কলোনিগুলিকে স্বীকৃতিদানে রাজি হলেন; যদিও সরকারি তালিকায় সব কলোনির নাম অন্তর্ভুক্ত ছিল না। শুধু তাই নয়, ১৯৫০-এর পর যে সব কলোনি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেইসব কলোনিগুলিকেও স্বীকৃতিদানের বিষয়টি সরকার বিবেচনা করবে, এই আশ্বাস দিলেন। তা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে সরকার স্বীকার করে নিল যে ১৯৫১-র ষোলো নং আইন জবরদখল কলোনিগুলির ওপর প্রয়োগ করা সম্ভব হবে না। অতএব জবরদখল কলোনি উচ্ছেদ আইনের বিরুদ্ধে ইউ সি আর সি-র আন্দোলন সফল হয়েছিল বলা চলে। ইউ সি আর সির যেসব দাবি সরকার মেনে নিল তা হল : (১) যুক্তিসহ মূল্যে জমি অধিগ্রহণের জন্য সংবিধান সংশোধন; (২) আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে জমি অধিগ্রহণের সমস্যার সমাধান; (৩) সমস্ত জবরদখল কলোনির স্বীকৃতি দান; গৃহ নির্মাণ ও ব্যবসার জন্য কলোনিবাসীদের ঋণ দান। ইউ সি আর সি-র নেতৃত্বে উদ্বাস্তুদের এই গণতান্ত্রিক

আন্দোলন পরিশ্চমবঙ্গের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

সপ্তম অধ্যায়

# বুক ভাঙা ঘর : সরকারি উদ্বাস্তু ত্রাণশিবির

আগের কয়েকটি অধ্যায়ে জবরদখল কলোনির উদ্বাস্তুদের ইতিহাস, অসংখ্য ছিন্নমূল মানুষের দীর্ঘ যন্ত্রণার, দুর্দম সাহসের এবং সৃজনশীলতার ইতিহাস। এই ছিন্নমূল মানুষেরা জীবনমৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মানবিক অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য লড়েছে, এক দুঃস্বপ্নের জগতের অন্ধকার থেকে ফিরে এসেছে অর্থবহ যৌথজীবনে। যে সরকার কথা রাখেনি, তাদের লাঞ্ছনার দিকে চোখ ফিরিয়ে রেখেছে, সেই সরকারের উদাসীনতাকে, স্থানীয় মানুষের বিরূপতাকে, তারা অতিক্রম করে এসেছে। একটি স্বনির্ভর যৌথজীবনকে তারা বিকশিত করেছে। সরকার তাদের জন্য কিছু করেনি। কিছু করবে তা তারা আশাও করেনি। শুধু চেয়েছে সরকার যেন যে জমি তারা দখল করেছে, তা ছিনিয়ে না নেয়। জমির যুক্তিসহ মূল্য দিতেও তারা রাজি ছিল। তারা চেয়েছিল উপযুক্ত মূল্যে এই জমিকে তাদের বৈধ সম্পত্তিতে পরিণত করতে। বন্ধ্যা, পতিত জমিকে তারা উদ্ধার করেছে, এই জমির উন্নয়নে তিন কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে। এই সৃজনশীলতার সরকারি প্রতিক্রিয়া ছিল উচ্ছেদের আইন। অতএব উদ্বাস্তুদের আবার পথে নামতে হয়েছিল, দীর্ঘ সংগ্রাম করতে হয়েছিল যাতে তারা আবার নতুন করে বাস্তুহারা না হয়। শেষপর্যন্ত সরকারকে হার মানতে হয়েছিল।

জবরদখল কলোনির উদ্বাস্তুদের অধিকাংশই এসেছিল নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে। তাদের যৎকিঞ্চিৎ আর্থিক সঙ্গতি ছিল। তাদের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ছিল, সাংগঠনিক সামর্থ্য ছিল। তাই তারা নিজেদের ভাগ্য জয় করার প্রচণ্ড সংগ্রামে জয়ী হয়েছিল। কিন্তু যেসব উদ্বাস্তু এসে সরকারি ত্রাণশিবিরে আশ্রয় নিয়েছিল, তাদের অধিকাংশই ছিল কৃষক, জেলে, তাঁতি, মিস্ত্রি, গ্রামীণ স্কুল শিক্ষক প্রভৃতি; সংক্ষেপে গ্রামীণ অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত মানুষ। এরা একেবারে সর্বহারা হয়ে এদেশে এসেছিল। এরা যখন এসে শিয়ালদহ স্টেশনে আছড়ে পড়তে লাগল, তখন দিশেহারা সরকার এদের স্টেশন থেকে প্রথম নিয়ে গেল সাময়িক বিশ্রাম শিবিরে (Transit Camp) এবং সেখান থেকে তাদের সরকারি ত্রাণশিবিরে এনে জন্তুর মতো ঢুকিয়ে দেওয়া হল। জীবিকানির্বাহের জন্য তাদের যা দেওয়া হতে লাগল, তা ভিক্ষা বলাই সঙ্গত। সরকারি পরিভাষায় এই ভিক্ষার নাম 'ডোল' (Dole)। উদ্বাস্তুদের মুখে মুখে এই 'ডোল' কথাটি নতুনভাবে অর্থবহ হয়ে উঠল। কথাটির মানে দাঁড়াল কিছু চালডাল, কিছু প্রায় পচা আটা এবং শিশুদের জন্য কিছু গুঁড়া দুধ। এরই নাম শুকনো ডোল।

ক্যাম্পের ডোলজীবী এই মানুষগুলি অল্পদিনের মধ্যেই ভুলে গেল যে তারা একসময় মানুষ ছিল। জলের অভাব, মলমূত্রত্যাগ করার জন্য প্রয়োজনীয় পায়খানা প্রায় না থাকার মতো, শুকনো ডোলের অনিয়মিত ও অপ্রচুর সরবরাহ যা অধিকাংশ সময়

অখাদ্য ও শিশুদের জন্য সামান্য দুধ এবং সর্বোপরি ব্যক্তিগত একান্ত জীবনের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি—সব মিলিয়ে ক্যাম্পের জীবন দুঃসহ। সভ্যতার যে আস্তরণ মানবিক জীবনকে তার সুউচ্চ মহিমা দেয়, তা খসে পড়ল। সভ্য জীবনের সব বাঁধ ভেঙে গেল। নির্বাধ পাশব জীবনের উন্মুক্ততায় ফিরে গেল ক্যাম্পবাসীদের জীবন। বাধ্যতামূলক আলস্যে তাদের দিন কাটত। রাত্রি আরো অসহ্য। অনেকেরই রাত কাটত যুদ্ধের সময় মার্কিন সৈন্য বাহিনীর প্রয়োজনে তৈরি গুদামের মতো 'নিসেন হাটে' (১০০'×২৫') যাতে কোনো জানালা ছিল না। ছিল শুধু দুটো রেলের ওপর বসানো দুটি দরজা যা দুদিক থেকে ঠেলে দিলে খাপে খাপে লেগে যেত। রাত্রিতে দরজা খোলা রাখা যেত না। কারণ ভয় ছিল হায়েনারা ঘরে ঢুকে শিশুদের তুলে নিয়ে যাবে। কিছু শিশুকে হায়েনারা তুলে নিয়েও গিয়েছিল। সুতরাং রাত্রিতে 'নিসেন হাটে'র দরজা বন্ধ করে দেওয়া হত। দরজা বন্ধ করলে নিসেন হাটগুলি একেবারে লক্ষ্মীন্দরের বাসরঘর হয়ে দাঁড়াত। এই আলো হাওয়াধীন গুদামেই ইট, কাঠ দিয়ে বিশটি পরিবারের স্থান নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল। এখানে কোনো পরিবারেরই সামান্যতম গোপনতারও কোনো সুযোগ ছিল না। এই নিসেন হাটে অথবা মিলিটারি ব্যারাকের মতো গুদাম ঘরে সরকার উদ্বাস্তুদের আশ্রয় দিয়েছিল। এখানে এদের আশ্রয় দিয়ে সরকার তাদের হব্‌স্‌ যে আদিম পাশব জীবনের বর্ণনা করেছেন, সেখানে পৌঁছে দিলেন। জীবন জঘন্য, জান্তব ও সংক্ষিপ্ত হয়ে গেল। প্রায় পাশব নির্বিচার যৌন জীবনে ফিরে গেল তারা।

রানাঘাটের কুপার্স ক্যাম্পে এ সময়ে সবচেয়ে বেশি উদ্বাস্তুকে আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল। কুপার্স ক্যাম্পে উদ্বাস্তুর সংখ্যা এ সময়ে ৭০,০০০-এ দাঁড়িয়েছিল। এই ক্যাম্পের উদ্বাস্তুদের জীবন নারকীয়তার কোন স্তরে পৌঁছেছিল, তা বোঝা যাবে ক্যাম্পবাসীদের দিন কিভাবে কাটত, তা বর্ণনা করলে। উপেন্দ্র নামে এক ক্যাম্পবাসীর কথা ধরা যাক। দেখা যাক সে সারাটা দিন কিভাবে কাটাত। কুপার্স ক্যাম্পে ৭০ হাজার মানুষের জন্য ৮০টির মতো অস্থায়ী পায়খানা ছিল। সকালবেলা এই রকম একটি অস্থায়ী পায়খানায় ঢোকার জন্য জলের মগ হাতে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যাবে উপেন্দ্রকে। তারপর ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে পচা দুর্গন্ধে ভরা গর্তে কয়েক মিনিট কাটিয়ে বেরিয়ে আসত। এই প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করার জন্য ঝগড়া, গালাগালি এবং অনেক সময় হাতাহাতিও হত। এই পর্ব শেষ হওয়ার পর তাকে বালতি হাতে টিউবওয়েল থেকে জল সংগ্রহ করার জন্য লাইনে দাঁড়াতে হত। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে এই ৭০ হাজার মানুষের জন্য ব্যবহারযোগ্য টিউবওয়েল ছিল মাত্র বিশটি। ফিরে এসে সে একটুকরো রুটিসহ চায়ের গ্লাশে চুমুক দিত। বিগত রাত্রির খাবার থেকে রেখে দেওয়া হয়েছিল এই রুটির টুকরো। চায়ের পর্ব মিটে যাওয়ার পর দ্বিপ্রাহরিক আহারের সময় পর্যন্ত তার আর কোনো কাজ রইল না। ক্যাম্প কমান্ড্যান্টের অনুমতি ছাড়া সে ক্যাম্পের বাইরে যেতে পারবে না। ক্যাম্পের বাইরের জগতে তার কোনো প্রবেশাধিকার নেই। দিনমজুরি, অথবা বাজারে মাছ তরকারি বেচে কিছু রুজি রোজগারের ব্যবস্থা করাও নিষিদ্ধ ছিল। এই ধরণের কোনো কাজ করতে গিয়ে ধরা পড়লে তার শাস্তি ছিল নগদ ও শুকনো ডোল বন্ধ হয়ে যাওয়া। অথচ এই ডোলের ওপরই তাদের বেঁচে থাকা নির্ভর করছিল। ক্যাম্পের বাইরে শ্রমের মূল্যে কিছু উপার্জন করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। ক্যাম্পের ভেতরেও উৎপাদনশীল কর্মের কোনো সুযোগ ছিল না। কেননা এটা ত্রাণশিবির। সরকারকে আগে জেনে নিতে হবে যে উপেন্দ্র আদৌ পুনর্বাসন পাওয়ার যোগ্য কিনা।

আমরা ইতিপূর্বে লক্ষ করেছি যে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দেওয়া হবে কিনা তা স্থির করতে সরকারের দশ বছরের বেশি সময় লেগে গিয়েছিল। সুতরাং উদ্বাস্তুরা যদি পুনর্বাসন পাওয়ার যোগ্য না হয়, তবে তাদের উৎপাদনশীল কর্মে নিয়োগের কোনো প্রশ্ন ওঠে না। তাদের একমাত্র প্রাপ্য ডোল।

সুতরাং সকাল নয়টায় চা এবং বেলা দুটোয় দ্বিপ্রাহরিক আহারের মধ্যবর্তী সময়টা কাটানো সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বেলা নয়টায় বাসি রুটি দিয়ে চা, বেলা দুটোয় ভাত, ডাল ও আলু সহযোগে আহার এবং মাঝখানে ৫ ঘণ্টা সময়। আবার বেলা দুটোয় দুপুরের আহার এবং রাত নয়টায় রাত্রির আহার, তার মধ্যেও ছয় ঘণ্টা সময়। এই এগারো ঘণ্টা সময় বৃথা বয়ে যেত তাস পাশা জুয়া ও আলস্যে। রাত্রির আহারের পর সোজা বিছানায় চলে যেত মশারি থাকলে মশারির নীচে, নয়তো চাদর ও কয়েকটা লাঠি দিয়ে তাঁবুর মতো কোনো রকমে সৃষ্ট একটা আবরণের নীচে। তারই মধ্যে তাদের অলস প্রত্যঙ্গের একটা ব্যবহার তাদের জানা ছিল, যাতে তাদের একটা তীক্ষ্ণ অস্তিত্বের বোধ অনুভব হত। অনেক সময় অন্যের মশারি বা তাঁবুর মতো আবরণের মধ্যেও সে রাত কাটাত। সে যে ভুল করে তা করত, তাও নয়। অনেক সময় তা ছিল স্বেচ্ছাকৃত। কিন্তু তা নিয়ে কেউ প্রশ্ন করত না। একজন প্রাক্তন ক্যাম্পবাসী বর্তমান লেখকের কাছে দুঃখ প্রকাশ করে বলেছিলেন, "আমরা আর মানুষ ছিলাম না। আমাদের আচরণ পশুর মতো হয়ে গিয়েছিল। মাঝে-মাঝেই এই রকম ঘটনা ঘটত। আমরা জানতেও পারতাম না কার মশারির ভেতর কে শুচ্ছে।"

নগ্নতা, ক্ষুধা ও মৃত্যু। প্রত্যেকটি ত্রাণশিবিরের ওপর একটি বিষাদের আচ্ছাদন ছিল। শত শত মানুষ মারা যেত, বিশেষ করে বৃদ্ধ ও শিশুরা। তারা দমবন্ধ হয়ে মরত, পচা আটার শুকনো ডোল খেয়ে মরত, নলকূপের বিষাক্ত পানীয় জল খেয়ে মরত।

সরকারি ত্রাণশিবিরে শিবিরবাসীদের মর্মন্তুদ অভিজ্ঞতার বিবরণ জানতে পেরেছিলাম বিজয় মজুমদারের কাছে। উদ্বাস্তু কলোনিতে গুজব ছড়িয়ে পড়ছিল যে সরকারি ত্রাণশিবিরে হাজার হাজার উদ্বাস্তুর মৃত্যু হচ্ছে এবং মৃতদেহের উপযুক্ত সৎকারও করা হচ্ছে না। সুতরাং ইউ সি আর সি থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে একটি ইউ সি আর সি-র দল এই ব্যাপারে তদন্ত করতে যাবে। এই দলটির সদস্য হলেন বিজয় মজুমদার, অম্বিকা চক্রবর্তী, ডাক্তার নরেশ ব্যানার্জ্জী ও আরো দুজন। কিন্তু সমস্যা হল সরকারী ক্যাম্পে ঢোকার। বাইরের লোকের সরকারী ক্যাম্পে প্রবেশাধিকার ছিল না ইউ সি আর সি-র তো নয়ই। উদ্বাস্তু সংগঠনের প্রতিনিধিদের, কংগ্রেস ছাড়া অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্যদের ক্যাম্পে প্রবেশাধিকার ছিল না। সরকারের লক্ষ্য ছিল কোনোভাবেই যেন বামপন্থীদের ছোঁয়াচ শিবিরবাসীদের গায়ে না লাগে।

সুতরাং কাশীপুর সরকারি ক্যাম্পে ঢোকার জন্য ইউ সি আর সি দলটিকে কৌশলের আশ্রয় নিতে হল। ডাক্তার নরেশ ব্যানার্জির গায়ের রং ছিল ধবধবে শাদা। তিনি শাহেবি পোশাক পরে ইউ সি আর সি দলটিকে নিয়ে কাশীপুর ক্যাম্পের গেটে এসে পৌছন। তারপর শাহেবি কেতায় তার কার্ডটি শান্ত্রীব হাতে দিয়ে তার পেছনে পেছনে দোতলায় কমান্ড্যান্টের ঘরে চলে যান। তার দলের চারজন লোক শান্ত্রীর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে উদ্বাস্তু পরিবারে ভর্তি একতলার হলঘরে ঢুকে পড়েন। হলঘরে ঢুকে তারা একটা ভয়ঙ্কর দৃশ্যের সম্মুখীন হলেন। সেই দৃশ্য দেখে বিজয় মজুমদার হতবাক হয়ে গেলেন। আমার দীর্ঘজীবনে আর আমি কখনো এমন দৃশ্যের সম্মুখীন হইনি। ডজনখানেক উনুনে

দুপুরের রান্না হচ্ছিল। সারাঘর ধোঁয়ায় ভরা। চারিদিকে চিৎকারের শব্দ শোনা যাচ্ছিল—ছোট ছেলেদের প্রচণ্ড চেঁচামেচি, হুড়োহুড়ি, দাপাদাপি, মেয়েদের তীক্ষ্ণ কণ্ঠের প্রতিযোগিতা, অবসন্ন পুরুষদের নিম্নস্বরে কথাবার্তা। এই কোলাহলকে ছাপিয়ে উঠছিল হলঘরের পেছনের দেওয়ালে স্তূপীকৃত মৃত মানুষের ফুলে ওঠা কয়েকডজন শবের দুর্গন্ধ। এই ভয়ংকর দৃশ্য দেখে ইউ সি আর সি-র দলের লোকদের প্রায় মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়ার অবস্থা হয়েছিল। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের বীর নেতা অম্বিকা চক্রবর্তী তো তৎক্ষণাৎ হলঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেই বমি করে দেন। অন্যেরা আরো কয়েক মুহূর্ত থেকে ফুলে ওঠা গলিত শবের ছবি তুলে ছুটে ক্যাম্পের গেটের বাইরে চলে আসেন। যা তারা দেখে এলেন তা তাদের কল্পনাতীত ছিল। এই স্তূপীকৃত গলিত শবের ছবি পরদিন 'স্বাধীনতা'য় বেরোয়।

কুপার্স ক্যাম্প ও ধুবুলিয়া ক্যাম্পবাসী অনেক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকে বিজয় মজুমদারের বর্ণনার যাথার্থ্য প্রমাণিত হয়। নিসেন হাটে থাকার অভিজ্ঞতা আছে এমন একজন কুপার্স ক্যাম্পবাসী জানিয়েছেন যে সকালে নিসেন হাটের বিরাট দরজা খোলার পরে যখন প্রথম সূর্যের আলো আসত, তখন দেখা যেত ডজনখানেক বৃদ্ধ, বৃদ্ধা ও শিশু এই লক্ষ্মীন্দরের বাসরঘরে প্রাণ হারিয়েছে। মৃতদেহগুলিকে প্রতিদিন ঘর থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হত না। নিসেন হাটের পেছনের দেওয়ালে তাদের বেশ কয়েকদিন স্তূপীকৃত করে রেখে দেওয়া হত। প্রতিদিন শবের সংখ্যা বাড়ত, মৃতদেহের স্তূপও আকারে বাড়ত। পচাগলা শবের দুর্গন্ধ ও দৃশ্য ক্রমশ এমন পরিচিত হয়ে গিয়েছিল যে এ নিয়ে কারুর আর মাথাব্যথা ছিল না। মৃতদের জন্য চোখের জলও বিশেষ পড়ত না। ওই দুমড়ানো মোচড়ানো দেহগুলির মুখে মৃত্যুর বিভীষিকাময় বিকৃতির ছাপ আর ভয়েরও উদ্রেক করত না। এই ভয়ানক মৃতদেহগুলি আর এক গাদা কাঠের বেশি কিছু নয়। কেননা কিছুতেই আর কিছু যেত আসত না। ঘরের লোকেরা ঘরকন্নার কাজ করত, রান্না করত, খেত, গল্প করত, শিশুর জন্ম দিত, ঘুমোত। মৃতদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো আগের দিনও তাদের মধ্যে ছিল, আজ তারা অনেকে ওই বিগলিত শবের স্তূপে। অনেক দূরে। তাদের স্থির দৃষ্টি আর জীবিতদের বিদ্ধ করে না। পরদিন জীবিতদের কেউ কেউ ওই বিগলিত শবের স্তূপে ঠাঁই পাবে। কুপার্স ক্যাম্পের নিসেন হাটের, কাশীপুরের হলঘরের অথবা যে কোনো ক্যাম্পের এই ধরণের মর্গের অধিবাসীরা গহ্বরের কিনারায় দাঁড়িয়ে এক চিরন্তন গোধূলির মধ্যে বাস করত। জীবন থেকে মৃত্যু একটি মাত্র পদক্ষেপ। সব ক্যাম্পের নিসেন হাটে অথবা হলঘরে জীবন ও মৃত্যু দুই-ই তার রহস্য হারিয়ে অতিশয় সাধারণ অকিঞ্চিৎকর ও অর্থহীন হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

কুপার্স ক্যাম্পে সপ্তাহে একদিন একটা ট্রাক আসত। স্তূপীকৃত এই শীতল শব নিয়ে যেত ক্যাম্প থেকে কিছুদূরে একটা জঙ্গলের শ্মশানে। সেখানে দেহগুলির যৌথ সৎকার হত। তাও হত আংশিক। শিশুদের শব কবর দেওয়া হত। অনেক সময় তাদের জঙ্গলে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হত। বন্যজন্তুর খাদ্য হত তারা। একটি মৃতদেহের সৎকারের জন্য সরকারি আর্থিক বরাদ্দ ছিল ১৬ টাকা। শবদেহের সৎকারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল কালীবাবুকে। সুতরাং আংশিক ও যৌথ সৎকার হলে তা থেকে বেশ ভালো লাভ হত। শিশুদের ক্ষেত্রে তো পুরোটাই লাভ। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা হায়েনা, শেয়াল ও অন্যান্য বন্যজন্তুর আহার্যে পরিণত হত।

ধুবুলিয়া ক্যাম্পের এক মহিলা লেখকের কাছে চোখের জল ফেলতে ফেলতে

বলেছিলেন : 'বড় দুঃখের দিন গেছে। শত শত শিশু আমাশয়ে মারা গেছে।' এই কথা বলতে বলতে তিনি শিউরে উঠেছিলেন। "গোটা ক্যাম্পে সন্তানহারা নারীর আর্তনাদ। সেসময় থাকলে দেখতে পেতেন রাস্তার দুপাশে সার বেঁধে মৃত শিশু কোলে নিয়ে মেয়েরা কাঁদছে, অপেক্ষা করছে কখন ট্রাক আসবে, মৃত শিশুদের সৎকার করতে নিয়ে যাবে।" দমবন্ধ হয়ে মৃত্যু, পচা আটা খেয়ে, বিষাক্ত জল খেয়ে মৃত্যু, নিসেন হাটে অথবা হলঘরে স্তূপীকৃত শব, যৌথ ও আংশিক সৎকার, বন্যজন্তুর জন্য জঙ্গলে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া শিশু—কুপার্স ক্যাম্প, ধুবুলিয়া ক্যাম্প, কাশীপুর ক্যাম্পে একই চিত্র।

প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকে জানা যায় যে অন্যান্য ক্যাম্পের অবস্থাও একই রকমের ছিল। ক্যাম্প প্রশাসকেরা শুধু তাদের বাঁধাধরা কাজ করে যেতেন। তাদের মনে এই ধারণা হয়েছিল যে এই হাজার হাজার মানুষ যারা ক্যাম্পে পশুর জীবন যাপন করছে, তাদের জন্য কিছু করারও মানে হয় না। এরা কি সত্যিই মানুষ? এদের উদ্যম নেই, সাহস নেই, বেঁচে থাকার জন্য মানসিক দৃঢ়তা নেই। এরা যে শয়ে শয়ে মরবে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। মানুষের অখাদ্য আহার্য ও জল, গ্যাস চেম্বারের মতো থাকার ঘর, ঝঞ্ঝাটের দিনে এসব অস্বাভাবিক নয়। পাঞ্জাবের উদ্বাস্তুদের দিকে তাকিয়ে দেখুন তো। ওরা কি প্রচণ্ড ঝড় ঝঞ্ঝা পেরিয়ে এসেছে। ওরা এখন জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত। অবশ্য একথা কারুরই মনে পড়েনি যে পশ্চিম-পাকিস্তানি উদ্বাস্তুদের ভয়ে সরকারি কর্মচারীদের কাঁটাতারের বেড়ার পেছনে পিল বক্সে বসতে হত। অথচ পূর্বপাকিস্তানি উদ্বাস্তুরা সর্বদা সরকারি কর্মচারীদের ভয়ে তটস্থ হয়ে থাকত। যে কোনো মুহূর্তে ডোল বন্ধের শাস্তির খড়্গ নেমে আসতে পারত।

বন্দুকবাজ পশ্চিম-পাকিস্তানি উদ্বাস্তুদের প্রতি বেশ স্বাস্থ্যপ্রদ শ্রদ্ধা ছিল নেহরুর। তিনি জানতেন এদের সম্পূর্ণ পুনর্বাসন তাঁর ক্ষমতায় থাকার পূর্বশর্ত। ৪০ লক্ষ বন্দুকবাজ পাঞ্জাবি উদ্বাস্তু এবং সৈন্যবাহিনীতে তাদের স্বজনদের উপেক্ষা করার ক্ষমতা ছিল না নেহরুর। পশ্চিম-পাকিস্তানি উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য তিনি নবজাত ভারতরাষ্ট্রের সমগ্র ঐশ্বর্য নিয়োজিত করেন। তাতে নেহরুর শাসন নিরাপদ হয়।

পূর্ববঙ্গকে ভারত থেকে কেটে বাদ দিয়ে দিতে নেহরুর যে কোনো বিবেকি বাধা ছিল না, তা বোঝা যায় ১৯৪৬-এর শেষে রামমনোহর লোহিয়ার সঙ্গে তাঁর যে কথাবার্তা হয়েছিল, তা থেকে। ১৯৫৯-এর ২৫মে একটি প্রবন্ধে রামমনোহর লোহিয়া এই কথাবার্তার স্মৃতিচারণ করেন[১] : পূর্ববঙ্গের সর্বত্র গাছপালা, ঝোপঝাড়, জল নেহরুর চোখে পড়েছিল। তিনি মূল ভারতীয় ভূখণ্ড থেকে পূর্ববঙ্গ ছেঁটে ফেলে দেওয়ার কথা বেশ জোর দিয়ে বলছিলেন। এই ভারতবর্ষকে তিনি অথবা লোহিয়া চেনেন না? তিনি আরো বলতে পারতেন, এই বাঙালিদেরও তিনি চেনেন না। তারা কোনোমতেই উত্তর ভারতীয়দের মতো নয়। তাদের আকৃতি, প্রকৃতি, আচার-আচরণ, বেশবাস কিছুই উত্তর পশ্চিম ভারতীয়দের সঙ্গে মেলে না। মধ্যযুগীয় মুসলমান ইতিহাসকাররা বাংলাকে "ভালো জিনিশে বোঝাই নরক" বলে বর্ণনা করেছেন। ভালো জিনিশ আছে, সন্দেহ নেই। পাট আছে, কয়লা আছে, চা আছে। কিন্তু ভালো লোক নেই। বাঙালিরা একটা ঝগড়াটে অবাধ্য জাতি।

১ রামমনোহর লোহিয়ার প্রবন্ধ, Guilty Men of Partition, quoted in Organiser, 1 June 1989

অষ্টম অধ্যায়

# ক্যাম্প উদ্বাস্তুদের সত্যাগ্রহ

ক্যাম্পের উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দেওয়ার কোনো সুচিন্তিত পরিকল্পনা সরকারের ছিল না। ১৯৫৫ নাগাদ ও তারপর থেকে ভারত সরকার যুক্তিসহ ভিত্তিতে পূর্ব-পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের সমস্যা সমাধানের কথা ভাবতে থাকে। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৫ পর্যন্ত সরকারের আশা ছিল যে উদ্বাস্তুরা দেশে ফিরে যাবে। সুতরাং এসময়ে বায়নানামা পরিকল্পনায় কিছু পরিবারকে সাহায্য দেওয়া হয়েছিল যারা সরকারি ঋণ নিয়ে জমি কিনে নিজেদের ঠাঁই করে নিয়েছিল। রাজ্য পুনর্বাসন দপ্তর কিছু পরিবারকে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের হাতে তুলে দেয়। ইউনিয়ন বোর্ড অথবা পরিবর্ত ইউনিয়ন বোর্ড পরিকল্পনায় তাদের পুনর্বাসনের জন্য সরকার তাদের কোনো অর্থ দেয়নি। নিজেদের টাকা দিয়ে তাদের জমি কিনে নেওয়ার কথা ছিল। অনেক সময় টাকা থাকলেও চাষযোগ্য জমি পাওয়া যায়নি। অথবা জমি পাওয়া গেলেও জমিতে ফসল ফলাবার জন্য যে সময় প্রয়োজন, সে সময়ের জন্য জীবিকানির্বাহের অর্থ ছিল না তাদের। শেষ পর্যন্ত তাদের জমি ফেলে চলে আসতে হয়। বিহার ও ওড়িশাতে যে সব উদ্বাস্তুদের পাঠানো হয়েছিল, তাদের জন্যও সরকারের কোনো পুনর্বাসন পরিকল্পনা ছিল না। তাদের সেখানে পাঠানো হয়েছিল কারণ, পশ্চিমবঙ্গে তারা অতিরিক্ত, বাড়তি মানুষ। অনুরূপভাবে লক্ষণীয় যে পশ্চিমবঙ্গের ক্যাম্পবাসীদের যখন দণ্ডকারণ্যে পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিল সরকার, তখনো দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনার প্রতিবেদন প্রস্তুত হয়নি; মানা ও অন্যান্য স্থানের বিশ্রাম শিবির এমনকী পুনর্বাসনের স্থানে যাওয়ার রাস্তাও তৈরি হয়নি।

তাহলে আসল কথা দাঁড়াল এই যে ১৯৪৬ থেকে উদ্বাস্তুরা পশ্চিমবঙ্গে আসতে শুরু করেছে। যারা এসেছে তাদের ২৫ শতাংশ সরকারি ক্যাম্পে আশ্রয় নিয়েছে। তাদের আদৌ পুনর্বাসন দেওয়া হবে কিনা ১৯৫৫ পর্যন্ত ভারত সরকার তা স্থির করে উঠতে পারেনি।

স্বভাবতই বায়নানামা পরিকল্পনা, ইউনিয়ন বোর্ড পরিকল্পনা ও পরিবর্ত ইউনিয়ন বোর্ড পরিকল্পনা অনুযায়ী যেসব ক্যাম্পে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল, শেষ পর্যন্ত তারা সেখানে থাকতে পারেনি। তারা সেখান থেকে পালিয়ে এসেছিল। পুনর্বাসনের স্থান থেকে পালিয়ে আসা এই সব উদ্বাস্তুদের কাছে এই পরিকল্পনা নিষ্ঠুর পরিহাস বলেই মনে হয়েছিল। কিন্তু পালিয়ে আসা এই সব উদ্বাস্তুদের নিয়ে কোনো প্রচণ্ড শোরগোল হয়নি। শুধু এদের জীবনের যন্ত্রণা কিছু বেড়েছিল।

কিন্তু যেসব উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবঙ্গের বাইরে বিহার, ওড়িশা ইত্যাদি রাজ্যে পাঠানো হয়েছিল, তারা অনেকে এইসব ক্যাম্পের বিশেষত বিহারের বেতিয়া ক্যাম্পের জীবনের নরকযন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে পশ্চিমবঙ্গে পালিয়ে আসে। বেতিয়া ক্যাম্পত্যাগী

পশ্চিমবঙ্গে চলে আসা উদ্বাস্তুরা যে সত্যাগ্রহ আন্দোলন করে, তা ক্যাম্পবাসী উদ্বাস্তুদের প্রথম সরকার বিরোধী আন্দোলন বলা যেতে পারে। বেতিয়া ক্যাম্পত্যাগী উদ্বাস্তুদের সরকার বিরোধী সত্যাগ্রহ বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।

## বেতিয়া ক্যাম্পত্যাগী উদ্বাস্তুদের সত্যাগ্রহ : ১৯৫৭

বিহারের বেতিয়া ক্যাম্পকে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের সবচেয়ে বড় ক্যাম্প বলা যেতে পারে। উদ্বাস্তুরা এদেশে আসার পর থেকে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার এই সিদ্ধান্তে পৌঁছয় যে পশ্চিমবঙ্গে বিপুলসংখ্যক উদ্বাস্তুর জায়গা হবে না, সুতরাং উদ্বাস্তুদের একটি বৃহদংশকে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে—বিহার, ওড়িশা, আসাম, ত্রিপুরা ও উত্তর ভারতের বহু জায়গায় ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বিহারের চম্পারণ জেলার বেতিয়ায় ছিল পশ্চিমবঙ্গের বাইরে উদ্বাস্তুদের বৃহত্তম ক্যাম্প। এই ক্যাম্পে উদ্বাস্তুদের সংখ্যা প্রায় ৭০,০০০-এ পৌঁছে গিয়েছিল, বেতিয়া ক্যাম্প পশ্চিমবঙ্গের কুপার্স ক্যাম্পের সঙ্গে তুলনীয়। কারণ কুপার্স ক্যাম্পেও উদ্বাস্তুদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৭০,০০০। পশ্চিমবঙ্গের ভেতরে ও বাইরে সব উদ্বাস্তু ক্যাম্পই কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল।

যেসব উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবঙ্গের বাইরে বিভিন্ন রাজ্যে ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল, সেখানে তাদের পুনর্বাসনের কোনো নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছিল না। স্পষ্টতই সরকারের উদ্দেশ্য ছিল এই বিপুলসংখ্যক ক্ষুধার্ত ও দাহ্য উদ্বাস্তুকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া, পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিকে উদ্বাস্তুবিহীন করে দেওয়া। ১৯৫১-র উচ্ছেদ আইনের বিরুদ্ধে উদ্বাস্তু আন্দোলন এবং ১৯৫২-র নির্বাচনের পরিণাম থেকে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে উদ্বাস্তু উপাদানের গুরুত্ব বোঝা গিয়েছিল। কিন্তু ১৯৫২-তে উদ্বাস্তু নেতৃত্ব উদ্বাস্তুদের একটি খণ্ড অংশকেই রাজনীতিতে নিয়ে আসতে পেরেছিলেন। এরা জবরদখল কলোনির উদ্বাস্তু। তবু এই জবরদখল কলোনির উদ্বাস্তুরাই পশ্চিমবঙ্গের একটা নতুন মোচড় দিয়েছিল। রাজনীতিতে নতুন আবেগের সঞ্চার
।।

ক্যাম্পের উদ্বাস্তুরা তখনো রাজনীতির বাইরে। কিন্তু ক্যাম্পকে রাজনীতি স্পর্শ করেনি, তাও বলা চলে না। খবর পাওয়া যাচ্ছিল ক্যাম্পের উদ্বাস্তুরা রেললাইনে বসে ট্রেন চলাচল বন্ধ করে দিচ্ছে, ধুবুলিয়া ও কুপার্স ক্যাম্পে পুলিশের গুলি চলেছে। ক্যাম্পগুলির ভেতরে একটা মন্থন চলছিল। ক্যাম্পের অফিসারদের অবৈধ ও স্বৈরাচারী কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে ক্যাম্পবাসীরা তাদের নিজস্ব সংগঠন গড়ে তোলে। উদ্বাস্তু নেতৃবৃন্দ ক্ষমতার এই নতুন উৎসকে ব্যবহার করবার চেষ্টা করবে তা স্বাভাবিক। সুতরাং বামপন্থীরা তাদের গ্রাস করে রাস্তায় নিয়ে আসার আগেই সরকার তাদের পশ্চিমবঙ্গ থেকে অন্যত্র সরিয়ে দেওয়ার কথা ভেবেছিল। নয়তো তারা বামপন্থীদের শিকার হবে এবং সরকারের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠবে। একমাত্র একথা মনে রাখলেই উদ্বাস্তুদের তড়িঘড়ি অন্যান্য রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পাঠিয়ে দেওয়ার অর্থ বোঝা যায়। তাদের জন্য সরকারের কোনো পুনর্বাসন পরিকল্পনা ছিল না। উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য ওড়িশা সরকার যে পতিত জমি দিতে চেয়েছিল, তা উদ্ধার করা সম্ভব ছিল না। শুধু তাই নয়, সেই জমি বাসযোগ্যও ছিল না। বিহার সরকারও ওই একইরকমের জমি দিতে

চেয়েছিল। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের ক্যাম্প থেকে অন্য রাজ্যের ক্যাম্পে উদ্বাস্তুদের পাঠানোর অর্থ ছিল একটি বন্দীশিবির থেকে অন্য বন্দীশিবিরে স্থানান্তরণ।

বেতিয়া ক্যাম্পবাসীদের জীবনও ছিল পশ্চিমবঙ্গের ক্যাম্পবাসীদের জীবনের মতো। ঠিক তাও বলা চলে না। জীবন কঠিনতর হয়েছিল। ডোল সময়মতো পাওয়া যেত না। ক্যাম্পবাসীরা বুঝতে পেরেছিল যে তাদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসন দেওয়ার কোনো পরিকল্পনা নেই। ক্যাম্পের অফিসাররা নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন। ক্যাম্পবাসীদের তারা কীটপতঙ্গের মতো দেখত। নানারকমের অসুখে ভুগছিল তারা। অথচ তাদেব চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থাই ছিল না বলা চলে, তার ওপর ছিল সংকীর্ণ প্রাদেশিকতা। কর্তৃপক্ষ স্থানীয় মানুষদের মধ্যে এই ধারণা জন্মে দিয়েছিল যে উদ্বাস্তু পঙ্গপাল চলে আসায় স্থানীয় মানুষ দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হয়ে উঠবে। সুতরাং স্থানীয় দরিদ্র মানুষের মনে উদ্বাস্তুদের প্রতি ঘৃণা জন্মে উঠছিল।

ক্রমশ বেতিয়া উদ্বাস্তুদের হতাশায় পেয়ে বসল। তারা অপুষ্টিতে, অনাহারে, রোগে মরছিল। তাই তারা ঠিক করল যদি মরতেই হয়, তবে বেতিয়ার ঘৃণার পরিমণ্ডলেব মধ্যে না মরে পশ্চিমবঙ্গে গিয়ে আত্মীয়পরিজনদের মধ্যে মরাই ভালো। শেষ পর্যন্ত ১৫ হাজার উদ্বাস্তু বেতিয়া ক্যাম্প ছাড়ে। তারা যখন চলে আসতে থাকে তখন বিহার সরকার রেডিওতে ঘোষণা করে যে ক্যাম্পের অব্যবস্থা দূর করার জন্য উদ্বাস্তুদের দাবি মেনে নেওয়া হবে। কিন্তু উদ্বাস্তুদের অভিজ্ঞতা বলছিল এই সরকারি প্রতিশ্রুতির কোনো মূল্য নেই। অতএব পলায়মান উদ্বাস্তুরা আর বেতিয়া ক্যাম্পে ফিরে গেল না।

বেতিয়ায় পুনর্বাসনের কোনো ব্যবস্থা হবে এমন ভরসা ছিল না উদ্বাস্তুদের। উদ্বাস্তুদের ৭০ শতাংশ কৃষিজীবী। তাদের পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজনীয় জমি ছিল না বেতিয়ায়। যে জমি ছিল তা উদ্বাস্তুদের মধ্যে বিতরণ করলে স্থানীয় কৃষকেরা তাদের কাছ থেকে তা কেড়ে নিত।

১৯৫৭-র প্রথম দিকে বেতিয়া ক্যাম্প ছেড়ে আসা ১৫ হাজার উদ্বাস্তু হাওড়া স্টেশনে এসে আশ্রয় নেয়। কিন্তু এত মানুষের স্থান সংকুলান হাওড়া স্টেশনে সম্ভব ছিল না। অতএব হাওড়া স্টেশন থেকে তারা শিয়ালদহ স্টেশনে ও হাওড়া ময়দানে ছড়িয়ে পড়ে। এরপর নিছক বেঁচে থাকার তাগিদে তারা ইউ সি আর সি-র শরণাপন্ন হয়। ইউ সি আর সি যে বেতিয়া উদ্বাস্তুদের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিল তার পেছনে ছিল নিছক মানবিকতাবোধ।

বেতিয়ার পলাতক উদ্বাস্তুরা পশ্চিমবঙ্গে মরতে এসেছে। প্রতিদিন প্রায় ৬ জন উদ্বাস্তুর মৃত্যু হচ্ছিল। প্রথম দশ দিনেই ৬০ জন উদ্বাস্তু অনাহারে ও রোগে ভুগে মারা যায়। ইউ সি আর সি-র প্রাথমিক দায়িত্ব ছিল উদ্বাস্তুদের জন্য খাদ্য ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

সাধারণভাবে বেতিয়া উদ্বাস্তুদের সমস্যা ছিল প্রথমত ত্রাণ ও দ্বিতীয়ত অবিলম্বে তাদের পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসন দান। বেতিয়া উদ্বাস্তুদের ব্যাপারে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি বিশেষভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে। সি পি আই-এর জেলা কমিটি ১৯৫৭-র ১৫ এপ্রিল সভা ডেকে এই প্রস্তাব গ্রহণ করে যে ২১ ও ২৪ এপ্রিল ইউ সি আর সি ও সি পি আই পরিচালিত পিপলস্ রিলিফ কমিটি যৌথভাবে বেতিয়ার উদ্বাস্তুদের জন্য কলকাতায় অর্থসংগ্রহ করবে এবং ১৭ এপ্রিল পাঁচটি বড় বামদলের প্রতিনিধিরা ডঃ রায়ের সঙ্গে দেখা করবেন। ১৯ এপ্রিল বিভিন্ন উদ্বাস্তু সংগঠনের নেতৃত্বে একটি সভা ডাকা হবে এবং

প্রয়োজন হলে আইন অমান্য আন্দোলনের মধ্য দিয়ে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নামার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে।

১৭ এপ্রিল বামপন্থী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ডঃ রায়ের যে আলোচনা হয়, তা ডঃ রায়ের চরিত্রে নতুন আলোকপাত করে। ডঃ রায় বেতিয়ার উদ্বাস্তুদের মৃত্যুময় অস্তিত্বে করুণায় অভিভূত হয়েছিলেন। অথচ যেহেতু তারা কর্তৃপক্ষকে না জানিয়ে ক্যাম্প ত্যাগ করে এসেছে, তাই তাদের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে চাপ দেওয়ার কোনো উপায় ছিল না। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারকে লিখলে তার একমাত্র উত্তর আসত : আগে উদ্বাস্তুরা বেতিয়া ক্যাম্পে ফিরে যাক, তারপর তাদের কথা ভাবা যাবে। অথচ কলকাতা এসে উদ্বাস্তুরা অনাহারে, রোগেভুগে মরবে, এও ডঃ রায়ের কাছে সহনীয় ছিল না। সুতরাং বামপন্থী নেতৃবৃন্দ যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন তখন তিনি বেতিয়ার উদ্বাস্তুদের উদ্ধারের জন্য একটি পরিকল্পনা ছকে দিলেন। এই ধরণের পরিকল্পনা যে ডঃ রায়ের কাছ থেকে আসতে পারে, তা বাম নেতৃবৃন্দের চিন্তার বাইরে ছিল। ডঃ রায় বেতিয়ার মৃত্যুপথযাত্রী উদ্বাস্তুদের নিয়ে কী করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। কেন্দ্রীয় সরকার ক্যাম্পত্যাগীদের কোনো সহায়তা করবে না। স্বেচ্ছাব্রতী কিছু সংগঠনের সহায়তায় এদের সমস্যার সমাধান হবে না। ডঃ রায় বামপন্থী নেতাদের বললেন যে এই অবস্থায় সমস্যার সমাধানের মতো পরিস্থিতি একমাত্র তাঁরাই সৃষ্টি করতে পারেন। কিন্তু তা কিভাবে সম্ভব? তাঁরা বেতিয়ার উদ্বাস্তুদের সমস্যা সমাধানের জন্য সংঘবদ্ধ আন্দোলন করে এমন চাপ সৃষ্টি করতে পারেন যাতে ডঃ রায় কেন্দ্রীয় সরকারকে জানাতে পারেন যে বেতিয়ার উদ্বাস্তুদের সমস্যার সমাধান না হলে পশ্চিমবঙ্গের শান্তি ও শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হবে। আন্দোলন কিভাবে পরিচালিত হবে তারও একটি পরিকল্পনা তিনি নেতৃবৃন্দকে বলে দিলেন। প্রথমত সরকারের কাছে তাঁরা একটি স্মারকলিপি দেবেন। তাতে বলা হবে যে সরকার যদি এই স্মারকলিপি প্রাপ্তির তিন দিনের মধ্যে বেতিয়া উদ্বাস্তুদের দাবিদাওয়া না মেটায় তবে তাঁরা সরকারের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নামবেন। ইতিমধ্যে ক্ষুধার্ত উদ্বাস্তুদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য ২১ ও ২৪ এপ্রিল কলকাতা শহর জুড়ে উদ্বাস্তু ত্রাণের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা হবে।

বামপন্থী নেতারা বুঝতে পারলেন যে বেতিয়ার পলাতক উদ্বাস্তুদের সমস্যা সমাধানের জন্য ডঃ রায় তাদের সহযোগিতা চাইছেন। ডঃ রায় জানতেন যে এ ব্যাপারে তিনি তাঁর দলীয় লোকদের সাহায্য পাবেন না। কারণ এই পলাতক মানুষগুলির জন্য পশ্চিমবঙ্গের মানুষের বিশেষ সহানুভূতি ছিল না। তাই তিনি সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টির জন্য বিরোধীদের আহ্বান জানান। এছাড়া তিনি আর কীই-বা করতে পারতেন? বেতিয়া ক্যাম্পের নারকীয় জীবন সহ্য করতে পারেনি বলে উদ্বাস্তুরা চলে এসেছে—শুধুমাত্র এই অপরাধেই তিনি তাদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে পারেন না।

বামপন্থী নেতৃবৃন্দ সঙ্গে সঙ্গে কাজে নেমে পড়েন। ডঃ রায় আন্দোলনের কথা বলেছেন। এই আন্দোলন করা হবে এবং শুধু লোক দেখানো ব্যাপার হবে না। বামপন্থীরা যদি এই আন্দোলনের মাধ্যমে কিছু রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা আদায় করে নেয়, তবে তাতেও ডঃ রায়ের কোনো আপত্তি ছিল না।

এই সাক্ষাৎকারের পর দ্রুত ঘটনা ঘটতে থাকে। ইউ সি আর সি অবিলম্বে আন্দোলনে নেমে পড়ে। সভা, বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হতে থাকে। কিন্তু এই আন্দোলন শুধুমাত্র ইউ সি আর সি-র ব্যাপার নয়। তাই এই আন্দোলন পরিচালনার

জন্য একটি নতুন পরিকাঠামো তৈরি করা হল। সব বামপন্থী সংগঠন এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করবে। অতএব সব বামদলের প্রতিনিধি নিয়ে একটি কর্ম সমিতি (Action Committee) গঠন করা হল।

আন্দোলনের পূর্বপ্রস্তুতি হিশেবে কর্মসমিতির সদস্যরা প্রথম কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী কে সি খান্নার সঙ্গে দেখা করে বেতিয়ার উদ্বাস্তুদের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন ত্রাণের দাবি করেন। তাছাড়া কোন পরিস্থিতিতে তারা বেতিয়া ক্যাম্প ছেড়ে চলে এসেছে তা খতিয়ে দেখার জন্য একটি যৌথ অনুসন্ধান কমিটি গঠনের প্রস্তাব করেন। খান্না কর্মসমিতির প্রস্তাবে রাজি হননি। এবার কর্মসমিতি দাবি করল যে বেতিয়ার উদ্বাস্তুদের বেতিয়ায় ফেরত পাঠাবার প্রয়োজন নেই। পশ্চিমবঙ্গেই তাদের পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব। পুনর্বাসনমন্ত্রী জানালেন যে এ ব্যাপারে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা না করে কিছুই বলতে পারবেন না।

এভাবে প্রাথমিক পর্ব শেষ হল। স্থির হল সত্যাগ্রহ করে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু করা হবে। ৫ মে থেকে প্রতিদিন ওয়েলিংটন স্কোয়ারে অথবা কলেজ স্কোয়ারে বেতিয়ার উদ্বাস্তুদের নিয়ে মিটিং করা হবে এবং মিটিঙের শেষে মিছিল করে ১৪৪ ধারা লঙ্ঘন করে উদ্বাস্তুরা গ্রেপ্তার বরণ করবে।

সব গুরুত্বপূর্ণ বাম রাজনৈতিক দল ও অন্যান্য প্রগতিশীল সংগঠনের প্রতিনিধি নিয়ে কর্মসমিতি গঠিত হয়েছিল। ইউ সি আর সি-র ছিলেন অম্বিকা চক্রবর্তী, প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী, অনিল সিংহ, জীবনলাল চ্যাটার্জি। অন্যান্য রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন হেমন্তকুমার বোস, ডঃ এস সি ব্যানার্জি প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। বেতিয়ার উদ্বাস্তুদের ওপর বিশেষ প্রভাব ছিল অপূর্বলাল মজুমদারের। তিনি ছিলেন কর্মসমিতিতে বেতিয়ার উদ্বাস্তুদের মুখপাত্র। বেতিয়ার উদ্বাস্তুদের অধিকাংশই আশ্রয় নিয়েছিল হাওড়া ময়দানে। কিছু উদ্বাস্তু চলে গিয়েছিল শিয়ালদহ স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে।

সত্যাগ্রহ আন্দোলনের যে কর্মসূচি স্থির হল তা ছিল এইরকম : বিভিন্ন এলাকা থেকে উদ্বাস্তুরা ওয়েলিংটন স্কোয়ারে অথবা মনুমেন্ট ময়দানে এসে জমায়েত হবে। একটি সংক্ষিপ্ত সভার শেষে সত্যাগ্রহীদের মাল্যভূষিত করা হবে। তারপর সত্যাগ্রহীদের মিছিল এসপ্ল্যানেড ইস্ট ও ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিটের সংযোগস্থলে পুলিশ অবরোধ ভেদ করে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে। পুলিশ তাদের পুলিশভ্যানে তুলে নেবে। এই হল সত্যাগ্রহের একটি দিন। এভাবেই দিনের পর দিন সত্যাগ্রহ চলতে থাকল। ১৯৫৪ থেকে ১৯৫৯ পর্যন্ত বামপন্থীরা যত সত্যাগ্রহ করেছিল, সব সত্যাগ্রহেরই এই এক চেহারা।

সত্যাগ্রহীদের নামের তালিকা আগে থেকেই প্রস্তুত করা হত। ৪ মে সত্যাগ্রহ শুরু হয়। সভাশেষে মাল্যভূষিত হয়ে ১৪৬ জন উদ্বাস্তু ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট ও এসপ্ল্যানেড ইস্টের সংযোগস্থলে পুলিশ অবরোধ ভেঙে গ্রেপ্তার বরণ করে। তারা স্লোগান দিতে থাকে : অনাহার থেকে বাঁচবার জন্য খাদ্য দাও, বাসস্থান দাও, নইলে জেলে নিয়ে যাও। যাদের গ্রেপ্তার করা হল তাদের মধ্যে অম্বিকা চক্রবর্তী, সনৎ চ্যাটার্জি ও সুবীর ঘোষকে লালবাজার সেন্ট্রাল লক্ আপে রাখা হল। অন্যান্যদের জেলে পাঠানো হল।

এভাবে দিনের পর দিন জীর্ণ-শীর্ণ প্রেতের মতো উদ্বাস্তুদের মিছিল ওয়েলিংটন স্কোয়ার থেকে এসপ্ল্যানেড ইস্টে গিয়ে হাসিমুখে গ্রেপ্তার বরণ করত। হাসিমুখ তার কারণ হাওড়া ময়দানে, শিয়ালদহ প্ল্যাটফর্মে না খেয়ে উদ্বাস্তুরা মরছিল। জেলে যে

কয়দিন থাকবে দুবেলা খাবার জুটবে। অনাহারে থাকতে হবে না। এই ক্ষুধার্ত মৃত্যুপথযাত্রী মানুষগুলির কাছে জেল এখন কাঙ্ক্ষিত স্থান। জেল নিশ্চিন্ত আশ্রয়। সেখানে কয়েকদিন থেকে আসা ভাগ্যের ব্যাপার। কিন্তু যাদের গ্রেপ্তার করা হত তাদের সবাইকে জেলে পাঠানো হত না। অনেককেই তাদের আকাঙ্ক্ষিত জেলের গেটেই ছেড়ে দেওয়া হত। স্বল্পসংখ্যক লোকই কয়েকদিনের জন্য জেলে থাকার সুযোগ পেত। সপ্তাহখানেক সত্যাগ্রহ চলার পর সরকার নতুন কৌশল অবলম্বন করল। রাতের অন্ধকারে সত্যাগ্রহীদের শহর থেকে ২০-২৫ কিলোমিটার দূরে নিয়ে গিয়ে কোনো নির্জনস্থানে পুলিশভ্যান থেকে নামিয়ে দেওয়া হত।

কর্মসমিতির আশা ছিল যে খাদ্য ও বাসস্থানের জন্য হাজার হাজার উদ্বাস্তুর জেলে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা দেখে কলকাতাবাসীর মনে কিছুটা করুণার সঞ্চার হবে। তা হয়নি। জনগণের সক্রিয় সমর্থন ছাড়া এই আন্দোলন সফল হবে না, ক্রমে তা স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। অথচ বেতিয়ার উদ্বাস্তুদের প্রতি পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কোনো সহানুভূতি ছিল না। অতএব তাদের সত্যাগ্রহের প্রতি সমর্থনেরও কোনো প্রশ্নই ছিল না। তাই পরিস্থিতিতে সিপিআই পশ্চিমবঙ্গে একটি বৃহত্তর খাদ্য আন্দোলন শুরু করে তার সঙ্গে বেতিয়ার উদ্বাস্তুদের যুক্ত করতে চাইল। অপূর্বলাল মজুমদার ছিলেন বেতিয়ার উদ্বাস্তুদের মুখপাত্র। বেতিয়ার উদ্বাস্তুরা পুরোপুরি তাঁর প্রভাবাধীন ছিল। তিনি একটি বৃহত্তর খাদ্য আন্দোলনের সঙ্গে উদ্বাস্তুদের সত্যাগ্রহকে যুক্ত করার বিরোধিতা করলেন। কেননা বৃহত্তর খাদ্য আন্দোলনের সঙ্গে উদ্বাস্তু সত্যাগ্রহ যুক্ত হলে, উদ্বাস্তুদের সমস্যার সমাধান হবে না। অন্যদিকে ডঃ রায়ও চাননি সিপিআই উদ্বাস্তু আন্দোলনকে বৃহত্তর খাদ্য আন্দোলনের পথে নিয়ে যাক। বৃহত্তর খাদ্য আন্দোলন হলে উদ্বাস্তুদের সমস্যার সমাধান তো হবেই না, উদ্বাস্তুদের মৃত্যু অনিবার্য হয়ে উঠবে। ডঃ রায় বিরোধী নেতৃবৃন্দের সাহায্য চেয়েছিলেন বেতিয়ার উদ্বাস্তুদের বাঁচাবার জন্য, তাদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেবার জন্য নয়। অপূর্বলাল মজুমদার স্বয়ং নমশূদ্র এবং নমশূদ্র বেতিয়া উদ্বাস্তুদের তিনি অবিসংবাদিত নেতা। তিনি এই উদ্বাস্তুরা বেতিয়া ছেড়ে এসে যে মৃত্যু ফাঁদে ধরা পড়েছে তা থেকে তাদের রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। তিনি জানতেন সিপিআই-এর খাদ্য আন্দোলনের মধ্যে জড়িয়ে পড়লে এদের কোনোক্রমেই বাঁচানো যাবে না। উদ্বাস্তুদের নেতা অপূর্বলাল মজুমদার ডঃ রায়েরও মুখপাত্র হয়ে উঠলেন। বিরোধী নেতৃবৃন্দ জানতেন যে অপূর্বলাল মজুমদারের সহযোগিতা ছাড়া উদ্বাস্তু সত্যাগ্রহ একদিনও চালানো যাবে না। কেননা, মজুমদারের ইঙ্গিত ছাড়া একজন সত্যাগ্রহীও পাওয়া যাবে না।

ডঃ রায় চাইছিলেন বেতিয়ার উদ্বাস্তুদের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বেতিয়া শিবিরের মানোন্নয়ন এবং সেখানকার উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দিতে কেন্দ্রীয় সরকারকে বাধ্য করতে। তাহলে বেতিয়াতে উদ্বাস্তুদের ফেরত পাঠানো সম্ভব হবে এবং এই প্রত্যাবর্তনও অর্থবহ হয়ে উঠবে। একই কথা চিন্তা করছিলেন অপূর্বলাল মজুমদার। অতএব মজুমদারের পক্ষে কর্মসমিতিতে বিধান রায়ের মুখপাত্র হয়ে ওঠাটা স্বাভাবিক ছিল। ডঃ রায়ও তাঁর মাধ্যমে উদ্বাস্তু আন্দোলনকে নিয়মতান্ত্রিক পথে পরিচালিত করে উদ্বাস্তুরা যাতে সি পি আই-এর রাজনৈতিক আন্দোলনের হাতিয়ার না হয়ে ওঠে তার ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন।

এক সপ্তাহের মধ্যে এই আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটল। কর্ম সমিতি হেমন্ত বসুকে

বেতিয়া উদ্বাস্তুদের অবস্থার উন্নতির জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানাতে দিল্লি পাঠালেন। হেমন্ত বসুর দিল্লি যাত্রা ব্যর্থ হল। সিপিআই সাংসদ রেণু চক্রবর্তী দিল্লি থেকে এসে কর্মসমিতিকে জানালেন যে ক্যাম্পত্যাগী উদ্বাস্তুদের বেতিয়া ফিরে যেতে হবে; কারণ তারা বিনা নোটিশে ক্যাম্প থেকে চলে এসেছে। কর্মসমিতি দুটি দাবি উত্থাপন করল: (১) বেতিয়া ক্যাম্প সম্পর্কে যৌথ অনুসন্ধান এবং (২) পলাতক উদ্বাস্তুদের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন ত্রাণ দান। এই দুটি দাবি পূরণ করা হলে কর্মসমিতি আন্দোলন প্রত্যাহার করবে।

ডঃ বিধান রায়ের পরিচয়পত্র নিয়ে অপূর্বলাল মজুমদার তিনজন সহকর্মী সহ বেতিয়া ঘুরে এলেন। তিনি ফিরে এসে তাঁর প্রতিবেদনে জানালেন যে বেতিয়া উদ্বাস্তুদের ফেরত পাঠাবার আগে বেতিয়া ক্যাম্পের মানোন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিতে হবে সরকারকে।

৩০ মে কর্মসমিতির এক সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে, বেতিয়া উদ্বাস্তুদের ফেরত পাঠাবার ব্যবস্থা করতে অপূর্বলাল মজুমদার মুখ্যমন্ত্রী ও উদ্বাস্তু দলনেতাদের সঙ্গে আলোচনা করবেন। বেতিয়া উদ্বাস্তু নেতাদের বেতিয়া ফিরে যাবার শর্ত হল · দুমাসের বকেয়া ক্যাশডোল দেওয়া হলে তারা বেতিয়া ফিরে যাবে। পুনর্বাসন মন্ত্রী খান্নার সঙ্গে ডঃ রায় ফোনে যোগাযোগ করলেন। তিনি বকেয়া ক্যাশডোল দিতে রাজি হলেন। কেন্দ্রীয় সরকার ও বিহার সরকার ক্যাম্পের মানোন্নয়নের জন্য কিছু ব্যবস্থা গ্রহণে স্বীকৃত হল। তা হল:(১)শিবিরের মানোন্নয়ন, (২)১৯৫৮-র মার্চের মধ্যে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দান, (৩) ২০ শতাংশ ক্যাশডোল বৃদ্ধি, (৪) ন্যায্যমূল্যের রেশন দোকান চালু করা এবং (৫) দুটি শিক্ষণ শিবির সহ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করা। ডঃ রায় সমস্ত বন্দী সত্যাগ্রহীকে মুক্তি দিলেন এবং উদ্বাস্তুদের বেতিয়া ফিরে যাবার জন্য বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করলেন। শেষ পর্যন্ত ৬ জুন সত্যাগ্রহ প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নিল কর্মসমিতি।

অধিকাংশ পলাতক উদ্বাস্তুই বেতিয়া ফিরে গেল কিন্তু সকলেই নয়। কলকাতা ও তার শহরতলীতে কিছু কিছু বেতিয়ার উদ্বাস্তু থেকে গেল। যারা ফিরে গেল তাদের অবস্থা আগের থেকে ভালো হল একথা বলা যাবে না। শিবিরের মানোন্নয়নের যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, পুনর্বাসনদানের ব্যবস্থা করার যে কথা হয়েছিল তার প্রায় কিছুই হয়নি। কেন্দ্রীয় সরকার ও বিহার সরকার তাদের প্রতিশ্রুতি বেমালুম ভুলে গিয়েছিল। উদ্বাস্তুরা যখন সেই প্রতিশ্রুতি পালনের দাবি জানাতে থাকে তখন কেন্দ্রীয় ও বিহার সরকার এমন ভাব দেখাতে থাকে যেন কোনো প্রতিশ্রুতি দেওয়াই হয়নি। দাবিদাওয়া আদায়ের জন্য উদ্বাস্তুরা স্থির করে যে ১৯৫৮-র ১৫ মে তারা শান্তিপূর্ণভাবে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করবে। বিহার সরকার এর সুযোগ নিয়ে উদ্বাস্তুদের বুঝিয়ে দিল যে বিহার পশ্চিমবঙ্গ নয়। ১০ মে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী বেতিয়ায় পাঠিয়ে দেওয়া হল। চম্পারণ জেলাশাসক একদল পুলিশ অফিসার-সহ স্বয়ং বেতিয়ায় উপস্থিত হলেন। ইতিমধ্যে ১২ মে কিছু ঘটনা ঘটে গেল যার জন্য বিহার সরকার মোটেই প্রস্তুত ছিল না। ওই দিন স্থানীয় ক্ষুধার্ত কৃষকেরা মিছিল করে বেতিয়ার দিকে এগিয়ে গেল। উদ্বাস্তুরাও তাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মেলাল। আতঙ্কিত সরকার এই পরিস্থিতির মোকাবিলায় এক কৌশলের আশ্রয় নিল।

১৩ মে বিক্ষুব্ধ উদ্বাস্তু নেতাদের সঙ্গে আলোচনার জন্য জেলাশাসক এক বৈঠক ডাকেন। নেতারা নির্ধারিত সময়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। এই বিশ্বাসঘাতকতায় ক্রুদ্ধ হয়ে উদ্বাস্তুরা ব্লক কম্যান্ড্যান্টকে ঘেরাও করে। সশস্ত্র

পুলিশের বুলেট তার জবাব দেয় : ৫ জন উদ্বাস্তু ঘটনাস্থলেই নিহত হয় এবং অনেকেই আহত হয়। পুলিশ হত্যা করার জন্যই গুলি চালিয়েছিল, উদ্বাস্তুদের বুঝিয়ে দিয়েছিল যে তারা বিহারে আছে, পশ্চিমবঙ্গে নয়। বেতিয়ায় তাদের পুনর্বাসন দেওয়া হল না, বেতিয়ার শিবিরেই তাদের রেখে দেওয়া হল!

বেতিয়া হল সেই চম্পারণ যেখানে গান্ধীজি কৃষক সত্যাগ্রহ শুরু করেছিলেন যাকে জাতীয় আন্দোলনের সূচনাপর্ব বলে চিহ্নিত করা হয়। স্বাধীন ভারতবর্ষে চম্পারণের বেতিয়ায় ভারতেরই এক প্রান্ত থেকে আসা কৃষকেরা গান্ধীজির অনুকরণেই সত্যাগ্রহ আন্দোলন করেছিল। গান্ধীজির উত্তরাধিকারীরা সশস্ত্র পুলিশ নিয়ে এসে তাদের হত্যা করেছিল। অথচ এই নিরীহ মানুষগুলি সরকার তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করুক শুধু এই দাবি করেছিল। প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার চেয়ে হত্যা করা অনেক সহজ।

## পশ্চিমবঙ্গে সরকারি উদ্বাস্তু ক্যাম্পে সত্যাগ্রহ

দণ্ডকারণ্য প্রকল্পের মাধ্যমে সরকার ক্যাম্পের উদ্বাস্তুদের দুর্বিষহ জীবননাট্যের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে তাদের জীবনে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করতে চেয়েছিল। দণ্ডকারণ্য ওড়িশার কোরাপুট ও মধ্যপ্রদেশের বস্তার জেলার কিছুটা বনাঞ্চল নিয়ে গঠিত। এখানে পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য নতুন স্বর্গ নির্মাণের পরিকল্পনা হয়েছিল। এই দণ্ডকারণ্য প্রকল্পের জন্য ১০০ কোটি টাকা খরচ করা হবে স্থির হয়েছিল। উদ্বাস্তুদের কাছে তা অবিশ্বাস্য মনে হল। পশ্চিমবঙ্গে এবং পশ্চিমবঙ্গের বাইরে সরকারি ক্যাম্পে তারা এমন নির্যাতন সহ্য করেছে যে তাদের এই স্থির ধারণা হয়েছিল যে দণ্ডকারণ্যের স্বর্গ শেষপর্যন্ত দণ্ডকারণ্যের সোনার হরিণের মতো বিলীন হয়ে যাবে। দীর্ঘ ১০ বছর ধরে তারা সরকারি শিবিরে পশুর মতো জীবনযাপন করেছে। সরকার বারবার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে। পুনর্বাসন দপ্তরের অফিসারদের অত্যাচার তাদের সরকারের প্রতি এমন বীতশ্রদ্ধ করে তুলেছিল যে সরকারের কোনো প্রতিশ্রুতিই তারা বিশ্বাস করতে পারছিল না। তাদের ধারণা হয়েছিল যে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে সরকারি শিবিরগুলোর মতোই দণ্ডকারণ্যও একটি সরকারি শিবির (ক্যাম্প), তার বেশি কিছু নয়। মরুভূমির মতো দেশ দণ্ডকারণ্য। সেখানে গেলে তারা আর ফিরে আসতে পারবে না।

সরকারি প্রচারযন্ত্র ও পত্রপত্রিকা প্রচার করতে লাগল যে উদ্বাস্তুরা যদি দণ্ডকারণ্যকে নিজেদের দেশ বলে মনে করতে পারে তাহলে দণ্ডকারণ্য এক মনোরম ভূমিতে পরিণত হবে, উদ্বাস্তুদের দুঃখদুর্দশার পরিসমাপ্তি ঘটবে। কিন্তু যদি সরকারি আবেদনে তারা সাড়া না দেয়, যদি দণ্ডকারণ্যে যেতে রাজি না হয় তবে সব সরকারি শিবির বন্ধ করে দেওয়া হবে, ক্যাশডোল বন্ধ হবে। নেহরুর সরকার উদ্বাস্তুদের দণ্ডকারণ্যে পাঠিয়ে অবিলম্বে উদ্বাস্তু সমস্যার অবসান ঘটাতে চেয়েছিল।

কিন্তু ক্যাম্পের উদ্বাস্তুদের এত সহজে সরকারের কথা মেনে নেওয়ার মতো মানসিকতা ছিল না। সরকারি সিদ্ধান্ত না মানলে ক্যাম্পের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে, ক্যাশডোল বন্ধ হয়ে যাবে, এই হুমকি সব সরকারি ক্যাম্পে ছড়িয়ে পড়ে। উদ্বাস্তুরা দণ্ডকারণ্যে নির্বাসনে যাওয়ার আগে একটি চূড়ান্ত আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যোগী

হয়। এই আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত সরকারি ক্যাম্পের উদ্বাস্তুদের আইন অমান্য আন্দোলন। একমাস ধরে এই আন্দোলন চলেছিল; ৩০ হাজারেরও বেশি উদ্বাস্তুকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং সরকারি প্রশাসন ব্যবস্থা এক সংকটজনক পরিস্থিতিতে এসে দাঁড়িয়েছিল।

এই আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুদের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ আইন অমান্য আন্দোলন। পূর্ববর্তী আন্দোলন ছিল 'উচ্ছেদ আইনে'র বিরুদ্ধে জবরদখল কলোনিগুলির আন্দোলন। কিন্তু উচ্ছেদ আইনের বিরুদ্ধে আইন অমান্য আন্দোলন বিশেষভাবে জবরদখল কলোনিগুলির আন্দোলন। জবরদখল কলোনির বাইরের উদ্বাস্তুরা এই আন্দোলনের শরিক হয়নি। অন্যদিকে, ক্যাম্পের উদ্বাস্তুদের আন্দোলনেও জবরদখল কলোনির উদ্বাস্তুরা যোগ দেয়নি। ইউ সি আর সির নেতৃত্ব জবরদখল কলোনির উদ্বাস্তুদের ক্যাম্প-উদ্বাস্তুদের আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করতে চেয়েছিল। কিন্তু জবরদখল কলোনির উদ্বাস্তুরা এই আন্দোলনে যোগ দেয়নি। কলোনিতে তারা প্লট পেয়েছে, কিন্তু জমির ওপর তাদের অধিকার লাভ-তখনো অনিশ্চিত। সুতরাং ক্যাম্পের উদ্বাস্তুদের সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দিয়ে সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করে সেই অনিশ্চিত অবস্থাকে আরো অনিশ্চিত করে তুলতে তারা চায়নি। এই আন্দোলনে জবরদখল কলোনির উদ্বাস্তুদের যোগ না দেওয়ার আরো একটি কারণ উল্লেখ করা যেতে পারে। জবরদখল কলোনির অধিবাসীরা অধিকাংশই নিম্নমধ্যবিত্ত। কিছু উচ্চমধ্যবিত্ত ও কৃষিজীবীও তাদের মধ্যে ছিল। কিন্তু সরকারি ক্যাম্পের উদ্বাস্তুরা অধিকাংশই নমশূদ্র কৃষিজীবী। তাদেরই দণ্ডকারণ্যে পাঠাবার কথা হচ্ছিল। এই কৃষিজীবী নমশূদ্র কৃষকদের সঙ্গে দেশ ত্যাগ করার আগেও পূর্বোক্ত শ্রেণীর মানুষদের বিশেষ মেলামেশা বা আন্তঃসম্পর্ক ছিল না। তাই এই কৃষকশ্রেণীর ভবিষ্যৎ নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথা ছিল না।

প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমবঙ্গে যেসব উদ্বাস্তু এসেছিল তাদের মধ্যে তিনটি শ্রেণী লক্ষ করা যায় : (১) ভূম্যধিকারী এবং উচ্চবিত্ত। তাদের অধিকাংশেরই কলকাতায় বাড়িঘর ছিল :(২) দ্বিতীয় শ্রেণী নিম্নমধ্যবিত্ত। তারা সরকারি ঋণ অথবা নিজেদের টাকা দিয়ে বসবাসের জায়গা কিনে নেয় নয়তো ফাঁকা বাড়ি, জমি, ব্যারাক দখল করে নেয় এবং শেষ পর্যন্ত জবরদখল কলোনি প্রতিষ্ঠা করে। (৩) কৃষিজীবী, কৃষির সঙ্গে যুক্ত কারিগর অথবা ব্যবসায়ী প্রভৃতি যারা সরকারি ক্যাম্পে আশ্রয় নিয়েছিল। এদেরই দণ্ডকারণ্যে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হচ্ছিল। প্রথম শ্রেণীর মানুষেরা দেশবিভাগের ফলে সম্পত্তি হারালেও দেশবিভাগের প্রচণ্ড আঁচ তাদের গায়ে লাগেনি। দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষেরা ইতিমধ্যেই কিছুটা সুস্থিতির দিকে যাচ্ছিল। জবরদখল কলোনি থেকে উচ্ছেদের প্রশ্ন আর বিশেষ ছিল না, কলোনিগুলি স্বীকৃতি পাচ্ছিল। তাই এই দুই শ্রেণী ক্যাম্পবাসী কৃষিজীবী উদ্বাস্তুদের থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখেছিল।

## সরকারি ক্যাম্পের উদ্বাস্তুদের সত্যাগ্রহ : ১৯৫৮-৫৯

সরকারি ক্যাম্পের উদ্বাস্তুদের ১৯৫৮-র মার্চ-এপ্রিলের সত্যাগ্রহকে উদ্বাস্তুদের বৃহত্তম আন্দোলন হিশেবে চিহ্নিত করা যায়। উদ্বাস্তুদের জোর করে দণ্ডকারণ্যে পাঠাবার সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এই সত্যাগ্রহ আন্দোলন। প্রায় ৩০,০০০ উদ্বাস্তু গ্রেপ্তার বরণ

করে। তাদের জন্য বিশেষ কারাগার তৈরি করতে হয়। এক মাসেরও বেশি সময় ধরে এই আন্দোলন চলেছিল। যদিও উদ্বাস্তুদের এই আন্দোলনে একটি ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্ব ছিল না তবুও এই আন্দোলন সুশৃঙ্খলভাবে চলেছিল বলা যেতে পারে। উদ্বাস্তুদের মধ্যে বিভেদ ছিল। এই বিভেদের কারণ ক্যাম্পবাসী উদ্বাস্তুদের মধ্যে ৭০ শতাংশ ছিল নমশূদ্র। আগেই বলা হয়েছে এরা অধিকাংশই কৃষিজীবী। ক্যাম্পবাসী উদ্বাস্তুরা সরকারের বিরুদ্ধে ছোটখাটো আন্দোলন করে তাদের নিজস্ব নেতৃত্ব গড়ে তুলেছিল। সিপিআই এবং ইউ সি আর সি-র প্রভাব ক্যাম্পবাসীদের উপরে পড়লেও ক্যাম্পবাসী নমশূদ্র নেতৃত্বের এই ভয় ছিল যে ইউ সি আর সি নেতৃত্ব যদি ক্যাম্পে ব্যাপকভাবে বিস্তৃতি লাভ করে তাহলে নমশূদ্র নেতৃত্ব শেষ পর্যন্ত ইউ সি আর সি-র কর্মী সদস্যে পরিণত হবে, তাদের বিশিষ্ট সত্তা মুছে যাবে। ক্যাম্পবাসী নমশূদ্র নেতাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যোগেন মণ্ডল (পাকিস্তানের প্রাক্তন মন্ত্রী), হেমন্ত বিশ্বাস ও অপূর্বলাল মজুমদার। এরা সকলেই নমশূদ্র ছিলেন। নমশূদ্রদের একটি বড় অংশ 'মতুয়া' ধর্মাবলম্বী ছিল যাদের নেতা ছিলেন বিলাতফেরত ব্যারিস্টার পি আর ঠাকুর। নমশূদ্র শ্রেণীর মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে প্রভাবশালী এই সব নেতাদের সূক্ষ্ম রাজনৈতিক জ্ঞান ছিল না এবং উদ্বাস্তু আন্দোলনকে সঠিক নেতৃত্বদানের রাজনৈতিক দক্ষতাও ছিল না। অথচ একটি বৃহৎ সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিচালনার জন্য সঠিক রাজনৈতিক নেতৃত্ব আবশ্যিক। পশ্চিমবঙ্গে এই সময়ে ইউ সি আর সি ছাড়াও প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টি নেতৃত্বাধীন 'সারা বাংলা বাস্তুহারা সম্মেলন' নামে একটি সংগঠন ছিল। এই দুটির মধ্যে ইউ সি আর সি অত্যন্ত প্রভাবশালী এবং জবরদখল কলোনির আন্দোলনের সময়ে ইউ সি আর সি তার নেতৃত্বের ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে। নমশূদ্র নেতৃবৃন্দের সঠিক রাজনৈতিক নেতৃত্বের জন্য এই দুটি সংগঠনের একটির সঙ্গে যুক্ত হওয়া জরুরি ছিল। নমশূদ্র নেতৃবৃন্দের ভয় ছিল ইউ সি আর সি-র সঙ্গে যুক্ত হলে ইউ সি আর সি তাদের হজম করে ফেলবে এবং তাদের স্বাধীন সত্তা আর থাকবে না। অতএব নমশূদ্র নেতৃবৃন্দ পি এস পি প্রভাবিত 'সারা বাংলা বাস্তুহারা সম্মেলন'-এর সঙ্গে যুক্ত হলেন। এতে সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিচালনার মাধ্যমে প্রভাব বিস্তার করার সুবর্ণ সুযোগ পেল সারা বাংলা বাস্তুহারা সম্মেলন। কিন্তু এতে ক্যাম্পবাসী উদ্বাস্তুদের একটি বড় অংশ 'সারা বাংলা বাস্তুহারা সম্মেলন'-এর সঙ্গে যুক্ত হলেও ইউ সি আর সি-র আধিপত্য পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেল তাও নয়। কারণ ইতিপূর্বে ইউ সি আর সি অনেক সরকারি ক্যাম্পে তাদের নিজস্ব সংগঠন গড়ে তুলেছিল। সুতরাং উদ্বাস্তুদের বৃহত্তম সত্যাগ্রহ আন্দোলন একটি অখণ্ড ধারায় প্রবাহিত হল না। দুটি ধারায় বিভক্ত হয়ে গেল।

আগেই বলা হয়েছে দণ্ডকারণ্যে উদ্বাস্তুদের পাঠিয়ে দিয়ে সরকারি ক্যাম্পের দরজা বন্ধ করে দেবার সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে উদ্বাস্তুদের মনে ব্যাপক বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের বাইরের ক্যাম্প জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা উদ্বাস্তুদের অনেকেরই ছিল। দণ্ডকারণ্য এইসব ক্যাম্পের চেয়ে ভালো জায়গা হবে একথা বিশ্বাস করার কোনো যুক্তি খুঁজে পায়নি উদ্বাস্তুরা। সরকার ইচ্ছে করলে বিভিন্ন সরকারি ক্যাম্প থেকে কিছু কিছু উদ্বাস্তুকে দণ্ডকারণ্য দেখিয়ে আনতে পারত। সরকার তা করেনি। ফলে সরকারি প্রচারমাধ্যম দণ্ডকারণ্য স্বর্গ সম্পর্কে যে সব প্রচার করছিল তা উদ্বাস্তুরা বিশ্বাস করেনি। ভারত সরকার বাঙালি উদ্বাস্তুদের কখনোই মানুষ বলে মনে করেনি। যদি তা করত তাহলে এই নমশূদ্র গোষ্ঠীকে দিয়ে দণ্ডকারণ্যে এক নতুন স্বর্গ রচনা করতে পারত। এই

নমশূদ্র কৃষক সমাজ দণ্ডকারণ্যের রূপ বদলে দিতে পারত। পারালকোট তার প্রমাণ।

উদ্বাস্তু সংগঠন ও বামপন্থী দলগুলি অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই দাবি করছিল যে বিপুলসংখ্যক উদ্বাস্তুদের দণ্ডকারণ্যে পাঠাবার আগে তাদের জন্য সেখানে উপযুক্ত বাসস্থানের এবং সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। তাছাড়া দণ্ডকারণ্যে তাদেরই পাঠানো হবে যারা সেখানে যেতে ইচ্ছুক, জোর করে কাউকে সেখানে পাঠানো চলবে না। কিন্তু তারও আগে আর একটি প্রশ্নের মীমাংসা করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে পতিত জমির তালিকা প্রস্তুত করে দেখাতে হবে যে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুদের স্থান সংকুলান হবে না। কেন্দ্রীয় সরকার ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে উদ্বাস্তুদের ছড়িয়ে দিয়ে তার দায়িত্ব পালন করতে চাইছে। উদ্বাস্তুরা পশ্চিমবঙ্গেরই সন্তান। এই অসহায় মানুষগুলো পশুর মতো সরকারি ক্যাম্পে এতকাল কাটিয়েছে। তবু তারা এতকাল তাদের দেশের মাটিতেই ছিল। বাইরে পাঠালে তাদের পশুর মতো জীবন ঘুচবে না। অথচ দেশের মাটিও তারা হারাবে।

অতএব উদ্বাস্তুরা লড়াইয়ের পথেই চলে গেল। তাদের চোখের সামনে দুটো আইন অমান্য আন্দোলনের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ছিল! (১) বাংলা বিহার একীকরণের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে আন্দোলন যা সফল হয়েছিল এবং (২) বেতিয়া উদ্বাস্তুদের আন্দোলন যা পুরোপুরি ব্যর্থ হয়নি। তাই ২ লক্ষ ৬০ হাজার ক্যাম্পবাসী উদ্বাস্তু তাদের মাতৃভূমি চিরতরে ছেড়ে যাবার আগেই চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হল।

আগেই বলা হয়েছে যে ক্যাম্পের উদ্বাস্তুরা এই আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। ইউ সি আর সি এবং সারা বাংলা বাস্তুহারা সম্মেলন উদ্বাস্তুদের এই বৃহত্তম আন্দোলনকে একই পতাকাতলে সংহত করতে পারেনি। যখন আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হল তখন দেখা গেল দুটো পতাকাতলে দুটো মিছিল দুই পথ দিয়ে মহাকরণের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, পুলিশ অবরোধ ভাঙছে তাদের মুখে একই স্লোগান, তারা একই প্রিজনভ্যানে উঠছে। একমাস ধরে এই ব্যাপার চলতে থাকে। তবুও ইউ সি আর সি ও সারা বাংলা বাস্তুহারা সম্মেলন ঐক্যবদ্ধ হয়ে সরকারের উপর কঠিন আঘাত হানতে পারেনি।

অবশ্য সকলের গ্রহণযোগ্য একটি কর্মসূচি পালনের মধ্য দিয়েই ইউ সি আর সি বেশ কিছুকাল ধরেই ক্যাম্পের উদ্বাস্তুদের ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াস চালাচ্ছিল। ১৯৫৭-র ডিসেম্বর মাসে কুপার্স ক্যাম্পে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে ২১দফা দাবি সম্বলিত এক সনদ গ্রহণ করা হয়। স্থির হয় যে এই ২১ দফা দাবি পূরণের জন্য মুখ্যমন্ত্রী এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হবে। সরকার এই দাবি প্রত্যাখ্যান করে। ফলে ইউ সি আর সি ধারাবাহিকভাবে বিক্ষোভ সমাবেশ ঘটাতে থাকে। ১৯৫৭-র ডিসেম্বর থেকে ১৯৫৮-র মার্চের মধ্যে ১৭টি বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এই বিক্ষোভ সমাবেশই সত্যাগ্রহ আন্দোলনের পথ উন্মুক্ত করে দেয়। কিন্তু ইউ সি আর সি প্রস্তুত হবার আগেই বাঁকুড়ার ক্যাম্পবাসী উদ্বাস্তুরা আঘাত হেনে বসে। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে যেতে অস্বীকার করায় বাঁকুড়া ক্যাম্পের ১০০ উদ্বাস্তু পরিবারের ডোল বন্ধ করে দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে ১২ মার্চ থেকে বাঁকুড়া ক্যাম্পের উদ্বাস্তুরা সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করে। ইউ সি আর সি-ও বাঁকুড়া ক্যাম্পের উদ্বাস্তুদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে। ইউ সি আর সি-র এক কেন্দ্রীয় সমাবেশে অম্বিকা চক্রবর্তী ঘোষণা করেন যে বাঁকুড়া ক্যাম্পের উদ্বাস্তুদের সাহায্য করার জন্য ২৫ হাজার উদ্বাস্তু ইতিমধ্যেই প্রস্তুত হয়েছে। উদ্বাস্তুরা বুলেটের মুখে প্রাণ দেবে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে যাবে না। ইউ সি আর সি-র নেতৃত্ব

দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করল যে যদি সরকার জোর করে উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবঙ্গের বাইরে পাঠাবার চেষ্টা করে তাহলে ইউ সি আর সি আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করবে। ইতিমধ্যে পি এস পি প্রভাবিত 'সারা বাংলা বাস্তুহারা সম্মেলন'ও আইন অমান্য আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। ইউ সি আর সি ও সম্মেলনের নেতৃবৃন্দের মধ্যে একটি ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়াসও দানা বেঁধে উঠেছিল। কিন্তু এই যৌথ আইন অমান্য আন্দোলনের প্রয়াসের অঙ্কুরেই বিনষ্টি ঘটে নমশূদ্র নেতৃত্ব বিরোধিতার জন্য। ইউ সি আর সি-র সাধারণ সম্পাদক অম্বিকা চক্রবর্তী নেতা হরিদাস মিত্রের কাছে এক প্রস্তাব পাঠান। হরিদাস মিত্র যোগেন মণ্ডলের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করে জানান যে ইউ সি আর সি-র প্রস্তাব বিবেচনার.জন্য সম্মেলন আহূত ১৭ মার্চের সত্যাগ্রহ আন্দোলনের কর্মসূচি পিছিয়ে দেওয়া হোক। ওইদিনই সন্ধ্যাবেলা দেবব্রত বসু, যোগেন মণ্ডল, হেমন্ত বিশ্বাস এবং সম্মেলনের অন্যান্য নেতারা অম্বিকা চক্রবর্তীর চিঠির বিষয়বস্তু আলোচনার জন্য এক সভায় মিলিত হন। সভায় সিদ্ধান্ত হল কোনো অবস্থাতেই ইউ সি আর সি-র সঙ্গে যৌথ আন্দোলন হবে না। সম্মেলনের নেতা ডঃ এস সি ব্যানার্জি ও হরিদাস মিত্রকে স্পষ্ট বলে দেওয়া হল যে কোনো মতেই ইউ সি আর সি-র সঙ্গে যৌথ আন্দোলন হবে না। বাধ্য হয়ে ডঃ ব্যানার্জি ও হরিদাস মিত্র বিভক্ত আন্দোলনই মেনে নিলেন। সম্মেলন এবং ইউ সি আর সি-র নেতৃত্বে উদ্বাস্তুদের দুটি পৃথক আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হল।

১৭ মার্চ সম্মেলন উদ্বাস্তুদের নিয়ে সত্যাগ্রহ করল। এই সত্যাগ্রহে কী ধরণের সাড়া মেলে তা দেখবার জন্য ইউ সি আর সি অপেক্ষা করে রইল। ইউ সি আর সি-র নেতৃত্বের ধারণা হয়েছিল যে সম্মেলনের পক্ষে এই আন্দোলন দীর্ঘদিন চালানো সম্ভব হবে না। কিন্তু ইউ সি আর সি-র পক্ষে বেশিদিন দূরে সরে থাকা সম্ভব ছিল না। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল কলকাতায় ইউ সি আর সি-কে সত্যাগ্রহ আন্দোলনে নামতে হবে। অতএব অম্বিকা চক্রবর্তী ১৯ মার্চ সভা, বিক্ষোভ সমাবেশের মধ্য দিয়ে প্রতিবাদ দিবস পালনের আহ্বান জানালেন। পোদ্দার নগরে ইউ সি আর সি-র গ্র্যান্ড কাউন্সিল সিদ্ধান্ত নিল যে ৭ এপ্রিল সমস্ত জেলার উদ্বাস্তুদের নিয়ে মনুমেন্ট ময়দানে এক বিশাল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। সভাশেষে একটি মিছিল মহাকরণ অভিযানে এগিয়ে যাবে। যেখানে পুলিশ বাধা দেবে তারা সেখানেই অবস্থান করবে এবং পুলিশ শক্তি প্রয়োগ না করলে সেখান থেকে তারা নড়বে না। এভাবে ৭ এপ্রিল থেকে কলকাতায় দুটো স্বতন্ত্র সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু হল। একটি মিছিল ওয়েলিংটন স্কোয়ার থেকে এসপ্ল্যানেড ইস্ট ও ওল্ড কোর্ট হাউসের সংযোগস্থলে উপস্থিত হত। আর একটি ময়দান থেকে রাজভবন এবং কার্জন পার্কের মধ্যবর্তী ও ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিটে এগিয়ে যেত। দুটি সত্যাগ্রহ আন্দোলনের এই দুটি পথ একই জায়গায় গিয়ে মিশত—নির্দিষ্ট জায়গায় জমায়েত, একই স্লোগান, সংক্ষিপ্ত সভা, ১৪৪ ধারা লঙ্ঘন করে নিষিদ্ধ এলাকায় জোর করে প্রবেশ এবং প্রিজনভ্যানে উঠে পড়া।

জেলভরা এবং জনসমর্থন আদায় করাই ছিল সত্যাগ্রহের মূল উদ্দেশ্য। সত্যাগ্রহীদের এছাড়া কোনো পথও ছিল না। দণ্ডকারণ্যের স্বাধীন জীবনের চেয়ে পশ্চিমবঙ্গের জেলের জীবনও অধিকতর কাম্য। কিন্তু সবাইকে যে জেলে নিয়ে যাওয়া হত তাও নয়। পুলিশ উদ্বাস্তুদের প্রিজনভ্যানে তুলে জেলে নিয়ে যেত না। নিষিদ্ধ এলাকাকে মুক্ত করতেই উদ্বাস্তুদের প্রিজনভ্যানে তোলা হত। কিন্তু প্রিজনভ্যান জেলে

যেত না। প্রায় ৫০ কিলোমিটার দূরে কোনো ফাঁকা জায়গায় সত্যাগ্রহীদের ভ্যান থেকে নামিয়ে দেওয়া হত। এতে আন্দোলনের নেতৃত্ব কিছুটা অস্বস্তিতে পড়েছিল। কিন্তু কোনো সরকারই সত্যাগ্রহীদের নিয়ে এ জাতীয় লুকোচুরি বেশিদিন খেলতে পারে না। আন্দোলনের মোকাবিলা করার প্রকৃত পন্থা এই কপট কৌশল হতে পারে না। অতএব কয়েকদিন আন্দোলন চলার পর সরকার আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে কঠিন ব্যবস্থা নিল। ৩০ হাজারেরও বেশি উদ্বাস্তুকে গ্রেপ্তার করা হল এবং তাদের রাখার জন্য অস্থায়ী জেল তৈরি করা হল।

সম্মেলন সত্যাগ্রহ শুরু করেছিল ১৭ মার্চ। ইউ সি আর সি পরিস্থিতি কী দাঁড়ায় সে দিকে দৃষ্টি রেখে অপেক্ষা করছিল। সম্মেলন ও ইউ সি আর সি যুক্ত আন্দোলন করতে পারেনি। কিন্তু তাদের দাবির মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না। দুয়েরই দাবি ছিল : (১) কোনো অনিচ্ছুক উদ্বাস্তুকে দণ্ডকারণ্যে পাঠানো চলবে না; (২) পশ্চিমবঙ্গের বাইরে না যেতে চাওয়ার জন্য কোনো উদ্বাস্তুর ডোল বন্ধ করা চলবে না; (৩) বায়নানামা সংক্রান্ত বিবাদ দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে; (৪) যেহেতু ৭০ শতাংশ ক্যাম্প উদ্বাস্তু কৃষিজীবী, তাই তাদের পশ্চিমবঙ্গে উদ্ধারযোগ্য পতিত জমিতে পুনর্বাসন দিতে হবে এবং (৫) পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের জন্য নতুন শিল্পায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

ক্যাম্প উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসন দেওয়ার মতো উদ্বৃত্ত জমি আছে কিনা এই বিষয়টি ছিল প্রকৃত প্রশ্ন। বামদল এবং উদ্বাস্তু সংগঠনগুলির বক্তব্য ছিল যে সরকার অনুসন্ধান করলে পশ্চিমবঙ্গেই প্রয়োজনীয় উদ্ধারযোগ্য পতিত জমি পাওয়া যাবে। কিন্তু সরকার সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছিল যে এমন একটুকরোও উদ্বৃত্ত চাষযোগ্য জমিও নেই যেখানে উদ্বাস্তু কৃষকদের পুনর্বাসন দেওয়া যেতে পারে।

সরকার এবং বাম রাজনৈতিক দলগুলি পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করছিল এই বলে যে দণ্ডকারণ্য সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। বামদলগুলি সরকারের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ এনেছিল যে ক্যাম্প উদ্বাস্তুদের দণ্ডকারণ্যে পাঠিয়ে দেওয়ার প্রধান কারণ ছিল পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের ভোট ব্যাঙ্ক অটুট রাখা। কেননা স্থানীয় মানুষ এই দাবি করছিল যে ক্যাম্প উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবঙ্গের বাইরে পুনর্বাসন দেওয়া হোক। পক্ষান্তরে সরকারের এই দৃঢ় ধারণা হয়েছিল যে বামদলগুলি ক্যাম্প উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসন দিতে বলছে তাদের ভোটের জন্য এবং রাজ্যে অরাজক অবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য। সরকার এবং বামদলগুলির দৃষ্টিভঙ্গির এই বৈপরীত্যের মূলে ছিল ১৯৫২ এবং ১৯৫৭-র সাধারণ নির্বাচনে উদ্বাস্তুদের ভোটের প্যাটার্ন। এই দুই নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলের কংগ্রেসের ভোটব্যাঙ্ক সাধারণভাবে অটুট ছিল। কিন্তু কলকাতা শহরতলীতে এবং কলকাতার কাছাকাছি উদ্বাস্তুকেন্দ্রিক ছোট ছোট শহরে বামদলগুলির ভোটব্যাঙ্ক ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ইতিমধ্যে কেরালাতে কমিউনিস্টরা ক্ষমতায় এসেছে। কলকাতার আশেপাশে জবরদখল কলোনিতে বামদলগুলি তাদের দৃঢ় আধিপত্য বিস্তার করেছে। এই কলোনিগুলির ক্রমাগতই সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটছিল। তার উপরে যদি গ্রামাঞ্চলে উদ্ধারযোগ্য পতিত জমিতে ক্যাম্প-উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়, তবে গ্রামাঞ্চলে কংগ্রেসের ভোটব্যাঙ্ক অটুট থাকবে না। শেষ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গও কেরালার পথেই যাবে। সিপিআই যে এ ধরণের ভাবনা-চিন্তা করছিল তার প্রমাণ আছে। দণ্ডকারণ্য সত্যাগ্রহের সময় সিপিআই ক্রমাগত বলছিল যে উদ্বাস্তু এবং পশ্চিমবঙ্গের ভূমিহীন কৃষকদের নিয়ে

একটি যুক্ত আন্দোলন গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি। বস্তুত ১৯৫৮-র আগস্টে ইউ সি আর সি যে বিকল্প প্রস্তাব দিয়েছিল তাতে উদ্বৃত্ত জমিতে শুধু উদ্বাস্তুদেরই নয় পশ্চিমবঙ্গের ভূমিহীন কৃষকদেরও পুনর্বাসনের কথা বলা হয়েছিল। ইউ সি আর সি তার প্রত্যেকটি নীতি সংক্রান্ত বক্তব্যে উদ্বাস্তু, কৃষক, এবং শ্রমিকদের যুক্ত আন্দোলনের কথা বলে এসেছে। ১৯৫৮-তে ইউ সি আর সি ও সিপিআই-এর কিষাণসভার সব বক্তব্যে উদ্বাস্তু ও পশ্চিমবঙ্গের ভূমিহীন কৃষকদের যুক্ত আন্দোলন যে অত্যন্ত জরুরি তা বলা হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় যে সিপিআই গ্রামাঞ্চলে কংগ্রেসি ভোটব্যাঙ্কে ভাগ বসাবার কথা ভাবছিল।

১৭ মার্চ থেকে সম্মেলনের সত্যাগ্রহ শুরু হয়েছিল। প্রতিদিন কয়েকশো ক্যাম্প উদ্বাস্তু মিছিল করে এসপ্ল্যানেড ইস্ট ও ওল্ড কোর্ট হাউসের সংযোগস্থলে পুলিশ বেষ্টনী ভঙ্গ করে গ্রেপ্তার বরণ করত। এদের দেখে মানুষ বলেই মনে হত না, এরা প্রেতের মতো একদল নারীপুরুষ ও শিশু ছিন্নবাস এবং ক্ষুধার্ত। এদের দেখে মনে হত এরা ভয় পেয়েছে, নির্বাসনের যন্ত্রণার, মৃত্যুর। সমাজের বাইবে এদের অবস্থান। প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলগুলির ক্ষমতার লড়াইয়েব এরা বোড়ে। এরা কায়াহীন পুরুষ, নাবী ও শিশু। কিন্তু এই প্রেতের মতো মানুষের দৈনন্দিন শোভাযাত্রা কলকাতাব মানুষের মনকে স্পর্শ করেনি।

৩ এপ্রিল নাগাদ সত্যাগ্রহ বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে পড়ল। কয়েক হাজার মানুষ সত্যাগ্রহ করে গ্রেপ্তার বরণ করল। ৩ এপ্রিল ডঃ রায় কাগজে একটি বিবৃতি দিয়ে সাবধান করে দিলেন যেন কেউ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এবং রাজ্যে অরাজকতা এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের ব্যবহার না করে। ডঃ বায স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন যে ক্যাম্পবাসী উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দেবার মতো জমি পশ্চিমবঙ্গে নেই। সুতরাং তিনি তাদের পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসন দেবেন এই জাতীয় আশ্বাস দিতে পারছেন না। পশ্চিমবঙ্গে কৃষিজীবী উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দেবার গ্যারান্টি তিনি দিতে পারবেন না।

ইতিমধ্যে ইউ সি আর সি আইন অমান্য আন্দোলন শুরু কবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। স্থির হয়েছিল ৭ এপ্রিল একটি বিক্ষোভ সমাবেশ করে ইউ সি আব সি আন্দোলন শুরু করবে। ইউ সি আর সি প্রায় ২০ হাজার উদ্বাস্তু সমাবেশেব ব্যবস্থা করেছিল। ইউ সি আব সি-র আন্দোলন শুরু করার সরকারি প্রতিক্রিয়া হল ৬ এপ্রিল ৫০ জন ইউ সি আর সি ও সম্মেলনের নেতার গ্রেপ্তার। কিন্তু তা সত্ত্বেও ৭ এপ্রিল ইউ সি আব সি-র সমাবেশ হল। এই সমাবেশ বিক্ষোভ প্রদর্শন করে মহাকরণ অভিযানে যাবে এবং পুলিশ বেষ্টনী ভঙ্গ করবে।

৮ এপ্রিল থেকে প্রতিদিন দুটো জাযগা থেকে দুটো আলাদা মিছিল কাছাকাছি দুটো নির্দিষ্ট জায়গায় জমায়েত হত। সেখানে পুলিশ তাদের গতিরোধ করত, লাঠিচার্জ করত, কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়ত এবং তারপব প্রিজনভ্যানে তুলে নিয়ে যেত। এই সত্যাগ্রহ বেতিযা উদ্বাস্তুদের সত্যাগ্রহের মতোই চলতে থাকে। তবে পার্থক্য ছিল এই যে এক্ষেত্রে সব ক্যাম্পবাসী উদ্বাস্তু দুটো সংগঠনের সাথে যুক্ত। সব বামপন্থী দল এই সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ করে। একমাস ব্যাপী সত্যাগ্রহে প্রায় ৩০ হাজার উদ্বাস্তু গ্রেপ্তার বরণ করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এরা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কোনো সহানুভূতি লাভ করতে পারেনি। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এবং সংবাদপত্রগুলিব এই ধারণা হয়েছিল যে এখানে উদ্বাস্তুদের

সংখ্যা এত বেশী যে পশ্চিমবঙ্গে আর তিলধারণের জায়গা নেই। দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা উদ্বাস্তু জর্জরিত পশ্চিমবঙ্গের উপযুক্ত সমাধান।

দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা নিয়ে সংসদে যে বিতর্ক হয় তাতে সাধন গুপ্ত একে তুঘলকি পরিকল্পনা বলে অভিহিত করেন। পুনর্বাসনমন্ত্রী মেহেরচাঁদ খান্না সরকারের পক্ষ থেকে যা বললেন তাতে পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তুদের প্রতি সীমাহীন অবজ্ঞা প্রকাশ পেল। তিনি বললেন পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তুরা ভারতীয় নাগরিকদের তুলনায় সুখেই আছে। তিনি জানান যে পুনর্বাসনের জন্য উদ্বাস্তুদের নিজস্ব কোনো পরিকল্পনা থাকলে তারা তা সরকারের কাছে পেশ করতে পারে এবং তিনি তা বিবেচনা করে দেখবেন। নয়তো সরকার কতকাল ডোল দিয়ে যাবে সে বিষয়ে তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তিনি সকলকে জানালেন পূর্বাঞ্চলের উদ্বাস্তুরা মোটামুটি সুখেই আছে। তাই ক্যাম্পবাসী উদ্বাস্তুদের আন্দোলনে অন্যান্য উদ্বাস্তুরা যোগ দিচ্ছে না। চমৎকার যুক্তি কোনো সন্দেহ নেই। ভারতের দরিদ্রশ্রেণীর মানুষ সুখেই আছে; কারণ তারা সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামছে না। মেহেরচাঁদ খান্না নিজেও একজন পাঠান উদ্বাস্তু। তিনি কি পূর্ব-পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের সঙ্গে পশ্চিম-পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের তুলনামূলক বিচার করেছিলেন?

ইতিমধ্যে ডঃ রায় দেবেন সেন ও আরো তিনজন নেতাকে একটি চিঠি লিখে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে কোনো উদ্বাস্তুকে জোর করে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে পাঠানো হবে না। বাইরে যেতে অস্বীকার করায় যাদের ডোল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল তাদের আবার ডোল দেওয়া হবে। তিনি আরো আশ্বাস দেন যে বায়নানামা স্কিম-এর সমস্যার সমাধান এবং পশ্চিমবঙ্গের কৃষিভিত্তিক শিল্পবিকাশের পরিকল্পনার দিকেও সরকার দৃষ্টি দেবে। ডঃ রায় রাজ্য উদ্বাস্তু পুনর্বাসন উপদেষ্টা বোর্ডের সদস্য প্রফেসার নির্মল ভট্টাচার্যকে একই চিঠি দিয়েছিলেন। এই চিঠির ভিত্তিতে আশা করা হয়েছিল যে খুব শীঘ্রই সত্যাগ্রহ আন্দোলন প্রত্যাহৃত হবে। প্রফেসার নির্মল ভট্টাচার্য এ বিষয়ে উদ্যোগী হন। তিনি ইউ সি আর সি-র সভাপতি হেমন্ত বসু এবং পি এস পি নেতা দেবেন সেনকে ডঃ রায়ের কাছে একটি চিঠিতে এই অনুরোধ জানাতে বলেন যে তিনি যেন সুনিশ্চিত আশ্বাস দেন যে তিনি কোনো উদ্বাস্তুকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দণ্ডকারণ্যে পাঠাবেন না, যেদিন থেকে নগদ ডোল বন্ধ করা হয়েছে সেদিন থেকেই আবার তা দেওয়া হবে এবং পশ্চিমবঙ্গে কৃষিভিত্তিক শিল্পবিকাশের পরিকল্পনা কার্যকর করা হবে। এই চিঠির খশড়া ইউ সি আর সি ও সম্মেলন উভয় সংগঠনই মেনে নেয় এবং তা ডঃ রায়ের কাছে পাঠানো হয়। ডঃ রায়ও আশ্বাস দেন যে তিনি তাদের এই দাবি মেনে নেবেন।

আসলে এই সত্যাগ্রহ যা চেয়েছিল তা আদায় করতে পারেনি। পারা সম্ভবও ছিল না। ইউ সি আর সি ও সম্মেলন ডঃ রায়ের কাছ থেকে শুধুমাত্র এই প্রতিশ্রুতি আদায় করেছিল যে কোনো অনিচ্ছুক ক্যাম্প উদ্বাস্তুকে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে পাঠানো হবে না। কিন্তু তারা সরকারের কাছ থেকে এই প্রতিশ্রুতি আদায় করতে পারেনি যে যারা থেকে যাবে তাদের পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসন দেওয়া হবে অথবা ক্যাম্পগুলি এক বৎসরের মধ্যে বন্ধ করে দেওয়া হবে না। তা হলে যারা থেকে যাবে তাদের কি হবে? উদ্বাস্তু নেতাদের কাছে এই প্রশ্নের কোনো উত্তর ছিল না। সুতরাং মাসখানেক ধরে যে সত্যাগ্রহ চলল তা প্রায় ব্যর্থ হয়েছিল বলা যেতে পারে। ২০ এপ্রিল ইউ সি আর সি এবং সম্মেলন এই সত্যাগ্রহ তুলে নেয়। সত্যাগ্রহের ফলে সরকারের কাছ থেকে বিশেষ কিছু পাওয়া যায়নি

বলা যেতে পারে। সরকার শুধু বলেছে অনিচ্ছুক উদ্বাস্তুদের দণ্ডকারণ্যে পাঠাবে না এবং যাদের নগদ ডোল বন্ধ করা হয়েছে তা আবার দেওয়া হবে। কিন্তু যারা থেকে যাবে তাদের ডোল দেওয়া হবে একথা বলেনি। তাছাড়া, ১৯৫৯-এর জুলাই থেকে সব ক্যাম্প বন্ধ করে দেওয়া হবে এই সিদ্ধান্ত থেকেও নড়েনি। সরকার স্থির করেছিল যে হয় ক্যাম্পের উদ্বাস্তুরা দণ্ডকারণ্যে যাবে নয়তো তাদের একসঙ্গে ছয় মাসের নগদ ডোল দিয়ে ক্যাম্প ছেড়ে চলে যেতে বলা হবে। তারপর তাদের ব্যবস্থা তাদের নিজেদেরই করতে হবে। অর্থাৎ সত্যাগ্রহ তুলে নেওয়ার পর সত্যাগ্রহের আগে যে অবস্থা ছিল সেই অবস্থাই থেকে গেল।

ভারত সরকারের উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন পশ্চিমবঙ্গে দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা সম্পর্কে এই ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল যে সেখানে সমগ্র ক্যাম্প উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব। এমনকী গুরুত্বপূর্ণ বামদলগুলির মধ্যেও এই বিশ্বাস জন্মেছিল যে এই পরিকল্পনা উদ্বাস্তুদের দূরবর্তী একটি স্থানে ভুলিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনামাত্র নয়। কিন্তু ইউ সি আর সি-র এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল যে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বৃত্ত চাষযোগ্য জমি আছে যেখানে কৃষক উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব এবং যারা কৃষিজীবী নয় তাদের কুটির ও বৃহদায়তন শিল্পে পুনর্বাসন দেওয়া যেতে পারে। বস্তুত সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তুদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের একটি ব্যাপক পরিকল্পনা ইউ সি আর সি প্রস্তুত করেছিল। এই পরিকল্পনা 'পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু পরিকল্পনার বিকল্প প্রস্তাব' **(An Alternative Porposal for the Rehabilitation of Refugees in West Bengal)** নামে প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রস্তাবে ইউ সি আর সি হিশেব করে দেখিয়েছিল যে মাত্র ২৫ কোটি টাকা ব্যয় করে দণ্ডকারণ্যে ১০০ কোটি টাকা খরচ করে যা করার কথা বলা হচ্ছে তা করা সম্ভব। পাঞ্জাবের উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য যে টাকা খরচ করা হয়েছে তার তুলনায় এই টাকা অকিঞ্চিৎকর। সরকার বামদলগুলি অথবা উদ্বাস্তু সংগঠনগুলির সঙ্গে দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা কার্যকর করা সম্ভব কিনা তা নিয়ে কোনো পরামর্শ করেনি। কেন্দ্রীয় সরকার যেন ধরে নিয়েছিল যে পূর্ব-পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের জন্য বিপুল অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে তাতে তাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। অথচ কৃতজ্ঞতা তো দূরের কথা, উদ্বাস্তুরা এই পরিকল্পনা মেনে নিতে অনিচ্ছুক। এই দৃষ্টিভঙ্গিকে তারা অলস, উদ্যোগহীন এবং বাক্যবাগীশ বাঙালি চরিত্রের দৃষ্টান্ত বলেই ধরে নিয়েছিল। দণ্ডকারণ্য যে একটি ভূস্বর্গ হতে চলেছে সরকার থেকে এই প্রচার নিরন্তর হচ্ছিল এবং পশ্চিমবঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদপত্রগুলিতেও তার প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছিল। বলা হচ্ছিল উদ্বাস্তুরা দণ্ডকারণ্যে গেলে এবং দণ্ডকারণ্যকে আপন করে নিলে সেখানে একটি নতুন বাংলা গড়ে উঠবে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সমস্ত শ্রেণীর নেতৃস্থানীয় মানুষদের একথা মনে হয়নি যে দণ্ডকারণ্যে গিয়ে সেখানকার প্রকৃত অবস্থা একবার দেখে আসা প্রয়োজন। দেখা প্রয়োজন যে সেখানে পতিত জমি উদ্ধার করা হয়েছে কিনা এবং সেচের ব্যবস্থা আছে কিনা। যে কোনো জায়গাতেই উপনিবেশ স্থাপনের মূল উপাদান এই দুটি। দণ্ডকারণ্য কর্তৃপক্ষের প্রথম চেয়ারম্যান ফ্লেচার এই দুটি উপাদানের উপরই প্রাথমিকতা দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন দণ্ডকারণ্যে উপনিবেশ স্থাপনের প্রাথমিক উপাদান দুটি। কিন্তু মধ্যপ্রদেশ ও ওড়িশা সরকার ফাঁদে পড়া উদ্বাস্তু শ্রম কাজে লাগিয়ে রাস্তা তৈরির উপরে জোর দিয়েছিল। এই কারণে ফ্লেচার পদত্যাগ করেন। বাগজোলা ও

হেরোভাঙাতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারও ঠিক একই কাজ করেছিল।

শেষ পর্যন্ত ১৯৫৮-র এপ্রিলের উদ্বাস্তু সত্যাগ্রহ আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছিল। শুধুমাত্র ক্যাম্পের উদ্বাস্তুদের নিয়ে এই আন্দোলন সফল করা সম্ভব ছিল না। এর সাফল্যের জন্য জনসমর্থনের প্রয়োজন ছিল। জীর্ণ শীর্ণ ক্ষুধার্ত উদ্বাস্তুদের জেলে পাঠিয়ে কোনো আন্দোলনই সফল হতে পারে না। অথচ জনসমর্থন না থাকায় উদ্বাস্তুদের নিয়ে একটি হিংসাত্মক আন্দোলনও করা সম্ভব ছিল না। হয়তো ইউ সি আর সি-রও কিছুটা ভুল ছিল। ইউ সি আর সি দণ্ডকারণ্য অঞ্চল পরিদর্শনের দাবি জানাতে পারত। দণ্ডকারণ্য দেখে এসে সেচের কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে, কোথায় জলাধার প্রস্তুত করতে হবে, কৃষিপণ্য বিক্রির কি ব্যবস্থা করা হবে সে বিষয়ে তাদের সুনির্দিষ্ট মতামত উপস্থাপিত করতে পারত। এবং দণ্ডকারণ্যে দেড় লক্ষ উদ্বাস্তুকে প্রেরণ ও আবাসনের ব্যবস্থার তদারকির দাবি করতে পারত। যে অস্থায়ী শিবিরের মাধ্যমে তাদের স্থায়ী আবাসনের ব্যবস্থা করা হবে সেগুলি যাতে বাসযোগ্য হয় তার দেখাশোনার দাবি জানাতে পারত। এতে ডঃ রায়ের হাত শক্ত হত এবং হয়তো নেহরুরও এই ধারণা হত যে এই বিপুল জনসমষ্টির দণ্ডকারণ্যে পুনর্বাসনের দায়িত্ব শুধুমাত্র সরকারি প্রশাসনের হাতে দেওয়া অনুচিত হবে। উদ্বাস্তুদের স্বাভাবিক নেতারা যদি দণ্ডকারণ্যের সৃজনশীল উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত হত তাহলে হয়তো প্রকৃতই একটি নতুন মানবসমাজ গড়ে উঠতে পারত। যদি দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা কার্যকর করার পেছনে সমস্ত বামদল ও উদ্বাস্তু সংগঠন এসে দাঁড়াত এবং ডঃ রায়ের অনুপ্রাণিত নেতৃত্ব পেত তাহলে দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনাতে প্রাণ সঞ্চারিত হতে পারত। কিন্তু তা হয়নি। সিপিআই ও অন্যান্য বামদলগুলির লক্ষ্য নিবদ্ধ ছিল পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনের দিকে। শেষ পর্যন্ত ক্যাম্পের উদ্বাস্তুদের একটি প্রাণহীন আমলাতন্ত্রের হাতেই সমর্পণ করা হল। তাতে উদ্বাস্তুরা প্রথম পশ্চিমবঙ্গে আসার পর যে অমানবিক দুর্দশা ও যন্ত্রণার মুখোমুখি হয়েছিল তারই পুনরাবৃত্তি ঘটল।

নবম অধ্যায়

# পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের কাজ: একটি পর্যালোচনা

## ভারত সরকারের পুনর্বাসন নীতি

বাঙালি উদ্বাস্তুদের সবচেয়ে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল তাদেব সংস্কৃতি চেতনা। যেখানেই তারা বসতি স্থাপন করুক না কেন তাদের ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে তাদের নাড়ির টান থেকেই যেত। ব্রিটিশ শাসনের প্রথম দিকে বাঙালিরাই প্রথম ইংরেজি ভাষায় শিক্ষিত হয়ে ওঠে। যেখানেই ব্রিটিশ ক্ষমতা বিস্তৃত হয়েছে সেখানেই ইংরেজি শিক্ষিত একটি পেশাদার শ্রেণী হিশেবে বাঙালিরা ইংরেজকে অনুসরণ করেছে। তারা দেশে ফিরে আসাব কথা ভাবেনি। কিন্তু তারা যেখানেই বসতি স্থাপন করুক না কেন সেখানেই তারা তাদের নিজস্বতা অক্ষুণ্ণ রেখেছে। তারা তাদের ভাষা, সাহিত্য, বিশিষ্ট ধর্মকে ভালোবেসেছে। ভারতে বাঙালি উপনিবেশের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল একটি কালী মন্দির ও বঙ্গীয় সাহিত্য সভা। এই অর্থেই হিরণ্ময় ব্যানার্জি বাঙালিদের ইহুদিদের সঙ্গে তুলনা করেছেন। অভিপ্রয়াত বাঙালি মন ইহুদিদের মতোই দেশে ফিরে আসার স্বপ্নে বিভোর থাকত। মাতৃভূমির সঙ্গে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার কথা তারা ভাবতেই পারেনি।

বিহার ওড়িশার দুর্গম স্থানে এবং দণ্ডকারণ্যে যাওয়ার যে অনিচ্ছা ছিল বাঙালি উদ্বাস্তুদের মনে তার বড় কারণ একটি স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী হিশেবে তাদের সত্তা মুছে যাওয়ার ভয়। যে উদ্বাস্তুরা ৫০-এর দশকে পশ্চিমবঙ্গে এসে সরকারি শিবিরে আশ্রয় নিয়েছিল তাদের অধিকাংশই ছিল কৃষিজীবী নমশূদ্র। তারা বদ্ধ গ্রামীণ সমাজে বাস করত। দেশবিভাজনের পরে পরেই তাদের স্বাভাবিক নেতা শহুরে হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী পশ্চিমবঙ্গে চলে আসে। ১৯৫০-এর প্রথম দিক থেকেই যখন মুসলমানদের উন্মত্ত আক্রমণ নমশূদ্র সমাজের উপর আছড়ে পড়ে তখন তারা দিশেহারা হয়ে পশ্চিমবঙ্গের এবং ভারতের অন্যত্র সরকারি ত্রাণশিবিরে আশ্রয় নেয়। এই সরকারি ত্রাণশিবিরে তাদের জীবন দুঃসহ হয়ে উঠেছিল। ত্রাণশিবিরের জড়োসড়ো জীবন তাদের মধ্যে এক মৃত্যুময় হতাশা এনে দিয়েছিল। তা আরো তীক্ষ্ণতর হয়েছিল যখন তারা দেখতে পেল যে তাদের দেশের লোক তাদের চায় না এবং বিদেশে তাদের এমন জায়গায় স্থানান্তরিত করা হবে যা চাষের অযোগ্য। দুর্গম স্থানে হয়তো তারা যেতে রাজি হত যদি তারা দেখতে পেত যে যেখানে তাদের বসতি দেওয়া হবে সেই স্থান আগে থেকেই তাদের পুনর্বাসনের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। আসলে তা কিছুই করা হয়নি। তাদের শুধু পশ্চিমবঙ্গ থেকে দুর্গম ও দুঃসহ স্থানে সরিয়ে দিয়ে সরকার তার কাঁধের বোঝা হালকা করতে চেয়েছিল। এ এক ধরণের মরুময় অরণ্যে তাদের নির্বাসন যেখানে তারা লোকচক্ষুর অন্তরালে তিলে

তিলে মরবে, যেখানে বাম রাজনৈতিক ধ্যান ধারণার ছোঁয়াচ লাগবে না। সভ্যতার আলোক থেকে অনেক দূরে জনশূন্য স্থানে অবস্থিত এই সমস্ত ত্রাণশিবিরে তাদের অদৃষ্টে জুটেছিল প্রশাসনিক আমলাদের ঘৃণা ও অত্যাচার। তারা আমলাদের ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে থাকত এবং শত শত মানুষের মৃত্যুও হচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত তারা হাওড়া স্টেশনে পালিয়ে চলে আসে। কারণ ওইসব ক্যাম্পের আতঙ্কময় জীবনের চেয়ে পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে মৃত্যুও তারা শ্রেয় মনে করেছিল। ভারত সরকার যে তাদের কোনো সুনিশ্চিত পুনর্বাসন নীতি ছাড়াই পশ্চিমবঙ্গের বাইরে ঠেলে পাঠিয়ে দিয়েছিল তার প্রমাণ মেলে Estimates Committee-র কাছে কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রকের সচিব যে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন তা থেকে। তিনি বলেছিলেন :[১]

অন্তত প্রথম দিকে পুনর্বাসন সম্পর্কে ভারত সরকারের নীতি খুবই অনিশ্চিত ছিল। প্রথম দিকের কয়েকটি বছরে এই ধারণা ছিল যে দুই বাংলার সংস্কৃতি, ভাষা ও ঐতিহ্য এত কাছাকাছি এবং দুটি অঞ্চলই এত সংলগ্ন যে শেষ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুরা দেশে ফিরে যাবেই। এই ধারণার ফলে বেশ কিছু বছর পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসন যথোচিতভাবে অগ্রসর হয়নি। বস্তুত কোনো দৃঢ় পুনর্বাসন নীতি ছিল না। এদেশে বসতি স্থাপনের জন্য প্রয়োজন মাফিক সহায়তা দেওয়া হত মাত্র, অর্থনৈতিক পুনর্বাসনদানের জন্য সুপরিকল্পিত ভিত্তিতে কোনো পরিকল্পনা নেওয়া হয়নি। ১৯৫৫-র কোনো এক সময়ে ভারত সরকার যুক্তিসিদ্ধ ভিত্তিতে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের সমস্যার কথা চিন্তা করতে থাকে। এই চিন্তার মূল কথা ছিল এই যে কৃষিতে, ছোট ব্যবসায়ে যেখানেই পুনর্বাসন দেওয়া হোক না কেন তা দেওয়া হবে অর্থনৈতিক ভিত্তিতে। সচিবের বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে ভারত সরকার ১৯৫৫ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের প্রয়োজন মাফিক ঋণ দিয়েছে। সরকারের কোনো পুনর্বাসন নীতি ছিল না। আর্থিক সহায়তা করা হয়েছে জীবিকানির্বাহের জন্য, পুনর্বাসনের জন্য নয়। ভারত সরকার ক্রমাগতই আশা করেছে যে এরা দেশে ফিরে যাবে যদিও এই ধরণের আশার কোনো যুক্তিসহ ভিত্তি ছিল না। জনাগম কোনো সময়েই একেবারে থেমে থাকেনি। Estimates Committee-র হিশেবে দেখা যায় যে ১৯৪৬ এবং ১৯৫৮-র মধ্যে, ৪১ লক্ষ ১৭ হাজার লোক পূর্ব-পাকিস্তান থেকে চলে আসে।[২] এই সময়ে পাকিস্তান সরকারের নীতির কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। ১৯৫০-এর চুক্তি করে নেহরু এই জনাগম বন্ধ করতে চেয়েছিলেন। তাতে পশ্চিমবঙ্গ থেকে মুসলমানদের দেশত্যাগ বন্ধ হয় এবং যারা পশ্চিমবঙ্গ থেকে পূর্ব-পাকিস্তানে চলে গিয়েছিল তারা ফিরে আসে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ থেকে হিন্দুরা পশ্চিম-পাকিস্তানে ফিরে যেতে পারেনি। এতে পাকিস্তানেরই সুবিধা হল। কিন্তু হিন্দু উদ্বাস্তুদের অবস্থার বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয়নি। পাকিস্তান চুক্তি না মানা সত্ত্বেও নেহরুর পক্ষে বাঙালি হিন্দু উদ্বাস্তুদের জন্য বিশেষ কিছু করার ছিল না। কাশ্মীর তার মনকে এমনভাবে অধিকার করেছিল যে এ সময়ে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের হয়ে এমন কোনো কাজ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না যাতে তাঁর কাশ্মীর নীতি কোনোভাবে ব্যাহত হয়। তাঁর মাতৃভূমি কাশ্মীরকে ভারতের অন্তর্গত রাখতেই হবে। তার জন্য যদি পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুরা লক্ষে লক্ষে বাস্তুচ্যুত হয় তো হোক। তাছাড়া ইতিমধ্যেই বাঙালি হিন্দুদের উপর তাঁর বিরাগের একটি নতুন কারণও দেখা দিয়েছিল। তা হল তাদের বাম রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি। তিনি ১৯৪৯-এর দক্ষিণ কলিকাতার উপনির্বাচনের ফল দেখে বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন।ভোটের ব্যাপারে বাঙালি হিন্দুরা মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়। তার চেয়ে

পশ্চিমবঙ্গে গ্রামাঞ্চলে বাঙালি মুসলমান ভোটের ব্যাপারে অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য। নিছক এদেশে টিকে থাকার দায়েই তাদের কংগ্রেসকে ভোট দিতে হবে। তাছাড়া তাঁর মনে হয়তো আর-একটি আশাও লুকিয়েছিল যে পূর্ব-পাকিস্তানের মতো একটি উদ্ভট ভৌগোলিক সৃষ্টি হয়তো বেশিদিন টিকে থাকবে না।

নেহরুর মনে যেই হিশেবেই থাক না কেন তিনি পূর্ব-পাকিস্তান থেকে এই নিরন্তর জনাগম মেনে নিতে একেবারেই রাজি ছিলেন না। তিনি আশা করেছিলেন যে তারা দেশে ফিরে যাবে। অতএব ডোল দেওয়া ছাড়া তাদের জন্য আর কিছু করণীয় নেই। তিনি শুধু ক্রমাগত বলতে লাগলেন যে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে জনাগম এমন একটি বিপর্যয় যা দুঃসহ। অবশ্য পশ্চিম-পাকিস্তান থেকে জনাগম বিপর্যয় সন্দেহ নেই, তবে তা সহনীয়।

অতএব নেহরু পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে মনস্থির করতে পারেনি। তাতে ডঃ রায়ের পক্ষে সমস্যাটির সমাধান আরো দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছিল। ভারত সরকার যে ঋণ দিচ্ছিল তা দিয়ে উদ্বাস্তুদের জন্য যা করা সম্ভব তা তিনি করেছিলেন। ১৯৫০-এর মার্চ থেকে ১৯৫০-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত ২ লক্ষ ৫২ হাজার ৪শত উদ্বাস্তু (৫০ হাজার ৪ শত ৮০ উদ্বাস্তু পরিবার) সরকারি ক্যাম্পে আশ্রয় নিয়েছিল।[৩] ডঃ রায় স্থির করেন যে ক্যাম্পের সব সুস্থ সবল উদ্বাস্তুকে ১৯৫১-র ৩০ এপ্রিল নাগাদ পুনর্বাসন দেওয়া হবে।[৪] এটি একটি দুঃসাধ্য কাজ সন্দেহ নেই। ৬ হাজার উদ্বাস্তু পরিবার সরকারের উপর স্থায়ীভাবে নির্ভরশীল ছিল। কারণ এই সব পরিবারের কর্তা অথবা কর্ত্রী বয়স্ক অথবা প্রতিবন্ধী পুরুষ ও নারী। এদের বাদ দিয়ে পুনর্বাসন দান যোগ্য পরিবারের সংখ্যা দাঁড়াল ৪৪ হাজার ৪৮০[৫]। কিন্তু এদের পুনর্বাসনদানের জন্য জমি অধিগ্রহণের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল ১৯৪৮-এর **The West Bengal Land Development and Planning Act.** এই আইনে ১৯৪৮-র মূল্যমান অনুসারে জমি অধিগ্রহণের অধিকার সরকারকে দেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ এই আইন অনুযায়ী জমি অধিগৃহীত হলে মালিকরা দাম পেত বাজার দরের তুলনায় অনেক কম হারে। অতএব অধিগ্রহণের এই আইন কার্যকর হয়নি। জমির মালিকদের সংঘবদ্ধ বিরোধিতার ফলে সরকার এই আইন অনুযায়ী জমি অধিগ্রহণ করতে পারেনি।

গ্রামাঞ্চলের কৃষিজীবীদের পুনর্বাসনদানের জন্য সরকার চারটি পুনর্বাসন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল : (১) টাইপ পরিকল্পনা; (২) ইউনিয়ন বোর্ড পরিকল্পনা; (৩) বারুজীবী পরিকল্পনা এবং (৪) সবজি চাষ পরিকল্পনা। গ্রামাঞ্চলে অকৃষিজীবীদের জন্য তিনটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় : (১) টাইপ পরিকল্পনা; (২) ইউনিয়ন বোর্ড পরিকল্পনা এবং (৩) পরিবর্ত ইউনিয়ন বোর্ড পরিকল্পনা। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে টাইপ প্রকল্প ছাড়া অন্য সব কটি প্রকল্পই গ্রহণ করা হয়েছিল অনুমানের উপর ভিত্তি করে। এই প্রকল্পগুলির জন্য জমি সংগ্রহ করার চেষ্টা হয়েছিল ১৯৪৮-এর ১৬নং আইন প্রয়োগ না করে। টাইপ প্রকল্প অনুসারে সরকার অধিগৃহীত জমিতে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দেওয়া হল অথবা উদ্বাস্তুরা সরকারের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে নিজেরাই জমি কিনে নিল। তাদের গৃহ নির্মাণ, চাষবাস ও ছোট ব্যবসায়ের জন্যও ঋণ দেওয়া হল। ইউনিয়ন বোর্ড প্রকল্প অনুসারে সরকার ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টদের সহযোগিতায় এবং ইউনিয়ন বোর্ডসমূহের তত্ত্বাবধানে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দেওয়ার চেষ্টা হল। এই হল ইউনিয়ন বোর্ড প্রকল্প। ইউনিয়ন বোর্ডের পরিবর্ত পরিকল্পনা অনুসারে সেলামি দিয়ে বৃহদায়তন পতিত জমি

সংগ্রহ করে সেখানে অকৃষিজীবীদের বসতি স্থাপনের ব্যবস্থা করা হল। বারুজীবী ও সবজি চাষ প্রকল্প অনুযায়ী পান চাষ ও সবজি চাষের দ্বারা কৃষিজীবীদের পুনর্বাসন দেবার চেষ্টা হল। এই প্রকল্পগুলিতে অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের উপর জোর দেওয়া হয়নি। কেননা, কেন্দ্রীয় সরকার এতদিনেও আদৌ অর্থনৈতিক পুনর্বাসন দেওয়া হবে কিনা সে ব্যাপারে মনস্থির করতে পারেনি। এই প্রকল্পগুলির লক্ষ্য ছিল ক্যাম্প থেকে উদ্বাস্তুদের অন্যত্র বসবাসের ব্যবস্থা করা।

সব কটি প্রকল্প শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়। সরকার বুঝতে পারেনি যে উদ্বাস্তুদের মাথা গোঁজার মতো কুঁড়েঘর গড়ে দেওয়াই যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন ছিল অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করা। প্রয়োজন ছিল সুচিন্তিত পরিকল্পনার। কিন্তু সরকারের মূল লক্ষ্য ছিল উদ্বাস্তুদের ক্যাম্প থেকে অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া। উদ্বাস্তু পুনর্বাসন মূলত সৃজনশীল কাজ, বিদেশের মাটিতে ঘরছাড়া মানুষদের প্রোথিত করা। এই ঘরছাড়া মানুষদের প্রয়োজন ও মনের কথা বিবেচনা করে অগ্রসর হলেই এই কাজের সার্থকতা আসে। কিন্তু সরকার উদ্বাস্তুদের কথা ভাবেনি, ভেবেছে উদ্বাস্তু ক্যাম্প খালি করার কথা। বস্তুত সরকারের নীতি থেকে এই ধারণা হয় যে উদ্বাস্তুরা এদেশে এসে বিশ্রী ঝামেলার সৃষ্টি করেছে। এখানে আরো একটি কথাও বিবেচ্য যে সরকার একমাত্র সরকারি পরিকল্পনা ছাড়া উদ্বাস্তু সংগঠনসমূহ যে সকল পরিকল্পনা সরকারের কাছে পেশ করেছিল তা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে।

## পুনর্বাসন পরিকল্পনা সম্পর্কে ইউ সি আর সি-র বক্তব্য

১৯৫২ জুলাই-এ ইউ সি আর সি সরকারের কাছে তার প্রথম পুনর্বাসন সংক্রান্ত স্মারকলিপি পেশ করে। ১৯৫২-র নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গে ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজের পর্যালোচনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার একটি তথ্য অনুসন্ধানকারী কমিটি (**Fact Finding Committee**) গঠন করে। এই কমিটি তার প্রতিবেদন পেশ করবে একটি মন্ত্রী কমিটির কাছে। ১৯৫৩-তে এই কমিটি মন্ত্রী কমিটির কাছে তার প্রতিবেদন পেশ করে। তথ্য সংগ্রহকারী কমিটির প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে মন্ত্রী কমিটি তার সুপারিশ পেশ করে। ইউ সি আর সি-র স্মারকলিপির বক্তব্যের সঙ্গে তথ্য অনুসন্ধানকারী কমিটি ও মন্ত্রী কমিটির পুনর্বাসন সম্পর্কে সমালোচনা ও সুপারিশ মিলে যায়। এ থেকে পুনর্বাসন সম্পর্কে ইউ সি আর সি-র গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়।

ইউ সি আর সি উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য সংগ্রহের জন্য একটি কমিটি গঠন করে। ইউ সি আর সি-র স্মারকলিপি এই কমিটি যে তথ্য সংগ্রহ করে তার ফলশ্রুতি। এখানে মনে রাখতে হবে যে উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে এই প্রথম বিস্তৃত জরিপ। এর আগে তথ্য সংগ্রহকারী কমিটির নির্দেশে **Indian Statistical Institute** অত্যন্ত দ্রুত একটি নমুনা জরিপ করে মাত্র।

ইউ সি আর সি-র স্মারকলিপিতে প্রথমেই বলা হল যে পুনর্বাসনের উপর অর্থব্যয়ের পরিমাণ থেকে কতটা পুনর্বাসন হয়েছে তার হিশেব করা ভুল। কত সংখ্যক উদ্বাস্তুর কি পরিমাণ অর্থনৈতিক পুনর্বাসন হয়েছে তার সঠিক মূল্যায়ন পুনর্বাসনের অগ্রগতির উপযুক্ত ভিত্তি। পুনর্বাসন পরিকল্পনা সঠিক না হলে পুনর্বাসন প্রশাসনের পক্ষে লক্ষ

লক্ষ উদ্বাস্তুর পুনর্বাসনের সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। সরকার ধরে নিয়েছে যে পুনর্বাসনদানের প্রথম পদক্ষেপ হল স্থায়ী বাসস্থানের ব্যবস্থা করা, জীবিকানির্বাহী পেশার ব্যবস্থা পরবর্তী পদক্ষেপ। এই নীতি ভুল। এতে আশ্রয়ের ব্যবস্থার প্রাথমিকতা স্বীকৃত। সরকারের মতে জীবিকানির্বাহী পেশার ব্যবস্থা গৌণ। স্মারকলিপিতে বলা হয় যে সরকারের সব অবাস্তব পুনর্বাসন পরিকল্পনার মূলে এই অযৌক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি।

উদ্বাস্তুদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের কোনো সমন্বিত পরিকল্পনা ছিল না সরকারের। পরিকল্পনাগুলি খণ্ড খণ্ড ও বিচ্ছিন্নভাবে পরিকল্পিত হয় এবং পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির সঙ্গে এদের যুক্ত করা হয়নি। সামগ্রিকভাবে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির একটি সাধারণ পরিকল্পনার অঙ্গীভূত হয়নি এই পরিকল্পনাগুলি। বস্তুত সরকারের পুনর্বাসন নীতি শেষপর্যন্ত গিয়ে দাঁড়িয়েছিল এইরকম : গৃহনির্মাণের জন্য একপ্রস্ত ঋণ। এই ঋণ দেওয়ার সময় বিবেচনা করা হত না যে যেখানে চাষবাস অথবা ব্যবসায়ের জন্য ঋণ দেওয়া হচ্ছে সেখানে তা আদৌ সম্ভব কিনা। এই ধরণের নীতি ব্যর্থ হতে বাধ্য ছিল। এতে যে বিপুল অর্থ ব্যয় হত তা উদ্বাস্তুদের কোনো কাজে লাগত না। পুনর্বাসন নীতির মূল কথা হওয়া উচিত ছিল উদ্বাস্তু পরিবারগুলির অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করা। তাহলে অন্য সব কিছু আপনা থেকেই আসত।

একটি ব্যাপক পুনর্বাসন পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য কি প্রয়োজন তা স্মারকলিপিতে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়। প্রথমত পূর্ববর্তী পরিকল্পনা সমূহ কী করেনি তা জানা প্রয়োজন; দ্বিতীয়ত দেশে কত উদ্বাস্তু আছে তার সঠিক পরিসংখ্যান প্রণয়ন এবং তৃতীয়ত কতটা জমি উদ্বাস্তুদের পুনর্বসতির জন্য পাওয়া যেতে পারে সে বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা আবশ্যিক। এই তিনটির একটি সম্পর্কেও সরকারের বিশেষ কোনো ধারণা ছিল না। রাজ্যে কত উদ্বাস্তু আছে এবং কতটা উদ্বৃত্ত জমি পুনর্বাসনের জন্য পাওয়া যেতে পারে তার কোনো পরিসংখ্যান ছিল না সরকারের। ১৯৬১-র আদমসুমারিতে (সেন্সাস) উদ্বাস্তুদের একটি পরিসংখ্যান আছে। কিন্তু ১৯৬১-র আদমসুমারিতে উদ্বাস্তুদের যে সংখ্যা দেখানো হয়েছে তার চেয়ে উদ্বাস্তুদের সংখ্যা বেশি ছিল। কেননা অনেক উদ্বাস্তু উদ্বাস্তু হিশেবে তাদের নাম লেখায়নি।

সরকার যেসব পুনর্বাসন পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছিল তার পেছনে বৈধ পবিসংখ্যানের কোনো সমর্থন ছিল না। পুনর্বাসনের জন্য জমি অধিগ্রহণও সমস্যার বিষয় ছিল। নির্বিচারে জমি অধিগ্রহণ করলে ধনী দরিদ্র সকলের জমিই অধিগৃহীত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তাতে উদ্বাস্তুদের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের ক্রুদ্ধ প্রতিক্রিয়া হত। ইউ সি আর সি চায়নি জমি এভাবে অধিগৃহীত হোক।

রাজ্যে চাষযোগ্য জমির অভাব ছিল, একথা সবাই জানত। কিন্তু বন্ধ্যা ও পতিত জমি অনেক ছিল যা সেচের দ্বারা ও বন কেটে চাষযোগ্য করা যেত। পতিত জমি পুনরুদ্ধার করে তাতে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দিলে স্থানীয় লোকেদের আপত্তি করার কারণ থাকত না। কিন্তু জমি অধিগ্রহণ করতে গিয়ে সরকার সমস্যার সম্মুখীন হল। ১৯৪৮-এর The Land Development and Planning Act অনুযায়ী ১৯৪৬-এর বাজারদর অনুযায়ী সরকার জমি অধিগ্রহণ করতে পারত। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের একটি রায় নির্দেশ দেয় যে ১৯৪৬-এর ডিসেম্বরের বাজারদর অনুযায়ী জমির মালিকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া চলবে না; কেননা, তা সংবিধান বিরোধী। এতে সরকারের পক্ষে জমি অধিগ্রহণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। ইউ সি আর সি তার স্মারকলিপিতে তাই জমি অধিগ্রহণের জন্য

সংবিধান সংশোধনের কথা বলে। এখানে উল্লেখ্য যে মন্ত্রী কমিটিও ওই একই সুপারিশ করেছিল। স্মারকলিপিতে কৃষিজীবী ও অকৃষিজীবী উদ্বাস্তুদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের জন্য একটি খশড়া পরিকল্পনা পেশ করা হয়।

## কৃষিজীবীদের জন্য পরিকল্পনা

(১) পতিত ও অনুর্বর জমি দ্রুত অধিগ্রহণ করে উদ্বাস্তুদের শ্রমের দ্বারাই তা পুনরুদ্ধার করা হোক। যে জমিতে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনদানের ব্যবস্থা করা হবে সেই জমির কাছেই কর্মশিবির (work site camps) স্থাপন করে উদ্বাস্তুদের সেখানে নিয়ে রাখা হোক। জমির পুনরুদ্ধারের জন্য যা কিছু প্রয়োজন তা তাদের দেওয়া হোক। জমির পুনরুদ্ধারের কাজ সম্পন্ন হলে অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের জন্য আর্থিক সহায়তা দেওয়া হোক।

(২) সামগ্রিকভাবে গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনা এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্প বিকাশের ভার সরকারকে নিতে হবে। গ্রামোন্নয়নের জন্য জমিতে সেচের, শিক্ষার এবং গ্রামীণ স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৩) কামার, কুমোর, বিদ্যালয়ের শিক্ষক, জেলে, গ্রামের চিকিৎসক প্রভৃতির মতো অকৃষিজীবী পরিবার যারা গ্রামের অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত তাদের উপযুক্ত সংখ্যায় কৃষিজীবী পরিবারের সঙ্গে মিশ্রিত করে তাদের সঙ্গেই পুনর্বাসন দিতে হবে। মন্ত্রী কমিটিও এই একই সুপারিশ করেছিল।[৬]

## অকৃষিজীবীদের জন্য পরিকল্পনা

অকৃষিজীবী পরিবারদের জন্য জীবিকানির্বাহী পেশার ব্যবস্থা করতে হবে এবং তাদের কর্মস্থলের কাছাকাছি আবাসনের ব্যবস্থাও করতে হবে। নির্বিচারে ব্যবসার জন্য ঋণ দেওয়া বন্ধ করতে হবে। কেননা, উদ্বাস্তুরা এই ঋণকে কাজে লাগাতে পারছিল না। বরং অকৃষিজীবীদের উপযুক্ত কর্মসংস্থান করে দেওয়া ভালো। রাষ্ট্রীয় মালিকানায় শিল্প প্রতিষ্ঠা করে উদ্বাস্তুদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে এবং বেসরকারি শিল্পপতিদের শিল্প প্রতিষ্ঠায় উৎসাহিত করতে হবে। উদ্বাস্তু অধ্যুষিত অঞ্চলেই এই সব শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। এই সব শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও তার তত্ত্বাবধান করার দায়িত্ব পুনর্বাসন দপ্তরের একার হবে না। শিল্পদপ্তর ও সমবায় দপ্তরকে এই কাজে যুক্ত করতে হবে। মন্ত্রী কমিটিও এই একই সুপারিশ করেছিল।

## ত্রাণ ও কর্মশিবির (work site camp)

সরকারি ক্যাম্পে উদ্বাস্তুদের অলসভাবে দিন কাটাতে হত। স্মারকলিপিতে এই ক্যাম্পগুলিকে যথাসম্ভব শীঘ্র তুলে দেবার কথা বলা হয়। ইতিমধ্যে উদ্বাস্তুদের যেখানে পুনর্বাসন দেওয়া হবে সেখানে কিছু উদ্বাস্তু কর্মশিবির গড়ে তোলা হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল উদ্বাস্তুরা তাদের শ্রম দিয়ে তাদের পুনর্বসতির ব্যবস্থা করবে এবং সে জন্যেই কর্মশিবির প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। কিন্তু এই পরিকল্পনা কার্যকর করা হয়নি। উদ্বাস্তুদের

প্রকৃতপক্ষে বন্দী শ্রমিকদল হিশেবে ব্যবহার করা হয়েছিল। মাটিকাটার জন্য একাধিক স্থানে তাদের নিয়ে যাওয়া হত। কর্মশিবির স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য ছিল এইসব শিবিরের কাছাকাছি স্থানে উদ্বাস্তুদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসন। কিন্তু তা করা হয়নি। স্বভাবতই উদ্বাস্তুদের মধ্যে এই জাতীয় কাজের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে ওঠে এবং সরকার উদ্বাস্তুদের উপর নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা নেয়। কর্মশিবিরগুলো যাতে কার্যকর হয় সেজন্য স্মারকলিপিতে কিছু সুপারিশ ছিল। (১) পুনর্বাসনের স্থানেই কর্মশিবির গড়ে তুলতে হবে, (২) কর্মশিবিরে ঠিক তত সংখ্যক উদ্বাস্তু থাকবে পুনর্বসতির স্থানের উন্নয়নের কাজ সম্পন্ন হলে যাদের সেখানে পুনর্বসতি দেওয়া হবে। (৩) উদ্বাস্তুরা পরিকল্পনাটি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল থাকবে। (৪) উদ্বাস্তু পরিবারগুলিকে উপযুক্ত কাজ এবং প্রয়োজন হলে সাহায্য দিতে হবে, উপযুক্ত মজুরি দিতে হবে। (৫) কর্মশিবিরের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে হবে। বসবাসের, পানীয় জলের এবং চিকিৎসার উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে।

## পশ্চিমবঙ্গের বাইরে পুনর্বাসন

পশ্চিমবঙ্গ সরকার পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুদের জন্য জমি অধিগ্রহণ এবং জীবিকানির্বাহী পেশার ব্যবস্থা করতে পারেনি। তা থেকে এই ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল যে পশ্চিমবঙ্গ উদ্বাস্তুতে ভর্তি হয়ে গেছে এবং নতুন উদ্বাস্তু ধারণের ক্ষমতা পশ্চিমবঙ্গের নেই। তাই বিপুলসংখ্যক উদ্বাস্তুকে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু তাতে বিপর্যয় ঘটে। বিহার এবং ওড়িশায় উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের সরকারি প্রয়াসের ব্যর্থতার মূল কারণ এই যে সেখানে পুনর্বাসনের কোনো পরিকল্পনাই ছিল না। পশ্চিমবঙ্গকে উদ্বাস্তুমুক্ত করাই ছিল তাদের বাইরে পাঠানোর মূল উদ্দেশ্য। পুনর্বাসনের ব্যর্থতার অন্যান্য কারণের মধ্যে ছিল অপরিচিত পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও স্থানীয় মানুষের ঘৃণা। সরকারি প্রশাসন তো এদের কীটপতঙ্গের মতো দেখত। স্বভাবতই অধিকাংশ উদ্বাস্তুই পশ্চিমবঙ্গে ফিরে চলে আসে, দেশে এসেছিল এই ভেবে যে তারা অন্তত কিছুটা সহানুভূতি পাবে। তারা ভুল বুঝেছিল; তাদের প্রতি কোনো সহানুভূতি ছিল না সরকারের। বরং এভাবে ফিরে আসায় তাদের ডোল কেটে দেওয়া হয়েছিল। তাদের সংগঠন ইউ সি আর সি তাদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছিল। অকল্যান্ড হাউসের গেটে এবং মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে উদ্বাস্তুদের মিটিং, মিছিল, বিক্ষোভের নেতৃত্ব দিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত সরকারকে ডোল চালু করতে হয়েছিল। যদিও শাস্তিস্বরূপ ডোলের পরিমাণ কিছুটা কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই শাস্তিকে অমানবিক বলা যেতে পারে। উদ্বাস্তুরা নিরুপায় হয়ে ফিরে চলে এসেছিল। তথাকথিত পুনর্বাসনের ব্যর্থতাই উদ্বাস্তুদের ফিরে চলে আসার মূল কারণ। ইউ সি আর সি-র স্মারকলিপিতে বলা হয় যে কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন করলে উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবঙ্গের বাইরে পাঠানো যেতে পারে : (১) পশ্চিমবঙ্গের কাছকাছি জায়গায় পুনর্বাসন দেওয়া যেতে পারে, (২) সুনির্দিষ্ট পুনর্বাসন পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্যই তাদের বাইরে পাঠানো উচিত, (৩) উদ্বাস্তুদের তাদের জাতীয় পদ্ধতি অনুযায়ী পুনর্বাসন ও বিকাশের পরিপূর্ণ সুযোগ দিতে হবে।

ইউনিয়ন বোর্ড এবং ইউনিয়ন বোর্ডের পরিবর্ত প্রকল্পগুলি পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছিল

এবং এই প্রকল্পের ব্যর্থতার ফলে উদ্বাস্তুরা সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিল। আসলে এই দুটি প্রকল্পের মধ্য দিয়ে পুনর্বাসনের কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। এই প্রকল্পের মাধ্যমে উদ্বাস্তুদের লোকচক্ষুর অন্তরালে পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত গ্রামে নির্বাসিত করা হয়েছিল। ক্ষুধার তাড়নাতেই উদ্বাস্তুরা এইসব স্থান থেকে চলে আসে। কিন্তু পুনর্বাসনের স্থান থেকে যারা চলে এসেছিল তাদের সরকার অস্পৃশ্য বলে মনে করছিল। স্মারকলিপিতে বলা হয় যে পুনর্বাসনের স্থানে উপযুক্ত সাহায্য দিয়েই একমাত্র স্থান ত্যাগ বন্ধ করা যেতে পারে। স্মারকলিপিতে পুনর্বাসন দপ্তরের প্রশাসনিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তনের কথা বলা হয়। একথা সকলেরই জানা ছিল যে কেন্দ্র ও রাজ্যসরকারের মধ্যে সম্পর্কের তিক্ততার জন্য পুনর্বাসন পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণ ব্যর্থ হয়েছিল। স্মারকলিপিতে বলা হয় যে পুনর্বাসন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তার বাস্তব রূপায়ণের পূর্ণ ক্ষমতা রাজ্য সরকারকে দেওয়া উচিত। অবশ্য বিভিন্ন স্তরে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন পুনর্বাসন কমিটির উপর কেন্দ্রীয় সরকার নজর রাখবে এবং রাজ্য সরকার ক্ষমতার অপব্যবহার করলেই তার প্রতিরোধ করবে।

## ইউ সি আর সি-র দ্বিতীয় স্মারকলিপি : উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের দ্বিতীয় প্রস্তাব

১৯৫৮-র ১১ আগস্ট ইউ সি আর সি ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের কাছে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের দ্বিতীয় প্রস্তাবটি পেশ করে। উদ্বাস্তুদের বাইরে পাঠাবার প্রধান কারণ ছিল যে পশ্চিমবঙ্গে আর উদ্বাস্তু ধারণের জায়গা নেই। এই দ্বিতীয় স্মারকলিপিটি এই ধারণার বিরোধিতা করে। ক্যাম্প উদ্বাস্তুদের সংখ্যা এবং পশ্চিমবঙ্গে লভ্য উদ্ধারযোগ্য পতিত ও অনুর্বর জমির পরিমাণ অত্যন্ত সতর্কভাবে জরিপ করে ইউ সি আর সি এই সিদ্ধান্তে আসে যে পশ্চিমবঙ্গে আরো উদ্বাস্তু পুনর্বাসন দেওয়া যেতে পারে। এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে ইউ সি আর সি-র যুক্তি নীচে দেওয়া হল :

ইউ সি আর সি ক্যাম্পের উদ্বাস্তুদের সংখ্যার যে হিশেব করে তা থেকে স্পষ্ট হয় যে পুনর্বাসন মন্ত্রকের দেওয়া হিশেবে (no. 1/18/58 H+C) ক্যাম্পের উদ্বাস্তুদের যে সংখ্যা দেখানো হয়েছে প্রকৃত সংখ্যা তারও অনেক বেশি। কেন্দ্রীয় সরকারের হিশেব অনুযায়ী এই সংখ্যা ২·৭৬ লক্ষ। নীচের সারণিতে এই সংখ্যার হিশেব দেওয়া হল :[৮]

**সারণি নং—১**

| বিভিন্ন ধরণের শিবির | মোট সংখ্যা | পবিবারেব সংখ্যা |
|---|---|---|
| (ক) অস্থায়ী কলোনি ও ক্যাম্প | ২·০৭ লক্ষ | ৪১,২০০ |
| (খ) পি এল ক্যাম্প অথবা সরকারের স্থায়ী দায়িত্বাধীন ক্যাম্প এবং পীড়িতাবাস | ·৫৪ ,, | ১০,৪০০ |
| (গ) ভবঘুরেদের ক্যাম্প | ·০৮ ,, | ২,০০০ |
| (ঘ) শিয়ালদহ প্ল্যাটফর্মবাসী উদ্বাস্তু | ·০৭ ,, | ১,৯৩৫ |
| মোট | ২·৭৬ ,, | ৫৫,৫৩৫ |

৫৫,৫৩৫ পরিবারের মধ্যে ১০,৪০০ সরকারের স্থায়ী দায়িত্বাধীন ক্যাম্প এবং পীড়িতাবাসের বাসিন্দা। এই সব পরিবারের সঠিক তথ্য নিয়ে দেখা গেছে যে ওদের অর্ধেকের বেশি পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া যাবে না। তাই পুনর্বাসনদান যোগ্য পরিবারের সংখ্যা কমে দাঁড়াল ৫০,০০০ যার মধ্যে ৩৫,০০০ কৃষিজীবী এবং ১৫,০০০ অকৃষিজীবী। এই ৩৫,০০০ কৃষিজীবী পরিবারের মধ্যে যারা বায়নানামা প্রকল্পের আওতায় গিয়েছে অথবা বায়নানামা প্রকল্প অনুযায়ী নিজেরাই নিজেদের জমি বেছে নিতে রাজি আছে তাদের সংখ্যা ১৬,০৯৬। বায়নানামা প্রকল্পে যেতে ইচ্ছুক যে সমস্ত পরিবার সরকারি অনুমোদন লাভের অপেক্ষায় রয়েছে তাদের সংখ্যা ১৩,২৭৬। তাদের পুনর্বাসন দিলে সরকারি শিবির অনেকটা ফাঁকা হয়ে যায়। যদি ধরে নেওয়া হয় যে এই পরিবারগুলোর শতকরা ৩০ ভাগ অকৃষিজীবী তাহলেও অন্তত ৯,৬৮৭ পরিবার বায়নানামা প্রকল্পের মাধ্যমে নিজেরাই জমি খুঁজে নিতে পারে। তাই পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে যে কৃষিজীবী পরিবারদের জন্য জমি অধিগ্রহণ করতে হবে তাদের সংখ্যা ২৫,৩১৮। তাই বিকল্প প্রস্তাবের সিদ্ধান্ত হল :[৯] (১) ২৫,৩১৮ কৃষিজীবী পরিবারের জন্য জমি অধিগ্রহণ করা, (২) ১৫,০০০ অকৃষিজীবী পরিবারের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা, (৩) ৪০,৩১৮ পরিবারের জন্য গৃহনির্মাণের ও পুনর্বাসনের সহায়তার ব্যবস্থা করা।

সরকারি পুনর্বাসন পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতিটি কৃষিজীবী পরিবারের জন্য ৯ বিঘা কৃষিজমি এবং ১০ কাঠা গৃহনির্মাণের জমি বরাদ্দ ছিল। প্রতি পরিবারের জন্য ১০ বিঘা করে হিশেব করলে ২৫,৩১৮ কৃষিজীবী পরিবারের পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজন হয় ২·৬ লক্ষ বিঘা বা ৮৭ হাজার একর চাষযোগ্য জমি এবং গৃহনির্মাণের জন্য অতিরিক্ত ২৯,০০০ একর জমি। অর্থাৎ সবসুদ্ধ ১·১৬ লক্ষ একর জমি। এটা মোটামুটি ধরে নেওয়া যেতে পারে যে গৃহনির্মাণযোগ্য প্রয়োজনীয় জমি পশ্চিমবঙ্গে সহজেই লভ্য। কিন্তু আসল কথা হল ১·১৬ লক্ষ একর সংস্কারযোগ্য পতিত জমি পশ্চিমবঙ্গে লভ্য কিনা।

## পুনর্বাসন সমস্যা

ছিন্নমূল মানুষের জন্য পুনর্বাসন পরিকল্পনায় এই মানুষগুলির মানসিক উপাদান বিশেষ করে মনে রাখতে হবে। উদ্বাস্তুদের ইচ্ছা অনিচ্ছা উপেক্ষা করে যদি কোনো পূর্বনির্দিষ্ট ছাঁচে এই পরিকল্পনা তৈরি করা হয়, তাহলে তা ব্যর্থ হতে বাধ্য। পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসনের গভীর ইচ্ছা ছিল উদ্বাস্তুদের মনে। এখানে আবহাওয়া ও মাটি দুই-ই অনুকূল এবং এখানে তারা তাদের মাতৃভাষা ব্যবহার করতে পারত। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে পুনর্বাসনে তাদের সহযোগিতা পেতে হলে সরকারের উচিত ছিল তাদের বোঝানো যে পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসনের কোনো সম্ভাবনাই নেই। তাছাড়া, বিহার ও ওড়িশাতে যেসব উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য গিয়েছিল তাদের নিদারুণ দুর্গতি উদ্বাস্তুদের মনে বাইরে যাওয়ার ব্যাপারে ভীতির সঞ্চার করেছিল। বেতিয়ায় গুলিচালনা এবং চরবেতিয়ায় দমনমূলক ব্যবস্থা বাইরে পুনর্বাসন সম্পর্কে উদ্বাস্তুদের মনে গভীর অবিশ্বাসের সৃষ্টি করেছিল। তার প্রমাণ উদ্বাস্তুদের স্বতঃস্ফূর্ত সত্যাগ্রহ আন্দোলন।

১৯৫৪-তে মন্ত্রিকমিটি পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসনের দাবিকে অযৌক্তিক বলে মনে করে

নি। বরং বলেছিল এ বিষয়ে আর অগ্রসর হওয়া উচিত নয়। কমিটি সরকারকে এই পরামর্শ দিয়েছিল যে যতটা ভালোভাবে সম্ভব পশ্চিমবঙ্গেই তাদের পুনর্বসতি দান করার ব্যবস্থা করা উচিত।[১০] কমিটি বাগজোলা ও সোনারপুরে অতিরিক্ত জমি পুনরুদ্ধারের প্রয়োজনের কথা বলেছিল। কমিটি এও বলেছিল যে অকৃষিজীবীদেরও পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব।[১১]

এই রিপোর্টে পশ্চিমবঙ্গেই উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনদানের পথনির্দেশ করা হয়েছিল। বস্তুত সরকারও এই কমিটির নির্দেশ মেনে নিয়েছিল বলে মনে হয়। কেননা, সরকার প্রকাশ্যভাবেই ঘোষণা করেছিল যে কমিটির সুপারিশ সরকারের ভবিষ্যৎ পুনর্বাসন নীতির ভিত্তি। কিন্তু এই বছরেই মেহেরচাঁদ খান্না খবরের কাগজে বিবৃতি দিয়ে বলেন যে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব নয় বলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার মনে করে কারণ ১৯৫৫-৫৬-র প্রচণ্ড জনাগমে পরিস্থিতি পরিবর্তিত হয়েছে।[১২]

পরিস্থিতি পরিবর্তিত হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। ১৯৫৪-র জুনে সরকারি ক্যাম্পে ১৮·৪ হাজার পরিবার ছিল। ১৯৫৮ নাগাদ এই সংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছিল ৫৫ হাজারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও একটি কথা থেকে যায় যে মন্ত্রিকমিটি উদ্বাস্তুদের ১৯৫৫-র মার্চের আগে পুনর্বাসনের কথা বলেছিল।[১৩] ১৯৫৪-র জুনের আগের উদ্বাস্তুরা তখনো ক্যাম্পে ছিল। তার জন্য পুনর্বাসনমন্ত্রী মেহেরচাঁদ খান্না দোষারোপ করলেন উদ্বাস্তুদের। তাঁর মতে তারা উদ্বাস্তু ক্যাম্প ছেড়ে চলে যেতে চায়নি। কিন্তু মন্ত্রীর এই বক্তব্যের যথার্থ্য ছিল না। ১৯৫৪-তে মন্ত্রিকমিটি পশ্চিমবঙ্গে পতিত জমির সেচ ও পুনরুদ্ধারের পরিকল্পনা কার্যকর করার কথা বলেছিল। এই সব জমিতে শুধু কৃষিজীবী পবিবারেরই পুনর্বসতি দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। এদের অন্যতম হল হেরোভাঙা প্রকল্প। এতে ১১০০০ একর জমি পুনরুদ্ধার করে ২০০০ উদ্বাস্তু কৃষিজীবী পবিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া যেত। ভারত সরকারের গড়িমসির জন্য এই প্রকল্প কার্যকর হয়নি। সালানপুরের প্রকল্প অনুরূপভাবে বাদ দেওয়া হয়েছিল। অথচ পশ্চিমবঙ্গের বাইরে পতিত জমি পুনরুদ্ধারের পরিকল্পনা দ্রুত কার্যকর করা হচ্ছিল। এ জমি আদৌ চাষযোগ্য হবে কি না সে বিষয়ে নজর দেওয়ার সময় ছিল না সরকারের।

রাজ্য সরকারেব দীর্ঘসূত্রিতা বায়নানামা প্রকল্প কার্যকর হওয়ার ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে। পশ্চিমবঙ্গের ভেতরে পুনর্বাসনের জন্য প্রতিটি উদ্বাস্তু পরিবারকে ২৫০০ টাকা ঋণ দেওয়া হত। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে জমির দাম হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় এই ২৫০০ টাকা দিয়ে জমি কেনা সম্ভব হচ্ছিল না। এভাবে বায়নানামা ও অন্যান্য প্রকল্প কার্যকর করা কঠিন হয়ে উঠল. অথচ পশ্চিমবঙ্গের বাইরে যেমন রাজস্থানে প্রতিটি পরিবারকে ঋণ দেওয়া হয়েছিল ৬০০০ টাকা এবং অন্যান্য রাজ্যে ঋণের পবিমাণ ছিল ৫০০০ টাকা। পশ্চিমবঙ্গে জমি কেনার জন্য স্বল্প পরিমাণ ঋণ উদ্বাস্তুদের উদ্যোগহীন করে তোলে। পরবর্তীকালে সরকারকে স্বীকার করতে হয়েছিল যে কৃষিজমি কেনার জন্য যে স্বল্প পরিমাণ ঋণ দেওয়া হত তাই ছিল জমি সংগ্রহের পথে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক। অবশ্য পরে এই ঋণের পরিমাণ প্রতি বিঘায় ১০০ টাকা থেকে ৩৫০ টাকা করা হয়। তা সত্ত্বেও সব উদ্বাস্তুকে এই সুযোগ দেওয়া হয়নি। শুধু ১৯৫৪-র জুনের আগের কিছু উদ্বাস্তু এই সুযোগ পেয়েছিল।

বস্তুত ১৯৫৪ থেকে সরকারি উদ্যোগ কেন্দ্রীভূত হয়েছিল উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবঙ্গের বাইরের রাজ্যে পুনর্বসতি দেওয়া পন্থা খুঁজে বার করতে। পশ্চিমবঙ্গে জমি খুঁজে বার

করা বা তার উন্নয়নের চেষ্টা করা হয়নি। তার ফলে জুনের আগের উদ্বাস্তুদেরও একটা বড় অংশ ক্যাম্পেই পচতে থাকে এবং ক্যাশডোল নিয়ে জীবন কাটায়। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গে জমি খুঁজে বার করার, পুনরুদ্ধারের ও উন্নয়নের কোনো আন্তরিক চেষ্টা সরকার করেনি। পুনর্বাসন প্রকল্পসমূহ অবজ্ঞাভরে কার্যকর করা হয়নি। স্বল্প পরিমাণ পুনর্বাসন সহায়তা পুনর্বাসনের প্রতিবন্ধক হিশেবে ব্যবহার করা হয়েছে এবং নানা ধরণের বাধাবিঘ্ন ও অনাবশ্যক কালহরণের দ্বারা উদ্বাস্তুদের ব্যক্তিগত উদ্যোগকে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসনের সম্ভাবনাকে কৃত্রিমভাবে নিয়ন্ত্রণ করে রাজ্যের পুনর্বাসন প্রক্রিয়াকে স্তব্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

## পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য জমির লভ্যতা

রাজ্য পুনর্বাসন মন্ত্রী পি সি সেন ১৯৫৭-র ডিসেম্বরে রাজ্য বিধানসভায় এক বিবৃতিতে পশ্চিমবঙ্গে সংস্কারযোগ্য এবং সংস্কারযোগ্য নয় এমন জমির পরিমাণের বিস্তারিত বিবরণ দেন। সরকার কতটা এই জমি ব্যবহার করেছে তারও বিবরণ তিনি দেন। নীচের সারণি থেকে তা স্পষ্ট হবে।[১৪]

সারণি—২

| | |
|---|---|
| (ক) ১৯৪৪-৪৫-এর জমি জরিপের ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গে পতিত জমির পরিমাণ | ৫·৭৮ লক্ষ একর |
| (খ) সংস্কারযোগ্য পতিত জমির পরিমাণ | ২·৪৭ ,, ,, |
| (১) সরকার অধিগৃহীত জমির পরিমাণ | ৬১,০০০ একর |
| (২) গৃহ নির্মাণ ও চাষের জন্য সরকারি ঋণ নিয়ে উদ্বাস্তুরা যে জমি কিনেছে তার পরিমাণ | ৯৭,০০০ ,, |
| (৩) উদ্বাস্তুরা স্বীয় অর্থে যে চাষযোগ্য পতিত কিনেছে তার পরিমাণ | ৫০,০০০ ,, |
| মোট (১+২+৩) | ২,০৮,০০০ একর |

উপরের পরিসংখ্যান থেকে সরকার এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে পশ্চিমবঙ্গে চাষযোগ্য পতিত জমি নিঃশেষিত। কিন্তু ১৯৪৪-৪৫-এর ইশাক কমিটির প্রতিবেদনে চাষযোগ্য পতিত জমির জেলাওয়ারি যে পরিসংখ্যান আছে এবং ১৯৫১-৫২-র ফসল জরিপ থেকে যে তথ্য পাওয়া যায় এই দুইয়ের সঙ্গেই সরকারি পরিসংখ্যানের বিস্তার ফারাক। পর পৃষ্ঠার সারণিতে তার পরিচয় পাওয়া যাবে।[১৫]

৩নং সারণি থেকে দেখা যায় যে ইশাক কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে চাষযোগ্য পতিত জমির পরিমাণ ১৯·৮৬ লক্ষ একর। ফসল জরিপের প্রতিবেদনে এই জমির পরিমাণ হল ৯·৮৬ লক্ষ একর। এই সংখ্যাও সরকারের দেওয়া হিশেবের চেয়ে বেশি। তাছাড়া, সরকার চাষযোগ্য ও চাষযোগ্য নয় এমন পতিত জমির মধ্যে যে পার্থক্য নির্দেশ করেছে তাও মেনে নেওয়া যায় না। যে জমিকে চাষযোগ্য নয় বলে ধরে নেওয়া হয়েছে বিজ্ঞানভিত্তিক সেচ পদ্ধতি প্রয়োগ করে সেই জমিকেও চাষযোগ্য করে তোলা যায়। ইশাক কমিটির রিপোর্টে যে বিলগুলিকে চাষযোগ্য নয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে তার অনেকগুলিকেই জল নিষ্কাশনের দ্বারা চাষযোগ্য করে তোলা যায়। এ প্রসঙ্গে

সারণী—৩

| জেলা | চাষ যোগ্য নয় এমন পতিত জমি : ইশাক কমিটির রিপোর্ট (হাজার একরে) | চাষযোগ্য পতিত জমি (হাজার একরে) | | মোট কৃষিজীবী উদ্বাস্তু পরিবার | মোট জনসংখ্যা (হাজারে) | | ১৯৫৭-তে উদ্বাস্তু জনসংখ্যা (হাজারে) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ইশাক রিপোর্ট ১৯৪৪-৪৫ | ফসল জরিপ ১৯৫১-৫২ | | ১৯৪১ | ১৯৫৭ | |
| বর্ধমান | ৩১৪·৪ | ১৮৮·৮ | ১১৯·৪ | ৭·২ | ১৮৯১ | ২৩৬৪ | ১৫৯ |
| বীরভূম | ১৯৩·৪ | ১০৪·১ | ৭৭·৪ | ০·২ | ১০৪৮ | ১১৬৮ | ২৪ |
| বাঁকুড়া | ৩০৬·৪ | ২৭৩·৯ | ১৯৪·০ | ০·২ | ১২৯০ | ১৪২২ | ১৬ |
| মেদিনীপুর | ৫৯৭·৭ | ৩৩১·১ | ২১৬·৩ | ০·৫ | ৩১৯১ | ৩৫৯৯ | ৪৪ |
| হাওড়া | ৬৬·১ | ১৩·২ | ৯·২ | ০·২ | ১৪৯০ | ১৬৭১ | ৯১ |
| হুগলী | ১৩২·৫ | ৫৩·৭ | ১৮·৫ | ২·৯ | ১৩৭৮ | ১৭২৯ | ১০৫ |
| ২৪ পরগণা | ৩৯১·৪ | ২১৩·৬ | ৩৩·২ | ২৪·২ | ৩৫৩৬ | ৪৯৬৩ | ৮৩৭ |
| নদীয়া | ৮২·৯ | ১২০·২ | ১৪·৫ | ৫১·৪ | ৫৭২ | ১৩৫৩ | ৬৪১ |
| মুর্শিদাবাদ | ১৯৫·৩ | ১৪১·৫ | ৪২·৯ | ৪·৩ | ১৬৪১ | ১৮৫১ | ৭৬ |
| পশ্চিম দিনাজপুর | ১৯২·৮ | ১৫৬·৮ | ৩৬·২ | ১৫·৮ | — | ৭৮০ | ১৬২ |
| মালদা | ২০০·০ | ১০৯·৩ | ১৪·৩ | ৯·০ | — | ৯৯২ | ৭২ |
| জলপাইগুড়ি | ৪৪৬·৫ | ২৭৯·৫ | ১০২·৩ | ১৪·৪ | — | ১০০৪ | ১৫০ |
| দার্জিলিং | | | ৯·৯ | ১·১ | — | ৪৭৪ | ৩০ |
| কুচবিহার | | | ৫৩·৪ | ২১·২ | — | ৮০২ | ২২৬ |
| পুরুলিয়া | | | | | | | |
| কলকাতা | | | | ০·২ | — | ২৬৮৩ | ৭৭৩ |
| মোট | ৩১১৯·৪ | | | | | ২৬৮৫৫ | ৩৪০৬ |

বাগজোলা, ঘূর্ণি, যাত্রাগাছি প্রকল্পের কথা উল্লেখ করা যায়। মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলায় যে সমস্ত জমিকে চাষযোগ্য নয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে, উপযুক্ত সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে সেই জমিকে চাষযোগ্য করে তোলা সম্ভব হতে পারে। এক সরকারি সেচ ইঞ্জিনিয়ার স্টেটসম্যান পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টারকে বলেছিলেন যে সরকার দণ্ডকারণ্য

প্রকল্প রূপায়ণের জন্য ১০০ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দ করেছেন। কিন্তু দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কংসাবতী প্রকল্পের জন্য যে ব্যয়বরাদ্দ ধরা হয়েছে তার সঙ্গে যদি অতিরিক্ত ৫০ মিলিয়ন টাকা বরাদ্দ করা হয় তবে ২ লক্ষ ৫০ হাজার একর জমিকে চাষের আওতায় আনা সম্ভব।[১৬] বস্তুত পতিত জমি পুনরুদ্ধারের চাবিকাঠি বৈজ্ঞানিক সেচব্যবস্থা। তা চাষযোগ্য এবং চাষযোগ্য নয় এমন পতিত জমির পার্থক্য মুছে দিতে পারে। শিলাবতীতে স্বয়ংক্রিয় টিউবওয়েল বসিয়ে (সাধারণভাবে যা স্যালো নামে পরিচিত) সুফল পাওয়া গিয়েছে। এই ধরণের টিউবওয়েলের মাধ্যমে সেচের ব্যবস্থা করলে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলের চেহারা পালটে যাবে। পরবর্তীকালে তাই হয়েছিল।

১৯৪৫-৪৬-এ বাঁধ নির্মাণের ফলে যে সব জমি চাষযোগ্য নয় বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল সেই সবই চাষযোগ্য জমিতে পরিণত হল। সরকার ইতিমধ্যেই ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় করে ১১,০০০ একর পতিত জমির উন্নয়নের কাজ হাতে নিয়েছিল। দু-তিন বছরের মধ্যেই এই অঞ্চলেই আরো ৪০,০০০ একর জমির উন্নয়ন সম্ভব হবে। উপরন্তু আরো ৩০,০০০ একর কৃষিজমি যা জলে ডুবিয়ে ভেড়িতে পরিণত করা হয়েছিল তাও চাষযোগ্য করা সম্ভব।[১৭] অতএব এটা পরিষ্কার যে চাষযোগ্য জমির এলাকা কোনো একটি বিন্দুতে স্থির হয়ে থাকেনি। বছর বছর এই জমি বেড়েছে এবং সেচ ও উন্নয়নের কাজ হাতে নিলে আরো অনেক বাড়বে। পরবর্তী তিন বছরে যে পরিমাণ জমিকে চাষযোগ্য করা সম্ভব তার পরিসংখ্যান স্মারকলিপিতে দেওয়া হয়েছিল। নীচের সারণিতে তা দেওয়া হল।[১৮]

### সারণি—৪

| | হাজার একরে |
|---|---|
| (১) ১৯৫১-৫২-র ফসল জরিপ অনুযায়ী উদ্বাস্তু অধিকৃত জমি বাদ দিয়ে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ | ৭০,০০০ |
| (২) সেচ ও উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে চাষযোগ্য নয় অথচ চাষযোগ্য হতে পারে এমন জমির পরিমাণ | ২০,০০০ |
| (৩) সুন্দরবন এলাকায় উন্নয়নযোগ্য জমির পরিমাণ | ৫,০০০ |
| (৪) ভেড়িকে কৃষিজমিতে পরিণত করে যে জমি পাওয়া সম্ভব তার পরিমাণ | ৩,০০০ |
| মোট | ৯৮,০০০ |

পতিত জমিতে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনদানের জন্য পরিবার পিছু খরচের সঙ্গে জমির উন্নয়ন ও ভূমি সংস্কারের খরচ যুক্ত করতে হবে। সারণিতে উল্লিখিত প্রথম শ্রেণীর ভূমি সংস্কারের জন্য একর পিছু খরচ ৩০০ টাকার মধ্যে এবং পুনর্বাসনদানের জন্য পরিবার পিছু খরচ আনুমানিক ৩০০০ টাকা। দ্বিতীয় শ্রেণীর জমির ক্ষেত্রে সেচ ও ভূমি সংস্কারের জন্য খরচ একর পিছু প্রায় ৪০০ টাকা এবং পুনর্বাসনদানের জন্য পরিবার পিছু খরচ ৪০০০ টাকার বেশি নয়। সুন্দরবন এলাকায় জমির উন্নয়নের জন্য খরচ একর পিছু প্রায় ৫০০ টাকা এবং পরিবার পিছু পুনর্বাসনের খরচ ৪৫০০ টাকার মধ্যে। ভেড়িকে কৃষি জমিতে রূপান্তরিত করতে খরচ খুবই সামান্য এবং পুনর্বাসনের জন্য পরিবার পিছু খরচ ৩০০ টাকার মধ্যে। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য যা খরচ ধরা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসনের জন্য তার চেয়ে গড় খরচ কম। ১৯৫৭-৫৮-তে কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গের বাইরে ৪২৪৬২ একর জমিতে ৭৮৩৪টি

উদ্বাস্তু পরিবারকে পুনর্বাসনের জন্য ব্যয়বরাদ্দ করেছে ৩৩ লক্ষ ৯ শত ২২ টাকা। তাতে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে পুনর্বাসনের গড়পড়তা খরচ গিয়ে দাঁড়ায় পরিবার পিছু ৪৩৩০ টাকা। রাজস্থানে ৬৬০টি পরিবারের পুনর্বাসন দেওয়ার যে পরিকল্পনা করা হয়েছে তার জন্য ৩৩ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। অতএব সেখানে পরিবার পিছু পুনর্বাসনের ব্যয় গিয়ে দাড়াচ্ছে ৫০০০ টাকাতে। স্পষ্টতই পশ্চিমবঙ্গের বাইরে চাষযোগ্য পতিত জমি অধিকতর লভ্যও ছিল না অথবা সেই জমির সংস্কার ও উন্নয়নের ব্যয়ও কম ছিল না।[১৯] স্বয়ং পি সি সেন ১৯৫৭-র ডিসেম্বরে রাজ্য বিধানসভায় তাঁর বিবৃতিতে তাৎপর্যময় এই সত্যটি স্বীকার করেছেন। পশ্চিমবঙ্গে ভূমিসংস্কার ও উন্নয়নে অনেক সময় লাগবে এবং তাতে দীর্ঘকাল উদ্বাস্তুদের ডোল দিয়ে বসিয়ে খাওয়াতে হবে এই যুক্তিও টেকে না। কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৫৫ থেকে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে ভূমি সংগ্রহ করার চেষ্টা করে আসছিল। ১৯৫৫-৫৬-তে কেন্দ্রীয় সরকার যে জমি সংগ্রহ করে তা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর এবং এই দুটি বছর উদ্বাস্তুদের ক্যাম্পে ডোল দিয়ে বসিয়েই খাওয়ানো হয়েছিল। তারপরে কেন্দ্রীয় সরকার অধিকাংশ উদ্বাস্তুকে দণ্ডকারণ্যে পুনর্বসতিদানের সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু সেখানেও পুনর্বাসনের জন্য জমি প্রস্তুত হতে তিন বছর সময়ের প্রয়োজন ছিল। যে উদ্বাস্তুদের এই মুহূর্তেই সেখানে পাঠানো হবে তাদের হয় ডোল দিয়ে বসিয়ে খাওয়াবে নয়তো এই পরিকল্পনার রাস্তা তৈরির কাজে লাগাবে। পশ্চিমবঙ্গে সরকার একই কাজ করতে পারত। এখানেও তিন বছরের মধ্যে পুনর্বাসনের জমি প্রস্তুত হওয়া সম্ভব ছিল।

অতএব এই সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে যে জমির অলভ্যতা বা উন্নয়নেব খরচ অথবা সময় কোনোটিই পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের প্রতিবন্ধক হয়নি। যদি ভূমি সংস্কার ও উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ মঞ্জুর করা হত তাহলে ক্যাম্প উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসন না দিতে পারার কোনো কারণ ছিল না। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে সব কৃষিজীবী পরিবারকে জমিতে পুনর্বাসন না দিলেও চলত। এদের মধ্যে অনেক পরিবার ছিল যারা সুযোগ পেলে পেশা পরিবর্তন করতে রাজি ছিল।

গ্রামীণ অকৃষিজীবী পরিবারদের সম্পর্কে বলা যায় যে তাদের অনেক পরিবারকেই ১:১০ হারে কৃষিজীবীদের মধ্যেই বণ্টন করে দেওয়া সম্ভব ছিল। তাছাড়া তাদেব পুনর্বাসনের জন্য আরো কিছু প্রকল্পও হাতে নেওয়া যেত যেমন কল্যাণী, সগুনা, পাটনী, ভায়েনার বিলে মাছের চাষের প্রকল্প।

## পুনর্বাসনের জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠার প্রকল্প

১৯৫৪ পর্যন্ত সরকার উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা কথা ভেবে দেখেনি। জনমতের চাপে সরকার ক্যাম্প উদ্বাস্তুদের কর্মসংস্থানের জন্য শিল্পপতিদের উৎসাহিত করে এবং শিল্পস্থাপনে সরকারি সহায়তার কথা বলে। এই নীতি অনুযায়ী সরকার ২০টি প্রকল্প মঞ্জুর করে।[২০] কিন্তু এ নীতি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। অভিজ্ঞতা থেকে সরকারের এই শিক্ষা হল যে উদ্বাস্তুদের কর্মসংস্থান হতে পারে একমাত্র সরকারি উদ্যোগে শিল্প স্থাপন করলে। ইউ সি আর সি-র স্মারকলিপিতে সরকারি উদ্যোগে শিল্পস্থাপনের একটি ব্যাপক পরিকল্পনা করা হয়েছিল। কুপার্স ক্যাম্পকে একটি শিল্প উপনগরী হিশেবে গড়ে তোলার প্রস্তাব ঘোষণা করেছিল সরকার। কিন্তু ঘোষণা পর্যন্তই।

তার বাইরে আর কিছু করা হয়নি। স্মারকলিপিতে শান্তিপুরের তাঁতীদের কাঁচামাল সরবরাহের জন্য স্পিনিং মিল স্থাপনের পরামর্শ দেওয়া হয়। কুপার্স ক্যাম্পে ১৬০০ অকৃষিজীবী পরিবার ছিল। ১৫০০ লোকের কর্মসংস্থান হয় এমনভাবে এই মিলটিকে তৈরি করতে বলা হয়েছিল। নদীয়া জেলার ধুবুলিয়া ক্যাম্পের পাশাপাশি প্রচুর আখের উৎপাদন হয়। এই অঞ্চলে একটি চিনির কারখানা স্থাপন করা যেতে পারে যেখানে অন্তত ১০০০ লোকের কর্মসংস্থান হওয়া সম্ভব ছিল। উত্তরবঙ্গে একটি নিউজ-প্রিন্টের কারখানা প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছিল। স্মারকলিপিতে মেদিনীপুর জেলায় সাবুই ঘাস ও বাঁশ থেকে কাগজ তৈরির কারখানার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। ডিজেল পাম্পসেট তৈরির কারখানার কথাও বলা হয়। স্মারকলিপির একটি সংযোজনে ৫০০০০ কৃষিজীবী ও অকৃষিজীবী পরিবারের পুনর্বাসনের জন্য এই সব প্রস্তাব লিপিবদ্ধ করা হয়। স্মারকলিপির হিশেব অনুযায়ী এই সব পরিবারকে পুনর্বাসনদানের ব্যয় সর্বসাকুল্যে ২০ কোটি টাকার বেশি নয়। পরিশেষে স্মারকলিপিতে এই তীক্ষ্ণ মন্তব্য করা হয় যে উল্লিখিত সব পরিকল্পনা কার্যকর করলে যা ব্যয় হবে তা পশ্চিম-পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের জন্য যা ব্যয় করা হয়েছে তার চেয়ে অনেক কম।

স্মারকলিপি এই ধারণার খণ্ডন করে যে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুদের জন্য এক তিল ঠাঁই নেই এবং তাদের রাজ্যের বাইরে পাঠিয়ে দিতে হবে। এতে বলা হয় যে পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু ধারণের ক্ষমতা কতটা তা ভালোভাবেই জেনেই তবে তাদের পশ্চিমবঙ্গের বাইরে পাঠানো যেতে পারে। উদ্বাস্তুদের বিহার ও ওড়িশায় পুনর্বাসনের জন্য পাঠানোটা মারাত্মক ভুল হয়েছিল। বিহার ও ওড়িশা সরকার জানিয়েছিল যে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনদানের জন্য কোনো জমি তাদের কাছে নেই। বস্তুত বিহার ও ওড়িশা থেকে শত শত লোক প্রতি বছর কলকাতা ও তার শিল্পাঞ্চলে জীবিকার সন্ধানে চলে আসে। অতএব এর চেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার আর কি হতে পারে যে কেন্দ্রীয় সরকার উদ্বাস্তুদের জোর করে সেই বিহার ও ওড়িশাতেই পুনর্বাসনের জন্য ঠেলে পাঠিয়ে দিল। অথচ পুনর্বাসনের কোনো ব্যবস্থা সেখানে করা হল না। শুধু ডোল দিয়ে তাদের শিবিরে পচে মরার পথ প্রশস্ত করে দেওয়া হল। এভাবে দেশান্তরে পাঠিয়ে দেওয়া এক প্রকারের নির্বাসন। প্রকৃতপক্ষে সরকার তাই চেয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গে থাকলে উদ্বাস্তুরা কমিউনিজমের মতো ছোঁয়াচে রোগ দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যের পক্ষে তা ভালো নয়। অতএব রাজ্যের বাইরে যেখানে হোক তাদের পাঠিয়ে দাও। তাদের পশ্চিমবঙ্গের কাছাকাছি রাখাও চলবে না। তাহলেও ছোঁয়াচ লেগে যেতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে বেশ কিছুটা দূরে লোকচক্ষুর অন্তরালে জনশূন্য প্রান্তরে পাঠিয়ে দাও। তাহলে কিছুটা নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে। ডঃ মেঘনাদ সাহা প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে পশ্চিমবঙ্গে যদি তাদের রাখা সম্ভব না হয় তবে তাদের আসাম ও ত্রিপুরায় পুনর্বাসন দেওয়া হোক। কিন্তু তাও কেন্দ্রীয় সরকারের মনঃপূত হয়নি।[২১] দণ্ডকারণ্যে পতিত জমি উদ্ধারের জন্য যে বিপুল অর্থ ব্যয় করার প্রস্তাব করা হয়েছিল তার একভগ্নাংশও শুধু আসাম ও ত্রিপুরাতে ব্যয় করলে উদ্বাস্তুদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসন দেওয়া যেত।

উদ্বাস্তুরা পশ্চিমবঙ্গের বাইরে পুনর্বাসনের জন্য যেতে চায়নি। একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। তাদের উত্তরপ্রদেশ এবং আন্দামন ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে পাঠানো হয়েছে। তারা সেখান থেকে ফিরে আসেনি। তারা সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গভীর জঙ্গল কেটে সাফ করেছে, পতিত জমি উদ্ধার করেছে, নিজেরা প্রতিষ্ঠিত হয়ে সৌভাগ্যের মুখ দেখেছে।

আন্দামান দ্বীপের জমি তাদের পছন্দসই, জঙ্গল যতই বিপদসঙ্কুল হোক না কেন আবহাওয়া, মাটি ও বর্ষাকালটা পূর্ববঙ্গের মতোই। একবার সমুদ্র পার হওয়ার প্রাথমিক অনিচ্ছা কাটিয়ে ওঠার পরই তারা স্বেচ্ছায় আন্দামানে তাদের নতুন জমিতে চলে গিয়েছিল। রাজ্য সরকারও তাদের সেখানে পাঠাতে আগ্রহী ছিল। উদ্বাস্তুরাও আগ্রহী ছিল, কেননা এই নতুন দেশকে তারা তাদের পুরোনো দেশের আদলে গড়ে তুলতে চেয়েছিল। প্রথমদিকে ইউ সি আর সি উদ্বাস্তুদের আন্দামানে পাঠাবার বিরোধী ছিল। কিন্তু যখন দেখা গেল যে উদ্বাস্তুরা সেখানে যেতে ইচ্ছুক তখন ইউ সি আর সি চুপ করে গেল। তাহলে এই দ্বীপপুঞ্জে উদ্বাস্তুদের প্রবাহ বন্ধ হল কিভাবে? হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় সতর্কভাবে এর কারণ দেখিয়েছেন।[২২] কেন্দ্রীয় সরকারই এই দ্বীপপুঞ্জে উদ্বাস্তুদের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করেছিল। স্পষ্টতই এই দ্বীপপুঞ্জ পশ্চিমবঙ্গের একটি অংশে পরিণত হোক কেন্দ্রীয় সরকার তা চায়নি। তা স্পষ্ট হয় ডঃ আর কে চক্রবর্তীর একটি প্রশ্নের উত্তরে ১৯৭৪-এর ৩ ডিসেম্বর রাজ্যসভায় কেন্দ্রীয় শ্রম ও পুনর্বাসনমন্ত্রী আর কে খাদিলকারের বক্তব্য থেকে। খাদিলকার স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন যে কেন্দ্রীয় সরকার আন্দামানকে ভিন্নভাবে গড়ে তুলতে চাইছেন। কেননা আন্দামানের সুরক্ষার প্রশ্নটির দিকেও লক্ষ রাখতে হবে। তার উত্তরে ডঃ চক্রবর্তী বলেন যে এ থেকে কি ধরে নিতে হবে যে বাঙালিরা আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে পুনর্বসতি পেলে ভারতের নিরাপত্তার ঝুঁকি থাকবে? এই দ্বীপপুঞ্জে বিপুলসংখ্যক উদ্বাস্তুদের পুনর্বসতি দেওয়া যেত। কেন্দ্রীয় সরকার যদি এই প্রবাহ স্তব্ধ করে না দিত তাহলে উদ্বাস্তুদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের সমস্যার সমাধান হয়তো সহজতর হত এবং দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনার প্রয়োজন নাও হতে পারত। উদ্বাস্তু জনসংখ্যার একটি সুবৃহৎ অংশ এই দ্বীপপুঞ্জ, আসাম, ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বসতি পেতে পারত। এই সব কটি জায়গাতেই উদ্বাস্তুরা নিজেদের দেশ বলে ভাবতে পারত। আসাম এবং ত্রিপুরার অবস্থান ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল অনুকূল ছিল। সেখানে তারা স্বেচ্ছায় যেত। বস্তুত তারা অনেকেই সেখানে চলে যায় এবং প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহলে সরকার তাদের বিহার ও ওড়িশায় পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিল কেন? দণ্ডকারণ্যেই বা নিয়ে গেল কেন যেখানে কোনো চাষযোগ্য জমি নেই, সেচের সুযোগ নেই? ১৯৫৪-তে মন্ত্রিকমিটির রিপোর্টে সুপারিশ করা হয়েছিল যে যতটা সম্ভব পশ্চিমবঙ্গেই যেন উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়। রাজ্য সরকার এই সুপারিশ গ্রহণ করেনি এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে জানিয়ে দেয় যে পশ্চিমবঙ্গে আর তিলধারণের জায়গা নেই। হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় লক্ষ করেছেন যে এই সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। ১৯৫০-এ যখন পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুদের ঢল নামতে শুরু করে তখন এই পীড়িত মানুষগুলোর জন্য পশ্চিমবঙ্গবাসীর সহানুভূতি ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে মানুষের মেজাজ পালটে যায়। উদ্বাস্তুরা যখন জাবরদখল কলোনির আন্দোলন শুরু করল এবং সরকার যখন উদ্বাস্তুদের জন্য জমি অধিগ্রহণ করতে লাগল তখন পশ্চিমবঙ্গের মানুষ প্রথমদিকে সরকারি জমি অধিগ্রহণে শঙ্কিত এবং পরে বিরোধী হয়ে উঠল। হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন যে পশ্চিমবঙ্গের তিলধারণের কোনো ক্ষমতা নেই, এই ধারণা সঠিক নয়। পশ্চিমবঙ্গ থেকে উদ্বাস্তুদের দূরে সরিয়ে দেবার আসল কারণ ছিল স্থানীয় অধিবাসীদের ভোটের জন্য দুশ্চিন্তা।[২৩] রাজ্য সরকার পুনর্বাসন দিতে চায়নি, চেয়েছিল কাঁধের উদ্বাস্তুদের বোঝা ঝেড়ে ফেলে দিতে; পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে কংগ্রেসের নিরাপদ ভোট ব্যাঙ্ক অটুট রাখতে। উদ্বাস্তুদের শুধু পশ্চিমবঙ্গের বাইরে ঠেলে

দিলেই চলবে না, তাদের এতটা দূরে রেখে দিতে হবে যাতে সেখান থেকে তারা পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক স্বাস্থ্যের কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে না পারে। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের সন্নিহিত অঞ্চলেও উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের কথা ভেবে দেখা হল না। কারণ তাতে পশ্চিমবঙ্গের ভেতরে ও বাইরে উদ্বাস্তুদের মধ্যে যোগাযোগের পথ খোলা থাকতে পারত। এই অর্থে দণ্ডকারণ্য বাঙালি উদ্বাস্তু খালাস করার আদর্শ আঁস্তাকুড়। ডঃ আর কে চক্রবর্তী ১৯৭৪-এর ৩ ডিসেম্বর রাজ্যসভায় দণ্ডকারণ্যের উদ্বাস্তুদের অবস্থা সম্পর্কে যে বিবৃতি দেন তা থেকে এই উক্তির সত্যতা স্পষ্ট হবে। তিনি বলেন, "গত ১৪ বছর ধরে দণ্ডকারণ্যে কী চলছে? সরকারি প্রশাসকদের অপদার্থতার জন্য এই বিরাট অঞ্চলে উদ্বাস্তুদের পুনর্বসতি দেওয়া যায়নি। হাজার হাজার মানুষ ক্যাম্প ছেড়ে চলে যাচ্ছে। সম্প্রতি আমরা শুনেছি এ সকল ক্যাম্পে গুলিচালনা করা হয়েছে এবং কিছু লোকও মারা গেছে। উদ্বাস্তুদের দণ্ডকারণ্যে নিয়ে যাওয়ার ১৪ বছর পরও সেখানে তাদের পুনর্বসতি দেওয়া সম্ভব হল না কেন?

উদ্বাস্তুদের রাজ্যের বাইরে পাঠানোর পেছনে ছিল সরকারের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য। ঠিক এই কারণেই সরকার উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য ইউ সি আর সি-র বিকল্প প্রস্তাবকে কোনো গুরুত্ব দেয়নি। বিকল্প প্রস্তাব কোনো রাজনৈতিক দলিল ছিল না, ছিল সরকারি তথ্য থেকে আহৃত পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে একটি সুচিন্তিত পুনর্বাসনের পরিকল্পনা। সরকারের এই প্রস্তাবকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা উচিত ছিল। সরকার যে এই প্রস্তাব সতর্কভাবে পরীক্ষা করে দেখেছিল তার কোনো প্রামাণ নেই। অথচ এতে এই পীড়িত রাজ্যের ভবিষ্যৎ বিকাশের রূপরেখা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে আঁকা হয়েছিল। সেচ ও অন্যান্য উপায়ে ভূমি সংস্কার ও উন্নয়নের একটি বিরাট পরিকল্পনা কার্যকর করাব কথাও এতে বলা হয়েছিল। স্বয়ংক্রিয় নলকূপ বসিয়ে জমি সেচের সম্ভাবনার দিকেও অঙ্গুলি নির্দেশ করা হয়েছিল। বস্তুত এতে পশ্চিমবঙ্গের সবুজ বিপ্লবের আদি রূপরেখা ব্যাখ্যা করা হয়েছিল। ৯·৮ লক্ষ একর জমিতে ৫০,০০০ কৃষক পরিবারকে পুনর্বসতি দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। এই ৫০,০০০ পরিবার নিজেরাই নিজেদের জমি চাষ করত। এতে পশ্চিমবঙ্গে ভূমি ব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটত। এটি একটি দৃষ্টান্ত হয়ে থাকত এবং নেহরুর আধুনিকীকরণ আদর্শের ভিত্তি ভূমি হিশেবে পরিগণিত হতে পারত। কিন্তু চোখে ঠুলি পরা যে মানুষেরা সরকার চালাচ্ছিলেন তাদের একমাত্র উৎসাহ ছিল ঘাড়ের বোঝা ঝেড়ে ফেলার এবং ক্ষমতা ও সুযোগসুবিধার জন্য কংগ্রেসের ভেতরে আত্মকলহে মগ্ন হওয়া।

এই স্মারকলিপি থেকে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের সমগ্র প্রশ্নটি সম্পর্কে ইউ সি আর সি-র দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। ইউ সি আর সি উদ্বাস্তু পুনর্বাসনকে এক যুগ্ম প্রয়াস হিশেবে দেখেছিল। ইউ সি আর সি বিশ্বাস করত যে সরকার ও উদ্বাস্তুদের পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা শেষ পর্যন্ত সমস্যার একটি আদর্শ সমাধান নিয়ে আসবে। উদ্বাস্তুদের সঙ্গে দায়িত্বশীল মানুষের মতো ব্যবহার করা উচিত ছিল। ধরে নেওয়া উচিত ছিল যে তাদেরও অন্যান্য মানুষের মতো ইচ্ছা অনিচ্ছা আছে। যে কোনো পুনর্বাসন পরিকল্পনার সাফল্য উদ্বাস্তুদের ঐচ্ছিক সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু সরকারের সঙ্গে উদ্বাস্তুদের সম্পর্ক ছিল শত্রু দেশের বন্দীদের সঙ্গে সম্পর্কের মতো। তাদের একটি বন্দী শিবির থেকে আর একটি বন্দী শিবিরে নিয়ে যাওয়া হত, ডোল দিয়ে তাদের পেট ভরানো হত এবং সরকারের ইচ্ছানুযায়ী যে কোনো কাজ তাদের করতে দেওয়া হত।

ইউ সি আর সি চেয়েছিল সরকার উদ্বাস্তুদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসুক। উদ্বাস্তু সংগঠনগুলোর সঙ্গে আলোচনা করে রাজ্যের ভেতরে ও বাইরে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন বিষয়ক নীতি নির্ধারণ করুক। যদি দেখা যায় যে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে পুনর্বাসন দেওয়া ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই, তাহলে সেই বিশেষ সত্যটি উদ্বাস্তুদের বুঝে নেওয়ার জন্য সময় দেওয়া ভালো যাতে শেষ পর্যন্ত একটি সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব হয়। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে কোথায় তাদের পুনর্বাসন দেওয়া হবে সে বিষয়েও উদ্বাস্তুদের মতামত নেওয়া প্রয়োজন।

ইউ সি আর সি একটি যুগ্ম প্রয়াসের কথা বলেছিল। এমন একটি দুঃসাধ্য সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ যার সমাধান যুগ্ম প্রয়াস ছাড়া সম্ভব ছিল না। অথচ সরকার সে পথে যায়নি। সোজা বিপর্যয়ের পথে হেঁটেছে। সরকারের নীতি পূর্ববঙ্গের কৃষকদের সবচেয়ে সৃজনশীল অংশকে নিরুপায় ভাঙা মানুষের দলে পরিণত করেছিল এবং পশ্চিমবঙ্গের অশেষ দুর্গতির কারণ হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গ এই মানুষগুলোকে দূরে ছুঁড়ে দিয়েছিল; মানুষ থেকে তাদের অসহায় জীর্ণশীর্ণ পশুতে পরিণত করেছিল। কিন্তু তাদের হাত থেকে পশ্চিমবঙ্গ রক্ষা পায়নি। তারা কোনো জায়গায় থেমে থাকেনি। তারা কেবলই ফিরে এসেছে এবং শেষ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের জীর্ণ সামাজিক ও রাজনৈতিক ইমারতকে আঘাত করেছে।

## সরকারি পুনর্বাসন পরিকল্পনা সমূহ : তাদের প্রকৃতি, তারা কতটা কার্যকর হয়েছিল

পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনে সরকারি প্রচেষ্টার সঠিক মূল্যায়ন করার জন্য কতকগুলি প্রাসঙ্গিক তথ্য মনে রাখা প্রয়োজন। ত্রাণ ও পুনর্বাসন পেয়েছিল তারা যারা ১৯৪৬-এর অক্টোবর এবং ১৯৫৮-র মার্চের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে এসে সরকারি ত্রাণশিবিরে আশ্রয় নিয়েছিল। ১৯৫৮-র মার্চ পর্যন্ত সর্বসমেত ৩১·৩২ লক্ষ বা সাধারণভাবে ৩২ লক্ষ উদ্বাস্তু এসেছিল। এদের মধ্যে শতকরা ২৫ জন অর্থাৎ ৭·৯২ লক্ষ বা ৮ লক্ষ সরকারি ত্রাণশিবিরে আশ্রয় নিয়েছিল। এরাই সরকারি পুনর্বাসনের আওতায় এসেছিল। অবশিষ্ট ৭৫ শতাংশ সরকারি শিবিরে আশ্রয় নেয়নি। তারা সরকারি ক্যাম্পের প্রায় পাশবিক জীবনকে মেনে নিতে পারেনি; নিজেরাই নিজেদের পুনর্বাসনের চেষ্টা চালিয়েছিল। অধিকাংশ সরকারি পুনর্বাসন পরিকল্পনাই সরকারি ক্যাম্পের সাধারণভাবে ৮ লক্ষ উদ্বাস্তুর জন্য করা হয়েছিল। যে ২৪ লক্ষ উদ্বাস্তু ক্যাম্পে আশ্রয় নেয়নি তাদের মধ্যে ১৫ লক্ষ টাইপ-লোন পেয়েছিল। অর্থাৎ বাস্তুভিটা কেনার জন্য ঋণ, কৃষি জমি, গরু, লাঙল, গৃহনির্মাণ, ছোটখাটো ব্যবসায়ের জন্য ঋণ। শেষ পর্যন্ত সবসুদ্ধ ২৩ লক্ষ (ক্যাম্পবাসী ও অ-ক্যাম্পবাসী) কোনো না কোনো ধরণের পুনর্বাসন সহায়তা পেয়েছিল। অবশিষ্ট ৯ লক্ষ কোনো পুনর্বাসন সহায়তা পায়নি। যারা ১৯৪৬-এর অক্টোবর ও ১৯৫৮-র মার্চের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে এসেছিল সরকার তাদের পুরোনো উদ্বাস্তু (old-migrants) নামে চিহ্নিত করল। এর উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব-পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তুপ্রবাহ বন্ধ করে দেওয়া। কিন্তু প্রবাহ বন্ধ হয়নি, তারা আসতেই থাকে।

১৯৬৪-র জানুয়ারি থেকে এ প্রবাহ বিপুল বেগে বইতে থাকে। ১৯৬৪-র জানুয়ারি

এবং ১৯৭১-এর মার্চের মধ্যে ১১·১৪ লক্ষ মানুষ ভারতে চলে আসে। তাদের মধ্যে ৬ লক্ষ পশ্চিমবঙ্গে থেকে যায়। সরকার পুরোনো উদ্বাস্তু নাম প্রচলন করে নতুন উদ্বাস্তুদের অস্বীকার করতে চাইছিল। এই অস্বীকৃতি আর সম্ভব হল না। তাদের উদ্বাস্তু বলে স্বীকৃতি দান করতে হল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যবস্থা করা হল যে যারা পশ্চিমবঙ্গের বাইরে সরকারি ক্যাম্পে আশ্রয় নেবে শুধু তারাই ত্রাণ ও পুনর্বাসন সহায়তা পাবে।

সুতরাং উদ্বাস্তুদের আবার স্বীকার করে নিতে হল এবং এই স্বীকৃতির ফলে উদ্বাস্তুরা তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ল, এভাবে উদ্বাস্তুদের তিনটি ভাগে বিভক্ত করার উদ্দেশ্য ছিল একটি সময়সীমা নির্ধারণ করা যার পর কোনো ত্রাণ ও পুনর্বাসন সহায়তা দেওয়া হবে না। স্পষ্টতই বোঝা যায় সরকার পূর্ব-পাকিস্তান-উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সহায়তা বন্ধ করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছিল। কারণ, ইতিমধ্যে পাঞ্জাবের পশ্চিম-পাকিস্তানি উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। শুধু কিছু ছোটখাটো সমস্যা বাকি ছিল। ১৯৫৮-র মধ্যে এই সমস্যার সমাধান করে পুনর্বাসন মন্ত্রকই তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। অতএব কেন্দ্রীয় সরকার এই অদ্ভুত যুক্তির উপর নির্ভর করছিল : যেহেতু পুনর্বাসন সমস্যা পশ্চিমে সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন হয়েছে তাই পূর্বেও এই সমস্যার অবসান অবশ্যই ঘটেছে, যদিও তখনো নিরবচ্ছিন্নভাবে জনাগম ঘটছিল এবং কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৫৫ নাগাদ এই সমস্যার সমাধানের কথা ভাবতে শুরু করেছিল।[২৪] তাই ১৯৫৮-র ৩১ মার্চ উদ্বাস্তু আগমনের শেষ সময়সীমা নির্ধারিত হয়েছিল। কিন্তু সেখানে সরকার দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি। অতএব পূর্ব-পাকিস্তানি উদ্বাস্তুরা তিনটি নামে চিহ্নিত হয়ে যায়: (১) যারা ১৯৪৬-এর অক্টোবর ও ১৯৫৮-র মার্চের মধ্যে এসেছে তাদের নাম দেওয়া হল পুরোনো উদ্বাস্তু। তাদের মোট সংখ্যা ৪১·১৭ লক্ষ। এদের মধ্যে ৩১·৩২ লক্ষ পশ্চিমবঙ্গে থেকে যায়। (২) যারা ১৯৫৮-র এপ্রিল ও ১৯৬৩-র ডিসেম্বরের মধ্যে এসেছে তাদের মধ্যবর্তী উদ্বাস্তু নাম দেওয়া যেতে পারে। সরকার তাদের উদ্বাস্তু হিশেবে স্বীকার করেনি। সুতরাং তারা কোনো সরকারি নামে চিহ্নিত হয়নি। সরকার এদের দিকে তাকিয়ে দেখেনি, তাদের কোনো পুনর্বাসন সহায়তা দেওয়া হয়নি। এভাবে জনাগমকে উপেক্ষা করে সরকার উদ্বাস্তু সমস্যাকে এড়িয়ে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু বেশিদিন তা সম্ভব হল না। পূর্ব-পাকিস্তানে দাঙ্গাহাঙ্গামায় আবার জনাগম শুরু হল। এমনভাবে প্রবল জনস্রোত এসে আছড়ে পড়ল যে সরকারের আর চোখ বুজে থাকার উপায় রইল না। এতে একটি তৃতীয় শ্রেণীর উদ্বাস্তু সৃষ্টি হল। (৩) যারা ১৯৬৪-র জানুয়ারি এবং ১৯৭১-এর মার্চের মধ্যে এল তাদের চিহ্নিত করা হল নতুন উদ্বাস্তু হিশেবে। এই নতুন উদ্বাস্তুরা পুনর্বাসন সহায়তা পাবে যদি তারা পশ্চিমবঙ্গের বাইরে পুনর্বাসন চায়। এদের মধ্যে ৬ লক্ষ উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গের বাইরে পুনর্বাসন নিতে রাজি হল না। তারা থেকে গেল এবং কোনো পুনর্বাসন সহায়তাও পেল না।

পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসনের প্রকৃতি কী ছিল এবং কতটা পুনর্বাসন হয়েছিল তা পরীক্ষা করে দেখার আগে রাজ্যে উদ্বাস্তুদের মোট সংখ্যা কত এবং কত উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সহায়তা পেয়েছিল সে বিষয়ে একটি স্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক। উদ্বাস্তুদের মোট সংখ্যা সম্পর্কে বলা চলে যে ১৯৪৬ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত তাদের পরিসংখ্যান নির্ভর তথ্য আছে। কেন্দ্রীয় সরকারের হিশেব অনুযায়ী ৪০ লক্ষ উদ্বাস্তু ১৯৪৬-এর অক্টোবর ও ১৯৭১-এর মার্চের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসে। এই ৪০ লক্ষের মধ্যে তাদের সংখ্যা নেই যারা ১৯৫৮-র এপ্রিল ও ১৯৬৩-র ডিসেম্বরের মধ্যে এসেছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের

হিশেব অনুযায়ী তাদের সংখ্যা ৫৫ হাজার।[২৫] এতে তাদেরই ধরা হয়েছে যারা সরকারি চেকপোস্ট পার হয়ে এসেছে। ১২০০ মাইল লম্বা অরক্ষিত সীমান্ত যারা পেরিয়ে এসেছে তারা এই হিশেবের মধ্যে নেই। একটি হিশেব অনুযায়ী তাদের সংখ্যা ২ লক্ষ ৫০ হাজার (২·৫ লক্ষ)।[২৬] বছরে ২·৮ শতাংশ হিশেবে এরা বেড়েছে তা ধরে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাস্টার প্ল্যান হিশেব করেছে যে ১৯৭১-এ সর্বসাকুল্যে উদ্বাস্তুদের সংখ্যা ছিল ৫৮ লক্ষ। ১৯৭৪-এ পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিকল্পনা কমিশনের কাছে যে হিশেব দেয় তাতে দেখা যায় যে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুদের সংখ্যা প্রায় ৬০ লক্ষ। ১৯৭১-এর সেন্সাসে যে সংখ্যা পাওয়া যায় তার সঙ্গে এই হিশেব মিলে যায়। অবশেষে ১৯৫০-এর পরে জবরদখল কলোনিতে যে ২·১ লক্ষ উদ্বাস্তু থাকে তাদের ধরলে সামগ্রিকভাবে উদ্বাস্তুদের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ৭৬·৫ লক্ষের বা সাধারণভাবে ৮০ লক্ষে।[২৭] অতএব যে ৮০ লক্ষ উদ্বাস্তু বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে আছে তাদের মধ্যে মাত্র ২৩ লক্ষ কোনো না কোনো ধরণের পুনর্বাসন সহায়তা পেয়েছে। পরে নতুন উদ্বাস্তুদের কিছু ছোটখাটো সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছিল। সবসুদ্ধ বর্তমান উদ্বাস্তু জনসংখ্যার ২৮·৩ শতাংশ কোনো না কোনো ধরণের পুনর্বাসন সহায়তা পেয়েছিল।

সুতরাং মোট উদ্বাস্তু জনসংখ্যার হিশেব জানা গেল; কত উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সহায়তা পেয়েছিল তা জানা গেল। এবার পুনর্বাসন সহায়তার জন্য সরকার কত অর্থ ব্যয় করেছে তা দেখা যেতে পারে। যদিও টাকা খরচের পরিমাণ দিয়ে বোঝা যাবে না যে প্রকৃত পুনর্বাসন কতটা হয়েছিল। কেননা প্রথম দিকের পুনর্বাসন পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছিল। ১৯৫৪ নাগাদ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে পাঁচটি পুনর্বাসন পরিকল্পনার মধ্যে চারটিই পরিত্যক্ত হয়েছে। একমাত্র টাইপ প্রকল্পটি ছাড়া অন্য কোনো প্রকল্পই উদ্বাস্তুদের কোনো কাজে আসেনি।

## তথ্য সংগ্রহকারী কমিটির (Fact Finding Committee) প্রতিবেদন : ১৯৫২ পর্যন্ত পুনর্বাসনের কাজ

১৯৫৩-র জুনে তথ্য সংগ্রহকারী কমিটি তার প্রতিবেদন পেশ করে। এই প্রতিবেদন পশ্চিমবঙ্গে ত্রাণ ও পুনর্বাসনের বিভিন্ন দিক খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে এবং বিভিন্ন সরকারি পরিকল্পনা কিভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে সে বিষয়ে পরিসংখ্যান নির্ভর তথ্য পেশ করে। উদ্বাস্তু ক্যাম্প ও কলোনির অবস্থাও এই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। প্রতিবেদনের মূল কথাগুলি নীচে দেওয়া হল :

ক্যাম্পবাসীদের ৬০ শতাংশ কৃষিজীবী। তাদের পুনর্বাসন এবং ক্যাম্প থেকে অপসারণ নির্ভর করছে কৃষি জমির লভ্যতার উপর। জমি খুঁজে পাওয়া না গেলে ক্যাম্পবাসীদের ক্যাম্প থেকে সরানো কঠিন। ক্যাম্পগুলির অবস্থা স্বাস্থ্যসম্মত নয়। ১৯৫২-র ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত সরকারি দায়িত্বাধীন স্থায়ী ক্যাম্প ও হোমের অধিবাসীর সংখ্যা ছিল ৩৪ হাজার। উদ্বাস্তু আগমন বেড়ে যাওয়ায় তাদের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ৩৭ হাজারে।[২৮]

# পুনর্বাসন

প্রতিবেদন পুনর্বাসনের বিভিন্ন দিককে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে :

(১) গ্রামীণ পুনর্বাসন, (২) কৃষি, (৩) শহুরে পুনর্বাসন এবং (৪) শিক্ষা, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ।

এই চারটি প্রকল্প কিভাবে কার্যকর হয়েছিল সে বিষয়েও এই প্রতিবেদনে পরিসংখ্যান নির্ভর তথ্য পাওয়া যায়। এই প্রকল্পগুলি কী পরিমাণে গৃহনির্মাণে সহায়তা করেছিল এবং জীবিকানির্বাহী পেশায় উদ্বাস্তুদের নিযুক্ত করতে পেরেছিল তারও কিছুটা ধারণা পাওয়া যায়।

# গৃহনির্মাণ কার্যে সহায়তা

শহুরে এলাকায় ৩১৮৬ পরিবারকে গৃহনির্মাণ ঋণ দেওয়া হয়। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় গঠিত কলোনির ২১০০০ পরিবারকে গৃহনির্মাণ ঋণ দেওয়া হয় এবং তারা গৃহনির্মাণ করে। ক্যাম্পের অধিবাসী এবং ক্যাম্পের অধিবাসী নয় এই উভয় শ্রেণীর লোককেই গৃহনির্মাণ ঋণ দেওয়া হয়। প্রতিবেদনের হিশেব অনুযায়ী ১·৫ লক্ষ পরিবারের গৃহনির্মাণের ব্যবস্থা করা হয়।

# জীবিকানির্বাহী নিযুক্তি

কী পরিমাণ জীবিকা নির্বাহী নিযুক্তির ব্যবস্থা করা হয়েছিল তার সঠিক হিশেব খুঁজে পায়নি তথ্য সংগ্রহকারী কমিটি। শুধু ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনসটিটিউটের জরিপ থেকে জানা গিয়েছিল যে ১৪ শতাংশ উদ্বাস্তু পরিবার স্বনির্ভর। সুতরাং জীবিকানির্বাহী নিযুক্তির পরিমাণ জানার জন্য কমিটি বিভিন্ন পুনর্বাসন প্রকল্পের কাজ পর্যালোচনা করে দেখে। গ্রামাঞ্চলে কৃষিজীবী পরিবারের পুনর্বাসনের জন্য চারটি প্রকল্প ছিল।

(১) টাইপ প্রকল্প,
(২) ইউনিয়ন বোর্ড প্রকল্প,
(৩) বারুজীবী প্রকল্প,
(৪) সবজি চাষ প্রকল্প।

(১) সাধারণ টাইপ স্কিম অনুযায়ী উদ্বাস্তুদের সরকার অধিগৃহীত জমি অথবা জমি কেনার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ ঋণ দিত। উদ্বাস্তুরা দরদাম করে নিজেরাই জমি কিনত। কিন্তু তারা ঋণ ও অনুদান হিশেবে পুনর্বাসন সহায়তা পেত। ঋণ ও অনুদানের সর্বোচ্চ পরিমাণ ছিল পরিবার পিছু ১৯০০ টাকা। তার মধ্যে ছিল ৫৫৫ টাকা গৃহনির্মাণের জন্য, কৃষিঋণ বাবদ ৬০০ টাকা, ৬ মাস জীবিকা নির্বাহের জন্য এবং যেখানে প্রয়োজন সেচ ও ভূমি সংস্কারের জন্য ঋণ দেওয়া হত যথাক্রমে ১০০ ও ৫০০ টাকা একর পিছু। এর মধ্যে ১ মাসের নগদ ডোলও অন্তর্ভুক্ত ছিল। জমির পরিমাণ নির্দিষ্ট ছিল পরিবার পিছু ২ একর।

(২) ইউনিয়ন বোর্ড প্রকল্পে সরকার ইউনিয়ন বোর্ড প্রেসিডেন্ট ও স্থানীয় স্কুল শিক্ষকদের সক্রিয় সহায়তায় বোর্ডের বিভিন্ন মৌজায় উদ্বাস্তুদের ছোট ছোট দলে বিভক্ত

করে পুনর্বাসন দিতে চেয়েছিল। এই প্রকল্পের সাফল্য নির্ভর করছিল স্থানীয় মানুষ ও ইউনিয়ন বোর্ডের কর্মচারীদের সহযোগিতা ও সাহায্যের উপর। উদ্বাস্তুরা তা পায়নি। এই প্রকল্প অনুযায়ী জমি কেনার জন্য উদ্বাস্তুদের কোনো ঋণ দেওয়া হত না। তাতে পুনর্বাসন ক্ষেত্রে উদ্বাস্তুরা নিজেদের টাকা দিয়ে কেনার মতো জমি খুঁজে পায়নি। এই প্রকল্প পুরোপুরি ব্যর্থ হয়।

(৩) বারুজীবী প্রকল্প অনুযায়ী গড়ে ০·৬৬ একর পরিমাণ জমি পান চাষের জন্য দেওয়া হয়েছিল। আরো দেওয়া হয়েছিল ৮ কাঠা বাস্তুজমি। সেচের ব্যবস্থা না থাকায় এই প্রকল্পও ব্যর্থ হয়।

(৪) সবজি চাষ প্রকল্পও বারুজীবী প্রকল্পের মতো ব্যর্থ হয়। এই প্রকল্প ফলপ্রসূ হয়নি কারণ যাদের এই প্রকল্পে নিযুক্ত করা হয়েছিল তাদের অধিকাংশই অকৃষিজীবী নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর এবং তাদের সবজি চাষের কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। জমিও সবজি চাষের উপযুক্ত ছিল না, সেচের ব্যবস্থাও ছিল না। কলকাতা থেকে দূরে অবস্থানের জন্য উপযুক্ত বাজারও ছিল না।

## অকৃষিজীবী উদ্বাস্তু

গ্রামীণ অকৃষিজীবী উদ্বাস্তুদের জন্য তিনটি প্রকল্প ছিল :

(১) টাইপ প্রকল্প,

(২) ইউনিয়ন বোর্ড প্রকল্প

(৩) ইউনিয়ন বোর্ডের পরিবর্ত প্রকল্প।

(১) টাইপ প্রকল্প অনুযায়ী গ্রামীণ অকৃষিজীবী উদ্বাস্তুদের সরকার উন্নত বাস্তুভিটা দিত অথবা তারা বাস্তুভিটা কেনার জন্য ঋণ পেত। এই প্রকল্পে ঋণ ও অনুদানের সর্বোচ্চ পরিমাণ ছিল ১১৭৫ টাকা। তার মধ্যে ৫০০ টাকা গৃহনির্মাণ ঋণ, ৫০০ টাকা ছোট ব্যবসায়ের ঋণ, জীবিকানির্বাহী ঋণ এবং ১ মাসের নগদ ডোল। যারা নিজেরা দরদাম করে জমি কিনত তাদের প্রতি প্লটের জন্য ৭৫ টাকা ঋণ দেওয়া হত।

(২) কৃষিজীবীদের জন্য ইউনিয়ন বোর্ড প্রকল্পের মতোই ছিল অকৃষিজীবীদের ইউনিয়ন বোর্ড প্রকল্প। এই প্রকল্প পুরোপুরি ব্যর্থ হয়।

(৩) ইউনিয়ন বোর্ডের পরিবর্ত প্রকল্প অনুযায়ী বৃহদায়তন পতিত জমিতে সেলামি দিয়ে উদ্বাস্তু বসানোর চেষ্টা হয়েছিল। জমিদারদের সক্রিয় সহযোগিতা নিয়ে তাদের প্রজা হিশেবেই এদের বসানোর ব্যবস্থা হয়েছিল। এই প্রকল্পও পুরোপুরি ব্যর্থ হয়।

## শহরাঞ্চলে পুনর্বাসন

শহরাঞ্চলে অনেক উদ্বাস্তু পরিবার নিজেরাই পুনর্বসতি নেয়। তাদের বিভিন্ন ধরণের পুনর্বাসন সহায়তা দেওয়া হয়েছিল যার মধ্যে ছিল গৃহনির্মাণের জন্য ঋণ, ছোট ব্যবসায়ের জন্য ঋণ অথবা পেশাগত ঋণ। সরকারি ক্যাম্প থেকে অকৃষিজীবী পরিবারদের নিয়ে শহরাঞ্চলে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় কলোনি স্থাপিত হয়। এরকম ৮৩টি কলোনি ছিল। তাতে পরিবারের সংখ্যা ছিল ২১,৫০০। যে সব কলোনি শহরের কাছাকাছি অবস্থিত ছিল তারা শহরে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে নেয়। কিছু কিছু কলোনি

গ্রামাঞ্চলে স্থাপিত হয়েছিল অথচ তাদের শহুরে কলোনি বলেই ধরা হত। এরকম দুটি কলোনি তাহেরপুর ও গয়েশপুর। এদের জনসংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৫,০০০ ও ১০,০০০। এই সব কলোনিতে জীবিকানির্বাহী নিযুক্তির সুযোগ ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। ১৯৫২-র সেপ্টেম্বর নাগাদ ১৭,৫০০ পরিবারকে শহরাঞ্চলে ব্যবসায় ও বাণিজ্যের জন্য ঋণ দেওয়া হয়েছিল। সবসুদ্ধ ঋণের পরিমাণ ছিল ৯১·৩৪ লক্ষ টাকা। ১০৪৭ জন আইনজীবী, ডাক্তার, কবিরাজ, পেশাগত ঋণ পেয়েছিল। এই ঋণের পরিমাণ ৮·৩৬ লক্ষ টাকা।

## শিক্ষা, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ

উদ্বাস্তু শিশু এবং বয়স্কদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। স্থির হয় যে প্রত্যেক উদ্বাস্তু শিশুকে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হবে এবং তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী অবৈতনিক মাধ্যমিক শিক্ষাও দেওয়া হবে। কৃতী ও প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন ছাত্রদের কলেজীয় ও কারিগরি শিক্ষার জন্য বৃত্তি দেওয়া হবে। যে সব ছাত্রের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রবণতা আছে তাদের সেই প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

বিদ্যালয়গামী উদ্বাস্তু শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করে। তাদের সংখ্যা ১·৫ লক্ষ ধরে নেওয়া হয়। এদের জন্য ১০১৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। ১৯৫২-৫৩-তে এই সব বিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা ছিল ১·৩১ লক্ষ।

মাধ্যমিক শিক্ষা : পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণীতে পাঠরত দুঃস্থ ছাত্রদের বৃত্তি দেওয়া হত। পুনর্বাসন মন্ত্রক বিভিন্ন কলোনিতে ৯টি নতুন মাধ্যমিক স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থ মঞ্জুর করে। বিভিন্ন স্কুলের সম্প্রসারণের জন্যও অর্থ মঞ্জুর করা হয় যাতে তারা অতিরিক্ত উদ্বাস্তু ছাত্র ভর্তি করতে পারে। ২৩৮টি মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়কে ১৯৫১-৫২ পর্যন্ত ২৫·১৭ লক্ষ টাকা অনুদান এবং ৩·৩৫ লক্ষ টাকা ঋণ দিয়ে সাহায্য করা হয়েছিল।

কলেজীয় শিক্ষা : প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন ছাত্রদের কলা, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, ইঞ্জিনিয়ারিং ও পেশাগত প্রতিষ্ঠানে উচ্চশিক্ষালাভের জন্য বৃত্তি দেওয়া হত। প্রতিষ্ঠিত কলেজ সম্প্রসারণের জন্য এবং নতুন কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার অনুদান ও ঋণ মঞ্জুর করে যাতে উদ্বাস্তু ছাত্ররা এই সব কলেজে ভর্তি হতে পারে। কলকাতা শহর থেকে দূরে কলেজ স্থাপনের জন্য সরকার ৮০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করে। ১২টি নতুন ইন্টারমিডিয়েট কলেজ স্থাপিত হয়, ২০টি প্রতিষ্ঠিত কলেজ এবং ৯টি প্রতিষ্ঠিত কারিগরি শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান আর্থিক সহায়তা পায়। প্রথমদিকে স্থির হয়েছিল যে এই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৭৫ শতাংশ ছাত্র হবে উদ্বাস্তু। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে উদ্বাস্তু ছাত্রদের সংখ্যা ছিল ৫৫ শতাংশ।

সংক্ষেপে এই ছিল তথ্য সংগ্রহকারী কমিটির ১৯৫২ পর্যন্ত পুনর্বাসনের পর্যালোচনার প্রকৃতি। এ থেকে স্পষ্ট হবে যে পুনর্বাসন সমস্যার সমাধানের কোনো চেষ্টাই এ পর্যন্ত হয়নি। প্রত্যেকটি পুনর্বাসন প্রকল্প পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে। পুনর্বাসনক্ষেত্র থেকে উদ্বাস্তুরা পালিয়ে এসেছে। এ পর্যন্ত পুনর্বাসনের উদ্যোগকে অপরিকল্পিত ও অবিবেচনা প্রসূত

ব্যয়ের ইতিহাস বলেই ধরা যেতে পারে। পুনর্বাসনের জন্য সরকার অর্থ মঞ্জুর করেছে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। সরকার খতিয়ে দেখেনি যে, যে-টাকাটা মঞ্জুর করা হল তার যথোচিত ব্যবহার হল কিনা। যখন এস্টিমেট্স কমিটি পুনর্বাসন মন্ত্রকের কাছে জানতে চাইল যে পুনর্বাসন প্রকল্পগুলি কী পরিমাণ সাফল্যলাভ করেছে তখন তার উত্তর হল সে বিষয়ে তাঁর কোনো ধারণাই নেই। উত্তরপ্রদেশের পুনর্বাসন দপ্তরের ডেপুটি কমিশনারও জানতেন না যে কেন্দ্র পূর্ব-পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের জন্য যে অর্থ মঞ্জুর করেছে তা প্রকৃতই ব্যয় করা হয়েছে কিনা। পুনর্বাসন প্রকল্পের সাফল্য অথবা ব্যর্থতা সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকারেরও কোনো ধারণা ছিল না। এ বিষয়ে এস্টিমেটস্ কমিটির তিক্ত মন্তব্য হল : "কমিটির কাছে একথা আশ্চর্য মনে হয় যে যখন সমস্ত ঋণ ও অনুদান দিচ্ছে পুনর্বাসন মন্ত্রক তখন সে জানবে না কিভাবে টাকাটা মঞ্জুর করা হচ্ছে অথবা কিভাবে তা খরচ করা হচ্ছে।"

মন্ত্রী কমিটির প্রতিবেদনের ভিত্তি ছিল তথ্য সংগ্রহকারী কমিটির প্রতিবেদন। মন্ত্রী কমিটির প্রতিবেদনে বলা হয় যে পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসনের কাজ নানাকারণে স্তব্ধ হয়েছে। এই কারণগুলি হল :

(১) রাজ্যে জমির অভাব; (২) রাজ্যে জমির উপর জনসংখ্যার অতিরিক্ত চাপ; (৩) উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবঙ্গের বাইরে পুনর্বাসন নেওয়ার অনিচ্ছা; (৪) উদ্বাস্তুরা পূর্ববঙ্গের উর্বর ভূমি ও জলের প্রাচুর্যে অভ্যস্ত; অতএব তাদের জলহীন অনুর্বর ভূমিতে পুনর্বাসন নেওয়ার অনিচ্ছা।

মন্ত্রিকমিটির প্রতিবেদনে পুনর্বাসন পরিকল্পনাগুলির ত্রুটিবিচ্যুতিও উল্লেখ করা হয়। সেগুলি নীচে দেওয়া হল:

(১) পুনর্বাসন কলোনিগুলির স্থান নির্বাচন যথাযথ হয়নি।

(২) অকৃষিজীবী কলোনি গ্রামাঞ্চলে স্থাপিত হয়েছে এবং অকৃষিজীবী কলোনিতে কৃষিজীবীদের স্থান দেওয়া হয়েছে।

## পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানি উদ্বাস্তুদের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের ব্যয়ের তুলনামূলক আলোচনা

পশ্চিম-পাকিস্তানি উদ্বাস্তুদের জন্য দেশত্যাগী মুসলমানদের শূন্য জমি ও গৃহ ছিল; পশ্চিমবঙ্গে তা ছিল না। ১৯৫০-এর নেহরু লিয়াকৎ চুক্তির ফলে পশ্চিমবঙ্গত্যাগী মুসলমানদের পরিত্যক্ত ভূমি উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি! তাছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার জমি অধিগ্রহণে সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারণ করেছিল একর পিছু ১০৫০ টাকা। এই দামে উদ্বাস্তুদের জন্য চাষযোগ্য জমি সংগ্রহ করা শুধু কঠিন ছিল না, প্রায় অসম্ভব ছিল। শেষ পর্যন্ত উদ্বাস্তুদের যে জমি দেওয়া হয়েছিল তার উৎপাদন ক্ষমতা এত কম ছিল যে তাতে চাষীদের দুমুঠো খাদ্যের সংস্থান হত না। একে উপবাসের স্তরে টিকে থাকা বলা যেতে পারে, অর্থনৈতিক পুনর্বাসন নয়। চাষীদের জন্যে সরকারি পুনর্বাসনের এই ছিল অর্থ। ইতিপূর্বে লক্ষ করা গেছে যে পশ্চিমবঙ্গে ৩২ লক্ষ পুরোনো উদ্বাস্তুদের মধ্যে মাত্র ৮ লক্ষ পূর্ণ সরকারি পুনর্বাসন সহায়তা পেয়েছিল। পশ্চিম-পাকিস্তানি উদ্বাস্তুদের ৯৮ শতাংশ সরকারি ক্যাম্পে ছিল এবং তারা সবাই

পুনর্বাসন সহায়তা পেয়েছিল। পশ্চিম-পাকিস্তানি উদ্বাস্তুদের ক্যাম্পগুলি স্থায়ী হয়েছিল মাত্র ২ বছর। পূর্ব-পাকিস্তানি উদ্বাস্তুদের ক্যাম্পে ডোল দিয়ে রাখা হয়েছিল ১৪ বছর। স্বভাবতই এতকাল ক্যাম্পগুলি স্থায়ী হওয়াতে ত্রাণে অতিরিক্ত ব্যয় হয়, পুনর্বাসনে নয়। দীর্ঘকাল ধরে ত্রাণের জন্য অর্থ ব্যয় প্রকৃতপক্ষে অর্থের অপব্যয়। পশ্চিম ও পূর্ব-পাকিস্তানি উদ্বাস্তুদের জন্য ত্রাণ ও পুনর্বাসনে যে অর্থ ব্যয় করা হয়েছিল তা থেকে বোঝা যাবে যে পূর্ব-পাকিস্তানি উদ্বাস্তুরা দীর্ঘকাল ক্যাম্পে থাকায় কী পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। নীচের সারণি থেকে তা বোঝা যাবে।[২৯]

## সারণি—৫

| | |
|---|---|
| (১) পশ্চিম ও পূর্ব-পাকিস্তানি উদ্বাস্তুদের ত্রাণ ও পুনর্বাসনে মোট ব্যয় | ৪১৭·৬৮ কোটি টাকা |
| (২) ১৯৬৬-র মার্চ পর্যন্ত ত্রাণ ও পুনর্বাসনে ব্যয় | |
| (ক) পশ্চিম-পাকিস্তানি উদ্বাস্তুদের জন্য | ১৯৯·৪৭ কোটি টাকা |
| (খ) পূর্ব-পাকিস্তানি পুরোনো উদ্বাস্তুদের জন্য | ২১৮·২১ কোটি টাকা |
| (৩) ত্রাণের জন্য ব্যয় | |
| (ক) পশ্চিম-পাকিস্তানি উদ্বাস্তুদের জন্য | ৬৯·৭৮ কোটি টাকা |
| (খ) পূর্ব-পাকিস্তানি পুরোনো উদ্বাস্তুদের জন্য | ৯৬·৭৩ কোটি টাকা |

উপরের সারণির পরিসংখ্যান থেকে যা স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে তা হল পশ্চিম-পাকিস্তানি উদ্বাস্তুদের ৯৮ শতাংশের ত্রাণের জন্য ২ বছরে খরচ করা হয়েছিল ৬৯·৭৮ কোটি টাকা। পক্ষান্তরে পশ্চিমবঙ্গের ৩২ লক্ষ পুরোনো উদ্বাস্তুদের মধ্যে ৮ লক্ষের জন্য ১৪ বছরে খরচ করা হয়েছিল ৯৬·৭৩ কোটি টাকা। বাকি ১২১·৪৮ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছিল পূর্ব-পাকিস্তানি উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য। তার মধ্যে ২৬·৮৮ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছিল শিক্ষা ও চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা দেওয়াব জন্য। শেষ পর্যন্ত মাত্র ৯৪·৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ৪২ লক্ষ উদ্বাস্তুর অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের জন্য। অর্থাৎ পরিবার পিছু অর্থনৈতিক পুনর্বাসনে ব্যয় করা হয়েছিল ১১৩১ টাকা। পশ্চিম-পাকিস্তানিদের ত্রাণের জন্য ব্যয় করা হয়েছিল ৬৯·৭৮ কোটি টাকা এবং ১৪·৩২ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছিল শিক্ষা ও চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধার জন্য। পশ্চিম-পাকিস্তানি উদ্বাস্তুদের মোট সংখ্যা ছিল ৪৭·৪০ লক্ষ। তাদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের জন্য ব্যয় করা হয়েছিল ১১৫·৩৭ কোটি টাকা। এই টাকা ছাড়াও ছিল ১৯১ কোটি টাকা যা ক্ষতিপূরণ হিশেবে তাদের দেওয়া হয়েছিল। এই দুইয়ের যোগফল দাঁড়ায় ৩০৬·৩৭ কোটি টাকা। এই গোটা টাকাটাই পশ্চিম-পাকিস্তানি উদ্বাস্তুদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের জন্য ব্যয় করা হয়েছিল। অতএব পশ্চিম-পাকিস্তানি উদ্বাস্তু পরিবার পিছু অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের জন্য ব্যয় করা হয়েছিল ৩২৩২ টাকা। পূর্ব-পাকিস্তানি উদ্বাস্তু পরিবারের ক্ষেত্রে এই টাকাটা ছিল ১১৩১ টাকা। পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তান উদ্বাস্তুদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের জন্য যে টাকা ব্যয় করা হয় তার আনুপাতিক হার ৩ : ১।

# পশ্চিম-পাকিস্তানি ও পূর্ব-পাকিস্তানি উদ্বাস্তুদের ক্ষতিপূরণদানের তুলনামূলক পর্যালোচনা

পূর্ব-পাকিস্তানি উদ্বাস্তুরা কী পরিমাণ বঞ্চিত হয়েছিল তা বোঝা যাবে পশ্চিম-পাকিস্তানি উদ্বাস্তুদের নগদে ও বস্তুতে যে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছিল তা থেকে।

১৯৫০-এর এপ্রিলে নেহরু লিয়াকৎ আলি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি ১৯৫০-এর দাঙ্গার ফলে যে ব্যাপক দ্বিমুখী প্রবাহ ঘটে তা বন্ধ করার প্রয়াস। এ সময়ে ১৬ লক্ষ হিন্দু পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতে চলে আসে এবং ২ লক্ষ মুসলমান পূর্ব-পাকিস্তানে চলে যায়। এই চুক্তিতে দুদেশের উদ্বাস্তুদের দেশে ফিরে যাবার ব্যবস্থা করা হয় এবং দেশে তারা যে অস্থাবর সম্পত্তি ফেলে চলে গিয়েছিল তার সম্পূর্ণ মালিকানা ফিরে পাওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়। এই চুক্তিতে পূর্ব-পাকিস্তানি উদ্বাস্তুদের ফেলে আসা সম্পত্তির মালিকানা ফিরিয়ে দেওয়ার যে আশ্বাস দেয় তা পূর্ণ হয়নি। এর ফলে তারা ক্ষতিপূরণলাভের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। অথচ এই একই চুক্তি পশ্চিম-পাকিস্তানি উদ্বাস্তুদের জন্য ফেলে আসা স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করে।

উদ্বাস্তুদের জন্য নেহরুর করুণা ক্ষতিপূরণরূপে বিগলিত হয়ে পশ্চিম-পাকিস্তানি উদ্বাস্তুদের উপর বর্ষিত হয়। তা সম্ভব হয় নেহরু-লিয়াকৎ আলি চুক্তির ফলে। অথচ ঠিক এই চুক্তির ফলেই পূর্ব-পাকিস্তানের উদ্বাস্তুরা ক্ষতিপূরণের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। কেন্দ্রীয় পুনর্বাসনমন্ত্রী অজিতপ্রসাদ জৈনের এই দৃঢ় ধারণা ছিল যে ক্ষতিপূরণ না দেওয়া হলে পুনর্বাসন কখনো সম্পূর্ণ হয় না।[৩০] কেন্দ্রীয় নেতা ও মন্ত্রীদের বক্তব্য এই রকমই ছিল। কিন্তু তারা লক্ষ লক্ষ হৃতসর্বস্ব উদ্বাস্তু বলতে বুঝতেন পশ্চিম-পাকিস্তানি উদ্বাস্তুদের। কিন্তু পূর্ব-পাকিস্তানি উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রে এসব কথা প্রযোজ্য নয়; কেননা, তারা পুরোপুরি মানুষই নয়। পশ্চিম-পাকিস্তানি উদ্বাস্তুরা দেশবিভাজনের শিকার হয়েছিল এবং ক্ষতিপূরণ তাদের প্রাপ্য। কিন্তু যদি পূর্ব-পাকিস্তানি উদ্বাস্তুদের সর্বস্ব গিয়ে থাকে (সত্যিই গিয়েছিল কিনা সে বিষয়ে নেহরুর সন্দেহ ছিল) তাহলে সেটা তাদের দোষ। সুতরাং নেহরু তাদের 'দিল্লি চুক্তি' নামে কিছু কাগজ উপহার দিলেন এবং তাঁর করুণা ও ক্ষতিপূরণ তুলে রাখলেন পশ্চিম-পাকিস্তানি উদ্বাস্তুদের জন্য।

পাঞ্জাব, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, দিল্লি, বিহার, ওড়িশা, অন্ধ্র, তামিলনাড়ু ও মহীশূর থেকে দেশত্যাগী মুসলমানদের ফেলে যাওয়া সম্পত্তি একত্র করে কেন্দ্রীয় সরকার একটি ক্ষতিপূরণ ভাণ্ডার গড়ে তোলে। এই সম্পত্তির আনুমানিক মূল্য ছিল ১০০ কোটি টাকা। এই ১০০ কোটি টাকার সঙ্গে আরো ৯১ কোটি টাকা সরকারি অনুদান যুক্ত করা হয়। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরার দেশত্যাগী মুসলমানদের সম্পত্তি মুসলমানদের ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য দেশত্যাগী সম্পত্তি আইন করা হয়েছিল। তাছাড়া, সমগ্র ভারতবর্ষে দেশত্যাগী মুসলমানদের সমস্ত সম্পত্তি পশ্চিম-পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের জন্য ক্ষতিপূরণ ভাণ্ডারে গৃহীত হয়েছিল। এই ক্ষতিপূরণ ভাণ্ডারের মধ্যে ২০ হাজার টাকার কম মূল্যের খামার জমি ও বাড়িঘর অন্তর্গত হয়নি। মুসলমান দেশত্যাগীরা পাঞ্জাব ও হরিয়ানায় ৬০ লক্ষ একর খামার জমি এবং ৬ লক্ষ ৫০ হাজার একর গ্রামীণ গৃহ এবং অন্যান্য রাজ্যে ১০ লক্ষ একর খামার জমি ফেলে গিয়েছিল। এরা শহরাঞ্চলে ৩ লক্ষ ২ হাজার বাড়ি, দোকান, শিল্প ও

অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ফেলে যায়। এই সব সম্পত্তি পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের দেওয়া হয়। তাছাড়া সরকার আরো ২ লক্ষ ২১ হাজার বাড়ি ও দোকান এবং ১৯টি উদ্বাস্তু উপনগরী তৈরি করে। এই উপনগরীগুলিতে স্কুল, হাসপাতাল, বাজার এবং নতুন শিল্পস্থাপনের স্থান ছিল। আরো ৩০টি কলোনি তৈরি করা হয় যেখানে সবরকমের আধুনিক সুযোগ-সুবিধা ছিল। বিপুল অর্থব্যয়ে চণ্ডীগড় তৈরি করা হয়। একমাত্র দিল্লিতেই ১৪০০০ মুসলমান বাড়ি উদ্বাস্তুদের মধ্যে বণ্টিত হয়। দেশত্যাগী মুসলমানদের জমি এবং ক্ষতিপূরণের ফলে পশ্চিম-পাকিস্তানি উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন প্রক্রিয়া কতটা সহায়তা লাভ করেছিল তা এস্টিমেট্‌স্‌ কমিটির (৫৯—৬০) ৮৯তম প্রতিবেদন থেকে জানা যায়।[৩১] প্রতিবেদনে দেখা যায় যে ৫·৬৮ লক্ষ পরিবার দেশত্যাগী মুসলমানদের জমিতে পুনর্বসতি পায়। ৪·৩৫ লক্ষ পরিবার পশ্চিম-পাকিস্তানে শহরাঞ্চলে তারা যে অস্থাবর সম্পত্তি ফেলে এসেছিল তার জন্য ক্ষতিপূরণ পায়। অতএব ১০·০৩ লক্ষ উদ্বাস্তু পরিবার হয় দেশত্যাগী মুসলমানদের জমি পেয়েছিল নয়তো ক্ষতিপূরণ হিশেবে তাদের গৃহ বা দোকান পেয়েছিল। কিন্তু পশ্চিম-পাকিস্তান থেকে চলে আসা উদ্বাস্তু পরিবারের মোট সংখ্যা ছিল ৯·৪৩ লক্ষ। অর্থাৎ যত উদ্বাস্তু ছিল তাদের সংখ্যার চেয়ে যারা ক্ষতিপূরণ পেয়েছিল তাদের সংখ্যা বেশি। এ থেকে বোঝা যায় যে অনেকে প্রাপ্য ক্ষতিপূরণের দ্বিগুণ আদায় করে নিয়েছিল। ক্ষতিপূরণের জন্য অতিরঞ্জিত দাবি করা হয়েছিল। সরকার কোনোরকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করে ওই দাবি মেনে নিয়েছে। তা এস্টিমেট্‌স কমিটির চোখ এড়ায়নি। এস্টিমেটস্‌ কমিটি লক্ষ করেছে যে সরকার ১,৩১,১৭৩টি পরিবারের ১ লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরণের দাবি মেনে নিয়েছে। অথচ মোট উদ্বাস্তু পরিবারের সংখ্যা ছিল ৯ লক্ষ ৪৩ হাজার। এই দাবি সরকার মেনে নিয়েছিল। তার অর্থ এই যে পশ্চিম-পাকিস্তানে ৭·২টি উদ্বাস্তু পরিবারের মধ্যে অন্তত ১টির ১ লক্ষ টাকার সম্পত্তি ছিল। অর্থাৎ এ থেকে প্রমাণিত হয় যে পশ্চিম-পাকিস্তানি উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রে সরকারের পক্ষে অবিশ্বাস্যকে বিশ্বাস করতে কোনো অসুবিধা হয়নি।[৩২] এই ক্ষতিপূরণের বাইরেও অন্য ধরণের অর্থহীন ক্ষতিপূরণের দাবিও সরকার মেনে নিয়েছিল। এস্টিমেটস্‌ কমিটির (১৯৫৯-৬০) ৮৯তম প্রতিবেদনে এই সব দাবির একটি তালিকা পাওয়া যায়। এই সব দাবির অধিকাংশই কল্পিত। এই সব দাবি মেনে নিতেও সরকারের কোনো অসুবিধা হয়নি। বস্তুত এদেশে চলে আসার ফলে পশ্চিম-পাকিস্তানের উদ্বাস্তুরা অধিকতর বিত্তশালী হয়েছিল। এদের জন্য নেহরুর করুণা এভাবেই প্রকাশিত হয়। কিন্তু পোকামাকড়ের মতো বাঙালি উদ্বাস্তুরা নেহরুর চোখেই পড়েনি।

## পুনর্বাসন সহায়তার ধরণ

কেন্দ্রীয় পুনর্বাসনমন্ত্রী অজিতপ্রসাদ জৈনের সংজ্ঞানুযায়ী পুনর্বাসন শুধুমাত্র আবাসন ও জীবিকানির্বাহী নিযুক্তি নয়, তাঁর মতে এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যাতে শেষ পর্যন্ত উদ্বাস্তু ও অন্যান্য মানুষের মধ্যে সব পার্থক্য মুছে যায়। স্পষ্টতই জৈন যখন পুনর্বাসনের এই ব্যাপক সংজ্ঞা দিয়েছিলেন তখন তাঁর শুধু পশ্চিম-পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের কথাই মনে ছিল; পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের কথা তাঁর মাথায় আসেনি। তা না হলে

পূর্ব-পাকিস্তানের উদ্বাস্তুরা আবাসন অথবা জীবিকানির্বাহী নিযুক্তি পেল না কেন, অন্য সব তো দূরের কথা। তাদের জন্য শুধু বাক্যচ্ছটা এবং ডোল নামক ভিক্ষা। পূর্ব-পাকিস্তানি ও পশ্চিম-পাকিস্তানি উদ্বাস্তুদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের আচরণের পার্থক্য বড় স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। তা ধরা পড়ে পশ্চিম ও পূর্ব-পাকিস্তানি উদ্বাস্তুদের আবাসনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার যে সহায়তা দিয়েছে তা থেকে। নীচের সারণিতে তা দেওয়া হল ।[৩৩]

## পূর্ব ও পশ্চিমে আবাসন : একটি তুলনা

### সারণি—৬

| ৩১-১২-১৯৬০ নাগাদ নির্মিত অথবা নির্মীয়মাণ আবাসনের সংখ্যা | পশ্চিম-পাকিস্তানি উদ্বাস্তুদেব জন্য | পূর্ব-পাকিস্তানিদের জন্য |
|---|---|---|
| সরকার দ্বাবা নির্মিত | ১ ৬৬ লক্ষ | ০ ১১ লক্ষ |
| সরকারি সহায়তায় উদ্বাস্তুদেব দ্বারা নির্মিত | ০·২৭ লক্ষ | ৪ ৩২ লক্ষ |
| মোট | ১·৯৩ | ৪ ৪৩ লক্ষ |

এই সারণি থেকে বিশেষভাবে চোখে পড়ে যে কেন্দ্রীয় সরকার ১·৬৬ লক্ষ আবাসন পশ্চিম-পাকিস্তানি উদ্বাস্তুদের জন্য তৈরি করে দিয়েছিল। ২৭ হাজার বাড়ি কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তায় পশ্চিম-পাকিস্তানিরা তৈরি করেছিল। শুধু তাই নয়, সরকার দোকানঘর তৈরি করে দিয়েছিল এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ১৯টি উপনগরী নির্মাণ করেছিল। এদের মধ্যে কয়েকটির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। যথা—ফরিদাবাদ, হস্তিনাপুর, রাজপুরা, নিলখেরী, গান্ধীধাম, সারদানগর, উল্লাসনগর, গোবিন্দপুর ইত্যাদি। আধুনিক জীবনের সমস্ত নাগরিক সুযোগ-সুবিধায় সমন্বিত এইসব সুপরিকল্পিত ও স্বয়ংসম্পূর্ণ উপনগরী শিল্পায়িত শহরে পরিণত হয় এবং পশ্চিম-পাকিস্তানি উদ্বাস্তুদের নতুন জীবন ও উদ্যম দেয়।

পূর্বাঞ্চলে পূর্ব-পাকিস্তানি উদ্বাস্তুরা ৪·৪৩ লক্ষ আবাসন তৈরি করে। প্রত্যেকটি আবাসনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদান ছিল গ্রামীণ ও শহরাঞ্চলের জন্য যথাক্রমে ৫০০ টাকা ও ১২০০ টাকা। দু-তিন বছর ধরে তিনটি কিস্তিতে এই টাকা দেওয়া হত। স্বভাবতই এই সামান্য টাকাতে পূর্ব-পাকিস্তানের উদ্বাস্তুরা যে ঘরদোর তৈরি করেছিল তা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। সরকার মাত্র ১১০০০ বাড়ি তৈরি করেছিল। পূর্বাঞ্চলে কোনো উপনগরী তৈরি করা হয়নি। শুধু ৫টি উপনগরী তৈরি করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। যথা অশোকনগর, তাহেরপুর, গয়েশপুর, হাবিদপুর ও খোসবাসমহল্লা। যে কাগজে পরিকল্পনা করা হয়েছিল তার মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ ছিল। একমাত্র অশোকনগর হাবড়ার অতি দীন উপনগরীটি তৈরি হয়েছিল। পশ্চিমাঞ্চলের উপনগরীর সঙ্গে এই উপনগরীটির কোনো তুলনাই চলে না। আধুনিক অর্থে একে উপনগরী বলা চলে না। এতে ভবিষ্যতে শিল্প বিকাশের কোনো পরিকাঠামো নেই।

শহরাঞ্চলে পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তানি উদ্বাস্তুদের ঋণদানের ব্যাপারেও একই রকম পার্থক্যমূলক আচরণ ধরা পড়ে। পর পৃষ্ঠার সারণি থেকে তা দেখা যাবে।[৩৪]

### সারণি—৭

| ১৯৬১-৬২ পর্যন্ত প্রদত্ত ঋণ | শহরাঞ্চলে ঋণ | উদ্বাস্তু পুনর্বাসন প্রশাসন | মোট |
|---|---|---|---|
| | লক্ষ টাকায় | | |
| পূর্ব-পাকিস্তানের উদ্বাস্তু | ৯২৪·৯০ | ৩৯৪·০০ | ১,৩১৮·৯০ |
| পশ্চিম-পাকিস্তানের উদ্বাস্তু | ১,৫৬৮·২৩ | ৭২৮·০০ | ২,২৯৬·২৩ |

এই সারণি থেকে বোঝা যায় যে পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্বাস্তুরা পূর্ব-৭ উদ্বাস্তুদের দ্বিগুণ ঋণ পেয়েছিল। পূর্ব ও পাশ্চিম-পাকিস্তানিদের চাকুরির ক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় সরকারের নিদারুণ বৈষম্যমূলক আচরণ চোখে পড়ে। কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্র থেকে পশ্চিম-পাকিস্তানের ২·০৪ লক্ষ উদ্বাস্তুকে চাকুরি দেওয়া হয়। ট্রান্সফার ব্যুরো আরো ৮০ হাজার পশ্চিম-পাকিস্তানি উদ্বাস্তুকে চাকুরি দেয়। অতএব মোট ২·৮৪ লক্ষ পশ্চিম-পাকিস্তানি উদ্বাস্তুর চাকুরির ব্যবস্থা করে কেন্দ্রীয় সরকার। পূর্ব-পাকিস্তানি উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা হল মাত্র ১·১০ লক্ষ।[৩৫]

গ্রামাঞ্চলে পূর্ব-পাকিস্তানি উদ্বাস্তুদের যে জমি দেওয়া হয়েছিল তা যথেষ্ট ছিল না, চাষের অনুপযোগী ছিল এবং সেখানে সেচের ব্যবস্থাও ছিল না। পশ্চিম-পাকিস্তানি উদ্বাস্তুরা মুসলমান দেশত্যাগীদের ফেলে যাওয়া ৪৭·৩৫ লক্ষ একর চমৎকার চাষযোগ্য জমি পেয়েছিল। সরকার এই জমি উন্নয়নের পর পশ্চিম-পাকিস্তানি উদ্বাস্তুদের হস্তান্তর করে।[৩৬]

দুই অঞ্চলের উদ্বাস্তুদের প্রদত্ত সরকারি ঋণের পরিমাণ থেকেও পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের প্রমাণ পাওয়া যায়। চাষের যন্ত্রপাতি, বীজ, সার ও বলদ কেনার জন্য পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুরা ঋণ পেয়েছিল পরিবার পিছু ৬০০ টাকা। পশ্চিম-পাকিস্তানি উদ্বাস্তুরা পেয়েছিল ৬৯০ টাকা। পশ্চিম-পাকিস্তানের উদ্বাস্তুরা বৃত্তিঋণ পেয়েছিল পরিবার পিছু ৩০০০ টাকা। পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুরা বৃত্তিঋণ পেয়েছিল ১৫৫০ টাকা। পূর্ব-পাকিস্তানি উদ্বাস্তুদের ঋণদানের সমগ্র প্রক্রিয়াটি আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থায় লালফিতায় আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়েছিল। এতে অনর্থক কালহরণ হত। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের মধ্যে ক্রমাগত চিঠিপত্রের আদানপ্রদান হত, শেষ পর্যন্ত যখন ঋণ মঞ্জুর করা হত তখন বড় দেরি হয়ে যেত। দেরি হওয়াতে মঞ্জুরীকৃত ঋণের পরিমাণও কমে যেত। কেননা, মূল্যবৃদ্ধির জন্য যে অর্থ মঞ্জুর করা হত তার মূল্য কমে যেত। তাছাড়া, সাধারণভাবে আমলাতান্ত্রিক নিয়ম ছিল রাজ্য সরকারের যে কোনো আর্থিক দাবির ৬০ শতাংশ মঞ্জুর করা। উদ্বাস্তুদের দেয় ঋণের ক্ষেত্রে যে এই প্রথা চলতে পারে না কেন্দ্রীয় সরকার তা মনে করেনি। অথচ পশ্চিম-পাকিস্তানিদের. ঋণ দেওয়ার ব্যাপারে আমলাতান্ত্রিক লালফিতার শাসন দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছিল। কিন্তু তার চেয়েও যা বিস্ময়কর ছিল তা হল যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার মঞ্জুরীকৃত টাকাটাও যথাসময়ে উদ্বাস্তুদের জন্য কাজে লাগাতে পারেনি।

বাঙালি উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের কালহরণের নীতি এবং রাজ্য সরকারের ঔদাসীন্য যে অকিঞ্চিৎকর ঋণ আসত তা যথাসময়ে কাজে না লাগানো থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। গোটা ব্যাপারটা "কমিটি অব রিভিউ অ্যান্ড রিহেবিলিটেশন"-এর পর্যালোচনায় ধরা পড়ে—"ক্যাম্পবাসী যে সমস্ত উদ্বাস্তু জমি কেনা, গৃহনির্মাণ, ছোট

ব্যবসায় ও কৃষির জন্য পুনর্বাসন সহায়তা পেয়েছে তাদের সংখ্যা জানা সম্ভব হয়নি। মাত্র ৯০,০০০ অ-ক্যাম্পবাসী পরিবারকে গৃহনির্মাণের ঋণ দেওয়া হয়েছিল। তা থেকে দাঁড়ায় যে উদ্বাস্তুদের অতি সামান্য অংশই পুনর্বাসন সহায়তা পেয়েছিল। কেননা সরকারি নীতি ছিল ক্যাম্পবাসীদের পুনর্বাসন সহায়তা দান। সমগ্র উদ্বাস্তুদের মাত্র ২৫ শতাংশ ক্যাম্পবাসী। সুতরাং ৭৫ শতাংশ উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সহায়তা থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। রাজ্যে সামাজিক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ার এটি হচ্ছে বড় কারণ।"

সরকার ক্যাম্প উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন তার প্রধান দায়িত্ব বলে গ্রহণ করেছিল। দেখা যাক এক্ষেত্রে কিভাবে তার কর্তব্য পালন করেছিল। একটি ক্যাম্পবাসী উদ্বাস্তু গৃহনির্মাণ ঋণ পেত ৫০০ টাকা এবং বাস্তুভিটা কেনার জন্য ঋণ পেত ৭৫ টাকা। তাহলে মোট ঋণের পরিমাণ দাঁড়াল ৫৭৫ টাকা। একটি সরকারি প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে সরকার গৃহনির্মাণ ও বাস্তুভিটা ক্রয়বাবদ সর্বসাকুল্যে খরচ করেছিল ২৪৭ লক্ষ টাকা। অতএব ৪২,৯৫৭টি পরিবার বাস্তুভিটা ক্রয় ও গৃহনির্মাণ বাবদ ঋণ পেয়েছিল। তার অর্থ দাঁড়াল এই যে গ্রামীণ ক্ষেত্রে ২,১৪,৭৮৫ জন উদ্বাস্তু আবাসন পেয়েছিল।

শহরাঞ্চলে গৃহনির্মাণের পরিকল্পনানুযায়ী একটি ক্যাম্পবাসী উদ্বাস্তু ১০০০ টাকা গৃহনির্মাণ ঋণ, পেয়েছিল এবং বাস্তুভিটা ক্রয়ের জন্য পেয়েছিল ৬০০ টাকা। গৃহনির্মাণ পরিকল্পনায় মোট ব্যয় হয়েছিল ৬৩৬ লক্ষ টাকা। এই পরিকল্পনায় যারা ঋণ পেয়েছিল তাদের আনুমানিক সংখ্যা ৩৫,৮৩৭টি পরিবার অথবা ১,৭৯,১৮৫ জন উদ্বাস্তু। সুতরাং গ্রামীণ এবং শহরাঞ্চলের গৃহনির্মাণের পরিকল্পনায় মাত্র ৩,৯৩,৯৭০ জন লোক অথবা ৭৮,৭৯৪টি পরিবার একটি গৃহের সুযোগ পেয়েছিল। ক্যাম্পবাসী উদ্বাস্তুদের সংখ্যা ছিল ৮ লক্ষ। তাদের প্রায় অর্ধেক লোক এই সুযোগ পেয়েছিল মাত্র। সন্দেহ নেই সরকার পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের দায়িত্ব অস্বীকার করতে সক্ষম হয়েছিল। এই ব্যবহার যে কোনো সভ্য সরকারের অযোগ্য।

পুনর্বাসনের দুটি প্রধান উপাদান হল আবাসন ও জীবিকানির্বাহী পেশার ব্যবস্থা। আবাসনের ব্যাপারে ক্যাম্পবাসী অর্ধেক উদ্বাস্তুকে গৃহনির্মাণের সুযোগ দিয়ে সরকার হাত ধুয়ে ফেলল। জীবিকানির্বাহী পেশার ব্যাপারে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো ধারণাই ছিল না যে কি পরিমাণ উদ্বাস্তু জীবিকানির্বাহী পেশায় নিযুক্ত হয়েছিল। সরকারি উদ্যোগে ১·১০ লক্ষ উদ্বাস্তু চাকরি পেয়েছিল তা জানার একমাত্র উপায় আর্থনীতিক জরিপ। ১৯৭২-এ রাজ্য সরকার স্বীকার করে যে সে কোনো আর্থনীতিক জরিপ করে উঠতে পারেনি। বস্তুত, সরকার স্বীকার করে যে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুদের সীমাহীন দারিদ্র্য। তাদের অবস্থা দীনের থেকে দীন। ১৯৮০-তে রাজ্য সরকার একটি 'উদ্বাস্তু পুনর্বাসন কমিটি' নিয়োগ করে। এই কমিটির নমুনা জরিপ থেকে উদ্বাস্তুদের দীনতম অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়।

## উদ্বাস্তু ও ভবঘুরে নিবাস

শিয়ালদহ স্টেশনের ঝড়তিপড়তি উদ্বাস্তুদের নিয়ে ১৯৫৬তে ভবঘুরে নিবাস তৈরি হয়েছিল এবং সবসুদ্ধ তাদের সংখ্যা ছিল ৩,৯০৩ জন। এদের দুর্গতির সীমা ছিল না।
জন। এদের দুর্গতির সীমা ছিল না।

## বাগজোলার পুরোনো ক্যাম্পসমূহ (Ex-Camp Sites)

সল্টলেক ও লেকটাউনের কাছাকাছি প্রায় ৭০ একর জমি জুড়ে ছিল এই ক্যাম্পগুলি। এই ক্যাম্পগুলির একটা বিশেষ সুবিধা ছিল যে এই জায়গাগুলির কলকাতা এবং লেকটাউন ও সল্টলেকের মতো দুটো উপনগরীর কাছাকাছি অবস্থান। এই পুরোনো ক্যাম্পের উদ্বাস্তুদের ইতিহাস অত্যন্ত মর্মান্তিক। এগুলো আসলে কর্মশিবির যেখানে জমি উন্নয়ন করে তাদের পুনর্বসতি দেবার কথা ছিল। জমি উন্নয়ন করবে এই কর্মশিবিরের উদ্বাস্তুরা এবং যে জমি তারা নিজেদের শ্রমের দ্বারা উন্নয়ন করবে সে জমি তারাই পাবে। কিন্তু জমি যখন সংস্কার করা হল তখন কংগ্রেস ও সিপিআই সমর্থনপুষ্ট স্থানীয় অধিবাসীরা সেই জমি দখল করে নিল। এ নিয়ে স্থানীয় মানুষ ও উদ্বাস্তুদের মধ্যে দাঙ্গা হয়, কিছু লোক হতাহতও হয়। শেষ পর্যন্ত সরকার তা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করল এবং যে জমি উদ্বাস্তুরা সংস্কার করেছিল তা থেকে তারা বঞ্চিত হল। এই ক্যাম্পগুলিকে শেষ পর্যন্ত অস্থায়ী শিবিরে পরিণত করা হল এবং উদ্বাস্তুদের বলা হল ছয় মাসের নগদ ডোল নিয়ে ক্যাম্প ছেড়ে চলে যেতে। উদ্বাস্তুরা রাজি হল না। তারা পুরোনো ক্যাম্পেই থেকে গেল এবং কোনোক্রমে টিকে রইল। শেষ পর্যন্ত তারা এই অঞ্চলের অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল।

পশ্চিমবঙ্গে অবশিষ্ট আরো ৬৫টি ক্যাম্প ছিল যেখানে ৭,০৬৬টি পরিবার অথবা ৩৫০০০ মানুষ ছিল। সংসদীয় পর্যালোচনা কমিটি এই ক্যাম্পগুলি দেখে মন্তব্য করে যে এই ক্যাম্পগুলি শুয়োরের খোয়াড়ের মতো এবং এখানে যারা বাস করছে তারা পশুর জীবনযাপন করছে। এই ক্যাম্পগুলির মধ্যে কিছু ছিল কর্মশিবির যেখানে তাদের ভূমি সংস্কারের জন্য আনা হয়েছিল। বলা হয়েছিল যে ভূমি তারা সংস্কার করবে তা তাদেরই হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা হয়নি। স্থানীয় লোকেরা সে জমি দখল করে নেয়। বাগজোলায় এবং সোনারপুরে উদ্বাস্তুরা কয়েক হাজার একর জলে ডোবা জমি পুনরুদ্ধার করেছিল, কিন্তু সে জমির দখল তারা পায়নি। সরকার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে সরে যায়। কিন্তু তারা তাদের বেঁচে থাকার সংগ্রাম চালিয়ে যায়। প্রচণ্ড পরিশ্রম করে তারা টিকে থাকে। শুধু তাই-ই নয়, তারা তাদের সন্তানদের শিক্ষা দিতেও ভোলেনি।

## নতুন উদ্বাস্তু

কেন্দ্রীয় সরকারের হিশেব অনুযায়ী নতুন উদ্বাস্তুর সংখ্যা ছিল ৬ লক্ষ। আর অন্তর্বর্তী উদ্বাস্তুদের সংখ্যা ৫৫ হাজার। নতুন উদ্বাস্তুরা পশ্চিমবঙ্গের বাইরে যেতে রাজি হয়নি। তাই তারা পুনর্বাসনের সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। সরকার তাদের একেবারে ভুলে যায়। তাদের সংখ্যা ঠিক কত ছিল তাও জানার চেষ্টা করেনি সরকার। ৬ লক্ষ ও ৫৫ হাজার এই দুটি সংখ্যাই ছিল আনুমানিক। সরকারি দলিলপত্র ঘাঁটলে জানা যায় যে প্রকৃত সংখ্যা আরো কয়েক লক্ষ বেশি ছিল। এই নতুন উদ্বাস্তুরা পশ্চিমবঙ্গের ঠিক কোথায় আশ্রয় নিয়েছিল তা সঠিকভাবে বলা কঠিন। যদিও অনুমান করা যায় যে এরা নদীয়া, ২৪ পরগনা, মুর্শিদাবাদ, মালদা, জলপাইগুড়ি, পশ্চিম দিনাজপুর, কোচবিহারে ছড়িয়ে পড়ে এবং পুরোনো উদ্বাস্তুদের সঙ্গে মিশে যায়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় এরা কর্পুরের মতো শূন্যে উবে গিয়েছিল। কিন্তু এরা মরেনি। পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক মঞ্চে এদের আবার দেখা যাবে।

# পুরোনো উদ্বাস্তুদের জন্য শৈল্পিক, বৃত্তিমূলক ও কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রকল্পের পর্যালোচনা

১৯৫০-এর ডিসেম্বরে পুনর্বাসন মন্ত্রীদের সম্মেলনে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি প্রশিক্ষণদানের প্রকল্প তৈরি করার কথা বলা হয়। ১৯৫৪ পর্যন্ত বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের উপরেই প্রধান গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। কিন্তু ১৯৫৪ থেকে গুরুত্ব দেওয়া হয় কারিগরি শিক্ষার প্রতি। ১৯৫৮-তে সিভিল মেকানিক্যাল ও ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ত্রৈবার্ষিক ডিপ্লোমা কোর্স প্রবর্তন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এর আগে ছিল এক বছরের সার্টিফিকেট কোর্স। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রদের নিজস্ব শিল্পস্থাপনে অথবা চাকুরি খুঁজে নেওয়ার ব্যাপারে সরকার সাহায্য করে। ১৯৬০-৬১-র শেষ নাগাদ প্রায় ১০,০০০ পুরোনো উদ্বাস্তু কারিগরি ও ইঞ্জিনিয়ারিং প্রশিক্ষণ পায়। আরো ৫ হাজার প্রশিক্ষণ পায় পলিটেক্‌নিক ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে। ১৯৬০-৬১ নাগাদ বৃত্তিমূলক ও কারিগরি প্রশিক্ষণের জন্য খরচ হয়েছিল ২৮৩ লক্ষ টাকা। ৪৫,০০০ পুরোনো উদ্বাস্তু প্রশিক্ষণের সুযোগ পেয়েছিল।

প্রশিক্ষণ পেলেই হল না, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রদের চাকরির প্রয়োজন ছিল। স্পষ্টতই চাকরির জন্যই বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পস্থাপনের প্রয়োজন ছিল।

## মাঝারি শিল্প

১৯৫৪-তে একটি নতুন প্রকল্প প্রবর্তন করা হয়। এতে উদ্যোক্তাদের মাঝারি শিল্পস্থাপনের উৎসাহ দেবার ব্যবস্থা ছিল। উদ্যোক্তা শিল্পপতিদের ফ্যাক্টরি নির্মাণের স্থান দেওয়া হবে এবং তার দাম তারা কিস্তিতে শোধ করতে পারবে। স্বল্প সুদে শিল্পপতিদের কারখানার যন্ত্রপাতির মূল্যের ৫০ শতাংশ ঋণ দেওয়া হবে। শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য নির্ধারিত হারে জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে। ১৯৫৪-৫৬-তে গয়েশপুর, হাবড়া, তাহেরপুর, খোসবাসমহল্লা, রিষড়া, কামারহাটি, দাসনগরের মতো উদ্বাস্তু অধ্যুষিত অঞ্চলে এই সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়। কিন্তু এই প্রকল্প বিশেষ কার্যকর হয়নি। কেননা, এই সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার পরিবর্তে সরকার উদ্যোক্তাদের উপর একটি নির্দিষ্ট হারে উদ্বাস্তুদের শিল্পে নিয়োগ করবার শর্ত আরোপ করেছিল। শিল্পপতিরা ঋণ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সবই নিল, কিন্তু শর্তটি মানল না। ১৯৬০ নাগাদ ১৬টি মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান উৎপাদন শুরু করে। এই ১৬টি প্রতিষ্ঠানে ৭৮৫০ জন উদ্বাস্তুকে চাকরি দেবার কথা ছিল। কিন্তু চাকরি দেওয়া হয়েছিল মাত্র ১৭৫৯ জন উদ্বাস্তুকে।

কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার ঘটেছিল। ১৯৬০-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত ৪৪৬টি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পকে ৬০·৩৫ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়। তাদের চাকরি দেওয়ার কথা ছিল ৫৮৫২ জন উদ্বাস্তুকে। কিন্তু তা তারা দেয়নি।

এক্ষেত্রে একমাত্র অর্থবহ এবং সার্থক পদক্ষেপ হয়েছিল কলকাতার রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার সম্প্রসারণের ফলে। এই সম্প্রসারণ ঘটেছিল পুনর্বাসন মন্ত্রকের অর্থানুকূল্যে। বাসড্রাইভার, কনডাক্টর, ক্লিনার হিশেবে কলকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থায় ৩৩৩২ জন উদ্বাস্তু চাকরি পায়।

এইসব প্রকল্পের ব্যর্থতা থেকে বোঝা যাবে যে শিল্পে নিযুক্তির ক্ষেত্রে উদ্বাস্তুদের

বেকারির সংখ্যা কি বিপুল। বর্তমানে এদের সংখ্যা প্রায় ৭·৫ লক্ষ।

উপরে যে পুনর্বাসনের কাজের বিবরণ দেওয়া হল তা ১৯৪৭ থেকে ১৯৭৬ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজের পর্যালোচনা। এই পর্যালোচনা সংসদীয় কমিটির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে রচিত। এই কমিটিগুলি সরকারের তিন দশকের পুনর্বাসনের কাজের বিশ্লেষণ করেছে এবং দেখেছে যে সর্বক্ষেত্রেই সরকার ব্যর্থ হয়েছে। এই ব্যর্থতার কারণ হল এই যে পুনর্বাসনের জন্য কোনো পরিকল্পক সংস্থা ছিল না যে সংস্থা রাজ্যের উদ্বাস্তু জনসমষ্টির ব্যাপক জরিপের ফলে আহৃত নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যানভিত্তিক একটি পূর্ণাঙ্গ ও ঐক্যবদ্ধ প্রকল্প রচনা করতে পারত। অতএব পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসন প্রক্রিয়া অনুমান নির্ভর থেকে গেছে।

১৯৭৭-এ বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার আগে রাজ্যের উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানের কোনো অর্থবহ প্রয়াস দেখা যায়নি। ১৯৬৭-তে যুক্তফ্রন্ট সরকার উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য ২৫০ কোটি টাকার একটি পরিকল্পনা রচনা করেছিল। ১৯৭২-এ উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য কংগ্রেস সরকার ১৫০ কোটি টাকার একটি মাস্টার প্ল্যান তৈরি করে। এ সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার 'দি কমিটি অব রিভিউ অব রিহেবিলিটেশন ওয়ার্ক ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল' গঠন করে। উদ্দেশ্য ছিল ১৯৬১-৬২-র পুনর্বাসন 'অবশেষে'র (residuary) পরিকল্পনা অনুযায়ী যে সমস্ত প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে তাদের ফলাফল খতিয়ে দেখা। এই কমিটি পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সম্পর্কে ২০ খণ্ড প্রতিবেদন পেশ করে এবং তার কাজ শেষ করে ১৯৭৫-এ।

১৯৭৫-এ কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসনের অবশেষের সমস্যা নির্ণয়ের জন্য একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করে। কিন্তু কমিটি গঠন করেই কেন্দ্রীয় সরকার তার কাজ শেষ করে। তাদের সুপারিশগুলি প্রতিবেদনের কাগজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল। কেন্দ্রীয় সরকার তা কার্যকর করার কোনো চেষ্টাই করেনি।

১৯৭৭-এ সপ্তম ফিনান্স কমিশনের কাছে বামফ্রন্ট সরকার একটি স্মারকলিপি পেশ করে। তাতে একটি পুনর্বাসন পরিকল্পনা কার্যকর করার জন্য ৫০০ কোটি টাকা দাবি করা হয়। জনতা প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাই এই পরিকল্পনার ভিত্তিমূলক নির্দিষ্ট তথ্য চাইলেন। রাজ্য সরকার অবিলম্বে একটি উদ্বাস্তু পুনর্বাসন কমিটি গঠন করল। এই কমিটির কাজ হল রাজ্যের সমগ্র উদ্বাস্তু জনসংখ্যা জরিপ করা এবং উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের প্রাথমিক দিকগুলি চিহ্নিত করা। এই কমিটি একটি ব্যাপক জরিপ করে। সমগ্র রাজ্যে ছড়ানো উদ্বাস্তু জনসমষ্টির প্রায় এক তৃতীয়াংশ এই জরিপের অন্তর্গত হয়েছিল। আসলে জরিপটি রাজ্যের উদ্বাস্তু জনসমষ্টির একটি ছোটখাটো সেন্সাস-এ পর্যবসিত হয়েছিল। এই জরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্য পর পৃষ্ঠার সারণিতে দেওয়া হল।

৮নং সারণিতে দেখা যাবে যে, যে-সমস্ত জেলায় জরিপ করা হয়েছিল সেখানে উদ্বাস্তুদের সংখ্যা ৫,২৫,০২২। অর্থাৎ রাজ্যের সমগ্র উদ্বাস্তু পরিবারের ৩২·৮১ শতাংশ।

৯নং সারণিতে বিভিন্ন স্থানে উদ্বাস্তুদের আবাস নির্দেশ করা হয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে ৫৩·১৫ শতাংশ উদ্বাস্তু জবরদখল অথবা অন্যান্য কলোনিতে থাকে। ভাড়াবাড়ি, ব্যারাক ও অনুরূপ অন্যান্য স্থানে যে উদ্বাস্তুরা ছিল তাদের সংখ্যা ধরলে মোট সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ৭৯·৮৭ শতাংশ। এদের মধ্যে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠা কলোনির সংখ্যা মাত্র ৯·৬ শতাংশ। এই সংখ্যা থেকে বোঝা যায় যে অর্থনৈতিক

## সারণি—৮

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| নদীয়া | ১,৪০,৪২৯ | ২৯·২৫% | ২৬ ৭৪% | ৪,৮০,০৫৯ |
| কুচবিহার | ৯৮,৭৭৫ | ৯৮·৬০% | ১৮·৮১% | ৯৯,৯৭৫ |
| জলপাইগুড়ি | ৫৬,০২৯ | ৯৩·৩৮% | ১০ ৬৭% | ৬০,০০৪ |
| বর্ধমান | ৩৭,৬০২ | ৮৩·৬৫% | ৭ ১৬% | ৪৪,৯৫২ |
| মালদহ | ৩০,৮৬০ | ৯৯·৫৪% | ৫·৮৮% | ৪৬,১৮৮ |
| হুগলি | ২৬,৭২৬ | ৫৭·৮৬% | ৫·০৯% | ৩১,০০৩ |
| পশ্চিম দিনাজপুর | ২৪,২১৫ | ৫৩·৮০% | ৪ ৬১% | ৪৫,০০৫ |
| মুর্শিদাবাদ | ২২,০৩৫ | ৬৩·৯৭% | ৪ ২০% | ৩৪,৪৪৫% |
| হাওড়া | ৮,১০৩ | ২৩·০২% | ১·৫৪% | ৩৫,২০৭ |
| দার্জিলিং | ৮,০৮৮ | ৮০·৬৯% | ১ ৫৪% | ১০,০২৩ |
| বাঁকুড়া | ৪,৫৮৩ | ৯৯·০৫% | ০·৮৭% | ৪,৬২৭ |
| বীরভূম | ৪,০৫৩ | ৭৩·৭০% | ০ ৭৭% | ৫,৫৫০ |
| ২৪ পরগনা | ৩৩,৪০১ | ৬·৫৬% | ৬ ৩৬% | ৫,০৮,৯৯৮ |
| কলকাতা | ২৭,১২২ | ১৩·৯১% | ৫ ১৭% | ১,৯৫,০০৭ |
| মেদিনীপুর | ৩,০০২ | ২১·৪০% | ০ ৫৭% | ১৪,০৩১ |
| মোট | ৫,২৫,০২২ | ৩২·৫১% | | ১৬,১৫,০২৪ |

## সারণি—৯

### বাসস্থানের প্রকৃতি

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| পরিবারের সংখ্যা | ৫০,৬০০<br>(৯·৬১%) | ১,০৩,২৫২<br>(১৯ ৬৬%) | ৪,৬৬৭<br>(০ ৮৮%) | ৪,৭৬৫<br>(০ ৯০%) | ২৪৯<br>(০ ০৪%) | ৮৬,৭২৩<br>(১৬ ৫১%) | ৪,০৬৭<br>(০ ৭৭%) | ৫৩,৬৪৯<br>(১০ ২১%) | ১,৭৫,৮৩৬<br>(৩৩ ৪৯%) | ৪২,২১৪<br>(৭ ৮৪%) |

**সারণি—১০** ৫,২৫,০২২ ৮৯,৭৭৩ (১৭·০৯%) ৪,৩৫,২৪৯ (৮২·৯১%)

## সারণি—১১

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| পরিবারের সংখ্যা | ১৬,৬৮৭<br>(৩ ১৭%) | ২০,০১৩<br>(৩·৮১%) | ১,০৮,৮০৯<br>(২০·৭২%) | ৩,৪৫,৮৩৬<br>(৬৫ ৮৭%) | ২৭,৯১৯<br>(৫·৩১%) | ৫,৭৫৮<br>(১ ০৯%) | ৫,২৫,০২২ |

## সারণি—১২

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| পরিবারের সংখ্যা | ১,৮৭,৯৫৩<br>(৩৫·৭৯%) | ৩৬,৭৯৭<br>(৭·০০%) | ১,০২,৪৩১<br>(১৯·৫০%) | ৮০,৮১৯<br>(১৫·৩৯%) | ১,১৭,০২২<br>(২২·২৯%) | ৫,২৫,০২২ |

পুনর্বাসনের কথা ছেড়ে দিলেও আবাসনের ক্ষেত্রেও সরকারের দান কি নগণ্য।

১০নং সারণি থেকে জানা যায় যে উদ্বাস্তু পরিবারের ৮২·৯ শতাংশ জমি অথবা টাকায় সরকারের কাছ থেকে কোনো সহায়তা লাভ করেনি।

১১নং সারণি উদ্বাস্তু পরিবারগুলির বিভিন্ন আয়ের স্তর নির্দেশ করে। এদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ৬৫·৮০ শতাংশের মাসিক আয়ের স্তর ১০০ টাকা থেকে ৫০০ টাকা। যাদের আয়ের স্তর ৫০০ টাকা থেকে ১০০০ টাকা বা তারও বেশি তারা যথাক্রমে ৫·৩১ শতাংশ ও ১ শতাংশ।

১২নং সারণি থেকে জানা যায় যে উদ্বাস্তুদের ৩৫·৭৯ শতাংশের আয়ের প্রধান উৎস কৃষি। ১৯·৫০ শতাংশের আয় ব্যবসা ও বাণিজ্য থেকে। মাত্র ৭ শতাংশ শিল্প প্রতিষ্ঠানে কাজ করে।

তাহলে এই হল চার দশকের সরকারি পুনর্বাসন কর্মের নীট ফল : অর্ধ উলঙ্গ পুরুষ নারী ও শিশু যারা এই প্রতিষ্ঠিত সমাজের বাইরে, গহ্বরের কিনারায় দাঁড়িয়ে। এক সময় যে সমাজের তারা অংশ ছিল সেই সমাজের কোনো মূল্যবোধের আর কোনো মানে নেই তাদের কাছে। এই সমাজকে টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেলে দিতে তারা উদ্যত। পশ্চিমবঙ্গের পুনর্বাসনের ব্যর্থতা একটি নতুন ধরণের মনুষ্যগোষ্ঠী সৃষ্টি করেছে। এরাই প্রান্তিক মানুষ। প্রতিষ্ঠিত সমাজের মূল্যবোধের, নিয়মকানুনের এরা কোনো ধার ধারে না। একটি পাশব প্রকৃতির আন্তঃশক্তির তাগিদে এরা চালিত। পশ্চিমবঙ্গ যদি এই লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত মানুষকে বিমুখ করে তবে সে বাঁচবে না। তাকে হয় এদের এই মর্মান্তিক অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে হবে এবং সুসভ্য জীবনস্রোতে নিয়ে আসতে হবে, নয়তো সে মরবে।

এবার পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু পরিস্থিতির সঙ্গে পশ্চিমাঞ্চলের উদ্বাস্তুদের পরিস্থিতি তুলনা করা যেতে পারে। পুনর্বাসন সেখানে এক অলৌকিক রূপান্তর নিয়ে এসেছিল। (The Story of Rehabilitation নামক গ্রন্থে ভাস্কর রাও একটি কাব্যময় পৃষ্ঠায় মৃত্যুর উপরে জীবনের জয়গান করেন : "পশ্চিম-পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের একটি নামহীন আতঙ্ক থেকে নিঃস্বতা ও অসহায়তা থেকে সাধারণ জীবনের প্রশান্তির দিকে ক্লান্ত যাত্রা শেষ। দেহ, মন ও প্রাণের সব ক্ষত শুকিয়ে গেছে। সে এখন ভারতীয় বলে গৃহীত; জাতীয় জীবনের প্রবাহের অংশ, সে তার খঞ্জের যষ্টি ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। তা আর তার স্মৃতিকে নাড়া দেয় না। উদ্বাস্তুর সঙ্গে উদ্বাস্তু নয় এমন লোকের আর কোনো পার্থক্যই নেই। উদ্বাস্তুদের গা থেকে উদ্বাস্তু নামটি খসে পড়েছে। তারা এখন ফরিদাবাদ, নিলখেরী, উল্লাসনগর, পিম্‌প্রি ও গোবিন্দনগরের মতো উপনগরীতে থাকে। এই সব উপনগরী দেখে মনে হবে না যে এখানে উদ্বাস্তুরা থাকে।" জাতীয় পুনর্নির্মাণের মহৎ কর্মে পুনর্বাসন একটি অংশ। এই পুনর্নির্মাণের পরিমণ্ডল সর্বহারা উদ্বাস্তুকে ভারতের নাগরিকে পরিণত করেছে। বস্তুতপক্ষে পুনর্বাসনমন্ত্রকের কাজ একটি দ্বিমুখী আশীর্বাদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই মন্ত্রক উদ্বাস্তুদের দারুণ দুর্গতির সময়ে দেশের করুণা ও ধনসম্পদ তাদের জন্য নিয়োজিত করেছিল। এতে জাতি আধ্যাত্মিক ও বাস্তবসম্পদে মণ্ডিত হয়েছিল। ভাস্কর রাওয়ের লেখা পড়লে মনে হবে না যে একই পুনর্বাসন মন্ত্রক দেশের দুটি বিভাজিত অঞ্চলের জন্য কাজ করছিল। পশ্চিমে পুনর্বাসন কর্মের জন্য পুনর্বাসনমন্ত্রকের যে স্তুতি করেছেন ভাস্কর রাও তা তার প্রাপ্য। সমগ্র দেশের করুণা ও ধনসম্পদ পশ্চিম-পাকিস্তানি উদ্বাস্তুদের জন্য নিয়োজিত হওয়ায় পশ্চিম-পাকিস্তানি উদ্বাস্তুরা অভিপ্রয়াণের ফলে অধিকতর বিত্তশালী হয়ে উঠেছিল। এই মন্ত্রকের কাছেই পূর্ব-পাকিস্তানের উদ্বাস্তুরা অবজ্ঞার পাত্র। এরা আলস্যপরায়ণ, অসহযোগী ও উদ্যোগহীন মানুষ। এদের প্রায় মানুষই বলা চলে না। কীসে নিজেদের ভালো হবে তাও এরা বোঝে না। পূর্ব-পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের এই ছবিটি পুনর্বাসনমন্ত্রক তৈরি করেছে এবং সারা দেশের সম্মুখে তুলে ধরেছে। দুর্বল; পরাজিতের মনোবৃত্তিসম্পন্ন ও হাস্যকর বাঙালিকে তুলনা করা হয়েছে দুঃসাহসী, শক্তিশালী, বিজয়ী পাঞ্জাবির সঙ্গে। হাস্যকর বাঙালির এই ছবি পুনর্বাসনমন্ত্রক সারা দেশে বিলিয়েছে। বাঙালি অবজ্ঞার পাত্র থেকে গেছে। সে ভারতীয় সমাজে গৃহীত হয়নি।

উদ্ভট বাঙালির এই মুখচ্ছবি আসলে একটি মুখোশ। এই মুখোশ তার মুখে কেন্দ্রীয় সরকার পরিয়ে দিয়েছে যাতে যে শীতল অবজ্ঞা ও অবহেলা ভরা ব্যবহার তাদের সঙ্গে

করা হয়েছে তা চাপা পড়ে, যাতে ত্রাণ ও পুনর্বাসনে বাঙালি ও পাঞ্জাবিকে একই আসনে বসানো না হয়। এতে বাঙালি ও পাঞ্জাবির পুনর্বাসন সহায়তার হার সমান না হলেও কেন্দ্রীয় সরকারকে কেউ দোষ দেবে না। বাঙালি ও পাঞ্জাবির পুনর্বাসনের সমান দাবি থাকবে একথা কেউ আশাও করবে না। সুতরাং পূর্বাঞ্চলে পুনর্বাসন উদ্যোগ শেষ পর্যন্ত গিয়ে দাঁড়িয়েছিল পূর্ব-পাকিস্তানি উদ্বাস্তুদের ডোল দিয়ে জীবিত রাখা এবং পুনর্বাসন পরিকল্পনার নামে এমন কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল যার কোনো মানেই হয় না। এমনকী দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা যা ৩৫,০০০ উদ্বাস্তু পরিবারের পুনর্বাসনের জন্য রচিত হয়েছিল তাও কার্যকর করা হয়নি। মাঝ পথেই তা পরিত্যক্ত হয়েছিল। যে ৩৫,০০০ উদ্বাস্তু পরিবারকে অথবা ১,৭৫,০০০ উদ্বাস্তুকে দণ্ডকারণ্যে পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তাদের একটি বড় অংশকে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়েছিটিয়ে রাখা হয়েছিল। এমনকী পুনর্বাসনমন্ত্রকও জানে না শেষ পর্যন্ত কোথায় তারা গিয়েছিল এবং তাদের কী হয়েছিল। এখানেই ক্যাম্পবাসীদের যাত্রা শেষ। সরকার ক্যাম্পের ৮ লক্ষ অধিবাসীকে তার প্রধান দায়িত্ব বলে গ্রহণ করেছিল। তাদের অর্ধেকেরও কম অর্থাৎ ৩,৯৩,৯৭০ জন ক্যাম্পবাসী পশ্চিমবঙ্গে গৃহ পেয়েছিল এবং ১,৭৫,০০০ দণ্ডকারণ্যে ও পশ্চিমবঙ্গের বাইরের রাজ্যে ক্যাম্পে ঠাঁই পেয়েছিল। আরো ৫০,০০০ পুরোনো উদ্বাস্তু ক্যাম্পের শুয়োরের খোঁয়াড়ে টিকেছিল। অতএব ৮ লক্ষ ক্যাম্পবাসীদের মধ্যে ৬,১৮,০০০ ক্যাম্পবাসীদের সম্পর্কে আমাদের একটা স্পষ্ট ধারণা আছে। অবশিষ্ট ২ লক্ষ পশ্চিমবঙ্গের ভেতরে এবং বাইরে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং সরকার অথবা সাধারণ মানুষের এ নিয়ে কোনো মাথাব্যথা ছিল না যে এদের কী হল।

কিন্তু ৮ লক্ষ ক্যাম্পবাসীরা পুরোনো উদ্বাস্তুদের মাত্র ২৫ শতাংশ। বাকি ২৪ লক্ষ ক্যাম্পে যায়নি। তাদের মধ্যে মাত্র ১৫ লক্ষ কোনো না কোনো ধরণের পুনর্বাসন সহায়তা পেয়েছিল। অতএব দেখা যাচ্ছে যে ৯ লক্ষ উদ্বাস্তু সরকারের কাছ থেকে কোনো পুনর্বাসন সহায়তা পায়নি। এই ৯ লক্ষের সঙ্গে যদি ৬ লক্ষ নতুন উদ্বাস্তু এবং ৫০,০০০ অন্তর্বর্তী উদ্বাস্তুকে ধরা যায় তাহলে ১৯৬৬ পর্যন্ত কোনো পুনর্বাসন সহায়তা পায়নি এমন উদ্বাস্তুর মোট সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াবে ১৫,৫০,০০০।

এখন প্রশ্ন হল এই ১৫,৫০,০০০ উদ্বাস্তু গেল কোথায়? সরকারের কাছে এর কোনো উত্তর নেই। ওয়ার্কিং গ্রুপের প্রতিবেদনে ৮০৭টি জবরদখল কলোনির একটি তালিকা আছে। প্রাক ১৯৫১-র জবরদখল কলোনির সংখ্যা ১৪৯টি। এই ৯৫৬টি জবরদখল কলোনির জনসংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ৫.৫০,০০০। অবশিষ্ট ১০ লক্ষ কোনোরকম চিহ্ন না রেখে বিলীন হয়ে গেছে বলে মনে হয়। পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র রাস্তার ধারে এবং রেললাইনের পাশে যে অসংখ্য ঝুপড়ি ছড়িয়ে আছে, এদের সেখানে খোঁজ করলে পাওয়া যাবে। পুরুষেরা দিনমজুর অথবা রিকশাওয়ালা, মেয়েরা মধ্যবিত্ত পরিবারের ঝি। কালিঝুলি মাখা ছেঁড়া জামাপ্যান্ট পরা তাদের ছেলেমেয়েরা চায়েব দোকানে বয়ের কাজ করে দু-চার পয়সা রোজগার করে। এরা আক্ষরিক অর্থে একেবারে রাস্তার ছেলেমেয়ে হয়ে গেছে। এরা দেশ বিভাজন, ক্ষুধা ও ব্যাধির ফসল। একটিমাত্র প্রেরণার দ্বারা এরা তাড়িত-ক্ষুধা। যে ঘরে তারা রাত্রে ঘুমোতে যেত সেখানে প্রায় জায়গাই হত না। একটা ঝুপড়িতে সাধারণত সাত-আট জনের একটা পরিবার থাকত। তাই সারাদিনে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াত, কোথাও কোনো গণ্ডগোল হলেই এরা সেখানে ইটপাথর নিয়ে হাজির হয়ে যেত। এমন কাজ নেই যা তারা করতে পারত না।

ক্ষুধা ও ব্যাধি, বড়দের নির্দয় প্রহার এবং রাস্তায় কুকুরের মতো অর্থহীন ঘুরে বেড়ানো তাদের মধ্যে এক ধরণের বিষাক্ত ক্রোধ পুঞ্জিত করেছিল। সুযোগ এলেই এই ক্রোধ সরকারের বিরুদ্ধে ফেটে বেরোত। এরাই প্রান্তিক মানুষ, ১৯৫৯ ও ১৯৬০-এর খাদ্য আন্দোলনে তাদের এই নৈরাজ্যিক ক্রোধের ফসল তুলেছিল বাম দলগুলি।

১ Estimates Committee 1959-60, Ninety Sixth report (Second Lok Sabha) পৃ ১৪-১৫
২ তদেব পৃ ২
৩ উদ্বাস্তু পৃ ১৩৮
৪ তদেব
৫ তদেব
৬ মন্ত্রিকমিটির রিপোর্ট, পৃ ২৬
৭ তদেব, পৃ ৩০
৮ An Alternative Proposal for Refugee Rehabilitation, P-7
৯ তদেব, পৃ ১০
১০ মন্ত্রিকমিটির প্রতিবেদন, পৃ ১২
১১ তদেব, পৃ ৩৫
১২ Alternative Proposal, P-15
১৩ মন্ত্রিকমিটির প্রতিবেদন, পৃ ২১
১৪ Alternative Proposal, P-24
১৫ তদেব, পৃ ২৬
১৬ তদেব, পৃ ২৭
১৭ তদেব, পৃ ২৮
১৮ তদেব, পৃ ২৯
১৯ তদেব, পৃ ৩০
২০ তদেব, পৃ ৩৩
২১ সরকারি দলিল
২২ উদ্বাস্তু, পৃ ১৪৮—১৫৫
২৩ তদেব, পৃ ১৩৫
২৪ Estimates committee (1959-60) Ninety-Sixth Report (Second Lok Sabha) P-15
২৫ ওয়ার্কিং গ্রুপ-এর প্রতিবেদন, পরিশিষ্ট পৃ—৬
২৬ A Master plan of Economic Rehabilitation of Displaced persons in West Bengal, P-3
২৭ Refugee Rehabilitation Committee, interim report. P-2
২৮ Fact Finding Committee, report quoted in Committee of Ministers', P-4
২৯ Committee of Review of Rehabilitation Work in West Bengal—Rehabilitation loans to Displaced persons from erstwhile East Pakistan in West Bengal, P—3
৩০ Rao Bhaskar, The Story of Rehabilitation, Ministry of Rehabiliation, Government of India, P-116
৩১ Estimates Committee, '1959-60, Eighty-Ninth Report (Second Lok Sabha), P-3
৩২ তদেব, পৃ ১৯
৩৩ Committee of Review of Rehabilitation Work in West Bengal report on

**Rehabilitation loans to Displaced Persons from Erstwhile East Pakistan in West Bengal, P-9**

৩৪ তদেব, পৃ ৯।

৩৫ তদেব, পৃ ১০।

৩৬ তদেব, পৃ ১০

দশম অধ্যায়

# উদ্বাস্তু শক্তি ও বামপন্থী রাজনীতি
# 'এক পয়সার যুদ্ধ' ১৯৫৩

১৯৫৩-র জুলাই-এ উদ্বাস্তু জনসমষ্টির পুঞ্জীভূত ক্রোধ একটি হিংসাত্মক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। এই আন্দোলনকেই 'এক পয়সার যুদ্ধ' বলা হয়ে থাকে। এই আন্দোলন আসলে ট্রামভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন। এই আন্দোলনের সংগঠন ও নেতৃত্ব দেয় সিপিআই ও অন্যান্য বামদল। এই আন্দোলনে উদ্বাস্তু সংগঠন হিশেবে ইউ সি আর সি-র কোনো ভূমিকা ছিল না। কিন্তু ইউ সি আর সি-র নেতারা বামদলগুলিরও স্বীকৃত নেতা এবং এতকালের মিটিং, মিছিল, সমাবেশ, বিক্ষোভ প্রদর্শনের ইউ সি আর সি-র অনুগামী উদ্বাস্তুরা সরকারের বিরুদ্ধে কঠিন আঘাত হানবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল।

১৯৫৫-র জানুয়ারিতে The Statesman-এর সম্পাদক জি এ জনসন কলকাতার অবস্থা সম্পর্কে নেহরুকে একটি চিঠি দিয়েছিলেন। তাতে তিনি কলকাতার পরিস্থিতির কথা তাঁকে জানিয়েছিলেন। কলকাতা অতিরিক্ত জনবহুল। এর চেহারা আপাতত শান্ত। কিন্তু কান পাতলে ভেতরে গর্জন শোনা যায়। এখানে অসংখ্য বেকার। সামান্য কারণেই এখানে মানুষ জড়ো হয় এবং যা ইচ্ছা তাই করে। একটা ছোটখাটো মোটর দুর্ঘটনা হল; ভিড় জমে গেল; গাড়ির ড্রাইভার এমনকী গাড়ির আরোহীদেরও গাড়ি থেকে বার করে নেওয়া হল; মারধোরও করা হল। জনসন নেহরুকে নিজের পরিচয় গোপন রেখে কলকাতায় আসতে বলেছিলেন এবং কলকাতার পরিমণ্ডলকে একবার শুঁকে দেখতে বলেছিলেন যাতে কলকাতার বিপজ্জনক পটভূমির একটি সুস্পষ্ট ধারণা তাঁর জন্মে। বিশেষ কোনো কিছু ঘটছে একথা তিনি বলেননি। কিন্তু তাঁর মতে ছোটখাটো ঘটনা সব সময়েই ঘটছিল যা আপাতত শান্ত হলেও ঝড়ের ইঙ্গিতবহ।[১]

এই চিঠি থেকে জনসনের অসামান্য স্বচ্ছ দৃষ্টির কথা বোঝা যায়। নেহরু এই চিঠির কোনো মূল্য দেননি। তিনি জনসনের বক্তব্যকে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। অথচ কলকাতায় এমন সব ছোটখোটা ঘটনা সর্বদাই ঘটছিল যাদের ভেতরে ঝড়ের গর্জন শোনা যেত। এই চিঠির কথা নেহরু ডঃ রায়কে জানিয়েছিলেন। কলকাতায় যে বিস্ফোরক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তার কারণ ডঃ রায় নেহরুকে জানান। তিনি নেহরুকে লেখেন, জনসন যে পরিস্থিতির কথা লিখেছেন তা তাঁর জানা। এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে কলকাতায় এবং শহরাঞ্চলে বিপুলসংখ্যক বেকার যুবকের উপস্থিতির জন্য। একটি সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান নির্ভর জরিপ থেকে জানা যায় যে কলকাতার ২ লক্ষ ৩৪ হাজার মানুষের কোনো স্থায়ী কর্মের সংস্থান নেই; এদের মধ্যে ৮০ শতাংশ বাঙালি। এদের মধ্যে

১,৩৬,৫০০ মধ্যবিত্ত। এই ২,৩৪,০০০ মানুষের মধ্যে ৭০,০০০ উদ্বাস্তু।[২]

এই সমস্যার সমাধানের জন্য ডঃ রায় কেন্দ্রীয় সাহায্য চান। তিনি নেহরুকে জানান যে একমাত্র বৃহৎ ও ছোটখাটো শিল্পোদ্যোগই এই রাজ্যকে বাঁচাতে পারে। তিনি লেখেন, "বৃহৎ শিল্পোদ্যোগ গড়ে তোলার মতো অর্থ নেই আমার। কিন্তু একটি কি দুটি বৃহৎ শিল্প ও তার সঙ্গে যুক্ত ছোটখাটো শিল্পও আমাদের গড়ে তুলতে হবে।একমাত্র তাহলেই আমরা এ রাজ্যকে বাঁচাতে পারব।" তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন যে দুর্গাপুর পরিকল্পনা কেন্দ্র মঞ্জুর করেনি; অথচ এই পরিকল্পনা থেকে ১২০০ লোকের কর্মের সংস্থান হত।[৩]

সুতরাং যাদের কান আছে তারা শান্ত উপরিতলের অন্তরালে ঝড়ের গর্জন শুনতে পেয়েছিলেন। 'এক পয়সার যুদ্ধ' এই রকমই একটি বিষয় যা মাঝে মাঝেই অন্তরাল থেকে উঠে আসত, যা হঠাৎ নতুনভাবে অর্থবহ হয়ে উঠত এবং সাড়া পড়ে যেত সমস্ত দেশে।

কলকাতা শহরে ১,৮৭,২০০ বাঙালি ছিল যাদের কর্মের পূর্ণ সংস্থান ছিল না। এদের মধ্যে ৭০,০০০ ছিল উদ্বাস্তু। কলকাতার ৩৭·৫ শতাংশ উদ্বাস্তু বাঙালি বিস্ফোরণের পর্যায়ে এসে পৌঁছেছিল। খাদ্যাভাব বাড়ছিল, অত্যাবশ্যক পণ্যের মূল্যও বাড়ছিল। লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুর খাদ্য, আশ্রয় ও কর্মসংস্থানের সমস্যার কোনো সমাধান চোখে পড়ছিল না। প্রশাসনিক যন্ত্র ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। উদ্বাস্তুরা ক্রমাগত মিটিং, মিছিল সমাবেশ করছিল। কলকাতাকে এক মুহূর্ত ভুলতে দিচ্ছিল না যে তারা আছে। সরকার ও বামদলগুলির মধ্যে ক্ষমতার লড়াইয়ের এই ছিল প্রেক্ষাপট। সরকারের নিপীড়নমূলক প্রশাসন যন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল উদ্বাস্তু, শ্রমিক, নিম্নমধ্যবিত্ত ও দরিদ্রতম শহুরে জনতা। বামদলগুলি একত্রে কাজ করতে পারে এমন একটি মডেল ইউ সি আর সি তৈরি করেছিল। সেই মডেল অনুযায়ী একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির নাম দেওয়া হয় 'ট্রামভাড়া বৃদ্ধির প্রতিরোধ কমিটি।' এই কমিটি সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধী দলগুলোর যুক্ত সংগ্রামের নেতৃত্ব দেবে।

১৯৫২-র সাধারণ নির্বাচন বামদলগুলিকে নতুন আত্মবিশ্বাস দিয়েছিল। বাতাসে এক ধরণের নতুন অস্থিরতা ছিল। কলকাতা ও আশপাশে গড়ে ওঠা শহরগুলোতে উত্তেজনা ছিল। এই পরিস্থিতিতে একটি ছোট ব্যাপার কলকাতা ট্রামওয়ে কোম্পানির দ্বিতীয় শ্রেণীর ট্রামের এক পয়সা ভাড়াবৃদ্ধি হঠাৎ বড় হয়ে গভীরভাবে অর্থবহ হয়ে উঠল।

এতকাল পরে একথা হাস্যকর ও অবিশ্বাস্য মনে হয় যে দ্বিতীয় শ্রেণীর ট্রামের এক পয়সা ভাড়া বৃদ্ধির জন্য কলকাতায় প্রচণ্ড উত্তেজনা দেখা দিতে পারে। আসলে যে কারণে ব্যাপারটা ঘটল তা খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। বামদলগুলি তাদের শক্তির পরিচয় দেওয়ার জন্যে একটা সংগ্রামের সুযোগ খুঁজছিল। তারা সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে তাদের ক্ষমতার পরিমাপ করতে চাইছিল। ঠিক এই সময়েই একটি অতিরিক্ত পয়সা ভাড়াবৃদ্ধি সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সুযোগ এনে দেয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর ট্রামের ভাড়াবৃদ্ধি না হলেও অন্য কোনো বিষয় নিয়ে এই বিস্ফোরণ ঘটতই।

কলকাতা ট্রামওয়েজ কোম্পানি দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিটের এক পয়সা ভাড়া বৃদ্ধি করে। এই ভাড়াবৃদ্ধি কার্যকর হওয়ার কথা ছিল ১৯৫৩-র ১ জুলাই থেকে। কিন্তু এই ন্যূনতম ভাড়াবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই এর বিরুদ্ধে সংগঠিত প্রতিরোধ গড়ে উঠল।

ডঃ রায় ৫ জুলাই ইউরোপ সফরে যান। যাবার আগে তিনি ভাড়া বৃদ্ধির কারণ বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করে একটি বিবৃতি দেন। বিবৃতিতে তিনি বলেন যে Calcutta

**Tramway Act** অনুযায়ী এই ভাড়াবৃদ্ধির প্রশ্ন এসেছে। এই আইনে সরকার ট্রাম কোম্পানি কিনে নিতে চুক্তিবদ্ধ হয়। এই চুক্তি অনুযায়ী : (১) ১৯৭২-এর ১ জানুয়ারি থেকে এই ক্রয় কার্যকর হবে; (২) এই অন্তর্বর্তীকালে কোম্পানি সর্বোচ্চ ৪ শতাংশ ডিভিডেন্ট পাবার অধিকারী হবে এবং (৩) বর্তমান ভাড়ার কোনোরূপ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সরকারি অনুমোদন লাভের জন্য 'উপদেষ্টা কমিটি'র সুপারিশ প্রয়োজন হবে। ভাড়াবৃদ্ধির সুপারিশ নিম্নলিখিত কারণে সরকার অনুমোদন করেছে :[৪]

(১) সরকার এই কোম্পানি কিনতে ইচ্ছুক। কারণ, পরবর্তী কয়েক বছরে ট্রামকোম্পানির অর্জিত লভ্যাংশে সরকারও অংশীদার। ফলে চুক্তি অনুযায়ী ১৯৭২-এ কোম্পানির জন্য যে বিক্রয়মূল্য ধার্য করা হয়েছে সেই বিক্রয়মূল্য হ্রাস পাবে। অর্থাৎ সরকারকে কোম্পানি কিনবার জন্য অপেক্ষাকৃত কম মূল্য দিতে হবে।

(২) বর্তমানে ভাড়াবৃদ্ধির ফলে দ্বিতীয় শ্রেণীর ট্রামভাড়া যা দাঁড়িয়েছে তা পৃথিবীর মধ্যে সর্বনিম্ন এবং কলকাতা ও ভারতের অন্যান্য শহরের বাসভাড়ার তুলনায়ও কম।

(৩) ট্রাম চালাবার স্বার্থে প্রয়োজনীয় খরচও বেড়ে যাওয়ায় ট্রামভাড়া না বাড়ালে কোম্পানি বন্ধ হয়ে যাবে।

কোম্পানি 'মুখার্জী' কমিশনের কাছে লিখিত আকারে যে রিপোর্ট পেশ করেছিল তা কমবেশি ডঃ বিধান রায়ের বিবৃতির মতোই। কোম্পানির মতে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে এই সামান্য ভাড়া বৃদ্ধি অসহ্য বলে মনে হবে না। বিষয় তিনটি হল :[৫]

(১) গত ৩০ বছরে ট্রামের ভাড়া বৃদ্ধি ঘটেনি।

(২) এই সময়ের মধ্যে ট্রাম চালাবার খরচ প্রচুর পরিমাণে বেড়ে গিয়েছে। ভাড়াবৃদ্ধি না ঘটিয়ে কোম্পানি আর ক্ষয়ক্ষতি বহন করতে পারছে না।

(৩) ভাড়া বৃদ্ধির পরেও যে ভাড়া দাঁড়িয়েছে তা পৃথিবীর মধ্যে সর্বনিম্ন ভাড়া।

এই ট্রামভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে বিভিন্ন বামপন্থী দল 'ভাড়া প্রতিরোধ কমিটি' নামে একটি কমিটি গড়ে তোলে। এই কমিটি তিনটি যুক্তির উপর ভিত্তি করে ভাড়াবৃদ্ধির বিরোধিতায় নামে।[৬]

(১) কোম্পানির উন্নতি বা কোম্পানির শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে হবে—এমন কোনো আইনি বাধ্যবাধকতা কোম্পানির নেই।

(২) অতিরিক্ত ব্যয়ভারের বোঝা দ্বিতীয় শ্রেণীর ট্রামযাত্রীদেরই বহন করতে হবে এমন কোনো প্রমাণ কোম্পানি দিতে পারেনি। প্রয়োজন হলে সরকারি সাহায্য নিয়ে কোম্পানি তার মূলধন বৃদ্ধি ঘটাতে পারে বা উন্নয়নমূলক প্রকল্প হাতে নিতে পারে।

(৩) দ্বিতীয় শ্রেণীর ট্রামযাত্রীদের আর্থিক সামর্থ্য না থাকায় তারা বর্ধিত ভাড়া দিতে অপারগ। এই ভাড়া বৃদ্ধির ফলে আয়বৃদ্ধি ঘটবে বলে কোম্পানির যে বিশ্বাস তাও অবাস্তব।

এটা পরিষ্কার যে বিরোধীরা ভাড়াবৃদ্ধির বিরুদ্ধে যে যুক্তি দেখিয়েছে সে যুক্তির বিশেষ বিশ্বাসযোগ্যতা ছিল না। আসলে বিশ্বাসযোগ্যতার বিষয়টি নিয়ে এরা মাথাও ঘামায়নি। এই ট্রামভাড়া বৃদ্ধিকে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামার কারণ হিশেবেই তারা ব্যবহার করেছিল।

বিরোধীরা সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জিকে সভাপতি করে 'ট্রামভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধ কমিটি' **(Tram Fare Enhancement Resistance Committee)** নামে একটি সংগঠন

গড়ে তোলে। এই কমিটি বর্ধিত ভাড়া না দেবার জন্য যাত্রীদের কাছে আবেদন জানায়। বর্ধিত ভাড়া কার্যকর হবার দিনই (১ জুলাই) বিক্ষোভ সমাবেশ সংগঠিত হবে বলে স্থির করা হয়েছিল। যাত্রীরা বর্ধিত ভাড়া দিতে অস্বীকার করায় দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে ভাড়া বাবদ আদায়ের পরিমাণ কমে গেল। পিকেটিং, বিক্ষোভ, অ্যাসিড বাল্ব নিক্ষেপ, ইট-পাটকেল ছোঁড়া, ট্রাম পোড়ানো এবং রাস্তা অবরোধ প্রভৃতি কলকাতার বুকে দৈনন্দিন ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। লাঠি চালিয়ে কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়ে, সর্বোপরি গণগ্রেপ্তারের মাধ্যমে সরকার আন্দোলনের মোকাবিলায় নেমে পড়ে। বিরোধীরা ডঃ রায়ের অনুপস্থিতির সুযোগ নেয় এবং তারা বুঝতে পারে যে এই বিক্ষোভের মোকাবিলা করার মতো তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেনের নেই।

প্রথম দিন থেকেই গণ্ডগোলের সূচনা। দ্রুত বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। ট্রাম টার্মিনাসের সামনে পিকেটিং করা হল। TFERC-র স্বেচ্ছাসেবকরা ট্রামে উঠে দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের বর্ধিত ভাড়া দিতে নিষেধ করতে থাকে। পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করায় গণ্ডগোলের মাত্রা তীব্রতর হয়। ট্রাম পোড়াবার চেষ্টা চলতে থাকে। পুলিশের ওপর ইটপাটকেল পড়তে থাকে। সরকার বিরোধী আন্দোলনে ট্রামগাড়ি পোড়ানো বিরোধীদের আন্দোলনের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। ট্রাম পোড়ানো খুবই সহজ কাজ। যাত্রীদের নামিয়ে দিয়ে ইলেকট্রিক তার থেকে ট্রামগাড়ির সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিলেই হল। তারপর নিশ্চল ট্রামগাড়িতে আগুন দিয়ে দেওয়া। কলকাতায় বিক্ষোভ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে সমস্ত ট্রাম চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ৩ জুলাই ট্রাম চলাচল বন্ধ হয়ে যায় এবং ৭১০ জন বিক্ষোভকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার হওয়া বিক্ষোভকারীদের মধ্যে চারজন বিধায়ক, জ্যোতি বসু, গণেশ ঘোষ, জ্যোতিষ জোয়ারদার এবং সুবোধ ব্যানার্জি ছাড়াও ছিলেন ৩ জন মহিলা। পরদিন সরকার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানায় যে তৃতীয় দিনটি (৩ জুলাই) ছিল সকাল থেকে দাঙ্গাহাঙ্গামা গুণ্ডামির দিন। উত্তেজিত জনতা কালীঘাট ট্রামডিপোর সামনে জড়ো হলে সমস্ত ট্রাম রাস্তা থেকে তুলে নেওয়া হয়। শোভাবাজার-চিৎপুর সংযোগস্থলে উত্তেজিত জনতা একটি ট্রামগাড়ি পুড়িয়ে দেয়। একডালিয়া বাজারের কাছে পোড়ে আরো একটি ট্রাম। বিভিন্ন রাস্তায় অবরোধ গড়ে তোলা হয়, ট্রামগাড়ির উপর ইটপাথর, বোমা ছোঁড়া হয়। পিকেটার, বর্ধিত ভাড়া দিতে অনিচ্ছুক যাত্রী, হাঙ্গামাকারী, বোমা নিক্ষেপকারী এবং যারা ট্রাম পুড়িয়েছে তাদের অনেককে গ্রেপ্তার করা হয়।[৭]

পরদিন ৪ জুলাই পুলিশের উপর ইটপাটকেল ছোঁড়া হলে পুলিশের সাথে বিক্ষোভকারীদের তীব্র সংঘর্ষ শুরু হয়। দমদম রেলস্টেশনের কাছে পুলিশ বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে লাঠি চালায়, কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়ে এবং ১১ রাউন্ড গুলি চালায়। ট্রামবাস চলাচল, স্কুল কলেজ দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়। শহর ও শহরতলী এলাকায় জনজীবন স্তব্ধ হয়ে যায়।[৮]

বামপন্থীরা ঠিক করল ট্রামবাসকে ডিপো থেকে ছাড়তে দেওয়া হবে না, যাত্রীবোঝাই রেলগাড়িকে কলকাতায় ঢুকতে দেওয়া হবে না। দমদম এবং বালিগঞ্জ স্টেশনের কাছাকাছি এসে যাত্রীবোঝাই গাড়ি দাঁড়িয়ে রইল। দুটো স্টেশনে রেল অবরোধকারীদের সংখ্যা দাঁড়ায় পাঁচ হাজার। লাঠিধারী পুলিশ অবরোধকারীদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য এগিয়ে আসে। কিছু কিছু বিক্ষোভকারী ওভারব্রিজে উঠে পড়ে। তারপর চারিদিক থেকে পুলিশের উপর ইটপাটকেল পাথর পড়তে শুরু করে। উত্তরে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস

ছোঁড়ে, কিন্তু তাতে কোনো ফল না হলে শেষ পর্যন্ত পুলিশ গুলি চালায়। ইতিমধ্যে দুটো ট্রেন কামরায় আগুন ধরিয়ে দিলে তা সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়। জনগণ ছত্রভঙ্গ হলেও ট্রেনচলাচল সম্পূর্ণ বিঘ্নিত হয়। ডঃ এস সি ব্যানার্জির সভাপতিত্বে বিকেলবেলায় মনুমেন্টের পাদদেশে প্রতিরোধ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। আন্দোলনে সক্রিয় সমর্থন জানাবার জন্য জ্যোতি বসু ও অন্যান্য নেতারা জনগণকে অভিনন্দন জানান এবং সরকারি দমননীতির তীব্র নিন্দা করেন। জ্যোতি বসু জনগণকে স্মরণ করিয়ে দেন যে সফল ধর্মঘটই আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায় নয়। যতদিন সরকার বর্ধিত ভাড়া প্রত্যাহার না করছে ততদিন এ আন্দোলন চলবে। আন্দোলনের দ্বিতীয় দফা শুরু হতে চলেছে। 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র রিপোর্টে বলা হয়—"এক দীর্ঘ মিছিল ধর্মতলা ও কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট হয়ে শ্যামবাজার মোড়ে এসে থেমে যায়।"

৫ থেকে ১৫ জুলাইয়ের মধ্যে দ্বিতীয় দফার আন্দোলন সংগঠিত হয়। ইউ সি আর সি-র আন্দোলনের অনুকরণেই এই আন্দোলনের কর্মসূচি স্থির হয়েছিল—মিছিল, পিকেটিং, মিটিং, বোমা অ্যাসিড বাল্ব, সাধারণ ধর্মঘট প্রভৃতি। ১৫ জুলাই মনুমেন্টের নীচে এক বিশাল সমাবেশ হয়। দ্বিতীয় দফার আন্দোলন ছিল অধিকতর তীব্র এবং এই আন্দোলনে বামপন্থী নেতৃবৃন্দের আন্দোলন পরিচালনার দক্ষতা প্রমাণিত হয়।

১৫ জুলাইয়ের সাধারণ ধর্মঘট সফল হল; যদিও বড়বাজার ও চৌরঙ্গি এলাকা এই ধর্মঘটে কোনো সাড়া দেয়নি। সারা শহরব্যাপী ব্যাপক দাঙ্গাহাঙ্গামা শুরু হয়। কলকাতা, কলকাতার পার্শ্ববর্তী এলাকা ও হাওড়ায় দোকানপাট, কলকারখানা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। যে ১০০টি রাজ্য সরকারি বাস রাস্তায় বেরিয়েছিল তার মধ্যে ৫২টি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গ্যারেজে ফিরে আসে। রাস্তা থেকে ট্রাম তুলে নেওয়া হয়। সরকারি বাসট্রামের ওপর ইটপাটকেল পাথর পড়তে থাকে, কয়েকটিতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। রাস্তার সংযোগস্থলে বিক্ষুব্ধ জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ লাঠি চালায়, কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়ে, শেষ পর্যন্ত গুলি চালায়। যাদবপুরে পুলিশের গুলিতে একজনের মৃত্যু ঘটে এবং ছয়জন আহত হয়। শহরে ঢোকা বেরোবার মুখে প্রায় সমস্ত ট্রেন আটকে যাত্রীদের নামিয়ে দেওয়া হয়। তারা পায়ে হেঁটে বা অন্য কোনো উপায়ে গন্তব্যস্থানে পৌঁছায়। খালি ট্রেনগুলোতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়, নয়তো তার উপর বোমা ছোঁড়া হয়। বেলঘরিয়া স্টেশনে বিক্ষুব্ধ জনতা দুটো কামরার মধ্যেকার সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। পুলিশ জনতার উপর লাঠি চালায়, কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়ে। দমদম স্টেশনে সিগনালের তার কেটে দিয়ে ট্রেনচলাচলে বিঘ্ন ঘটানো হয়। হাওড়া-খড়্গপুর বিভাগে যোগাযোগের তার কেটে দেওয়ায় ট্রেন বাতিল করা হয়। বিকেল ৫টায় ধর্মঘট শেষ হলে শহরের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মিছিল এসে মনুমেন্টের তলায় ২০,০০০ মানুষের বিশাল সমাবেশ ঘটে। এটাই হল ১৫ জুলাইয়ের ধর্মঘটের চিত্র। বামপন্থী নেতারা ধর্মঘট সফল করার জন্য জনগণকে অভিনন্দন জানিয়ে ধর্মঘট চালিয়ে যাবার আহ্বান জানান।[৯]

বিভিন্ন জেলায় ডাকা ধর্মঘটে বিপুল সাড়া পাওয়া যায়। কৃষ্ণনগর, বহরমপুর, শান্তিপুরে ধর্মঘট সফল হয়। দোকানপাট, স্কুলকলেজ, যানবাহন বন্ধ থাকে। অর্থাৎ এককথায় জনজীবন স্তব্ধ হয়ে যায়।

এইভাবে দ্বিতীয় দফার আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটে। ইউ সি আর সি-র অংশগ্রহণ উদ্বাস্তুদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সকল উদ্বাস্তুই ইউ সি আর সি-র নেতৃত্ব মেনে নেয়নি। বিরুদ্ধ উদ্বাস্তু সংগঠন আর সি আর সি, কে এম পি পি-র সাথে যুক্ত হওয়ায় উচ্ছেদ

বিলের বিরুদ্ধে যৌথ আন্দোলন ব্যাহত হয়। কিন্তু বর্তমানে 'প্রতিরোধ কমিটি'র মধ্যে এই দুই সংগঠনই মিশে যায়। ইউ সি আর সি-র ডঃ এস সি ব্যানার্জি (কে এম পি পি) সত্যপ্রিয় ব্যানার্জি (ফরোয়ার্ড ব্লক), সুবোধ ব্যানার্জি (এস ইউ সি) নরেন দাস (সিপিআই) আর সি আর সি-র নিখিল দাস (আর এস পি), হেমন্তকুমার বসু (ফরোয়ার্ড ব্লক) এবং জ্যোতি বসু (সিপিআই) প্রতিরোধ কমিটির সাথে যৌথ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন ডঃ এস সি ব্যানার্জি এবং সম্পাদক ছিলেন হেমন্তকুমার বসু। প্রতিরোধ কমিটিকেই বামফ্রন্টের প্রকৃত ভ্রূণাবস্থা বলা যেতে পারে। প্রতিরোধ কমিটির নেতৃত্ব আর ইউ সি আর সি-র নেতৃত্ব একই। প্রতিষ্ঠার দিন ইউ সি আর সি-র মূল লক্ষ্য ছিল উদ্বাস্তু, কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র এবং মধ্যবিত্তদের নিয়ে যৌথ আন্দোলন গড়ে তোলা। স্বল্পকালের জন্য হলেও প্রতিরোধ কমিটির মাধ্যমে সেই লক্ষ্য পূরণ হয়েছিল। দ্বিতীয় দফার আন্দোলনে দেখা গেল যে শ্রমিক, ছাত্র এবং নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষ আন্দোলনে শামিল হয়েছে এবং এদের পাশে রয়েছে অগণিত উদ্বাস্তু সম্প্রদায়। কিন্তু কৃষক সম্প্রদায় এই যৌথ বামপন্থী সংগঠনের আয়ত্তের বাইরে থেকে যায়। কিন্তু এই ১০ দিনের কান-ফাটানো চিৎকার দেশের ভূমিহীনদের কানে গিয়ে পৌঁছায় এবং দুবছরেরও কম সময়ের মধ্যে বামফ্রন্টের ডাকে তারা জীবন বিপন্ন করেও কলকাতার বুকে আন্দোলনের মূলস্রোতে এসে মিলিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গের প্রগতিশীল পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রতিরোধ কমিটির আন্দোলন একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। এই আন্দোলনের মাধ্যমে ভবিষ্যতে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল। বামপন্থীদের জনমত গঠনের নীতি, জনগণকে যৌথ আন্দোলনে শামিল করার ক্ষমতা, সরকারি দমননীতি প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের কৌশল জনগণের চোখ খুলে দিয়েছিল।

তৃতীয় দফার আন্দোলনে যে বিষয়টি বিশেষভাবে স্থান পায় তা হল সাংবাদিকদের উপর পুলিশি অত্যাচার। ১৪৪ ধারা লঙ্ঘন উপলক্ষে প্রতিরোধ কমিটি যে জনসভা অনুষ্ঠিত করে তার সংবাদ সংগ্রহের জন্যই এই সাংবাদিকরা উপস্থিত হয়েছিলেন। ১৬ জুলাই শহরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ওয়েলিংটন স্কোয়ারে এবং তার চারদিকে হাঙ্গামা সংগঠিত হয়। বহুবার পুলিশ গুলি চালায় এবং শোনা যায় গুলিতে একজন প্রাণ হারান। সেনাবাহিনী উত্তর কলকাতার রাস্তায় মার্চ করে। যদিও সরকার একে দৈনিক রুটিন বলে উল্লেখ করেছে। এ থেকে পরিষ্কার বোঝা গেল যে শহরের বুকে উত্তেজনা থামাতে পুলিশবাহিনীকে সরকার যথেষ্ট বলে মনে করেনি। ছাত্ররা ১৪৪ ধারা লঙ্ঘন করে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে সমাবেশ করে। পুলিশ তাদের উপর লাঠি চালায়, কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়ে। ২১ জন ছাত্রকে গ্রেপ্তার করা হয়, ওয়েলিংটন স্কোয়ারের দক্ষিণপূর্ব কোণে ব্যারিকেড গড়ে তোলা হয়। টহলদারী পুলিশ রাস্তা মুক্ত করার জন্য গুলি চালায়। সাংসদ প্রফেসর হীরেন মুখার্জি প্রধানমন্ত্রীকে এক তারবার্তা পাঠিয়ে তাঁর হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেন; কারণ কলকাতার পরিস্থিতি ক্রমশই জটিল আকার ধারণ করছিল। বিধান পরিষদের নির্দল সদস্য (MLC) প্রফেসর এন সি ভট্টাচার্য রাজ্যপালকে এক খোলা চিঠি দিয়ে রাজ্য বিধানসভার অধিবেশন ডাকবার অনুরোধ জানান। প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি এস সি ব্যানার্জিকে তাঁর বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।[১৮]

ট্রাম ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন (কমিউনিস্ট) এবং ট্রামওয়ে মজদুর পঞ্চায়েত (সোস্যালিস্ট) আন্দোলনে শামিল হয়। তারা যৌথভাবে তাদের সদস্যদের ৫ দিনের ধর্মঘট পালনের

ডাক দেয়। তাদের দাবি ছিল :[১১]

(১) ট্রামের দ্বিতীয় শ্রেণীর বর্ধিত ভাড়া প্রত্যাহার করতে হবে।

(২) শহরের বুক থেকে ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করতে হবে।

(৩) প্রতিরোধ কমিটির আন্দোলনে অংশগ্রহণ করায় যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের সকলকে মুক্তি দিতে হবে।

(৪) যাদবপুর, আসানসোল এবং আমহার্স্ট স্ট্রিটে পুলিশে গুলি চালনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত করতে হবে।

ট্রাম কর্মচারীদের ধর্মঘটকে স্বাধীনতা উত্তর পশ্চিমবঙ্গে শ্রমিকদের প্রথম রাজনৈতিক ধর্মঘট হিশেব গণ্য করা যায়। তাদের কোনো অর্থনৈতিক দাবি ছিল না। তাবা বর্ধিত ট্রামভাড়া প্রত্যাহার দাবি জানিয়েছে। ট্রামকোম্পানির কর্তৃপক্ষ বোঝাতে চেয়েছিল যে বর্ধিত ভাড়া বাবদ আয় থেকে কর্মচারীদের মজুরি বৃদ্ধি ঘটানো হবে। কিন্তু এই যুক্তি দিয়ে ট্রাম কর্মচারীদের ভোলানো যায়নি। এখন থেকে তারা আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে থাকে। জ্বলন্ত ট্রাম ও ট্রামকর্মচারীদের ধর্মঘট কলকাতা শহরে আন্দোলনের প্রতীক হয়ে ওঠে।

বিরোধীদের আক্রমণের মোকাবিলায় সরকার তাঁর পুলিশ বাহিনীর উপরই নির্ভর করেছিল। আন্দোলনের মোকাবিলার জন্য যে জনসমর্থনের অসীম মূল্য থাকতে পারে সে ধারণা সরকারের ছিল না বললেই চলে। ১৬ জুলাই পথে সেনাবাহিনীর মার্চ করাকে দৈনন্দিন রুটিন বলে প্রচার করে সরকার মানুষকে বোকা বানাতে পারেনি। ওইদিনই মন্ত্রিসভার বৈঠক বসে এবং পুলিশমন্ত্রী কালীপদ মুখার্জি সাংবাদিকদের জানান যে, 'সরকার শক্তির মোকাবিলা শক্তি দিয়ে করতেই বদ্ধপরিকর।' এইভাবে বিরোধীদের কাছে সরকারের মুখোশ খুলে যায়। সরকারের মনোভাব পুলিশ বাহিনীর মধ্যে দ্রুততার সাথে ছড়িয়ে পড়ে। আন্দোলন নিশ্চিহ্ন করে দেবার জন্য পুলিশ প্রস্তুতি নেয়।

সভা, মিছিল করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে সরকার শহরের বুকে ১৪৪ ধারা জারি করে। সরকারের এই ঘোষণাকে নস্যাৎ করে দেবার জন্য ধারাবাহিকভাবে মিটিং মিছিল অনুষ্ঠিত হতে থাকে।

১৭ জুলাই রাত নেমে এলে অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকে। শ্রদ্ধানন্দ পার্ক অঞ্চলে ব্যাপক দাঙ্গাহাঙ্গামা ছড়িয়ে পড়ে । রাস্তা অবরোধ করা হয়, একটি সরকারি বাস পোড়ে এবং পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল ছোঁড়া হয়।

দক্ষিণ কলকাতার এক বিরাট অঞ্চল বিক্ষোভকারীদের দখলে চলে যায়। ১৪৪ ধারা লঙ্ঘন করে মিটিং করার অপরাধে পুলিশ প্রতিরোধ কমিটির একদল স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করে। স্বেচ্ছাসেবকদের পুলিশভ্যানে তোলার সাথে সাথেই পুলিশের উপর ইটপাটকেল পড়তে থাকে এবং গোটা এলাকাই রণক্ষেত্রের আকার ধারণ করে। বিক্ষোভকারীরা কালীঘাট ট্রামডিপোতে আগুন লাগাবার চেষ্টা করে এবং দমকল কেন্দ্র আক্রমণ করে। সরকারি বাসের উপর বোমা নিক্ষিপ্ত হলে ৬ জন ব্যক্তি আহত হন। ১৮ জুলাই বিক্ষোভকারীরা শোভাবাজার এলাকায় হাঙ্গামা শুরু করে। বোমানিক্ষেপকারী হামলাবাজদের ছত্রভঙ্গ করার উদ্দেশ্যে পুলিশ ৯ রাউন্ড গুলি চালায়।

এই সময় সরকার ট্রামভাড়া বৃদ্ধির বিষয়টি ট্রাইব্যুনালে পাঠায় এবং বর্ধিত ভাড়া কার্যকর করা স্থগিত রাখে। শহরের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্য সরকার 'প্রেস উপদেষ্টা কমিটি'র সদস্যদের মহাকরণে এক সভায় যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানায়।

খোলাখুলি আলোচনা হল। এ বিষয়ে প্রতিরোধ কমিটি যে বিবৃতি দেয় তার সংক্ষিপ্তসার হল :[১২] বিলম্বে হলেও সরকার বুঝতে পেরেছে যে তার নীতির পরিবর্তন আবশ্যিক। কিন্তু সরকারের সর্বশেষ বিবৃতিটি সন্তোষজনক নয়। কারণ এতে প্রধান দাবিগুলিকে মেনে নেওয়া হয়নি। ভাড়াবৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করায় যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তাদের বিনাশর্তে মুক্তিদানের বিষয়ে সরকার নীরব। ১৪৪ ধারা প্রত্যাহৃত হচ্ছে না এবং পুলিশি অত্যাচারের তদন্তের বিষয়েও সরকার নীরবতা পালন করছে।

২২ জুলাই সরকারি নীতি অমান্য করে প্রায় ৩০০ জন আন্দোলনকারী মনুমেন্টের নীচে এক সভায় মিলিত হয়। প্রতিরোধ কমিটি আগেই ঘোষণা করেছিল যে সাংবাদিক ও ফটোগ্রাফাররাও ওই সভাঙ্গনে উপস্থিত থাকবেন। বর্ধিত ভাড়া কার্যকর করা স্থগিত রাখতে বিরোধীরা সরকারকে বাধ্য করেছে। তবুও এর খাঁড়া মাথার উপর ঝুলছে। কারণ তখনো তা প্রত্যাহৃত হয়নি। সভা অনুষ্ঠানের দিন আগেই ঘোষিত হওয়ায় বিরোধীদের দৃষ্টান্তমূলক শিক্ষা দেবার সুযোগ সরকার ও তার পেটোয়া পুলিশের হাতে এসে গেল।

বেলা ৫টায় মিটিং হবার কথা। মিটিং শুরু হবার এক ঘণ্টা আগে থেকেই সশস্ত্র পুলিশ এবং লাঠিধারী পুলিশবাহিনী চৌরঙ্গি থেকে মনুমেন্ট পর্যন্ত গোটা রাস্তা নিজেদের দখলে নিয়ে নেয়। মনুমেন্টের নীচে শাদা পোশাকের পুলিশ-মোতায়েন করা হয়। সভাস্থল থেকে কিছুটা দূরে প্রস্তুত হয়ে থাকে অশ্বারোহী পুলিশবাহিনী। সভা শুরু হলেই এক ট্রাক বোঝাই পুলিশ এসে মেয়ো রোডে নামে এবং সেখানে যারা জমায়েত হয়েছিল নির্মমভাবে তাদের লাঠিপেটা করতে থাকে। জমায়েতকারীরা পালিয়ে যাবার পথ খুঁজে পায়নি। কারণ পালাবার পথে শাদা পোশাকের পুলিশ দাঁড়িয়ে। পুলিশবাহিনী তাদের উপর যথেচ্ছ অত্যাচার চালিয়ে তাদের পুলিশভ্যানে তোলে। যেসব সাংবাদিক সেখানে হাজির ছিলেন তাঁরাও মারের হাত থেকে রেহাই পেলেন না। ফটোগ্রাফারদের ক্যামেরা ভাঙচুর করা হল। দুজন আহত সংবাদসংস্থার কর্মীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হল এবং ছয় জনকে গ্রেপ্তার করা হল।[১৩]

সাংবাদিকদের উপর পুলিশি অত্যাচারের খবর মহাকারণে ছড়িয়ে পড়ায় সরকার বিব্রত বোধ করে। পুলিশমন্ত্রী কালীপদ মুখার্জি নিজে লালবাজার ছুটে এসে গ্রেপ্তার হওয়া সাংবাদিকদের সাথে সাক্ষাৎ করেন, তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দেওয়া হল। কিন্তু কলকাতার সংবাদপত্র সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। পরদিন দৈনিক সংবাদপত্রে মারমুখী পুলিশের ছবিসহ বড় বড় হরফে পুলিশি আক্রমণের খবর প্রকাশিত হয়। সমস্ত সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় কলমে সরকার ও পুলিশকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করা হয়। পুলিশের পূর্বপরিকল্পিত আক্রমণে সারা দেশের মানুষ মর্মাহত ও স্তম্ভিত হয়ে যায়। সংবাদসংস্থার কর্মীদের আক্রমণ করা পুলিশের লক্ষ্য ছিল না, তারা তাদের চিনতে পানেনি। এই আক্রমণের ফলে বিবেকহীন সরকারকে নীরবে জনগণের ঘৃণা সহ্য করতে হল।

পরদিন সরকার শহরের বুক থেকে ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করে নেয়, সাংবাদিক ও ফটোগ্রাফারদের উপর পুলিশি আক্রমণের বিচারবিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দেয় এবং পি ডি অ্যাক্ট অনুযায়ী গ্রেপ্তার হওয়া ৫ জন নেতাকে মুক্তি দেয়।[১৪] ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন টেলিফোনে ডঃ বিধান রায়ের সাথে যোগাযোগ করে প্রথম বিমানেই তাঁকে কলকাতায় চলে আসার অনুরোধ জানান। ডঃ রায় ৩০ জুলাই কলকাতায় পৌঁছান। বামপন্থী দলের নেতারা ওয়েলিংটন স্কোয়ারে এক সভায় ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার

করায় সন্তোষ প্রকাশ করেন।

ট্রাম কর্মচারীরা ওয়েলিংটন স্কোয়ারে এক সভায় সিদ্ধান্ত নেয় যে যতদিন সরকার প্রতিরোধ কমিটির দাবি মেনে না নিচ্ছে ততদিন ধর্মঘট চলবে। তাদের দাবি ছিল :[১৫]

(১) আন্দোলনের সাথে যুক্ত সমস্ত বন্দীদের অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে।

(২) বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে ঝুলে থাকা সমস্ত মামলা প্রত্যাহার করতে হবে।

(৩) পুলিশি আক্রমণের বিচারবিভাগীয় তদন্ত করতে হবে।

২৫ জুলাই মনুমেন্টের নীচে এক বিশাল জনসভা করে প্রতিরোধ কমিটি আন্দোলনের বিজয়োৎসব পালন করে। সমস্ত বামপন্থী দল এই সভায় অংশগ্রহণ করে। জনসভা সাফল্যের সাথে সম্পন্ন হল। এটা বামপন্থীদের ঐক্যেরই প্রতীক নয়, এটা প্রকৃতপক্ষে কলকাতার নাগরিকদেরও সভা। কারণ সমস্ত শ্রেণীর মানুষ এই সভায় যোগ দেয়। বহুবর্ণে রঞ্জিত বামপন্থীদলের পতাকা, ফেস্টুন এই জনসভাকে এক উৎসবের রূপদান করে। দীর্ঘ ২৫ দিনের আন্দোলনের মূল্যায়ন করে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রতিরোধ কমিটির যে সমস্ত দাবি তখনো পূরণ হয়নি তার একটি তালিকা সভায় প্রস্তুত করা হল। এই প্রস্তাবে বলা হয় যে প্রতিরোধ কমিটি বর্ধিত ট্রামভাড়া প্রত্যাহারের দাবিতে আন্দোলন শুরু করেছিল; সরকার তার উত্তরে চালিয়েছে দমননীতি। আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কলকাতা ও শহরতলীর হাজার হাজার মানুষের সমর্থন আন্দোলনে নতুন মাত্রা এনে দিয়েছে। এই আন্দোলনের তীব্রতা এত বেশি ছিল যে সরকার বাধ্য হয়ে দমননীতি চালিয়েছে। ফলে ঘটেছে জীবনহানি, সম্পত্তি নষ্ট, সাংবাদিক এবং কলকাতার মানুষের উপর অত্যাচার নেমে এসেছে এবং ৪০০ জনেরও বেশি মানুষ গ্রেপ্তার হয়েছে। সভায় প্রস্তাব নেওয়া হল যে যতদিন পর্যন্ত নিম্নলিখিত দাবিসমূহ পূরণ না হবে ততদিন পর্যন্ত আন্দোলন চলবে:[১৬]

(১) পুলিশি অত্যাচারের বিচারবিভাগীয় তদন্ত করতে হবে।

(২) প্রতিরোধ আন্দোলনের সাথে যুক্ত থাকার অপরাধে যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তি দিতে হবে।

(৩) পুলিশের গুলিতে যারা আহত ও নিহত হয়েছে তাদের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

(৪) সরকারি কর্মচারী বা অন্যান্য সংস্থার কর্মীদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আনা চলবে না।

(৫) দ্বিতীয় শ্রেণীর ট্রামভাড়া বৃদ্ধি করা চলবে না।

(৬) ট্রামকর্মচারীদের ধর্মঘটের দিনগুলোর বেতন দিতে হবে।

প্রতিরোধ কমিটির নেতৃত্ব যে এই আন্দোলনের তাৎপর্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিলেন তা তাঁদের বক্তব্যের মধ্য দিয়েই প্রকাশ পায়। ফরোয়ার্ড ব্লকের নেতা বিভূতি ঘোষ উল্লেখ করেন যে এই আন্দোলন ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। এই আন্দোলনের মাধ্যমেই বামপন্থী দলের মধ্যে ঐক্য সাধন সম্ভব হয়েছে।[১৭] ডঃ এস সি ব্যানার্জি এই আন্দোলনকে প্রকৃত গণজাগরণ বলে মন্তব্য করেন। এই আন্দোলন বৈপ্লবিক গণআন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে বলে উল্লেখ করেন। ডঃ বিধান রায় প্রতিরোধ কমিটির ছয় দফা দাবির লিখিত উত্তর দিলেন এইভাবে—

"ট্রামভাড়া বৃদ্ধির বিষয়টি ট্রাইব্যুনালে পাঠানো হয়েছে এবং ট্রাইব্যুনালের রায় না পাওয়া পর্যন্ত এবং জনপ্রতিনিধিদের মতামত ছাড়া কোনোপ্রকার ভাড়া বৃদ্ধি করা হবে

না।"

ডঃ বিধান রায়ের উত্তরের প্রতিক্রিয়ায় প্রতিরোধ কমিটির বক্তব্য হল : "প্রতিরোধ কমিটির মূল লক্ষ্য ছিল ট্রামভাড়া বৃদ্ধির প্রতিরোধ করা। শক্তিশালী গণআন্দোলনের ফলে সাময়িকভাবে হলেও সরকার ভাড়াবৃদ্ধি স্থগিত রাখতে বাধ্য হয়েছে। এই জয় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। মুখ্যমন্ত্রী বিষয়টি ট্রাইব্যুনালে পাঠিয়েছেন এবং জনপ্রতিনিধিদের মতামত না নিয়ে ভাড়া বৃদ্ধি করবে না বলে আশ্বাস দিয়েছেন।"

৪ আগস্ট ওয়েলিংটন স্কোয়ারে বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত করে প্রতিরোধ কমিটি দ্বিতীয়দফা আন্দোলনের বিজয়োৎসব পালন করে। বামপন্থী নেতারা এই প্রতিরোধ কমিটির মাধ্যমে কী সুযোগ-সুবিধা লাভ করা গিয়েছে তার ব্যাখ্যা করে আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য জনগণকে অভিনন্দন জানান।[১৮]

## এই আন্দোলনে উদ্বাস্তুদের ভূমিকা

ট্রামভাড়া বৃদ্ধির প্রতিরোধ আন্দোলনে উদ্বাস্তুদের ভূমিকা কি ছিল? সরকারি তথ্য থেকে এই আন্দোলনে উদ্বাস্তুদের অংশগ্রহণের একটি পরিষ্কার চিত্র পাওয়া যায়।—"কলকাতায় নিকটতম উদ্বাস্তু কলোনিগুলোর সমস্ত পুরুষ উদ্বাস্তুই এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল।"

"দমদমের বিভিন্ন কলোনি এবং আজাদগড়, বিজয়গড়, পোদ্দার নগব (১) রিজেন্ট কলোনি, নেহরু কলোনি, অঞ্জনগড় কলোনি, রায়মল্লিক কলোনি, লেক কলোনি এবং দক্ষিণের প্রতাপাদিত্য কলোনিতে প্রতিরোধ আন্দোলনের সময় কিভাবে পুলিশি আক্রমণ নেমে এসেছে ২৫ জুলাই-এর সরকারি রিপোর্টে তার উল্লেখ করা হয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণ শহরতলীর বড় বড় কলোনিগুলির উপর পুলিশ হামলা চালিয়েছে, উদ্বাস্তুদের বেধড়ক লাঠিপেটা করে গণগ্রেপ্তার করেছে।"

২৭ জুলাই-এর আর একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে যে একনাগাড়ে তিনদিন এই পুলিশি হামলা চলেছে। ইউ সি আর সি নেতারা আহত ও গ্রেপ্তার হওয়া উদ্বাস্তুদের তালিকা প্রস্তুত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কলোনিগুলোর উপর পুলিশি আক্রমণের দুটো লক্ষ্য ছিল : প্রতিরোধ কমিটির শক্ত হাত ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া আর উচ্ছেদ বিরোধী আন্দোলনকে দমন করা।

প্রকৃতপক্ষে প্রতিরোধ কমিটির আন্দোলন চলাকালীন উদ্বাস্তু কলোনিগুলোতে বিভীষিকার রাজত্ব বিরাজ করছিল। পোদ্দার নগর (১)-এর বাসিন্দা বিজয় মজুমদার উল্লেখ করেছেন যে ১৬ জুলাই সন্ধেবেলা তিনি কলোনিতে ফিরে দেখলেন যে পুরুষ উদ্বাস্তুদের সকলেই কলোনি ছেড়ে পালিয়েছে, আর মহিলারা পথ চেয়ে বসে আছে। আজাদগড় প্রসঙ্গে ইন্দু গাঙ্গুলির বক্তব্য একই।

এই আন্দোলনে কলকাতার সমগ্র ছাত্রসমাজ অংশগ্রহণ করেছিল। কিন্তু তারা প্রতিদিন অংশগ্রহণ করত না। ধর্মঘটের দিনগুলোতেই তারা অংশগ্রহণ করত আর স্কুলকলেজে যাবার পথে আন্দোলনে যোগ দিত (যদি সে সময় কোনো আন্দোলন চলতে থাকত)। ট্রাম কর্মচারীরা ১৫ দিনের ধর্মঘট ডেকে এই আন্দোলনে সাড়া দিয়েছিল। প্রতিরোধ কমিটির মূল শক্তি ছিল জবরদখল কলোনির উদ্বাস্তুরা যাদের কুঁড়েঘরের চালা ছাড়া হারাবার আর কিছুই ছিল না। উদ্বাস্তুদের অস্ত্র ছিল বোমা,

ইটপাটকেল ইত্যাদি। ইটপাটকেল জোগাড় করা এবং বোমা তৈরির কেন্দ্রই ছিল কলোনি এবং বস্তিগুলো। প্রতিরোধ কমিটির আন্দোলনে উদ্বাস্তুরা কতটা অংশগ্রহণ করেছিল তা পুলিশি আক্রমণের মাত্রা থেকেই বোঝা যায়।

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কলোনির উদ্বাস্তু নেতাদের সাথে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে যে আন্দোলনে সমগ্র উদ্বাস্তু সমাজ অংশগ্রহণ করেছিল।[১৯] সকল নেতাই একই কথা বলেছেন। প্রতিরোধ কমিটির একমাস ব্যাপী আন্দোলন চলাকালীন এই নেতারা কলকাতায় যাবার জন্য তাঁদের কলোনিগুলো থেকে চাঁদা তুলতেন এবং কলকাতায় গিয়ে ট্রামে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠে যাত্রীদের ভাড়া দিতে বারণ করতেন। তারা নিজেরাই আগের হারেই ভাড়া মিটিয়ে দিতেন। স্লোগান দেওয়া, পথবিক্ষোভে যোগদান করা, পুলিশের উপর ইটপাটকেল বোমানিক্ষেপ আর ট্রামগাড়িতে আগুন লাগানো—এ সমস্তই ছিল তাঁদের কর্মসূচি। তাঁরা অবশ্য কলকাতার পথ নাটকের প্রতিদিনকার অভিনেতা (অংশগ্রহণকারী) ছিলেন না। দৈনিক অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে থাকত সি পি আই, বামপন্থীদলের কিছু প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী আর কলকাতার উচ্ছৃঙ্খল সমাজবিরোধী শহুরে জনতা। কিন্তু উদ্বাস্তু অংশগ্রহণকারীরা ছিল অসংখ্য এবং দৃঢ়চেতা।

ইউ সি আর সি নেতারা প্রতিরোধ কমিটির সাথে গভীরভাবে যুক্ত হলেও উদ্বাস্তুদের মধ্যে তাদের কর্মস্রোত অব্যাহত থাকে। ২৫ জুলাই ইউ সি আর সি এক সভা ডেকে কলোনিগুলোর উপর পুলিশি অত্যাচারের তীব্র প্রতিবাদ জানায়।

১৩ আগস্ট ইউ সি আর সি তৃতীয় বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করে। এস সি ব্যানার্জি ইউ সি আর সি-র সাফল্যের বিবরণ দেন এবং উদ্বাস্তুদের স্বার্থে সমস্ত উদ্বাস্তু সংগঠনকে ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানান। বক্তাদের বক্তব্যের মাধ্যমে ইউ সি আর সি-র আত্মবিশ্বাসের সুর ধ্বনিত হয়। এস ইউ সি নেতা সুবোধ ব্যানার্জি ক্ষমতাদখলের লক্ষ্যে পৌঁছাবার প্রয়োজনে উদ্বাস্তুদের সামরিক কায়দায় প্রশিক্ষণদানের কথা উল্লেখ করেন।[২০]

প্রতিরোধ কমিটির আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকে বামপন্থী নেতারা বুঝতে পারলেন যে ইউ সি আর সি ক্রমশ একটি শক্তিশালী সংগঠন হিশেবে গড়ে উঠছে এবং সরকার বিরোধী সমস্ত প্রকার আন্দোলনে ইউ সি আর সি বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। এ সত্য প্রমাণিত হল যখন 'দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি' 'দক্ষিণ কলিকাতা শহরতলি বাস্তুহারা সংহতি' এবং ইউ সি আর সি-কে এক আবেদন জানায়। এই আবেদনে ২৯ জুলাই ১৪৪ ধারা লঙ্ঘন করে খাদ্যের দাবিতে মহাকরণ অভিযান কর্মসূচিতে স্বেচ্ছাসেবক পাঠাবার জন্য অনুরোধ জানানো হয়। এছাড়া, বারুইপুর, সোনারপুর, ক্যানিং ও জয়নগর থেকে যে সমস্ত কৃষক আসবেন তাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করারও আবেদন জানানো হয়। 'দক্ষিণ কলিকাতা শহরতলী বাস্তুহারা সংহতি' সমাবেশে দুটো মিছিল পাঠায় এবং কৃষকদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে। নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি সরকারের বিরুদ্ধে তাদের আন্দোলনে ইউ সি আর সি-কে সাহায্য করবার জন্য অনুরোধ করে এবং ১৯৫৪-র ১৮ জানুয়ারি সমস্ত বামপন্থীদল যে সভায় ১০ ফেব্রুয়ারি আন্দোলনের রূপরেখা ঠিক করবে সেই সভায় ইউ সি আর সি-কে একজন প্রতিনিধি পাঠাবার অনুরোধ করে। ১৭ জানুয়ারি ইউ সি আর সি এই মর্মে এক প্রস্তাব গ্রহণ করে যে তারা শিক্ষক আন্দোলনে সাহায্য করতে ইচ্ছুক এবং ১০ ফেব্রুয়ারি শিক্ষক আন্দোলনের দিন ইউ সি আর সি দক্ষিণ কলকাতায় ধর্মঘটের ডাক দেয়।[২১]

# খাদ্য আন্দোলন : ১৯৫৯

দক্ষিণ কলকাতার উপনির্বাচনে শরৎ বোসের জয় কংগ্রেসকে প্রচণ্ডভাবে আঘাত হানে। প্রধানমন্ত্রী নেহরু এই নির্বাচনের ফলাফলকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে জনগণের রায় বলে মনে করেছিলেন। তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভার পদত্যাগ করা উচিত। কিন্তু ডঃ বিধান রায়ের মতে রাজনৈতিক কারণে এই পরাজয় ঘটেনি, ঘটেছিল অর্থনৈতিক কারণে। পশ্চিমবঙ্গের মূল সমস্যা খাদ্যের ঘাটতি, বেকারি এবং উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজনীয় জমির অভাব। পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু সমস্যা এবং বেকার সমস্যা সম্পর্কে নেহরুর মনোভাবের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। খাদ্য সমস্যা সম্পর্কেও নেহরু একই মনোভাব পোষণ করতেন।

ডঃ বিধান রায় ১৯৪৯-এর ২২ জুন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির কাছে এক গোপন নোট পাঠান। এই নোটে তিনি উল্লেখ করেন যে অবিভক্ত বাংলায় চিরদিনই খাদ্যের ঘাটতি হয়ে এসেছে এবং দেশবিভাগের পর এই ঘাটতির পরিমাণ আরো বেড়ে গিয়েছে। প্যারিস থেকে ডঃ বিধান রায় ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী নলিনীরঞ্জন সরকারকে জানান যে তিনি (সরকার) যেন ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং-এ পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যের উন্নতি ঘটাবার দাবি জানিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করেন।[২২] তিনি সর্দার প্যাটেলকে এক দীর্ঘ চিঠিতে জানান যে খাদ্যের কোটা বৃদ্ধি করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার জনগণের খাদ্য জোগানের যে প্রচেষ্টা চালিয়েছে কিভাবে তা কেন্দ্রীয় খাদ্য দপ্তর বারবার প্রত্যাখ্যান করেছে। তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন যে কেন্দ্রীয় সবকারের সহযোগিতা ছাড়া রাজ্য সরকারের পক্ষে তাঁর কাজ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।[২৩]

ন্যায়সঙ্গত কারণেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্যের খাদ্য ঘাটতি পূরণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি জানাতেই পারে। পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যে ঘাটতি আছে বলেই এ দাবি নয়, দাবির আরো কারণ হল বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে ৪০ লাখ উদ্বাস্তু রয়েছে যাদের দায়দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারও অস্বীকার করতে পারে না। উপরন্তু পশ্চিমবঙ্গের কৃষি জমির এক বিরাট অংশ পাট চাষের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। দেশবিভাগের ফলে পাট চাষের দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গের কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের চটকলগুলিকে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে। কারণ পাট রপ্তানির ফলে ভারতে বৈদেশিক মুদ্রা আমদানি করা হয়। তাই ধানচাষের জমিকে পাট ও মেস্তা চাষের কাজে ব্যবহার করার ফলেও পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যে ঘাটতি দেখা দিয়েছে। কিন্তু পাট রপ্তানির জন্য যে কর আদায় হয় তা থেকে পশ্চিমবঙ্গ যে অংশ পাবার অধিকারী কেন্দ্রীয় সরকার তাও কমিয়ে শতকরা ২০ ভাগ থেকে ১২ ভাগে নামিয়ে দিয়েছে; অর্থাৎ আগে পাওয়া যেত ৬ কোটি টাকা। এখন কেন্দ্রীয় সরকার দিচ্ছে ৩·৫ কোটি টাকা। এই ২·৫ কোটি টাকা অন্যান্য প্রদেশের মধ্যে বণ্টন করা হচ্ছে। বোম্বাইয়ের প্রতি কেমন আচরণ করা হচ্ছে তা লক্ষ করলেই এই অসাম্য পরিষ্কার হয়ে যায়। বোম্বাইয়ের আয়করের পরিমাণ বাড়িয়ে শতকরা ২০ ভাগ থেকে শতকরা ২১ ভাগ করা হয়েছে। প্রকৃত ঘটনা হল, দেশবিভাগের ফলে পশ্চিমবঙ্গের আয়তন কমে গিয়েছে। কিন্তু যে অংশ পশ্চিমবঙ্গের বাইরে রয়ে গিয়েছে, দেশবিভাগের আগে সেই অঞ্চল থেকে মাত্র শতকরা ৫ ভাগ আয়কর জমা দিত।[২৪]

পশ্চিমবঙ্গকে মনে করা হত দুগ্ধবতী গাভী যে নিজেই নিজের খাদ্যের সংস্থান করবে; কিন্তু নিজের বাছুরকে বঞ্চিত করে অন্যান্যদের দুধ বিতরণ করবে। কয়লা থেকে যে

মুনাফা হত তা থেকেও পশ্চিমবঙ্গকে বঞ্চিত করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রে কেন্দ্র যেমন ঔদাসীন্য দেখিয়েছে; খাদ্য ঘাটতি পূরণের জন্য আবেদনেও কেন্দ্র একই মনোভাব দেখায়।

খাদ্য সমস্যা একটি স্বতন্ত্র সমস্যা যা উদ্বাস্তু সমস্যা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। বেকার সমস্যা যদিও একটি সাধারণ সমস্যা তবুও উদ্বাস্তু আগমনের ফলে এই সমস্যা অরো ঘনীভূত হয়। কিন্তু খাদ্যদ্রব্যের চড়া দাম সকলকেই বিপর্যস্ত করে। বামপন্থীদের কাছে এটা প্রধান প্রশ্ন হয়ে ওঠে।

পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে খাদ্য সংকটজনিত পরিস্থিতিই পশ্চিমবঙ্গের সকলশ্রেণীর মানুষকে এক পাতাকাতলে নিয়ে আসে। রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় খাদ্য উৎপাদনে ব্যর্থ। কেন্দ্রীয় সরকার খাদ্য ঘাটতি পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সরবরাহে বাধা সৃষ্টি করেছে। এই ঘাটতি পূরণ করবার মতো সামর্থ্য রাজ্য সরকারের নেই। রাজ্য সরকার আগেই বুঝতে পেরেছিল যে পশ্চিমবঙ্গে চাষযোগ্য জমির স্বল্পতার কথা বিবেচনা করেই একর প্রতি উৎপাদনবৃদ্ধির চেষ্টা করা সরকারের উচিত। কিন্তু বর্তমানে কেন্দ্রীয় খাদ্যদপ্তরের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকা ছাড়া রাজ্য সরকারের কিছুই করণীয় নেই। অথচ কেন্দ্রীয় খাদ্যদপ্তর রাজ্যকে খাদ্য সরবরাহের পূর্বনির্ধারিত নীতিও মানছে না।

বিরোধী বামপন্থীরা সরকারের এই সমস্যাসঙ্কুল পরিস্থিতি সঠিকভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছিল। ফরোয়ার্ড ব্লক এবং অন্যান্য বামপন্থী দল নিয়ে আর এস পি দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি গঠন করে। এই কমিটিতে সিপিআইকে নেওয়া হয়নি। এই কমিটি পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যসংকটের রূপটি সকলের সামনে তুলে ধরে। দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি এবং খরার সময়ে খাদ্যের অভাবের ফলে জনগণের মনে যে ক্ষোভ দানা বাঁধে জনগণের সেই পুঞ্জীভূত ক্ষোভকে হাতিযার করে এই কমিটি আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুতের কাজে নেমে পড়ে।

১৯৫২-র গ্রীষ্মকালে বিরোধী বামপন্থীরা প্রথম খাদ্য আন্দোলন শুরু করে। আন্দোলনকারীরা মেহনতি মানুষের স্বার্থে রেশনে চালগমের বরাদ্দ বাড়াবার জন্য দাবি জানাতে থাকে। তাদের স্লোগান ছিল—'অল্পদামে অধিক খাদ্য।' সেই সময় কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী রফি আহমেদ কিদওয়াই কলকাতা সফরে এসেছিলেন। তিনি ওয়েলিংটনে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি থেকে স্লোগানমুখর মিছিল স্বচক্ষে দেখেছেন।[২৫] পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বিধান রায় প্রধানমন্ত্রীকে এক চিঠি পাঠান। রফি আহমেদ কিদওয়াই ব্যক্তিগতভাবে প্রধানমন্ত্রীকে বিষয়টি জানান। মুখ্যমন্ত্রীর চিঠির জবাবে টেলিগ্রাম মারফৎ প্রধানমন্ত্রী খাদ্য সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির কথা জানিয়ে দেন। (১) কেন্দ্রীয় সরকার তার প্রতিশ্রুতিমতো খাদ্যের বরাদ্দ পূরণ করেছে এবং রাজ্য খাদ্যদপ্তরের কিছু অফিসার পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য পরিস্থিতিকে বিপর্যস্ত করে তুলেছেন। (২) কলকাতার সমস্যা খাদ্য দিয়ে মেটানো যাবে না; এ সমস্যা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক এবং প্রফুল্লচন্দ্র সেনের প্রতি জনগণের বিদ্বেষ থেকেই এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।[২৬] ১৯৫২-র সাধারণ নির্বাচনে প্রফুল্ল সেনের পরাজয়ের পর প্রধানমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেনকে খাদ্যমন্ত্রী হিশেবে নিযুক্ত করার বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু ডঃ বিধান রায় নেহরুর কথায় কান দেননি। তাই প্রধানমন্ত্রী চেয়েছিলেন বিধান রায় তাঁরই কৃতকর্মের ফল ভোগ করুক। তাই খাদ্য পাঠাবার পরিবর্তে পরিস্থিতির তদন্ত করতে একজন খাদ্য সচিবকে পাঠিয়ে দিলেন।

১৯৫২-র পর থেকে খাদ্য আন্দোলন বার্ষিক ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু ডঃ রায় এই ঘটনাগুলোকে নিছক বিরোধীদের ক্ষমতাদখলের প্রচেষ্টা বলে মনে করেন; যদিও বিষয়টি তা নয়। পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য দুষ্প্রাপ্য হয়ে ওঠে। খাদ্য আন্দোলনের ফলে রাজ্য সরকার কেন্দ্রের কাছে খাদ্যের দাবি জানাতে বাধ্য হয়। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে বামপন্থীদেরও দাবি ছিল একই। কিন্তু বামপন্থীরা আন্দোলনের মাধ্যমে কেন্দ্রের উপর চাপ সৃষ্টি করছিল। রাজ্যে যে খাদ্যের প্রয়োজন আছে কেন্দ্র তা বিশ্বাস করতে চায়নি। কেন্দ্রের এই অবিশ্বাস দূর করবার জন্য কলকাতার বুকে আন্দোলনকারীরা স্লোগান দিয়ে, ইটপাটকেল ছুঁড়ে, বোমা ছুঁড়ে এক অস্থির পরিস্থিতির সৃষ্টি করে চলে।

এছাড়া সে সময় বামপন্থীদের আন্দোলন করবার বিষয়ের অভাব ছিল না। ডঃ বিধান রায় নিজেই এক আন্দোলনের ক্ষেত্র তৈরি করে দিলেন। বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর প্রস্তাব অনুযায়ী তিনি বাংলা-বিহারকে এক করে দেবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। এই একীকরণ পরিকল্পনার বিরুদ্ধে আড়াই মাসব্যাপী সত্যাগ্রহ আন্দোলনের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ তোলপাড় হয়ে ওঠে। এর প্রতিফলন ঘটে উত্তর-পশ্চিম কলকাতার উপনির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীর বিরাট ব্যবধানে পরাজয়ের মধ্য দিয়ে। নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পরদিনই পশ্চিমবঙ্গ-বিহার একীকরণের পরিকল্পনা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। ১৯৫৭-র সাধারণ নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বিরোধী বামপন্থীদের আসনসংখ্যা ৫৭ থেকে বেড়ে দাঁড়ায় ৮০-তে।

১৯৫৮-র শেষ দিকে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বেড়ে যায় এবং সমস্ত বিরোধীদের নিয়ে 'মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি' (**Price Increase and Famine Resistence Committee PIFRC**)গড়ে ওঠে। এই কমিটির উদ্দেশ্য ছিল ২টি—(১) সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে চাল, আটার দাম বেঁধে রাখা এবং এই লক্ষ্য পূরণের জন্য সরকারের বিরুদ্ধে সারা রাজ্যব্যাপী আন্দোলন গড়ে তোলা; (২) এই আন্দোলনকে কালোবাজারি মজুতদারদের বিরুদ্ধে মেহনতি মানুষের আন্দোলনে উন্নীত করা এবং শেষ পর্যন্ত সারা দেশে কংগ্রেসের ভোট কেড়ে নেওয়া। বিরোধীরা জনগণের মধ্যে কমিটি গড়ে তুলে মজুত করা চাল, গম জোর করে কেড়ে নেবার উপর গুরুত্ব দিতে থাকে। ১৯৫৯-এর প্রথম দিকে সরকার নিজস্ব উদ্যোগে খাদ্যের বাণিজ্য করবার সিদ্ধান্ত নেয়। জাতীয় উন্নয়ন সমিতি এবং ডঃ বিধান রায় বুঝতে পারেন যে জনগণের খাদ্য এত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে এর বাণিজ্যের দায়িত্ব বিবেকহীন ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের হাতে ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। রাজ্য সরকার নিজে খাদ্যের বাণিজ্যের দায়িত্ব নিলে কর আদায় করে সরকারি সংস্থার মাধ্যমে সারা রাজ্যে একই মূল্যে চাল-গম সরবরাহ করা সম্ভব হবে; ন্যায্যমূল্যের দোকানের মাধ্যমে খাদ্যবণ্টন করা যাবে এবং শেষ পর্যন্ত বেসরকারি সংস্থার হাত থেকে খাদ্য বাণিজ্যের অধিকার সরকারের হাতে তুলে নেওয়া যাবে। কিন্তু লেভি আদায়ের আদেশ জারি করার সঙ্গে সমস্ত খাদ্যশস্য গোপন গুদামে চলে যাবে এবং খাদ্যশস্যের দাম বেড়ে যাবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছিল। ডঃ রায় বিরোধী বামপন্থী প্রতিনিধিদের নিয়ে এক বৈঠকে বসেন। উল্লেখ্য, এই বামপন্থীরা 'পশ্চিমবঙ্গ খাদ্য ও ত্রাণ উপদেষ্টা পরিষদ' (**West Bengal Food and Relief Advisery Board**)-এর সভা বয়কট করেছিল। লেভি সংগ্রহ ও খাদ্যবণ্টনে সরকারকে সাহায্য করবার জন্য বিরোধীরা সাধারণ মানুষকে নিয়ে কমিটি গঠনের দাবি জানায়। ডঃ রায় বুঝতে পারেন যে বিরোধীদের দাবি মেনে নেওয়া কতটা মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। সরকার নিয়ন্ত্রিত

জনগণের কমিটির মাধ্যমে ধানচালের উপর লেভি আদায় এবং খাদ্যবণ্টনের প্রচেষ্টা চালালে সারা দেশব্যাপী সশস্ত্র বিপ্লবের পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে। ফলে পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম্য জীবন ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। ডঃ রায় বিরোধীদের দাবি প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি এ ধরণের কমিটি গড়তে রাজি হলেন না।[২৭] বিরোধীদের সাহায্যে সরকারি বাণিজ্য চালাতে তিনি মোটেই আগ্রহী ছিলেন না।

ইতিমধ্যে চাল-গম দুষ্প্রাপ্য হয়ে ওঠে। খাদ্যের সন্ধানে হাজার হাজার মানুষ কলকাতায় চলে আসছিল। সরকারি হিশেব অনুযায়ী কলকাতায় জনাগমের সংখ্যা প্রতিদিন ৩০০০ জন। পাইকারি বিক্রেতা ও কলমালিকরা খাদ্যশস্য মজুত করে রেখেছে। জনগণের সাহায্য ছাড়া একা পুলিশের পক্ষে খাদ্যশস্য উদ্ধারের অভিযান চালানো সম্ভব ছিল না। কিন্তু গণসমিতিগুলি এই পরিস্থিতিতে ডঃ বিধান রায় কি ভূমিকা গ্রহণ করেন তা প্রত্যক্ষ করার অপেক্ষায় রইল।

২২ জুন ডঃ বিধান রায় লেভি আদায় এবং দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের আদেশ প্রত্যাহার করে নিলেন। তিনি স্বীকার করলেন যে "দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা সফল হয়নি।" ডঃ রায়ের মতে, "ঘাটতির রাজ্যে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ নীতি এবং সরকার নিয়ন্ত্রিত বাণিজ্য সফল হতে পারে না।"[২৮] অতএব স্বাভাবিক কারণেই প্রশ্ন উঠতে পারে কেন তাহলে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের আদেশ জারি করা হয়েছিল? সুতরাং জনগণকে একথা বোঝানো দরকার যে খাদ্য নিয়ন্ত্রণনীতি সরকারের গাফিলতির জন্য ব্যর্থ হয়নি। কিন্তু তা বোঝানো কঠিন ছিল। কেননা, মজুত মাল উদ্ধারের জন্য সরকারি তৎপরতা বিশেষ কিছুই ছিল না। জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া মজুত মাল উদ্ধারের কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। অতএব সরকারের বিরোধীদের গণসমিতি গঠনের প্রস্তাব বিবেচনা করে দেখা উচিত ছিল। এই দুঃসাহসিক পথে সরকার এগোল না। কারণ তা করলে সরকারের সঙ্গে পাইকারি বিক্রেতা, চালকলের মালিক এবং জোতদারদের যে সম্পর্ক রয়েছে তা সকলের সামনে প্রকাশ হয়ে যেত। গণসমিতিগুলি তাদের লক্ষ্যে কাজে নেমে পড়লে মন্ত্রিসভায় বিরাট সংকট দেখা দিত। প্রফুল্লচন্দ্র সেন দেশব্যাপী খাদ্য তল্লাশির কাজ গণসমিতির হাতে ছেড়ে না দিয়ে ধানচাল সংগ্রহের জন্য ৩০,০০০ রাজ্যপুলিশের উপর দায়িত্ব দিলেন।

উপযুক্ত প্রশাসনিক প্রস্তুতি ছাড়া লেভি আদায় এবং দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের আদেশ জারি করা সরকারের পক্ষে সম্ভব ছিল না। খাদ্য সংগ্রহ এবং তা বণ্টন করবার মতো উপযুক্ত মাধ্যমও সরকারের ছিল না। কিন্তু একবার মূল্য নিয়ন্ত্রণ করে ফেললে তা প্রত্যাহার করা সহজ নয়। তাতে পরিস্থিতি জটিলতর হত। বিরোধীদের চাপের মুখে ডঃ বিধান রায় পরিষ্কার জানালেন যে ধানচাল সংগ্রহের জন্য সরকার যে মূল্য স্থির করেছে তা খুবই কম যার ফলে ব্যবসায়ী, কালোবাজারিরা মাল গুদামজাত করে ফেলেছে। যখন মূল্যবৃদ্ধি ঘটে চলেছে, সেই মুহূর্তে তিনি দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের আদেশ প্রত্যাহার করে নিলেন। এবং কালোবাজারি মজুতদারদের প্রচুর মুনাফা লুটবার সুযোগ করে দিলেন। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের আদেশ কার্যকর করার আগে বিরোধীরা ডঃ বিধান রায়কে যুক্তি দেখিয়ে বলেছিলেন যে সরকার নির্ধারিত মূল্য খুবই কম হয়েছে এবং তা কিছুটা বাড়ানো উচিত। কিন্তু সরকার রাজি হয়নি। সরকারের ধারণা ছিল যে নিয়ন্ত্রিত মূল্য বাড়ালে সাধারণ মানুষ অসুবিধায় পড়বে। ফলে খাদ্যদ্রব্য হয়ে উঠল দুষ্প্রাপ্য এবং দাম হল আকাশছোঁয়া। শেষ পর্যন্ত সরকারি নীতির ফলে সাধারণ মানুষের আর কষ্টের সীমা রইল

না। ফলে সরকারি নীতির পরিবর্তন হল। কেন্দ্রীয় সরকারকে জানানো হল যে খাদ্যশস্যের যে সর্বনিম্ন মূল্য ধার্য করা হয়েছিল তা কিছুটা বাড়াতে হবে এবং ন্যায্যমূল্যের দোকানের মাধ্যমে খাদ্য বণ্টন করতে হবে।

সরকার আশা করেছিল যে নিয়ন্ত্রণনীতি তুলে নিলে অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে আসবে এবং একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় মূল্যবৃদ্ধি ঘটার পর তা আস্তে আস্তে কমতে থাকবে। কিন্তু তা হল না; মূল্য বেড়েই চলল।

লোকসভায় কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী এ পি জৈন তাঁর দেওয়া বিবৃতিতে পরিষ্কার জানালেন যে ২৪ জুন নিয়ন্ত্রণ আদেশ প্রত্যাহারের পর থেকেই খাদ্যদ্রব্যের মূল্য ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। বিবৃতিতে বলা হল যে কলকাতায় ২৪ জুন চালের মূল্য যেখানে ছিল মণ প্রতি ২৮·৮০ টাকা সেখানে ৩০ জুলাই তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে মণ প্রতি ২৯·২০ টাকা। পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলে মূল্য বেড়েছে মণ প্রতি ৩ থেকে ৪ টাকা।[২৯]

ক্রমশ পশ্চিমবঙ্গ দুর্ভিক্ষের দোরগোড়ায় এসে পৌঁছায়। মার্চ মাস থেকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ খাদ্যের সন্ধানে কলকাতায় চলে আসতে থাকে। অনেকেই প্ল্যাটফর্মে আশ্রয় নিয়ে ভিক্ষে করে, কুড়িয়ে খেয়ে দিন কাটাতে থাকে। কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তা ছাড়া এ খাদ্য সংকটের মোকাবিলা করা রাজ্য সরকারের সাধ্যের অতীত ছিল।

বিরোধীরা এই সুযোগ হাতছাড়া করল না। তারা পরিষ্কার বুঝতে পারল যে সরকারের খাদ্য নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনের নামবার সময় এসেছে। সরকারের খাদ্যনীতি রাজ্যের আর্থসামাজিক কাঠামোর উপর বিরাট আঘাত হানবে এবং সরকারের মূল ভিত্তি দুর্বল করে দেবে। তাই বিরোধীরা সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী আন্দোলনের ইতিহাসে এই প্রথম বামপন্থীরা পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের সমর্থন লাভ করল।

বামপন্থীরা অনায়াসেই এবং অতি দ্রুত উদ্বাস্তু এবং নিম্নমধ্যবিত্তদের আন্দোলনে শামিল করতে পারত। যে কোনো ধর্মঘটের ডাক দিলেই অধিকাংশ শ্রমজীবী মানুষের সমর্থন পাওয়া যাবে এ বিশ্বাসও তাদের ছিল। তাছাড়া, ১৯৫৯-এর শরৎকালে কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় যে হাজার হাজার গ্রামছাড়া কৃষক খাদ্যের সন্ধানে এসেছিল তাদের খুব সহজেই এই আন্দোলনে টেনে আনা সম্ভব ছিল। যে আন্দোলন শুরু হচ্ছিল তার মূল ভিত্তি ছিল নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষ। বামপন্থী নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে সিপিআই নেতৃত্ব সে বিষয়ে সম্যক ওয়াকিবহাল ছিলেন। তাই সিপিআই সাংবিধানিক নিয়মনীতি মেনে দীর্ঘকালীন আন্দোলন গড়ে তোলার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে।

মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি (Price Increase and Famine Resistance Committee) পরিচালিত আন্দোলন ১৫ জুন (১৯৫৯) প্রতিবাদ দিবস পালন এবং ২৫ জুন সাধারণ ধর্মঘট পালনের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। সাধারণ ধর্মঘট সম্পূর্ণ সফল হল। এই কমিটির মতে এটা ছিল প্রথম দফার আন্দোলন।

দ্বিতীয় পর্যায়ের আন্দোলনের রূপরেখা নির্ধারণের জন্য এই কমিটি আলোচনাসভায় বসে। বিভিন্ন সভায় আন্দোলনের কর্মসূচি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং শেষ পর্যন্ত ৮ আগস্ট মুসলিম ইনস্টিটিউটের রাজ্য খাদ্য কনভেনশনে আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হল। এই কনভেনশনে ঠিক হল রাজ্যব্যাপী খাদ্য আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। এই আন্দোলনের মূল দাবি হবে রেশন দোকানের মাধ্যমে প্রতিমণ ১৭·৫০ টাকা

দরে এবং খোলাবাজারে প্রতিমণ ২২·০০ টাকা দরে চাল বিক্রি করতে হবে। রেশনে বরাদ্দ বাড়িয়ে মাথাপিছু দেড় সের চাল ও ১ সের আটা দিতে হবে।

এই আন্দোলনের কর্মসূচি নিয়ে কমিটির বিভিন্ন সহযোগী দলের মধ্যে বিতর্ক চলে এবং শেষ পর্যন্ত ঠিক হল যে আন্দোলনের কর্মসূচি হবে—সভা, বিক্ষোভ সমাবেশ, মন্ত্রীদের বাড়ি ঘেরাও, আইন অমান্য করে গ্রেপ্তার বরণ করা, চালকল ঘেরাও করে চাল মজুত করার বিরোধিতা করা, খাদ্যদ্রব্য বের করে আনা, 'কলকাতা চলো' এই স্লোগান দিয়ে বিভিন্ন জেলা থেকে কৃষকদের সংঘবদ্ধ করে ৩১ আগস্ট মহাকরণ অভিযান করা। ওই দিন মনুমেন্টের পাদদেশে এক বিশাল সমাবেশ করা হবে এবং তারপর বিক্ষোভকারীরা মহাকরণ অভিযান করে ডালহৌসি স্কোয়ারে ঢোকার মুখে ১৪৪ ধারা লঙ্ঘন করবে। কমিটি ১৪৪ ধারা লঙ্ঘনের কর্মসূচিতে সম্মতি জানায়। কিন্তু বিরাট আকারে আইন অমান্য আন্দোলনের পথে যাবার কথা চিন্তাই করেনি। কমিটি বিশেষ করে সিপিআই সরকারের সহ্যের সীমা লঙ্ঘন করতে পারে এমন কোনো আন্দোলনে যেতে রাজি হয়নি। সরকার কমবেশি অভ্যস্ত এমন ধরণের আইন অমান্য আন্দোলনের পক্ষেই তারা মত প্রকাশ করে। সরকারও জানত কিভাবে সীমিত আইন অমান্য আন্দোলনের মোকাবিলা করতে হয়।

প্রফুল্লচন্দ্র সেন ১৯৪৮ সাল থেকে একটানা খাদ্যদপ্তরের দায়িত্বে রয়েছেন। বিরোধীদের আক্রমণের মূল লক্ষ্য ছিল এই প্রফুল্লচন্দ্র সেন। তিনি ছিলেন মন্ত্রিসভায় পার্টির হাতিয়ার। অতুল্য ঘোষ ও প্রফুল্লচন্দ্র সেন পার্টির নিয়ন্তার ভূমিকা পালন করতে থাকেন। ক্যাবিনেটে (মন্ত্রিসভায়) বিধান রায়ের পরেই ছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র সেন এবং তিনিই ছিলেন পার্টি ও সরকারের মধ্যে মুখ্য সংযোগরক্ষাকারী।

বিরোধীরা গণবিক্ষোভকে প্রফুল্লচন্দ্র সেনের বিরুদ্ধে পরিচালিত করে। তারা প্রফুল্লচন্দ্র সেনকে ক্যাবিনেট থেকে বিতাড়িত করা, হয়তো খাদ্যদপ্তর থেকে সরিয়ে দেবার জন্য বিধান রায়েব উপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। কিন্তু তাহলে সরকার এবং পার্টির মধ্যে ব্যবধান গড়ে উঠবে এবং বিধান রায়ের ক্ষমতার মূল ভিত্তি নড়ে উঠবে। আন্দোলন চলাকালীন বিরোধীরা প্রফুল্ল সেনের বিরুদ্ধে এমন তীব্র গণবিক্ষোভ গড়ে তোলে যার ফলে বিধান রায় প্রধানমন্ত্রীর ইঙ্গিত পেয়ে খাদ্য দপ্তরের দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নেবার চিন্তাভাবনা করতে থাকেন। কিন্তু প্রফুল্ল সেন খাদ্যদপ্তর আঁকড়ে বসে থাকতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ডঃ রায় জোর করলেন না। সরোজ চক্রবর্তী মন্তব্য করেছেন যে, "প্রফুল্ল সেন-বিধান রায় পরিচালিত সরকার এবং পার্টির মধ্যে সেতুবিশেষ।[৩০] তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে খাদ্যদপ্তর থেকে তাঁকে সরিয়ে দিলে পার্টির মধ্যে মহাসংকট দেখা দিত। সুতরাং প্রফুল্ল সেনকে খাদ্যদপ্তর থেকে সরানো সম্ভব ছিল না।

কমিটির ২০ আগস্ট আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু ১৭ আগস্ট সরকার তার স্বভাবসিদ্ধ নীতি নিয়েই আসরে নেমে পড়ে। বিরোধীদের গণআন্দোলন শুরু করার অপেক্ষায় সরকার বসে থাকেনি। পুলিশ ৬৩ জন রাজনৈতিক নেতাকে গ্রেপ্তার করে যাদের মধ্যে ১৪ জন বিধায়কও ছিলেন। গ্রেপ্তার হওয়া নেতাদের মধ্যে সিপিআই, আর এস পি এবং এস ইউ সি প্রভৃতি দলের নেতারাও ছিলেন। জ্যোতি বসু ও অনেকেই আত্মগোপন করেন।

নেতাদের গ্রেপ্তার করা হলেও কমিটি ২০ আগস্ট খাদ্য আন্দোলন শুরু করার সমস্ত প্রকার প্রস্তুতি চালিয়ে যেতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে এই নেতাদের গ্রেপ্তার করে সরকারের

কোনো লাভ হয়নি। সরকার এমনই সব নেতাদের গ্রেপ্তার করেছে যারা সাংবিধানিক নিয়মনীতি মেনেই আন্দোলনের পথে যাবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। বরং এর ফলে কলকাতার ছাত্র সমাজ রাজনৈতিক মঞ্চে নেমে পড়ে। আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ে ছাত্ররা দৃষ্টান্তমূলক ভূমিকা পালন করে। সমস্ত বামপন্থী ছাত্র সংগঠন সরকারি দমন নীতির বিরুদ্ধে ১৯ আগস্ট 'প্রতিবাদ দিবস' পালন করবার ডাক দেয়।

২০ আগস্ট ময়দানে এক বিশাল সমাবেশ সংগঠিত হয়। হেমন্ত বসু দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেন যে নেতাদের গ্রেপ্তার করা সত্ত্বেও সরকার কমিটির দাবি মেনে না নেওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। কমিটির দাবিগুলি হল : (১) খোলাবাজারে প্রতিমণ চালের দাম ২০-২২ টাকার মধ্যে রাখতে হবে; (২) ন্যায্যমূল্যের দোকানে মাধ্যমে প্রতিমণ চাল ১৭·৫০ টাকা মূল্যে সরবরাহ করতে হবে এবং (৩) সরকার যাদের গ্রেপ্তার করেছে তাদের সকলকে মুক্তি দিতে হবে। তিনি পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষকে এই আন্দোলনে যোগ দিতে আহ্বান জানান। সভা শেষে বিক্ষোভকারীরা মিছিল করে এসপ্ল্যানেড ইস্ট হয়ে খাদ্যমন্ত্রীর বাড়ির দিকে এগিয়ে চলে। রাজভবনের মুখে পুলিশবেষ্টনী গড়ে তোলা হয়। বেশ কিছুক্ষণ ধরে বিক্ষুব্ধ জনতা স্লোগান দিতে থাকে কিন্তু পুলিশবেষ্টনী ভেঙে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করল না। তাই কিছুক্ষণ পরে শান্তিপূর্ণভাবেই বিক্ষোভকারীরা চলে যায়। ব্যাঙ্কশাল কোর্টের কাছে সরকারি খাদ্যনীতির বিরুদ্ধে একদল জনতা বিক্ষোভ দেখায় এবং গ্রেপ্তার বরণ করে।

বিভিন্ন জেলায় আন্দোলন আইন অমান্য আন্দোলনের রূপ লাভ করে। কোর্টের মধ্যেই বিক্ষোভকারীরা বিক্ষোভ দেখিয়ে গ্রেপ্তার বরণ করে। আন্দোলনের প্রথম দিনেই হাওড়া, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, জলপাইগুড়ি, বর্ধমান, হুগলি, পুরুলিয়া প্রভৃতি জেলায় জনগণের মধ্যে প্রবল উদ্দীপনা লক্ষ করা যায়। সমস্ত জেলায় কোর্টের মধ্যে সমাবেশ, মিছিল, বিক্ষোভ প্রভৃতি সংগঠিত হতে থাকে। অসংখ্য আন্দোলনকারী গ্রেপ্তার বরণ করে।

যত দিন যেতে থাকে কলকাতা ও হাওড়ায় আন্দোলনের তীব্রতা তত বৃদ্ধি পায়। পুলিশ লাঠি চালায়, কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়ে এবং শেষ পর্যন্ত অসংখ্য বিক্ষোভকারীকে গ্রেপ্তার করে। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সমস্ত জেলাতেই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। ২৭ আগস্ট প্রায় ৬০০০ আন্দোলনকারীকে গ্রেপ্তার করা হয় যাদের মধ্যে ৫৬৪ জন ছিলেন মহিলা। ৩১ আগস্ট আন্দোলন চরম পর্যায়ে পৌঁছায়। ঠিক হল ওই দিন ময়দানে ৫০,০০০ মানুষের সমাবেশ ঘটিয়ে মহাকরণ অভিযান করা হবে।

আন্দোলন চলাকালীন কংগ্রেস দল এই সমস্যাকে রাজনৈতিক সমস্যারূপে দেখাবার চেষ্টা করেনি। বামপন্থীরা যেভাবে রাজনৈতিক মঞ্চে একাধিপত্য বজায় রেখে চলছিল তাতে মনে হচ্ছিল কংগ্রেসের কোনো অস্তিত্বই নেই। বামপন্থীরা ধারাবাহিকভাবে বিক্ষোভ, মিছিল এবং গ্রেপ্তার বরণ করে চলল। কংগ্রেসের কোনো সাড়াই পাওয়া গেল না। আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়েও কংগ্রেস কোনোপ্রকার সভা সমাবেশ করল না। শুধুমাত্র অতুল্য ঘোষই যা সংবাদপত্রে বিবৃতি দিলেন। কংগ্রেসের আচরণ দেখে মনে হল যে তারা যেন জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়কালে কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বামপন্থী প্রভাব মেনেই নিয়েছিল। কংগ্রেস এই ধারণা পোষণ করে চলছিল যে বামপন্থীরা যদি কলকাতার বুকে প্রভাব বিস্তার করেও তাহলেও গ্রামে কংগ্রেসের ভোটের কোনোপ্রকার হেরফের হবে না। কিন্তু বাস্তবে অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে

বামপন্থীদের বিক্ষোভ চলাকালীন কংগ্রেস নেতা এবং মন্ত্রীরা স্বাধীনভাবে কলকাতার বুকে চলাফেরা করার সাহস পেতেন না। তাই বামপন্থীদের সমস্ত প্রকার আন্দোলনের মোকাবিলা করবার জন্য সরকারকে তার নিজস্ব প্রশাসনিক ব্যবস্থার উপরই নির্ভরশীল থাকতে হয়েছিল।

৩১ আগস্ট যত এগিয়ে আসতে থাকে, কমিটি ততই আশাবাদী হয়ে ওঠে। আন্দোলন যেদিন শুরু হল সেদিন থেকেই কমিটি এই দিনটির জন্য অপেক্ষা করছিল। ২০ আগস্ট হেমন্ত বসু পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষকে ৩১ আগস্ট জনসভায় যোগ দেবার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। সিপিআই সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। পার্টি তার লোকাল কমিটি এবং বিশ্বস্ত সদস্যদের ৩১ আগস্টের কর্মসূচি পালনের জন্য নির্দেশ পাঠিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু পার্টির রাজ্য নেতৃত্ব শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন করবার পক্ষপাতী। তাঁদের ধারণা ছিল যে এই আন্দোলন চলবে দীর্ঘদিন এবং ধারাবাহিকভাবে। তাই কোনো হঠকারী পদক্ষেপ নিলে তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু কমিটির অন্যান্য বামপন্থী দলগুলো ছিল সরকারের সাথে সরাসরি সংঘর্ষে যাবার পক্ষপাতী। ২৭ আগস্ট আত্মগোপনকারী জ্যোতি বসুর নামে আবদুল হালিম সংবাদপত্রে এক বিবৃতি দেন। এই বিবৃতিতে বসু কমিটিকে ৩১ আগস্ট শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ সমাবেশ করবার অনুরোধ জানান। কিন্তু অন্যান্য সহযোগী সংগঠন বসুর এই বিবৃতির সমালোচনা করে। তারা প্রয়োজনে হিংসাত্মক পথেও যেতে প্রস্তুত। কমিটি সর্বদলীয় আন্দোলনের চরিত্র বজায় রাখবার জন্য ৩১ আগস্ট ডালহৌসি স্কোয়ারে সীমিত আকারে ১৪৪ ধারা লঙ্ঘনে সম্মত হয়। কিন্তু সিপিআই ঠিক করে ব্যাপকহারে এই ধারা লঙ্ঘন করা হবে না।' মাত্র নির্দিষ্ট কয়েকজনই এই ধারা লঙ্ঘন করবে।

৩১ আগস্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগকে উপেক্ষা করে বিপুলসংখ্যক মানুষ ময়দানের সমাবেশে যোগ দেয়। জমায়েতকারীর সংখ্যা ২৫,০০০-এর কম ছিল না, বরং বেশিও হতে পারে। কিন্তু বিভিন্ন গ্রাম থেকে মানুষ যাতে কলকাতায় ঢুকতে না পারে তার জন্য পুলিশ ব্যাপক প্রস্তুতি নেয়। ময়দানে সমাবেশে যাবার পথে কলকাতার বাইরেই ২০০ জনেরও বেশি মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই সমাবেশের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। তা হল, বিভিন্ন গ্রাম থেকে হাজার হাজার কৃষক এই সমাবেশে যোগ দিয়েছিল।

বেলা ৪-টের সময় সভা শুরু হল। কমিটির বামপন্থী নেতৃবৃন্দ জনগণের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। তারপর একটি মিছিল এসপ্ল্যানেড ইস্ট হয়ে মহাকরণ অভিযানে এগিয়ে চলে। মুখে তাদের স্লোগান—"স্বল্পমূল্যে খাদ্য দাও, নইলে গদি ছেড়ে দাও", "প্রফুল্ল সেন পদত্যাগ করো", "মহাকরণ অভিযান করো", "জনসাধারণের জীবনের বিনিময়ে যে সরকার মজুতদারদের প্রশ্রয় দেয়, সেই সরকার আমরা চাই না।" পুলিশ ডালহৌসি স্কোয়ারে ঢোকার পথে এসপ্ল্যানেড ইস্ট এবং ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিটের সংযোগস্থলে বেষ্টনী গড়ে তোলে এবং ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। সরকার পর্যাপ্ত পরিমাণ পুলিশি ব্যবস্থা রেখেছিল। ডালহৌসি স্কোয়ার এলাকায় অশ্বারোহী পুলিশবাহিনীসহ কয়েক হাজার পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল। ডালহৌসি স্কোয়ারে ঢোকার সমস্ত রাস্তাতেই পাহারার ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। কিন্তু বেশির ভাগই ছিল এসপ্ল্যানেড ইস্ট এবং ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিটের সংযোগস্থলে। বিক্ষোভকারীরা যদি পুলিশ বেস্টনি ভেঙে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করে তবে তাদের মোকাবিলা করবার জন্য সরকার লাঠিধারী পুলিশ,

কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপকারী বাহিনী মোতায়েন করেছিল; আর ১৪৪ ধারা লঙ্ঘনকারীদের গ্রেপ্তারের জন্য বাসও প্রস্তুত ছিল। বাকিরা আশেপাশে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেই চলে যাবে। বিক্ষোভ প্রদর্শন এবং তার মোকাবিলা করার এটাই ছিল প্রচলিত পদ্ধতি।

সন্ধ্যা ৬টার পর মিছিল এসপ্ল্যানেড ইস্টে উপস্থিত হয় এবং প্রায় দেড় ঘণ্টা মাঠে অবস্থান করে। তখনো পর্যন্ত সব ঠিকঠাক চলছিল। পুলিশ ভেবেছিল সাধারণত যা ঘটে সেরকমই ঘটবে : পুলিশবেষ্টনী ভাঙার চেষ্টা, গ্রেপ্তার, এক রাউন্ড লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়া এবং শেষ পর্যন্ত জনগণের ছত্রভঙ্গ ইত্যাদি। কিন্তু ৩১ আগস্টের বিক্ষোভ সমাবেশ সম্পর্কে পুলিশের হিশেব উলটে গেল। ৭টা ২০ মিনিট নাগাদ একটি শিশুসহ কয়েকজন পুরুষ মহিলা পুলিশবেষ্টনীর এক ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যায়। **The Statesman** পত্রিকার এক সাংবাদিকের ধারণা হয়েছিল যে পুলিশ ইচ্ছে করেই ফাঁক রেখেছিল যাতে তার ভেতর দিয়ে এগিয়ে গেলেই গ্রেপ্তার করা যায়। পুলিশ ভেবেছিল যে এই বিক্ষোভ বোধ হয় আগের মতোই হবে। কিন্তু তারা জনতার মেজাজ বুঝতে পারেনি। মুহূর্তের মধ্যে বিপুলসংখ্যক জনতা পুলিশবেষ্টনী ভেঙে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করে। জনতার উপর প্রথম লাঠিচার্জ চলল, তারপরেই কাঁদানে গ্যাস। বিক্ষুব্ধ জনতা অলিগলির মধ্যে ঢুকে পড়ে পুলিশের উপর ইটপাটকেল ছুঁড়তে থাকে। পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোতেও গণ্ডগোল ছড়িয়ে পড়ে। ডালহৌসি স্কোয়ার, ধর্মতলা, চৌরঙ্গি, সেন্ট্রাল এভিনিউ এবং কলেজ স্ট্রিটে পুলিশের সঙ্গে বিক্ষুব্ধ জনতার খণ্ডযুদ্ধ বেধে যায়। বিক্ষুব্ধ জনতা রাস্তার পাশের দোকানঘরের উপর পাথর ছুঁড়তে থাকে, সরকারি বাসে আগুন ধরিয়ে দেবার এবং ট্রামলাইন উপড়ে ফেলার চেষ্টা করে। ২০ জন পুলিশসহ প্রায় ৩৪০ জন আহত হয়। এদের মধ্যে ছিলেন অমর বোস, চিত্ত বোস, রাম চ্যাটার্জি, মাখন পাল এবং মোহিত মৈত্র। এরা ছিলেন মিছিলের নেতৃত্বে। এর আগেই পি ডি অ্যাক্ট-এ আবদুল্লা রসুলকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। যারা বিক্ষোভ মিছিলে যোগ দেবার জন্য আসছিল, তাদের মাঝ পথ থেকেই ৩০০ জনেরও বেশিকে গ্রেপ্তার করা হয়। ৩১ আগস্টের বিক্ষোভ সমাবেশ উদ্যোক্তা এবং পুলিশের অনুমানকে মিথ্যা প্রমাণিত করে দিয়েছিল।[৩১]

পরদিনই ছাত্ররা আন্দোলনে যোগ দেয়। খাদ্য আন্দোলনকারীদের উপর পুলিশি অত্যাচারের প্রতিবাদে ছাত্র ধর্মঘট ডাকা হল। স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা বেরিয়ে এসে বিশ্ববিদ্যালয় লনে সভা করে। সভাশেষে বিশাল এক মিছিল ধর্মতলা স্ট্রিটের দিকে এগিয়ে চলে। যখন তারা ডঃ বিধান রায়ের বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিল তখন প্রিন্সেপ স্ট্রিট থেকে একদল পুলিশ এসে হঠাৎ মিছিলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। হঠাৎ পুলিশের আক্রমণে অনেক ছাত্র মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। মিছিল কতকগুলি দলে বিভক্ত হয়ে যায়। পুলিশ লাঠি উঁচিয়ে তাড়া করে এলে তারা বিভিন্ন অলিগলিতে ঢুকে পড়ে।

সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে অলিগলিতে ঢুকে ছাত্ররা স্থানীয় হামলাবাজদের সাথে জোট বাঁধে। তারা ঠেলাগাড়ি বা হাতের কাছে যা পেল তাই দিয়ে রাস্তা অবরোধ করল যাতে পুলিশের গাড়ি গলির মুখে ঢুকতে না পারে। গলির ভেতর থেকে ছাত্ররা স্থানীয় হামলাবাজদের সাথে এক হয়ে পুলিশের উপর পাথর, সোডার বোতল, জুতো ছুঁড়তে থাকে। এর মধ্যে মুষলধারায় বর্ষা শুরু হলে কিছুক্ষণের জন্য এই খণ্ডযুদ্ধ বন্ধ হল, কিন্তু বৃষ্টি থামতেই আবার তা শুরু হয়।

দ্রুততার সাথে গণ্ডগোল অন্যান্য অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্রদের একটি মিছিল

হঠাৎ ধর্মতলা স্ট্রিটে ঢুকে পড়ে এসপ্ল্যানেড ইস্টের দিকে এগোতে থাকে; পুলিশ সেখানেই তাদের পথ অবরোধ করে দাঁড়ায়। ইতিমধ্যে কলেজ স্ট্রিটে খণ্ডযুদ্ধ বেধে যায়।

অসংখ্য ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে আশুতোষ বিল্ডিং-এর সামনে জড় হয়। রাস্তা বরাবর মই ফেলে দিয়ে ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকার মুখের রাস্তা অবরোধ করে যাতে পুলিশের গাড়ি আসতে না পারে। পুলিশ লাঠি চালায়, কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়ে। ইটপাটকেল বা হাতের কাছে যা পেয়েছে তাই ছুঁড়ে ছাত্ররা তার জবাব দেয়। কিছু সময় পর হঠাৎ পুলিশভ্যান তুলে নেওয়া হয়। একজন পুলিশ গাড়িতে উঠতে না পারায় উত্তেজিত জনতা তাকে ধরে প্রচণ্ড মারধোর করে। বিক্ষুব্ধ জনতা অনেক পুলিশের লাঠি ও পাগড়ি কেড়ে নেয়। তাদের লাঠি দিয়ে তাদেরই মারধোর করে পাগড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। চ্যাংড়া ছোকরারা আগুনের চারিদিকে ঘিরে আনন্দে নাচতে থাকে। রাত নেমে আসর পর তিনটে RWAC অ্যাম্বুলেন্স উলটে দিয়ে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। অনেক সরকারি বাস পুড়িয়ে দেওয়া দেওয়া হয় জ্বলন্ত গাড়িগুলো নেভাবার জন্য দমকল বাহিনীর গাড়িকে আসতে বাধা দেওয়া হয়। সন্ধ্যার সময়েই রাস্তার সমস্ত আলো নিভিয়ে দেওয়া হল।[৩২] The Statesman পত্রিকার সাংবাদিক উল্লেখ করেছেন যে রাতের বেলায় কলকাতার বুকে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল তার উপর পুলিশ বা আন্দোলনের উদ্যোক্তাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। পাঁচটি পুলিশ ফাঁড়ি আক্রান্ত হয় এবং সরকারি বাস, অ্যাম্বুলেন্স পুড়িয়ে দেওয়া হয়। আগ্নেয়াস্ত্র ছাড়া এই অবস্থা আয়ত্তে আনা পুলিশের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই পুলিশ কমিশনার মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করে পুলিশকে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করবার আদেশ দেবার অনুরোধ করেন। সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গোবিন্দবল্লভ পন্থের সাথে যোগাযোগ করে এই অবস্থা আয়ত্তে আনতে পুলিশ যাতে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করতে পারে তার অনুমতি দেবার অনুরোধ জানানো হয়। বিকেলবেলায় দিল্লির অনুমতি এল।[৩৩] তার পরের ঘটনা সরকারি প্রেস নোট থেকে জানা যায় : মধ্য রাত্রি পর্যন্ত পাওয়া খবরে জানা যায় যে ৬৫ জন গুলিতে আহত হয়ে হাসপাতালে ভরতি হয়েছে। মৃত অবস্থায় আনা হয়েছে ৪ জনকে, আর ২ জন ভরতির পর মারা যায়। অফিসারসহ একশো জনেরও বেশি মানুষ ইটপাটকেল বোমার আঘাতে আহত হয়েছে, কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। হাসপাতালে ভরতি হওয়া আহত মানুষের সংখ্যা ১১০ জন।[৩৪]

জ্যোতি বসু এই খাদ্য আন্দোলনকে খাদ্য, ত্রাণ এবং খাদ্যমন্ত্রীর অপসারণের দাবিতে বিশাল গণবিক্ষোভ বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি ১ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে ঘোষণা করেন : যতদিন আমাদের দাবি পূরণ না হচ্ছে ততদিন সরকার যতই দমননীতি চালিয়ে যাক না কেন কমিটির নির্ধারিত আন্দোলন চলবেই।[৩৫]

পরদিন ২ সেপ্টেম্বর কলকাতা শান্ত হয়ে এল। কিন্তু জনজীবন আগের মতোই স্তব্ধ হয়ে রইল। যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল বিচ্ছিন্ন, ঘটনাস্থলের দোকানপাট ছিল বন্ধ, হরিণঘাটা থেকে দুধ সরবরাহ বাতিল করা হল। রাত নেমে এলে ভয়াবহ ঘটনা ঘটতে থাকে। সবচেয়ে মারাত্মক ঘটনা হল উল্টোডাঙার ফাঁড়ি ও শ্যামবাজারের ট্রাফিক গার্ডের উপর আক্রমণ।

এই পর্যায়ে আসার পর কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য সরবরাহের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। ডঃ বিধান রায় বারবার খাদ্য সরবরাহের জন্য যে আবেদন জানিয়েছিলেন তাতে কেন্দ্র কর্ণপাত করেনি। ২ সেপ্টেম্বর লোকসভায় কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী এস কে পাতিল

জানালেন যে, কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গে ৫০,০০০ টন চাল পাঠাবে এবং পশ্চিমবঙ্গ আরো ৩০,০০০ টন ধান মধ্যপ্রদেশ থেকে আমদানি করতে পারবে। চলতি মাসের জন্য কেন্দ্র তার মজুত ভাণ্ডার থেকে ৭০,০০০ থেকে ৮০,০০০ টন গম পাঠাবে। এরপর খাদ্যশস্যের দাম ক্রমশ কমতে থাকে।[৩৬]

মনে হল অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে আসছে। কিন্তু এর আগে থেকেই কমিটি ৩ সেপ্টেম্বর সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। ওইদিন হাওড়া অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আয়ত্তের বাইরে চলে যায় এবং বেলা ৪-টে নাগাদ প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের সাহায্যে সেনাবাহিনী এগিয়ে আসে।

ধর্মঘট প্রায় সম্পূর্ণই সফল হল। শুধুমাত্র কয়েকটি বড় বড় কারখানায় আংশিক কাজ হয়েছিল। যখন বিক্ষোভকারীরা কারখানা বন্ধ রাখার দাবি জানায় তখনই সমস্যা জটিল আকার ধারণ করে। হাওড়ায় সকাল থেকেই কিশোররা খুরুত রোড জংশন থেকে বামনগাছি ব্রিজ পর্যন্ত পুরো রাস্তার দখল নিয়ে নেয়। প্রায় তিন ঘণ্টা যাবৎ পুলিশ ও জনতার মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ চলে। একটি ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ পোস্ট পুড়িয়ে দেওয়া হয়। পুলিশ কন্ট্রোল রুমের দিকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। জনতার দুটি বিশাল দল বোমা, সোডার বোতল এবং ইটপাথর নিয়ে পুলিশ কন্ট্রোল রুমের দিকে এগোতে থাকে। পুলিশ কয়েক রাউন্ড গুলি চালালে কয়েকজন মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। উত্তেজিত জনতা বিভিন্ন অলিগলিতে ঢুকে পড়ে সেখান থেকেই পাথর, বোমা ছুঁড়তে থাকে।

দাসনগরে ধর্মঘটীরা একটি জুটমিলের গেটে অবস্থান করলেই পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করে। অবস্থানকারীদের সঙ্গে মিল কর্তৃপক্ষের লোকজনের সংঘর্ষ বাধে। ছয় জন বিক্ষোভকারী আহত হয় এবং দুজনকে ভেতরে টেনে নিয়ে গিয়ে বয়লারের মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়। এক মারমুখী জনতা পাইপগান, বোমা ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে কারখানার গেট, গুদাম আক্রমণ করে এবং আশপাশের শ্রমিকদের কুঁড়েঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়। শেষ পর্যন্ত জ্বলন্ত ঘর থেকে মহিলাদের উদ্ধার করার জন্য পুলিশ এগিয়ে আসে। বামনগাছি, মালি পাঁচঘোড়া এবং জগাছিয়া থানা এলাকায় ধর্মঘটী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটে যায়। মারমুখী জনতা পাঁচটি থানা আক্রমণ করে।

কলকাতা ও তার আশপাশের অঞ্চলে ধর্মঘট সম্পূর্ণ সফল হল। যুবকেরা রাস্তা অবরোধ করায় সমস্ত যানচলাচল বন্ধ হয়ে যায়। হাজার হাজার যুবক উদ্দেশ্যহীনভাবে রাস্তায় ঘোরাফেরা করতে থাকে। কলকাতা এবং ২৪ পরগনায় তীব্র সংঘর্ষে বেশ কিছু মানুষ হতাহত হয়। সকাল হতে না হতেই শোভাবাজার ও বিডন স্ট্রিট এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে বটতলা ও মানিকতলা থানা আক্রান্ত হয়। চিত্তরঞ্জন এভিনিউতে অবরোধ গড়ে তোলা হয়। পথ অবরোধ তুলতে পুলিশ গুলি চালায়। ঢাকুরিয়াতে পুলিশ ফাঁড়ির উপর বোমা নিক্ষেপ করা হয়। অনেককে গ্রেপ্তার করা হল। খিদিরপুর, টালিগঞ্জ, কালীঘাট এবং ভবানীপুরে পুলিশ গুলি চালায়। রাত নেমে এলে যদুবাবুর বাজার এবং কলকাতার আরো কয়েকটি এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ ও পুলিশের গাড়িই ছিল বিক্ষোভকারীদের মূল লক্ষ্য। বিক্ষোভকারীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে বোমা ছুঁড়েই পালিয়ে যেত। পরিস্থিতির চাপে তারা—'আঘাত হানো আর পালিয়ে যাও'—এই কৌশল গ্রহণ করে।

২৪ পরগনা জেলার খড়দহ থানা এলাকায় সবচাইতে বেশি উত্তেজনা দেখা যায়। ধর্মঘটী এবং অ-ধর্মঘটীদের মধ্যে ভীষণ খণ্ডযুদ্ধ বেধে যায়। এক বিশাল বিক্ষুব্ধ জনতা

থানার উপর আক্রমণ করলে পুলিশও পালটা গুলি চালায়। বিক্ষোভকারীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়ে বি টি রোডের উপর অবরোধ গড়ে তোলে। বেহালায় ট্রামওয়ে অফিস এবং ট্রামগুমটি জ্বালিয়ে দেবার চেষ্টা করা হয়। জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ গুলি চালায়। বজবজের চটকলের সামনে দুই বিরোধী দলের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। আগরপাড়া রেলস্টেশনে আগুন লাগানো হয়। বেলঘরিয়া স্টেশনে পুলিশ চার রাউন্ড গুলি চালায়। কলকাতা হাসপাতাল সূত্রে পাওয়া খবর অনুযায়ী হতাহতের সংখ্যা : মৃত ৩ জন এবং পুলিশের গুলিতে আহত ১৯ জন।[৩৭] ৪ সেপ্টেম্বর কলকাতায় ৩০০ এবং হাওড়ায় ৫০০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

৪ সেপ্টেম্বরের পর কলকাতা ও হাওড়া স্বাভাবিক হয়ে আসে। ৯ সেপ্টেম্বর রবিবার সকালে পরবর্তী তৃতীয় পর্যায়ের আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণের জন্য কমিটি এক সভায় মিলিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কমিটি জনগণকে যতদিন পর্যন্ত দাবি পূরণ না হচ্ছে ততদিন সর্বত্র অবস্থান, বিক্ষোভ, সভা সংগঠিত করার আহ্বান জানান। দাবিগুলি হল: সেনাবাহিনী এবং ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করা, সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি, ৩১ আগস্ট থেকে পুলিশের গুলি চালনা ও বিভিন্ন ঘটনার তদন্ত করা, মৃত ও পঙ্গুদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দান প্রভৃতি।

১০ সেপ্টেম্বর সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করা হল এবং সেপ্টেম্বর মাসের শুরু থেকে কলকাতায় যে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছিল ১২ সেপ্টেম্বর তা প্রত্যাহারের আদেশ দেওয়া হল।· ৯ সেপ্টেম্বর ডঃ বিধান রায় জানান যে কলকাতা, হাওড়া এবং ২৪ পরগনায় কয়েকদিনের সংঘর্ষে ৩৯ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ২০০ জনের কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। মোট ১২,৪৮৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে যাদের মধ্যে ১০২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে পি ডি অ্যাক্টে। ১২ এবং ১৩ সেপ্টেম্বর পি ডি অ্যাক্টে গ্রেপ্তার হওয়া বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের ছেড়ে দেওয়া হল। সংঘর্ষের সাথে যুক্ত নয় এমন যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তাদেরও ছেড়ে দেওয়া হল।

৮ সেপ্টেম্বর সারা রাজ্যব্যাপী শহিদ দিবস পালন করা হল। ওই দিন কমিটির নেতৃত্বে এক বিশাল মৌন মিছিল বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। কমিটির নেতৃবৃন্দ ছিলেন মিছিলের পুরোভাগে। ১৪ সেপ্টেম্বর কমিটি এক সভায় খাদ্য আন্দোলনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করে এবং সারা রাজ্যব্যাপী আন্দোলন চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এছাড়াও কলকাতার বুকে আন্দোলনের এক কর্মসূচি গৃহীত হয়। ২৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আন্দোলন চলেছিল। কমিটি ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেবার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু বিভিন্ন জেলায় ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রুটিনমাফিক আন্দোলন চালিয়ে যাবার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

## খাদ্য আন্দোলন : ১৯৬৬ কিশোরদের বিদ্রোহ

সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে ১৯৫৯-এর খাদ্য আন্দোলনের তীব্রতা ক্রমশ কমতে থাকে। কেন্দ্রীয় সরকার পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য সরবরাহ করে; ফলে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য হ্রাস পায়। কিন্তু খাদ্য ঘাটতি জনিত সমস্যা থেকেই গেল। ১৯৫১ থেকে ১৯৬১-র মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটতে থাকে। এখানকার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার গিয়ে দাঁড়ায় ৩২.২ শতাংশ। কিন্তু সারা ভারতবর্ষে এই বৃদ্ধির হার ২১·৬ শতাংশ, এই বৃদ্ধি ঘটেছে

মূলত পূর্ব-পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তু আগমন এবং জীবিকার সন্ধানে ভারতের অন্যান্য রাজ্য থেকে কলকাতায় হাজারে হাজারে মানুষ চলে আসার ফলে। এই বিপুল জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলেই পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যে ঘাটতি দেখা দিয়েছিল।

১৯৬৪-৬৫ নাগাদ সারা ভারতবর্ষে এই খাদ্যসংকট দেখা দেয় এবং খাদ্যদ্রব্যের মূল্য দ্রুতহারে বাড়তে থাকে। এর ফলে শুধু যে সাধারণ মানুষেরই দুর্দশা বেড়েছিল তাই নয়, পাইকারি বিক্রেতা, কলমালিক এবং খুচরা বিক্রেতাদেরও সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়েছিল। কিন্তু সবচাইতে বিস্ময়কর ব্যাপার হল যে এই সময়ে খাদ্যশস্যের উৎপাদন প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পেলেও খাদ্যের সংকট দেখা দেয়। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন এই সংকটকে 'প্রাচুর্যের মধ্যেও কৃত্রিম সংকট' বলে মন্তব্য করেছিলেন। তাঁর মতে এক শ্রেণীর জোতদার ও চালকল মালিক অধিক মুনাফার লোভে খাদ্যশস্য মজুত করে রেখেছিল।

১৯৬৪-৬৫-তে খাদ্যসংকটের মুখে পড়ে প্রফুল্লচন্দ্র সেন কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় বেষ্টনী (কর্ডন) গড়ে তুললেন যাতে সরকারি লাইসেন্সপ্রাপ্ত ডিলারদের কাছে চাল আসতে না পারে। এছাড়া, তিনি রেশন ব্যবস্থা ও খাদ্যদ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করলেন। শহরের ভেতরে ন্যায্যমূল্যের দোকানের মাধ্যমে খাদ্যশস্য বণ্টনের ব্যবস্থা করা হল এবং ঠিক হল যে পাইকারি বিক্রেতাদের নিয়ন্ত্রিত মূল্যে কলকাতায় খাদ্যশস্য বিক্রি করতে হবে। শহরের বাইরে কলমালিকদের কাছ থেকে নির্দিষ্ট মূল্যে খাদ্যশস্য কিনে নেওয়া হবে। ১৯৬৫-তে এই নীতি আংশিক সফল হয়েছিল। কলকাতায় খাদ্যদ্রব্যের মূল্য আগের তুলনায় কমে যায় এবং কলমালিকদের মাধ্যমে খাদ্যশস্য সংগ্রহ এবং রেশনিং ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে। এই কলমালিকরা ছিলেন গ্রামাঞ্চলে কংগ্রেস সমর্থক এবং এরা কলকাতার কলমালিকদের চেয়ে এই নতুন নীতিতে বেশি মুনাফা লুটতে থাকে।[৩৮]

কলকাতায় প্রফুল্ল সেনের নীতি মোটামুটি সাফল্য লাভ করে। ১৯৬৬তে ধান সংগ্রহের আদেশ (Paddy Levy order)-এর সাহায্যে পশ্চিমবঙ্গব্যাপী এই নীতি কার্যকর করার চেষ্টা করা হয়। ১ ডিসেম্বর থেকে এই আদেশ কার্যকর করা হবে বলে স্থির হল। এই আদেশ বলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সরাসরি বা সরকারি মাধ্যমের সাহায্যে চাল উৎপাদনকারী এলাকা থেকে খাদ্যশস্য সংগ্রহের ব্যবস্থা করে। সমস্ত চালকলে শতকরা ১০০ ভাগ লেভি আদায়ের আদেশ জারি করা হল। বেসরকারি ব্যবসায়ীরা বাজার থেকে শস্য কিনতে পারবে না এবং শস্য উৎপাদনকারীদের অতিরিক্ত শস্য সরকার নির্ধারিত মূল্যে হস্তান্তর (সরকারকে) করার আদেশ দেওয়া হল।

সরকারের ধারণা ছিল ১৫ লক্ষ টন খাদ্যশস্য সংগ্রহ করা যাবে—চালকল থেকে ৮০০,০০০ টন, গ্রামীণ সমবায় সংস্থা থেকে ১৫০,০০০ টন এবং অন্যান্য সংস্থা (পঞ্চায়েত ও ধান ভানাই কল) থেকে ৫৫০,০০০ টন। গ্রামীণ সমবায় সংস্থা, পঞ্চায়েত এবং ধান ভানাই কল ছিল প্রকৃতপক্ষে সরকারি মাধ্যম। এদের উপর খাদ্য সংগ্রহের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। ধান সংগ্রহের আদেশে সমস্ত উৎপাদকদের ১৯৬৬-র ৩১ মার্চের মধ্যে সমস্ত খাদ্যশস্য সরকারের কাছে জমা দেবার আদেশ দেওয়া হল। তারা তাদের মাল বিক্রি করবে চালকল মালিকদের কাছে। নয়তো গ্রামীণ সমবায় সংস্থার কাছে, পঞ্চায়েতের কাছে অথবা ধান ভানাই কলে। সরকার আবার এদের কাছ থেকে সেগুলো সংগ্রহ করবে। এই আদেশে গুণগত মান অনুযায়ী চালের মূল্য ধার্য করা হয়

প্রতিমণ ১৫ টাকা থেকে ১৭ টাকা। তৎকালীন বাজারদর ছিল প্রতিমণ ৩৫ টাকা বা তার বেশি। সুতরাং তৎকালীন বাজারদর এবং সরকার নির্ধারিত দরের মধ্যে বিরাট ব্যবধান থেকে যায়। বড় বড় জমিদাররা সবচাইতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তারা এই আদেশ কৌশলে এড়িয়ে যাবার জন্য আদেশটি কার্যকর হবার নির্দিষ্ট দিনের আগেই সমস্ত শস্য কেটে নিয়ে গোপনে বিহার বা পূর্ব-পাকিস্তানে চালান করতে থাকে। এই চোরাচালান বন্ধ করতে সরকার ৩০,০০০ পুলিশকে দায়িত্ব দেয় যাতে কর্ডন ব্যবস্থা সফল হয়। পাইকারি বিক্রেতাদের ব্যাপকহারে গ্রেপ্তার করেও সরকার খাদ্যসংগ্রহের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারল না। এর কারণ হল, এক শ্রেণীর জোতদারের উপর যে-হারে লেভি দেবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তা যথাযথ হয়নি। তাই লেভি দানের আদেশ কার্যকর হবার এক সপ্তাহের মধ্যেই কোনো কোনো শ্রেণীর জমিদারদের ছাড় দিতে হল। কিন্তু এই ছাড় দেওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ রেশন দোকানে প্রয়োজনীয় খাদ্য সরবরাহ করা গেল না এবং খাদ্যশস্যের চোরাকারবার শুরু হয়ে গেল।

বিধানসভায় প্রফুল্ল সেন জানালেন যে কয়েক বছর ধরে খাদ্যশস্যের চাহিদা এবং জোগানের মধ্যে ব্যবধান এত বেড়ে চলেছে যে কেন্দ্র থেকে খাদ্য সরবরাহ না করলে এই ব্যবধান ঘোচানো সম্ভব নয়। ১৯৬৬-তে শীতকালীন আমনধানের চাষ অনেক কমে গিয়েছে, অথচ উদ্বাস্তু ও অন্যান্য রাজ্য থেকে পশ্চিমবঙ্গে জনাগমের হার বিপুল সংখ্যায় বেড়েছে। ফলে এই ব্যবধান ঘোচানো সরকারের সাধ্যের বাইরে। তাই সরকারকে বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ভোগের যে অসাম্য রয়েছে তা দূরীকরণের জন্য নীতি নির্ধারণ করতে হয়েছে। জনগণের চাহিদা সম্পূর্ণ মেটাবার মতো উপকরণ সরকারের নেই। তাই সরকার সীমিত খাদ্যশস্যের সমহারে বণ্টন করার নীতি গ্রহণ করেছে।[৩৯] তিনি স্বীকার করলেন ধান সংগ্রহের আদেশের ভিত্তিতে যে পরিমাণ লেভি আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাতে কিছুটা অসঙ্গতি রয়েছে এবং বিডিও-কে সেই অসঙ্গতি সংশোধনের অধিকার দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ধান সংগ্রহের আদেশে ধার্য লেভির পরিমাণ বড় জমিদারদের উদ্বৃত্ত শস্যের পরিমাণের চেয়েও কম ছিল।

কর্ডনিং প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, যে স্বল্প পরিমাণ খাদ্যশস্য পাওয়া যাচ্ছে তার সমবণ্টনের জন্য রাজ্যে অভ্যন্তরীণ কর্ডনিং ব্যবস্থা বিশেষ প্রয়োজনীয়। ঠিক হয়েছে যে কর্ডন করা এলাকার বাইরে কোনো ব্যক্তি ২ কিলোগ্রামের বেশি আমন চাল নিয়ে যেতে পারবে না। সরকার মনোনীত সংস্থা ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি পর্যন্ত স্বাধীনভাবে বেচাকেনা করতে পারবে এবং মার্চ মাসে রেজিস্টার্ড ডিলাররা ১০ কুইন্টাল পর্যন্ত চাল মজুত করে একবারে ১০ কিলোগ্রাম বিক্রি করতে পারবে।

সেন জানালেন যে জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে সংশোধিত রেশনিং ব্যবস্থা কার্যকর করার ক্ষেত্রে এ সমস্ত পদক্ষেপ বিশেষ প্রয়োজন এবং ৭৩ লক্ষ মানুষ এই রেশনিং ব্যবস্থার আওতায় আসবে। মার্চের প্রথম সপ্তাহ নাগাদ ৯৬ লক্ষ মানুষ এই রেশনিং ব্যবস্থার আওতায় আসবে। ১৯৬৫-র জানুয়ারি মাসের প্রথম দিকে কলকাতা এবং শিল্পাঞ্চলের ৭৩ লক্ষ মানুষকে বিধিবদ্ধ রেশনিং ব্যবস্থার আওতায় আনা গিয়েছিল। ১৯৬৬-তে আসানসোল ও শিলিগুড়িকে এই বিধিবদ্ধ রেশনিং-এর আওতায় আনা হয়েছিল। এইভাবে মোট ৮৪ লক্ষ মানুষকে এর আওতায় আনা সম্ভব হয়েছিল।

কিন্তু এ সমস্ত ব্যবস্থা সত্ত্বেও ১৯৬৬-র শীতকালে প্রফুল্লচন্দ্র সেন পশ্চিমবঙ্গের সবচাইতে বেশি সমালোচিত ব্যক্তিতে পরিণত হলেন। তবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ

নেই যে খাদ্য ঘাটতি মেটাবার জন্য তিনি যে ব্যবস্থা নিয়েছিলেন তা সদিচ্ছা প্রসূত।

একটি ঘাটতি-অঞ্চলে সীমিত খাদ্যশস্য সমহারে বণ্টনের নীতি ভুল একথা বলা চলে না যদি এই নীতি সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হয়। সেন লক্ষ করেছিলেন যে ১৯৬৪তে কোনো বিধিবদ্ধ রেশনিং ব্যবস্থা ছিল না, খাদ্য উৎপাদনকারীদের কোনো লেভি দিতে হত না, কলমালিকদের উপর মাত্র ২৫ শতাংশ লেভি ধার্য করা হয়েছিল। এই অবস্থাতেও পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছিল। সাধারণভাবে প্রফুল্ল সেনের ১৯৬৫-র খাদ্যনীতি সফল হয়েছিল। তাই তিনি ১৯৬৬-তে এই নীতি আরো এগিয়ে নিয়ে যান। ১৯৪৮ থেকেই তিনি খাদ্যদপ্তরের দায়িত্বে ছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন যে খাদ্যের ব্যাপারে তিনিই সবচাইতে অভিজ্ঞ ব্যক্তি। তাই যখন ডঃ বিধান রায়ের পর তিনি মুখ্যমন্ত্রী হলেন তখনো তিনি খাদ্যদপ্তর নিজের হাতেই রাখলেন। তাঁর ধারণা ছিল যদি বিধিবদ্ধ রেশনিং ব্যবস্থা এবং সংশোধিত রেশনিং ব্যবস্থার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মধ্যে খাদ্যের সমবণ্টন ঘটানো যায় তাহলে পশ্চিমবঙ্গে তিনি এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারবেন এবং কমিউনিস্টদের বুঝিয়ে দিতে পারবেন যে কংগ্রেস সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

রাজ্যব্যাপী খাদ্যসংগ্রহ, কর্ডনিং ব্যবস্থা, বিধিবদ্ধ এবং নতুন রেশনিং ব্যবস্থা কার্যকর করার দায়িত্ব প্রফুল্ল সেন মূলত আমলা এবং দুর্নীতিগ্রস্ত পুলিশবাহিনীর উপর ছেড়ে দিয়েছিলেন। ফলে এই ব্যবস্থা সফল হয়নি। তিনি এই ব্যবস্থার বাস্তব রূপায়ণে কংগ্রেস বা বিরোধী বামপন্থীদের সঙ্গে নেননি। বেশিরভাগ কংগ্রেসিই তার এই ব্যবস্থা মনেপ্রাণে মেনে নিতে পারেননি। এই ব্যবস্থা সবচাইতে বেশি আঘাত হেনেছিল জোতদার, কলমালিক, ব্যবসায়ী ও দোকানদারদের। এরাই ছিল কংগ্রেসের মূল শক্তি। তিনি ভেবেছিলেন এই ব্যবস্থা কার্যকর করতে কংগ্রেস এবং বিরোধী বামপন্থীদের সম্মতি পাবেন। কিন্তু কংগ্রেসিরাই প্রথম থেকে এর বিরোধিতা করতে থাকে। অথচ প্রফুল্ল সেন এই ব্যবস্থা কার্যকর করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ফলে প্রফুল্ল সেন থেকে কংগ্রেস সংগঠন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। প্রফুল্ল সেন প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে পার্টির মতামত না নিয়েই এই ব্যবস্থা চাপিযে দেবার চেষ্টা করতে থাকেন।[৪৩] এর ফলে দেশ জুড়ে কংগ্রেসের উপর প্রশাসনিক আমলাতান্ত্রিক চাপ সৃষ্টি হতে থাকে। খাদ্যসংকট এবং বিরোধী বামপন্থীদের চাপ এই যৌথ সংকটের মধ্যে প্রফুল্ল সেন নিঃসঙ্গ যাত্রীর মতো অসহায় হয়ে পড়েন। শুধু খাদ্যসংকটই নয়, রাজ্যব্যাপী মাছ, তেল, কেরোসিন সমস্ত কিছুর সংকট দেখা দেয়। এককথায় বলা যায়, সারারাজ্যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের এক চরম সংকট 'দেখা দেয়। সারা দেশের আর্থসামাজিক কাঠামো ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। ফলে প্রফুল্ল সেনের বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়। সারা দেশে খাদ্যশস্যের চোরাকারবার শুরু হয়ে যায়; দুর্নীতিগ্রস্ত আমলা ও পুলিশ এই অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে। এই সময়ে জ্যোতি বসু বামপন্থীদের বিশিষ্ট নেতা হিশেবে চিহ্নিত হন।

বিগত দুটো আন্দোলন থেকে ১৯৬৬-র খাদ্য আন্দোলন দুটো বিষয়ে আলাদা ছিল— (১) ১৯৬৭-র প্রথম দিকে সাধারণ নির্বাচন; (২) বিপুল সংখ্যক জনগণ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করায় আন্দোলনের চরিত্রের পরিবর্তন। নীতিগত দিক থেকে বামপন্থী দলগুলো প্রফুল্ল সেনের নতুন খাদ্যনীতিকে সমর্থন করত। তবে এই কর্মসূচির কয়েকটি বিষয়ে তারা বিরোধিতা করে। সরকারের বিভিন্ন নীতির বিরোধিতা করে বামপন্থীরা ১৯৬৬-র মার্চ মাসে রাজ্যব্যাপী খাদ্য আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে

এগোতে থাকে। আন্দোলনের কর্মসূচি ছিল—খাদ্য, ডি আই আইন, বন্দীদের মুক্তি ইত্যাদি। ৩ ফেব্রুয়ারি যুক্তফ্রন্টের এক সভায় প্রস্তাব নেওয়া হয় যে রাজ্যব্যাপী মিছিল, জনসভা এবং বিক্ষোভ প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে ২৫ ফেব্রুয়ারি 'খাদ্য দাবি দিবস' পালন করা হবে এবং খাদ্য আন্দোলনে জনমত গঠনের জন্য ৫ মার্চ 'কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হলে' একটি কনভেনশন অনুষ্ঠিত হবে। বামপন্থীরা বিগত আন্দোলনের ধাঁচেই এই আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে এগোতে থাকে। কিন্তু আচমকা আন্দোলন এমন মোড় নেয় যে নেতৃত্ব হতবাক হয়ে যায়। পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়াই এই আন্দোলন শুরু হয়ে যায় এবং তা বিধ্বংসী আকার ধারণ করে। এই গণজাগরণের পেছনে কোনো রাজনৈতিক দল ছিল না। আন্দোলনের তীব্রতা নেতাদের বিভ্রান্ত করে তোলে। বাস্তবিক, আন্দোলন যখন শুরু হয়, তখন কোনো নেতা ছিলেন না। খাদ্য, কেরোসিনের অভাব, দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক ইস্যুতে জনগণের মধ্যে বিক্ষোভ এত তীব্র আকার ধারণ করে যে এই ক্ষোভ সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র ক্রোধে রূপান্তরিত হয়। শেষ পর্যন্ত স্বতঃস্ফূর্ত বিস্ফোরণ ঘটে। এই মারমুখী জনতার মধ্যে ছিল নিম্নমধ্যবিত্ত, উদ্বাস্তু, ছাত্র, চাল চোরাচালানকারী পেশাদার বিক্ষোভকারী এবং সমাজ বিরোধীরা। ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে যখন জনগণ বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দিল তখনই রাজনৈতিক দলগুলো নেতৃত্বদানে এগিয়ে এসে প্রচলিত পথে আন্দোলনকে পরিচালিত করার চেষ্টা চালাতে থাকে।

যেসব অঞ্চলে আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে সেখানকার কয়েকজনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে **The statesman** পত্রিকায় আন্দোলনের সূত্রপাতের কারণ বর্ণনা করা হয়। তারা এই সিদ্ধান্তে আসেন যে এই আন্দোলন ছিল, 'হতাশা, ঘৃণা ও ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ' যার মূল কারণ 'অর্থনৈতিক দুর্দশার ক্রমবর্ধমান চাপ এবং সরকারি উদাসীনতা।'[৪১] অনুৎপাদক শ্রেণীর মধ্যে ক্রমবর্ধমান অসন্তোষের মূল কারণ খাদ্য ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব, মূল্যবৃদ্ধি, বেকার সমস্যা, খাদ্য অধিগ্রহণের ত্রুটিপূর্ণ নীতি, কর্ডনিং প্রথার কড়াকড়ি, হাটবাজারে লুটপাট এবং পুলিশের উপরি আদায়। এমনকী লেভি নির্ধারণে অসাম্যের ফলেও উৎপাদক অঞ্চলগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তৎকালীন বাজারদর এবং বিধিবদ্ধ দামের মধ্যে ব্যবধান এত বেশি ছিল যে সরকার বিধিবদ্ধ মূল্য খোলাবাজারে কার্যকর করতে গেলেই সমস্ত মাল গোপন গুদামে মজুত করে ফেলা হয়। ফলে গ্রামে ও শহরে খাদ্যের জোগান বন্ধ হয়ে যায়। সর্বোপরি, খাদ্য অধিগ্রহণের ব্যর্থতার ফলে নতুন রেশনিং ব্যবস্থাও কার্যকর হয়নি; রেশন দোকান বা খোলাবাজারে কোথাও খাদ্য পাওয়া যাচ্ছিল না।

পুলিশের অর্থগৃধ্নুতার ফলে কর্ডনিং প্রথা দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের বিরুদ্ধেই বিশেষভাবে কার্যকর হয়েছিল। এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গায় সামান্য পরিমাণ চালও তারা নিয়ে যেতে পারত না। পুলিশ তাদের হয়রানি এমনকী শারীরিক নির্যাতন করত; অথচ ট্রাকবোঝাই ধানচাল বিনা বাধায় পুলিশের সামনে দিয়েই চলে যেত। কেরোসিনের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। কেরোসিনের ডিলাররা পুলিশের সহায়তায় তাদের মাল নিরাপদে নিয়ে চলে যেত। কেরোসিনের অভাব বিশেষ করে ছাত্র সমাজের উপর আঘাত হানে।

অধিগ্রহণ এবং কর্ডনিং ব্যবস্থায় পুলিশ কর্মচারীরা অল্পদিনের মধ্যে ধনী হয়ে উঠল। এই পরিস্থিতিতে কংগ্রেস একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারত। তারা রাজ্যের জনগণকে বোঝাতে পারত খাদ্য অধিগ্রহণ করে জনগণের মধ্যে সমবণ্টন করবার

সরকারি নীতি কিভাবে জোতদাররা খাদ্যশস্য মজুত করে ব্যর্থ করে দিচ্ছে। কিন্তু সারা দেশে কংগ্রেসিদের শ্রেণীচরিত্রের কথা চিন্তা করলে তাদের পক্ষে এ ধরণের ভূমিকা পালন করা সম্ভব ছিল না। কংগ্রেসিরা দ্বিধায় ভুগছিল : মুখ্যমন্ত্রী তাদের কথা শোনেননি, ধান সংগ্রহের আদেশ প্রত্যাহার করেননি। অথচ ধান সংগ্রহের আদেশকেও তারা সমর্থন করতে পারছিল না। ফলে সাংগঠনিক দিক দিয়ে কংগ্রেস সম্পূর্ণভাবে পঙ্গু হয়ে পড়ল। যদি কংগ্রেস জনগণের সামনে প্রকৃত সত্য তুলে ধরত যে, যে সমস্ত জোতদার মজুতদাররা ধানচাল গোপনে মজুত করে রেখেছে তারাই এই খাদ্যসংকটের জন্য দায়ী, তাহলে হয়তো কংগ্রেসের মধ্যেকার অন্তর্দ্বন্দ্ব এড়ানো যেত। সুতরাং রাজনৈতিক ভাবে এ সমস্যা সমাধান করা সরকারের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল। খাদ্য অধিগ্রহণ এবং কর্ডনিং ব্যবস্থা নিয়ে মন্ত্রিসভাও দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেল।যারা সরকারের খাদ্য নীতিকে সমর্থন করেননি, তারা প্রফুল্ল সেনের নেতৃত্বের সরাসরি বিরোধিতা করতে পারলেন না। তাঁরা প্রফুল্ল সেনের নিন্দা করে বাধা সৃষ্টির কৌশল অবলম্বন করতে থাকেন। এইভাবে সমস্ত শ্রেণীর মানুষ থেকে প্রফুল্ল সেন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। আর পুলিশবাহিনী হয়ে উঠল সরকারের মূল হাতিয়ার। জনগণের রাগ গিয়ে পড়ল সরকারি কর্তৃপক্ষ ও পুলিশের উপর। কংগ্রেসের নিষ্ক্রিয়তার ফলে সারা দেশে যে শ্রেণীসংঘাত শুরু হয়েছিল, তার ফলে পুঞ্জীভূত ও ক্ষোভ সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলনে রূপান্তরিত হল। পক্ষান্তরে কমিউনিস্ট ও মার্ক্সবাদী বামপন্থী দলগুলো গ্রামের মানুষের স্বার্থে এগিয়ে আসে। কারণ বামপন্থীরা ১৯৬৭-র সাধারণ নির্বাচনের দিকে তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিল।

এই পুঞ্জীভূত ক্ষোভের মধ্যে প্রফুল্ল সেন নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লেন। সারা দেশ যখন তাঁর বিরুদ্ধে তখনো সেন তাঁর খাদ্যনীতিতে অটল থাকলেন। শহরে, গ্রামে খাদ্যশস্য উধাও হয়ে গিয়েছে; বাজার থেকে কেরোসিন উবে গিয়েছে; রেশন দোকানে খাদ্যদ্রব্যের সরবরাহ অনিশ্চিত হয়ে উঠেছে; ধানচাল এবং অনশনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে পুলিশবাহিনী; তারা প্রকাশ্যে দুর্নীতি শুরু করে দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বিভিন্ন ঘটনা ঘটতে লাগল যার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ল পশ্চিমবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে।

১৬ ফেব্রুয়ারি ২৪ পরগনার বসিরহাটে ঘটনার সূত্রপাত হল। খাদ্য ও কেরোসিনের দাবিতে এক বিক্ষুব্ধজনতা বশিরহাট বিডিও অফিসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শনের সময় পুলিশের সাথে সংঘর্ষ শুরু হলে ৬ জন আহত হয়। পরদিন ২৪ পরগনা জেলার অন্যান্য অঞ্চলে গণ্ডগোল ছড়িয়ে পড়ে এবং স্বরূপনগরে পুলিশের গুলিতে নুরুল হাসান নামে এক কিশোরের মৃত্যু ঘটে। কিশোরের মৃত্যুতে যেন অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়ল। ১৮ ফেব্রুয়ারি ২৪ পরগনার বাদুরিয়ায় তীব্র বিক্ষোভ দেখা দেয়। পুলিশফাঁড়ি আক্রান্ত হলে পুলিশের গুলিতে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। ক্ষুব্ধ জনতা বিডিও অফিস ভাঙচুর করে।

এ ধরণের আচমকা বিক্ষোভ শুরু হওয়ায় বামপন্থীদের পরিকল্পনা বানচাল হয়ে গেল। কিন্তু ২৪ পরগনায় মৃত্যু এবং বিভিন্ন গণ্ডগোলজনিত যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তাতে হস্তক্ষেপ করতে বামপন্থীরা কালবিলম্ব করল না। ফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ, রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম সমিতির প্রতিনিধিগণ, এস এফ আই, এ আই এস এফ, পি এস ইউ এবং ডি এস ও প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত 'কাউন্সিল অব্ অ্যাকশন' সকলে ২০ ফেব্রুয়ারি সভায় মিলিত হন এবং ঠিক হল ২২ ফেব্রুয়ারি সারা রাজ্যে সভা, সমাবেশ এবং বিক্ষোভ প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে শহিদ দিবস পালন করা হবে। আরো ঠিক হল যে ২১ ফেব্রুয়ারি সফলতার

সাথে 'দাবি দিবস' পালন করার জন্য কলকাতার গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় (রাস্তার সংযোগস্থলে) পথসভা অনুষ্ঠিত হবে।

; নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী মিটিং বিক্ষোভ প্রদর্শনের মাধ্যমে সারারাজ্যে শহিদ দিবস পালন করা হল। বিভিন্ন জায়গায় শহিদ বেদিতে মাল্যদান করা হল। ওইদিন কলকাতা ময়দানে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সোমনাথ লাহিড়ী, যতীন চক্রবর্তী এবং অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন। তাঁরা সকলেই সরকারের খাদ্যনীতির নিন্দা করে ২৪ পরগনায় পুলিশের গুলিচালনার বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি জানান এবং ২৫ ফেব্রুয়ারি ময়দানে সমাবেশে যোগদানের জন্য জনগণকে আহ্বান জানান। ওইদিন ময়দানে বামপন্থী রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম সমিতি এবং ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এক বিশাল সমাবেশ সংগঠিত করে। বক্তারা তাদের ৮ দফা দাবি সম্বলিত দাবিসনদ গ্রহণ করবার জন্য সরকারকে অনুরোধ জানান এবং ১০ মার্চ রাজ্যব্যাপী বন্‌ধ পালন করবার জন্য জনগণকে আহ্বান জানান। এই দাবিগুলোর মধ্যে ছিল রেশন কার্ড দান পদ্ধতির সরলীকরণ করতে হবে, যে সমস্ত জমিদারের ৭ একরের কম জমি রয়েছে তাদের উপর লেভি আদায়ের নোটিশ জারি করা বন্ধ করতে হবে, গ্রামীণ এলাকায় অনুৎপাদক শ্রেণীকে রেশন দান করতে হবে, কেরোসিন ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সমহারে বণ্টন করতে হবে, জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করতে হবে, ডি আই আইন প্রত্যাহার করতে হবে, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিতে হবে, ২৪ পরগনায় পুলিশের গুলিচালনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত করতে হবে এবং খাদ্য আন্দোলনে যুক্ত থাকায় যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের নিঃশর্ত মুক্তি দিতে হবে। সমস্ত বামপন্থী দল ঐক্যবদ্ধ হল। শুধুমাত্র পি এস পি নিজস্ব কর্মসূচি অনুযায়ীই চলতে থাকে। পি এস পি-র সহযোগী সংগঠন ফরোয়ার্ড ব্লক পি এস পি থেকে বেরিয়ে এসে ২৫ ফেব্রুয়ারি ময়দানের জনসভায় যোগদান করে।

এরপর ছাত্ররা নেমে এল। কলকাতায় ছাত্রদাঙ্গা ঘটতে থাকে। কলকাতা, বর্ধমান ও প্রেসিডেন্সি বিভাগে সমস্ত স্কুল কলেজ বন্ধ করে দেওয়া হল। ২ মার্চ আবার স্কুল কলেজ চালু হয়। ধর্মঘট ডাকা না হলেও ৩ মার্চ কিশোর ছাত্ররা জোর করে অনেক স্কুল বন্ধ করে দেয়, পরদিন ছাত্ররা আবার গণ্ডগোল শুরু করে। তিনটি সরকারি বাস ও একটি ট্রামে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ বেধে যায়। ৩৪ জন ছাত্র সমেত ৮৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।[৪২]

ওইদিনই কৃষ্ণনগর ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় ব্যাপক হাঙ্গামা ছড়িয়ে পড়ে। কৃষ্ণনগরে পুলিশের গুলিতে আনন্দ হাইত (১৭) নামে এক কিশোরের মৃত্যু ঘটে। ৫ মার্চ কৃষ্ণনগর হাসপাতালে কর্তব্যরত পুলিশদের উপর এক মারমুখী জনতা আক্রমণ করে। একজন পুলিশ ও একজন কনস্টেবলকে হত্যা করে, মর্গ ভেঙে ফেলে একটি মৃতদেহ বের করে নিয়ে মিছিল করে। বিক্ষোভকারীরা কৃষ্ণনগর রেলস্টেশন, ব্যাঙ্ক ও একজন কংগ্রেস মন্ত্রীর বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। ওই দিনই নদীয়া জেলার মদনপুর, পায়রাডাঙা রেলস্টেশন পুড়িয়ে দেওয়া হয় এবং ২৪ পরগনার বিরাটি সমেত কয়েকটি রেল স্টেশনেও আগুন লাগানো হয়। মারমুখী জনতা ট্রেন কম্পার্টমেন্ট পুড়িয়ে দেয়, রেললাইনের ফিস প্লেট উপড়ে ফেলে, টেলিফোন টেলিগ্রাফের তার ছিঁড়ে ফেলে এবং জাতীয় সড়কে অবরোধ গড়ে তোলে। বিক্ষোভকারী কিশোররা কৃষ্ণনগরের জীবনবিমা অফিস, জেলা স্কুলবোর্ড অফিস এবং উদ্বাস্তু পুনর্বাসন দপ্তর পুড়িয়ে দেয়, উদ্বাস্তুদের গৃহনির্মাণদানের ঋণপত্র পুড়িয়ে দেয়। ওইদিনই কৃষ্ণনগরে সেনাবাহিনী তলব করা

হয়।[৪৩] ফলে শীঘ্রই গণ্ডগোল স্তিমিত হয়ে যায়। কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় গণ্ডগোল চলতে থাকে এবং ১০ মার্চ সারা পশ্চিমবঙ্গ অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে।

ইতিমধ্যে অন্যদিকেও নাটকীয় ব্যাপার ঘটল। বাজেট অধিবেশনের উদ্বোধনী দিনে যখন রাজ্যপাল তাঁর ভাষণে খাদ্য ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি রোধে সরকারের ব্যর্থতা এবং ভারতীয় প্রতিরক্ষা আইন ডি আই আর-এ বন্দী রাজনৈতিক নেতাদের মুক্তিদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন তখনই সমস্ত বিরোধী সদস্য সভাকক্ষ ত্যাগ করেন। পরদিনও বিধানসভায় উত্তেজনা শুরু হয়। অর্থমন্ত্রীর হাত থেকে খশড়া বাজেটপত্র কেড়ে নেওয়া হয়। বিরোধীদের সাথে সরকার পক্ষের সদস্যদের হাতাহাতি শুরু হয়। ১৬ জন বিরোধী সদস্যকে বহিষ্কার করা হয়।[৪৪] বিধানসভার অধিবেশন কার্যত বন্ধ হয়ে যায়। ২০ ফেব্রুয়ারি বিধানসভার অধিবেশন যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায় সে বিষয়ে বিরোধীদের সাথে মুখ্যমন্ত্রীর আলোচনায় বসার কথা ছিল। কিন্তু বসিরহাটের গণ্ডগোলের ঘটনার অজুহাতে সভা বাতিল করা হয়।

এইভাবে বিরোধীদের সাথে আপোস চুক্তির পথ মুখ্যমন্ত্রী নিজেই বন্ধ করে দিলেন। বিরোধীরা বিধানসভার ভেতরে ও বাইরে উত্তেজনা বজায় রেখে চললেন। ঘটনা তার নিজগতিতেই এগিয়ে চলল এবং ১০ মার্চ উত্তেজনা চরমে পৌঁছায়। সরকার এবং কংগ্রেসি নেতারা ১০ মার্চ কি ঘটনা ঘটতে চলেছে তার আশঙ্কায় আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন। অথচ পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য তারা কোনো বিশেষ প্রস্তুতি নেননি। বরং বলা চলে পরিস্থিতির কাছে তারা আত্মসমর্পণ করেছিলেন।[৪৫] শুধু বিশিষ্ট কয়েকজন মন্ত্রী এবং কংগ্রেস নেতাদের জীবন রক্ষার জন্য কিছু পুলিশি ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

বিগত দিনের ঘটনা থেকে ভিন্ন চরিত্র নিয়ে ১০ মার্চ ঝড়ের সূত্রপাত ঘটে। বন্‌ধ-এর আগের দিন বাজারে প্রচুর বেচাকেনা হল। সাধারণ মানুষ কয়েকদিনের জন্য কেনাকাটা সেরে নেয়।

বন্‌ধ-এর দিন কলকাতা ও অন্যান্য জেলায় জনজীবন স্তব্ধ হয়ে যায়। রেল সম্পত্তি ধ্বংস করাই মূল লক্ষ্য হয়ে ওঠে। সরকার ট্রেন চালাতে চায় আর বিক্ষোভকারীরা ট্রেন চলাচল স্তব্ধ করে দিতে বদ্ধপরিকর। তারা রেললাইনের উপর বসে পড়ে, ফিসপ্লেট খুলে দেয়, লাইন উপড়ে ফেলে, ট্রেনের কামরা পুড়িয়ে দেয়, গুদামঘর জ্বালিয়ে দেয় এবং রেলের সম্পত্তি ধ্বংস করে। পুলিশের সাথে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষ বাধে, পুলিশের গুলিতে কলকাতায় দুজন এবং অন্যান্য জেলায় ১১ জন প্রাণ হারায়। পুলিশ-জনতা যুদ্ধে অনেক পুলিশ আহত হয়। শুধু কলকাতাতেই আহত হয় ১০০ জন। উপদ্রুত এলাকায় সামরিক বাহিনী তলব করা হয়।[৪৬]

খড়দহ, হিন্দমোটর, রিষড়া, কোন্নগর এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। জনতা-পুলিশ খণ্ডযুদ্ধ এবং ট্রেন পোড়ানোর ঘটনা ঘটে যায়। প্রায় ২০০০ উত্তেজিত জনতা খড়দহ স্টেশন আক্রমণ করে এবং রেল সম্পত্তি ধ্বংস করে। এই ধ্বংসের তালিকায় সিগন্যাল, কালভার্ট, সুইচ, ফিস প্লেট ইত্যাদি। রেললাইন উপড়ে ফেলা হয়। রেলরক্ষী বাহিনী তিন রাউন্ড গুলি চালায়। এক কিশোরের মৃত্যু ঘটে এবং অনেকে আহত হয়। আসানসোলে উত্তেজিত জনতা পুলিশের উপর আক্রমণ হানে, আসানসোলের পুরোনো থানা তছনছ করা হয় এবং পোস্ট অফিস, পুলিশভ্যান, খাদি কেন্দ্র ও আই এন টি ইউ সি-র অফিস পুড়িয়ে দেওয়া হয়। পুলিশ অনেক রাউন্ড গুলি চালায়। ৩১ জনকে হাসপাতালে পাঠানো হয়, তাদের মধ্যে অনেকেই গুলিতে আহত।

২৮ জনকে ভরতি করা হয়। তার মধ্যে ২ জনের মৃত্যু ঘটে। রামরাজাতলার কাছে হাওড়া-বোম্বে মেল পুড়িয়ে দেওয়া হয়। এখানেও রেললাইন থেকে ফিস প্লেট খুলে নেওয়া হয়ে। পুরুলিয়ায় বরাহভুবনে একটি ট্রেন লাইনচ্যুত হয়। বাউরিয়ায় লাইনের কাঠের স্লিপার পুড়িয়ে দেওয়া হয়। কোন্নগরে স্টেশন ও কেবিনঘর পোড়ানো এবং কোন্নগর ও রিষড়ার মাঝে একটি সেতু ধ্বংসের ঘটনা ঘটে। শ্রীরামপুর স্টেশনের মালগুদাম জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। চন্দননগর ও সোদপুর স্টেশন ভাঙচুর করা হয়। পূর্বরেল সূত্রে পাওয়া খবরে জানা যায় যে ৩৭টি কামরা ভস্মীভূত হয় এবং অন্যান্য জিনিশপত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

উত্তরবঙ্গে জলপাইগুড়ি জেলার আলিপুরদুয়ারে বহু অঞ্চলে হাঙ্গামা ছড়িয়ে পড়ে। ফালাকাটায় বিডিও অফিস আক্রান্ত হয়। টেলিফোনের তার কেটে দেওয়া হয়। আলিপুরদুয়ার রেলস্টেশনে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়।

কলকাতা এবং নিকটবর্তী এলাকা সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রহর গুনতে থাকে। রাত নেমে এলেই রাস্তার আলো নিভিয়ে দিয়ে হাঙ্গামা শুরু হয়। সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত রিষড়া, বারাকপুর মহকুমা, যাদবপুর, বেহালা ও মেটিয়াবুরুজ থানা এলাকায় কার্ফু জারি করা হয়। ওই সমস্ত অঞ্চলে এবং হুগলি জেলার আরো ১০টি এলাকায় ৫ জন বা তার বেশি একত্র জমায়েত নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।[৪৭]

কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় পরদিন হাঙ্গামা ছড়ায়। পোস্ট অফিস, থানা টহলদারী পুলিশগাড়ি, ট্রাম, সরকারি বাসগুমটি এবং দুধ সরবরাহের গাড়ি আক্রান্ত হয়। সব চাইতে বেশি উত্তেজনা ছড়ায় বরিষা, সরসুনা, ঠাকুরপুকুর, জিনজ্রাপোল এবং শখের বাজার এলাকায়। বেহালা থানা তিনবার আক্রান্ত হয় এবং পুলিশের গুলিতে এক কিশোর প্রাণ হারায়। এ সমস্ত এলাকায় রাস্তা অবরোধ করা হয় যাতে পুলিশের গাড়ি ও দমকল বাহিনী ঢুকতে না পারে। শুধুমাত্র বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডে ২০০ জায়গায় অবরোধ গড়ে তোলা হয়। বোমা ও পাথর ছুঁড়ে বেলঘরিয়া ও পানিহাটি থানা আক্রমণ করা হয়। খড়দহতে বোমাবাজির ঘটনা ঘটলে পুলিশের গুলিতে এক কিশোরের মৃত্যু হয়। হাওড়াতে পুলিশ গুলি চালালে অলোক মজুমদার নামে এক কিশোর ছাত্রের মৃত্যু হয়। হুগলি জেলার বৈদ্যবাটিতে উত্তেজিত জনতা রেললাইন আক্রমণ করলে পুলিশ গুলি চালায় এবং এক ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে। বৈদ্যবাটি চৌমাথায় সশস্ত্র পুলিশ অনেক রাউন্ড গুলি চালায়, তাতে একজনের মৃত্যু ঘটে এবং ছ জন আহত হয়।

কলকাতার অনেক অঞ্চলে জনতা-পুলিশের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ বেধে যায়। বোমা, পাথর দিয়ে একটি পুলিশভ্যান, একটি পোস্ট অফিস, ট্রামগাড়ি, সরকারি বাসগুমটি এবং পুলিশের উপর আক্রমণ করা হয়। বেলেঘাটা ও বাগবাজারে পুলিশ গুলি চালায়।বেলেঘাটায় পুলিশের গুলিতে এক ব্যক্তি প্রাণ হারায়। শহরের পূর্বাঞ্চলে শিয়ালদহের কাছে এবং অন্যান্য জায়গায় অবরোধ গড়ে তোলা হলে পুলিশ গুলি চালায় এবং তাতে একজনের মৃত্যু হয়; আহত হয় দু জন।[৪৮]

শনিবার, হাঙ্গামার তৃতীয় দিনে কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার চিত্র দেখে মনে হল আন্দোলন থেমে গেছে; যদিও বিভিন্ন জায়গায় অসংখ্য বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটতে থাকে।

এ সমস্ত ঘটনায় দিল্লির টনক নড়ে। এতদিন দিল্লি পশ্চিমবঙ্গের ঘটনাপ্রবাহের গতি প্রকৃতি লক্ষ্য করছিল। ৫ মার্চ যখন কৃষ্ণনগরে তীব্র গণ্ডগোল শুরু হয় তখন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ফোনে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে যোগাযোগ করে জানান যে সমস্যার সমাধানে

তাঁকে সাহায্য করতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জি এল নন্দা কলকাতায় আসছেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী তাতে রাজি হলেন না। কারণ তাতে মনে হতে পারত যে কেন্দ্রীয় সরকার হস্তক্ষেপ করছে এবং তাতে রাজ্যের মর্যাদা হানি হত। ৬ মার্চ গুয়াহাটি যাবার পথে প্রধানমন্ত্রী কলকাতায় মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। প্রধানমন্ত্রী ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী সাংসদদের নিয়ে দিল্লিতে এক বৈঠকে বসেছিলেন। কলকাতায় তিনি প্রফুল্ল সেনের সাথে সামগ্রিক সমস্যা নিয়ে আলোচনায় বসেন। তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে কতকগুলি পরামর্শ দেন। যেমন, বিরোধী নেতাদের মুক্তি দেওয়া এবং তাঁদের সাথে আলোচনায় বসা। কিন্তু সেন ও তাঁর সহকর্মীদের কাছে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণযোগ্য বলে মনে হল না। সুতরাং ঘটনাপ্রবাহ অব্যাহত থাকে।[৪৯]

কিন্তু ১০ ও ১১ মার্চের ঘটনায় এবং সংসদে বিরোধীদের সোরগোলে প্রধানমন্ত্রী কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। পরিস্থিতির সরেজমিন তদন্ত করে রাজ্য সরকারকে অবস্থা আয়ত্তে আনবার উপায় খুঁজে দিতে প্রধানমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নন্দা এবং কৃষিমন্ত্রী সুব্রহ্মনিয়ামকে নিয়ে গঠিত একটি কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক দল পশ্চিমবঙ্গে পাঠান। পশ্চিমবঙ্গে পৌঁছেই তাঁরা বুঝতে পারলেন যে তাঁদেব প্রধান কাজ হল প্রফুল্ল সেন ও মন্ত্রীসভার কয়েকজন সহকর্মীকে সামলানো। কারণ কেন্দ্রের এ ধরণের পদক্ষেপকে তাঁরা রাজ্যের ব্যাপারে কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ বলে মনে করছেন। শেষ পর্যন্ত প্রফুল্ল সেন নরম হলেন। তিনি বিরোধী বিধায়কদের মুক্তি দিয়ে তাদের সাথে আলোচনায় বসতে রাজি হলেন; একটি তদন্ত কমিশন গঠনে সম্মতি দিলেন। কিন্তু জ্যোতি বসু ও অন্যান্য নেতারা জেলে থাকায় বামপন্থীরা আলোচনায় রাজি হলেন না। নন্দার কথায় রাজ্য সরকার নরম হয়ে জ্যোতি বসু সহ অন্যান্য নেতাদের মুক্তি দিলেন।[৫০]

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর হস্তক্ষেপ এবং দলীয় নেতাদের সমালোচনার মুখে পড়ে প্রফুল্ল সেন অসহায় হয়ে পড়েন। অপ্রত্যাশিতভাবে তিনি তার পদত্যাগের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেন। মন্ত্রিসভার সদস্যরা তাঁকে পদত্যাগ না করতে অনুরোধ করেন। এমনকী প্রধানমন্ত্রীও তাঁকে শান্ত করবার চেষ্টা করেন। শেষ পর্যন্ত প্রফুল্ল সেন পদত্যাগপত্র পেশ করলেন না।[৫১]

১৩ মার্চ থেকে অবস্থা স্বাভাবিক হতে শুরু করে। ওইদিন ইতস্তত কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটে মাত্র। বামপন্থীরা কলকাতায় দু মাইল লম্বা মিছিল করে শহিদ দিবস পালন করে। 'দি স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকার রিপোর্টারের মতে স্বাধীনতার পরে কলকাতায় এত বড় গণবিক্ষোভ আর ঘটেনি।[৫২] ১৪ মার্চ জ্যোতি বসু, নিরঞ্জন সেন ও অন্যান্য নেতাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। বামপন্থী নেতৃবৃন্দ ও মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে কয়েক দফা আলোচনা হয়। কিন্তু যুক্তফ্রন্ট খাদ্য ও অন্যান্য দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্তে অটল থাকে। তারা বিধানসভা বয়কট করেন এবং তাঁদের দাবি আদায়ের জন্য ৬ এপ্রিল সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেন।

যুক্তফ্রন্টের দাবির মধ্যে ছিল : সারা রাজ্যে পূর্ণ রেশনিং ব্যবস্থা চালু করা, আবাদি অঞ্চলে রেশনের বরাদ্দ কমানো চলবে না, পর্যাপ্ত পরিমাণ কেরোসিন সরবরাহ করতে হবে এবং কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দাবি মানতে হবে। অন্যান্য দাবি ছিল : আন্দোলনের সাথে যুক্ত সমস্ত বন্দীদের মুক্তি দিতে হবে, আন্দোলন সংক্রান্ত সমস্ত মামলা প্রত্যাহার করতে হবে এবং পুলিশের আক্রমণে নিহত ও আহতদের পরিবারদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং সমস্ত গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ও জেলে আটক রাখার নির্দেশ

প্রত্যাহার করতে হবে।

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দাবি পূরণ না হলে বামপন্থীদের ডাকা ধর্মঘটের হুমকি মাথার উপর খাঁড়ার মতো ঝুলতে থাকে। রাজ্যে মোটামুটি স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসতে শুরু করেছে। অন্ততপক্ষে কিছু সময়ের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি ঘৃণাভাব কিছুটা স্তিমিত হয়ে এসেছে। হতাহতের তালিকায় পাওয়া তথ্যে জানা যায় ৩৯ জনের মৃত্যু ঘটেছে যাদের অধিকাংশই কিশোর। আহতদের সঠিক সংখ্যা পাওয়া যায়নি। ৫,৫০০ জনকে জেলে পাঠানো হয়েছে যাদের অধিকাংশই কিশোর। 'দি স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকার হিশেবে পাওয়া তথ্যে জানা যায় যে বন্‌ধ-এর দিনগুলোতে জাতীয় আয়ের ক্ষতির পরিমাণ ৬·৫ কোটি টাকা।[৫৩]

## ১৯৬৬-র খাদ্য আন্দোলনের প্রকৃতি

কেন্দ্রীয়মন্ত্রী রাজ্য সরকারকে যে দুটি বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে পরামর্শ দিয়েছিলেন তার একটি হল বিক্ষোভের কারণ অনুসন্ধানের জন্য একটি তদন্ত কমিশন গঠন। সেই অনুযায়ী ১৩ মার্চ এক সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী জানালেন যে রাজ্যপাল একটি তদন্ত কমিটি নিয়োগ করবেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই কমিটি হবে আদালতের চাইতে অধিক ক্ষমতাশালী। কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় দাঙ্গাহাঙ্গামার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করাই হবে এই কমিটির মূল লক্ষ্য। কমিটি যে বিষয়গুলোর উপর তদন্ত চালাবেন সেগুলি হল :—(১) দেশবিভাগের প্রতিক্রিয়া; (২) পুনর্বাসন পায়নি বা আংশিক পুনর্বাসন পেয়েছে এমন উদ্বাস্তু; (৩) বেকার বা প্রায় বেকার যুবক; (৪) ছাত্রদের শিক্ষা, বিনোদন এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধার অভাব; (৫) বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য স্তরে পরীক্ষায় অধিকমাত্রায় অকৃতকার্যতা; (৬) যে সব কিশোর আন্দোলনে নতুন মাত্রা এনে দিয়েছে তারা কোন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত এবং (৭) এই দাঙ্গার ফলে প্রকৃত লাভবান কারা হয়েছে।[৫৪]

বামপন্থীদের শান্ত করার উদ্দেশ্যেই এই তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছিল বলা চলে। কারণ তদন্তের বিষয়বস্তু অন্যান্য তদন্ত কমিটির বিষয়বস্তু থেকে আলাদা। এই কমিটির উদ্দেশ্য লক্ষ করলে বোঝা যায় যে কমিটি সামাজিক পরিস্থিতির তদন্ত করতেই নিযুক্ত হয়েছিল। যে বিষয় নিয়ে আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটেছে তার সাথে এর কোনো সম্পর্কই নেই। এই কমিটির অনুসন্ধানের বিষয়বস্তু এবং সুপারিশ সামাজিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিকদের সাহায্য করতে পারে। কিন্তু বিরোধীদের দাবির সাথে এর কোনো সম্পর্ক ছিল না।

তবে বিষয়বস্তুগুলো যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বিষয়বস্তুগুলোর মধ্যে একটি রয়েছে যা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, যেসব কিশোর আন্দোলনে যোগ দিয়েছে তাদের উপর সরকারের বিশেষ দৃষ্টি পড়েছিল। সরকার এদের কার্যকলাপে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। এমনকী বিরোধীরাও এদের আচরণে বিশেষ সমস্যায় পড়েছেন। কারণ এরাই আন্দোলনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে। বিরোধীরাই অবশ্য তাতে লাভবান হয়েছে। কিন্তু তারা পার্টির নিয়মশৃঙ্খলার আওতায় আসেনি। কেউ জানত না তারা কোথা থেকে এল আবার কোথায় হারিয়ে গেল। খাদ্য আন্দোলনের সময় বিরোধীরা প্রচলিত ধারায় আন্দোলন পরিচালনা করে এসেছে এবং সরকার ও

চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী তার জবাব দিয়েছে। উভয়পক্ষই এ ব্যাপারে ওয়াকিবহাল। কিন্তু ১৯৬৬-র আন্দোলনের মধ্যে যে নতুন শ্রেণীর অনুপ্রবেশ ঘটেছিল তাদের কোনোপক্ষই চিনত না। এই শ্রেণীই আন্দোলনের চরিত্র পালটে দিয়েছিল। দক্ষযজ্ঞে তারা শিবের অনুচর নন্দী ভৃঙ্গীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। তারা যথেচ্ছ ভাঙচুর করেছে, বাড়িঘর, বাসট্রাম পুড়িয়েছে, সরকার তথা জনগণের সম্পত্তি নষ্ট করেছে। আবার এরাই পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছে। হতাহতের তালিকা থেকেই বিষয়টি পরিষ্কার বোঝা যায়। যারা গুলিতে মারা গিয়েছে তাদের বয়স ১০ থেকে ১৮-র মধ্যে। 'দি স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকায় আন্দোলনে এই কিশোর বাহিনী যে ভূমিকা পালন করেছে তার বিবরণ পাওয়া যায় :—

"৪ মার্চ ধর্মঘট না ডাকা হলেও কিশোরবাহিনী জোর করে অনেক স্কুল বন্ধ করে দেয়। ওই বৃহস্পতিবারের ঘটনা কোনো রাজনৈতিক বা খাদ্য আন্দোলনের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়।

শুক্রবার বিকেলে শিয়ালদহ স্টেশনে...পুলিশি আক্রমণের প্রতিবাদে কিশোর ছাত্রদের কয়েকটি বড় বড় মিছিল উপস্থিত হলেই গণ্ডগোলের সূত্রপাত ঘটে। নেতৃত্বহীন ছাত্ররা ইট পাথর লাঠি দিয়ে বাসের উপর হামলা চালায়। বিশাল কনস্টেবল বাহিনী অসহায়ের মতো তাকিয়ে থাকে। পুলিশ এলে বিক্ষোভকারীরা আশেপাশের গলিতে পালিয়ে যায়। এরপর যা ঘটবার তাই ঘটল—পুলিশের সাথে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষ। দেওয়ালের আড়াল থেকে বিক্ষোভকারীরা পুলিশের উপর ইটপাটকেল ছুঁড়তে থাকে। পুলিশও কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়ে জবাব দেয়। তখনই বিপরীত দিক থেকে ইটপাথর ছুটে আসতে থাকে। আশপাশের বাড়ির ছাদ, ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে সকলে এই খণ্ডযুদ্ধ দেখতে থাকে।"

কৃষ্ণনগরের বিক্ষোভেও কিশোররা অংশগ্রহণ করে। পুলিশের গুলিতে নিহত আনন্দ হাইতের বয়স ১৭ বছর। হিন্দমোটর, রিষড়া, কোন্নগর, খড়দহ, বেহালায় পুলিশ জনতা খণ্ডযুদ্ধেও কিশোররা অংশগ্রহণ করে। 'দি স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকা থেকে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে :—

১০ মার্চ রিষড়ায় গুলিচালনা : বিক্ষুব্ধ জনতার সংখ্যা দাঁড়ায় ১০ হাজারের উপরে। তাদের মধ্যে অধিকাংশই কিশোর। তারা পুলিশের উপর আক্রমণ হানে। এক সময় বিক্ষোভকারীরা দুজন কনস্টেবলকে ধরে পোশাক খুলে নেয় এবং জোর করে গলির মধ্যে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে। তখনই পুলিশের ভারপ্রাপ্ত অফিসার গুলি চালাবার নির্দেশ দেন।

১০ মার্চ যখন আপ বর্ধমান লোকালের উপর ইটপাটকেল ছোঁড়া হয় তখনই গণ্ডগোলের সূচনা। ড্রাইভার এবং দুজন ফায়ার ম্যান কর্তব্যরত কনস্টেবলকে গুলি চালাতে বলে। সাথে সাথে কনস্টেবল তাদের উপর গুলি চালাবার নির্দেশ নেই বলে জানিয়ে দেয়। আক্রমণের মুখে কনস্টেবল গাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায়। ড্রাইভার, গার্ড, ফায়ারম্যানরাও পালিয়ে বাঁচেন। জনতার এক অংশ স্টেশনের দিকে এগিয়ে আসে। স্টেশনে ডাউন দুন এক্সপ্রেস দাঁড়িয়েছিল। এস ডি পি ও গুলি চালাবেন ঠিক করেও পিছিয়ে এলেন। কারণ বিক্ষোভকারীদের মধ্যে বিপুল সংখ্যক ছিল কিশোর। তিনি শূন্যে কয়েক রাউন্ড গুলি চালাবার নির্দেশ দিলেন।

১০ মার্চ শিয়ালদহ বিভাগ :—পূর্বরেলের শিয়ালদহ বিভাগের খড়দহ স্টেশনে সব

চাইতে বেশি হাঙ্গামা সংঘটিত হয়। আক্রমণের মূল লক্ষ্যই ছিল সিগন্যাল, কালভার্ট, সুইচ, ফিসপ্লেট, রেললাইন প্রভৃতি। ২০০০ এর মতো মারমুখী জনতা প্রায় দুঘণ্টা যাবৎ এই ধ্বংসকাণ্ড ঘটাতে থাকে। বেলা ৯-৩০ মিনিটে রেলরক্ষীবাহিনী ৫ রাউন্ড গুলি চালায়। বাবলু দাস নামে এক কিশোর মারা যায়।

যদিও খড়দহতে বিক্ষুব্ধ জনতার মধ্যে কত জন কিশোর ছিল তার সংখ্যা খবরে জানা যায়নি তবুও কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে জানা যায় যে জনতার মধ্যেকার অধিকাংশই (যাদের মধ্যে বেশিরভাগই কিশোর) রেললাইনের দুপাশের উদ্বাস্তু কলোনির লোক। ওই অঞ্চলের অমল দত্ত (সি পি আই) এবং সাধন চক্রবর্তী (প্রাক্তন সিপিআই (এম) নেতা)-র সাক্ষাৎকারে জানা যায় যে জনতা যখন স্টেশন আক্রমণ করে তখন তাঁরা স্টেশনের কাছেই দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁরা এই বিক্ষোভে কোনোপ্রকার অংশগ্রহণ করেননি। তাঁরা লক্ষ করলেন যে শয়ে শয়ে কিশোর রেললাইনের দুপাশ থেকে ছুটে এসে স্টেশনের উপর হামলা শুরু করে দিয়েছে। অমল দত্ত তাদের ঠেকাবার চেষ্টা করেছিলেন; কিন্তু তারা তাঁর কথা শোনেনি। শেষ পর্যন্ত দুজনেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দর্শকের ভূমিকা পালন করতে লাগলেন। হঠাৎ বাবলু পুলিশের গুলিতে লুটিয়ে পড়ে। একটি গুলি সাধন চক্রবর্তীর হাতের পাশ দিয়ে বেরিয়ে অমলের হাতে আঘাত হানে। আন্দোলনে অংশগ্রহণ করবার জন্য পার্টি থেকে তাদের কোনো নির্দেশ দেওয়া হয়নি। এই কিশোরদের হঠাৎ মারমুখী হওয়ার ঘটনাতে তাঁরা দুজনেই হতবাক্ হয়ে গিয়েছিলেন। ওই দলের মধ্যে পার্টি সদস্য বা পার্টি দরদী কাউকেই তাঁরা খুঁজে পাননি।

মার্চ ১১ : বেহালা থানা তিনবার আক্রান্ত হয়। এক সময় যখন জনতা পুলিশের গাড়ি ঘিরে ফেলে, তখন পুলিশ গুলি চালালে ১৮ বছরের এক কিশোরের মৃত্যু হয় এবং আরো পাঁচজন আহত হয়।

বেহালায় কয়েকজনের সাক্ষাৎকার নিয়ে জানা যায় যে বিক্ষুব্ধ জনতার অধিকাংশই কিশোর এবং যে মারা গিয়েছে সেও কিশোর।

দ্য স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার সংবাদদাতা ১৯৬৬-র আন্দোলনে কিশোরদের সংখ্যাধিক্য এবং তাদের ভূমিকায় অবাক হয়ে গিয়েছেন। তাঁর ভেতরে প্রশ্ন জেগেছে : সাধারণত ১৬ থেকে ২৫ বছর বয়স্কদের মধ্যে বৈপ্লবিক চেতনা জন্মে, কিন্তু এই ১০ থেকে ১৫ বছরের কিশোররা কিভাবে এই আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নিল? এই প্রশ্নের উত্তর পাবার জন্য তিনি আন্দোলনের নেতা ও বুদ্ধিজীবীদের কাছে গিয়েছিলেন। কেউ কোনো সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেননি। তাঁর মনে হয়েছিল যে হতাশা থেকেই তারা এ ধরণের আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে এগিয়ে এসেছিল। দক্ষিণ কলকাতার উদ্বাস্তু কলোনির ১০ বছরের একটি ছেলে তাঁকে এর ব্যাখ্যা দিয়েছে যা এখানে উল্লেখযোগ্য। ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করা হল—"হরতালের দিন কেন তুমি রাস্তা অবরোধ করতে গেলে?" সাথে সাথে উত্তর এল—"কারণ আমাদের খাবার নেই।" "কিন্তু তোমার দাদা না গিয়ে তুমি গেলে কেন?" ছেলেটি উত্তর দিল—"কেন যাব না? বাবাকে কাজে বেরোতে হয়। আমার দাদা সংসারের কাজকর্মের ব্যাপারে উদাসীন। তাই আমাকেই বাজারে যেতে হয়, রেশন, দুধ, কেরোসিন প্রভৃতির জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। তারপর বাজারে গিয়ে শাকসবজি, তেল ইত্যাদি কিনে আনি। সন্ধ্যাবেলা সংসারের খরচ নিয়ে মা-বাবার সাথে ঝগড়াঝাঁটি হয়, আর তারা

আমাদের বলেন যে কিছুদিন পর আর আমাদের খাবার জুটবে না।"[৫৫]

১৯৬৬-তে পশ্চিমবঙ্গের কিশোররা ১০ বছর বয়সেই জীবনের ভারে ক্লান্ত, অবসন্ন। তারা বাঁচার তাগিদেই জীবনের মায়া তুচ্ছ করে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। অবরোধ গড়েছে, রেললাইন উপড়ে দিয়েছে, রেল কামরা পুড়িয়ে দিয়েছে; পরিণতিতে অনেকেই পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছে।

সচেতন পাঠকসমাজ নিশ্চয়ই এসব কিশোর কোথা থেকে এল অনুমান করতে পারছেন। শিয়ালদহ থেকে কৃষ্ণনগর, শিয়ালদহ থেকে ডায়মন্ডহারবার, শিয়ালদহ থেকে বনগাঁ, হাওড়া থেকে ব্যান্ডেল পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে রেললাইনের দুপাশে গড়ে ওঠা অস্থায়ী কুঁড়েঘর থেকেই এরা বেরিয়ে এসে বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করেছে; এরা অভুক্ত, অশিক্ষিত, অপরাধপ্রবণ। এরা বলতে গেলে পথেরই মানুষ। কেউ তাদের দিকে ফিরেও তাকায় না। মানুষের স্বাভাবিক মানবতাবোধ এদের নেই। তারা যে সমাজে বাস করে সে সমাজের কাছে তারা কিছুই চায় না। তথাকথিত ভদ্রঘরের মায়েরা তাদের ছেলেমেয়েদের এদের সাথে মেলামেশা করতে দেন না। কারণ তারা সমাজের বাইরের মানুষ। ১০ বছর থেকেই খিদের জ্বালায় তারা অপরাধ প্রবণ দল গড়ে তুলেছে। রাজ্যের স্বাভাবিক পরিস্থিতিতেও এদের অপরাধ প্রবণতা, অসামাজিক কাজ বন্ধ হয় না; কারণ এদের সামনে সুস্থ জীবনযাপনের কোনো পথ খোলা নেই। কমিউনিস্ট পার্টি, বামপন্থীদলের নেতাদের কেউই জানতেন না এরা কোথা থেকে এসেছে। তাঁরা এদের রাস্তায় ঘোরাফেরা করতে দেখেছেন। ১৯৬৭-র সাধারণ নির্বাচনের লক্ষ্যে এগোবার জন্য তারা ভোটার খুঁজতে ব্যস্ত। এ সমস্ত ছন্নছাড়া কিশোরদের সম্পর্কে বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থী নেতাদের মানসিকতার কোনো পার্থক্য ছিল না।

এই বেপরোয়া কিশোরদের পরিচয় পাবার পর আমরা ৭নং বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে পারি। তাহল, এই দাঙ্গা হাঙ্গামার পরিচালক কারা এবং কারাই বা এ থেকে লাভবান হয়েছে? প্রাথমিক বিক্ষোভ সৃষ্টির জন্য মুখ্যমন্ত্রী সিপিআই (দক্ষিণপন্থী)-কে দায়ী করেছেন। তাঁর মতে, বামপন্থী কমিউনিস্ট (সিপিআই (এম)) পরে এসে এর দায়িত্ব নেয়। 'দ্য স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যে এ বিষয়ে এক শ্রেণীর প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করা হয়েছে; তারা মুখ্যমন্ত্রীর নজর এড়িয়ে এ সমস্ত কাজ করেছেন।[৫৬] এই হাঙ্গামায় অংশগ্রহণকারী পেশাদারী দাঙ্গাবাজদের কথা উল্লেখ করে পত্রিকার প্রতিবেদক মন্তব্য করেছেন যে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা যারা পালন করেছিল তারা হল উদ্বাস্তু। যাহোক, কারা এই আন্দোলনের উদ্যোক্তা এবং কারাই বা এ থেকে লাভবান হয়েছেন সে আলোচনায় আসা যাক। মুখ্যমন্ত্রী মন্তব্য করেছেন যে প্রাথমিক দায়দায়িত্ব সিপিআই-এর; এর পরে সিপিআই (এম) অংশগ্রহণ করে—এ মন্তব্যের কোনো ভিত্তি নেই। সাধারণের মধ্যে এই ধারণাই জন্মেছিল যে সিপিআই (এম)-ই এই আন্দোলনের পরিচালক। পূর্ব পরিকল্পিত গেরিলা পদ্ধতিতে এই আন্দোলন চালানো হবে ঠিক হয়েছিল। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে এ আন্দোলন শুরু হয়েছিল হঠাৎ এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে। যেখানেই জোর করে পুলিশের সাহায্যে ট্রেন চালাবার চেষ্টা করা হয়েছে, সেখানেই এই বিক্ষোভ সংগঠিত হয়েছে। যেভাবে আন্দোলনের ধারা অব্যাহত রয়েছে তাতে কমিউনিস্ট এবং বামপন্থীরা অবাকই হয়েছেন। কোনো দলই স্বীকার করেনি যে তারা আন্দোলন পরিচালনার নেতৃত্ব দিয়েছে, যদিও তারা এই দাঙ্গাহাঙ্গামা শুরু হবার তিনচার মাস আগে থেকেই খাদ্যের প্রশ্ন নিয়ে সভা, সমাবেশ সংগঠিত

করেছে। প্রথম যখন বসিরহাটে হাঙ্গামা শুরু হয়ে তা কংগ্রেস প্রভাবিত বসিরহাট ও হাবড়া এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে তখন সিপিআই (এম)-এর কোনো দেখাই পাওয়া যায়নি। কৃষ্ণনগরের ঘটনায় সিপিআই (এম) নেতা বিধায়ক গৌরকুণ্ডু জানিয়েছেন যে এই স্থানীয় ঘটনা সম্পর্কে পার্টির কোনো ধারণাই ছিল না।[৫৭] আন্দোলন ঘটেছে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই। ছাত্র জনতা নিজেরাই আন্দোলনে নেমে পড়েছে। তাছাড়া স্থানীয় কিছু সক্রিয় নেতা আটক থাকায় নদীয়া জেলা সি পি এম পার্টি কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। সিপিআই-এর নদীয়া জেলা কমিটির সম্পাদক সুশীল চ্যাটার্জিও একই মত প্রকাশ করেন।[৫৮]

কৃষ্ণনগরের ঘটনার পরেই সমস্ত বামপন্থী রাজনৈতিক দল একত্রিত হয়ে আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য তৎপর হয়। প্রত্যেক রাজনৈতিক দলই এই পরিস্থিতিকে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করার চেষ্টা করে। সি পি এম-ও তা থেকে আলাদা নয়। প্রাথমিকভাবে সিপিআই (এম) পার্টি দু-তিন দিনের ধর্মঘট ডাকার পক্ষপাতী ছিল না। তারা চেয়েছিল বছরের মাঝামাঝি যখন অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেবে তখনই তারা ধর্মঘটের ডাক দেবে। কিন্তু কৃষ্ণনগরের ঘটনার পর পার্টি তার রণনীতির পরিবর্তন ঘটায়। যখন সাধারণ মানুষ সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে তখনই পার্টি অন্য মূর্তি ধারণ করে। পার্টি খুব দ্রুত এবং ধারাবাহিক ধর্মঘট ডাকার জন্য যুক্তফ্রন্টে চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। যখন যুক্তফ্রন্ট ১০ মার্চ ধর্মঘট ডাকার সিদ্ধান্ত নেয় তখনই এই ধর্মঘটকে সফল করে তুলতে সিপিআই (এম) সর্বশক্তি নিয়োগ করে। প্রচারপত্র এবং বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে পার্টি সদস্য এবং সাধারণ মানুষকে এই ধর্মঘট সফল করবার জন্য আহ্বান জানান হয়। প্রস্তুতি হিশেবে মিটিং মিছিল সংগঠিত হয়। গুরুত্বপূর্ণ পার্টি সদস্যদের সতর্ক করে দেওয়া হয় যাতে গ্রেপ্তার এড়াতে তাঁরা রাতে বাড়ি না থাকেন। স্থানীয় পার্টি ক্যাডারদের নির্দেশ দেওয়া হল যে যদি সরকার ট্রাম বাস চালাবার চেষ্টা করে তবে তারা যেন রাস্তা রেললাইন, ট্রাম লাইন অবরোধ করে। কিন্তু এ সমস্ত থেকেই এ সিদ্ধান্তে আসা যায় না যে সিপিআই (এম) পার্টিই তীব্র বিক্ষোভ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সমাজে অব্যবস্থা সৃষ্টি করেছে। পার্টি হিংসাত্মক আন্দোলন গড়ে তুলবার জন্য কোনো নির্দেশ দেয়নি। কিন্তু পার্টি সদস্যদের মধ্যে এ ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে প্রয়োজনে হিংসাত্মক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে; আর সাধারণ মানুষ যদি আন্দোলনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসে তাহলে পার্টি ক্যাডাররা পিছিয়ে থাকবে না। এই সময়েই কিছু উগ্র বামপন্থী ব্যক্তিগত উদ্যোগে পার্টির পরিকল্পনা ছাড়াই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আসানসোলে পার্টি হিংসাত্মক আন্দোলনের পথে না গিয়ে নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে আন্দোলনে নামার ভূমিকা পালন করে। যখন সমাজবিরোধী, হকার এদের নিয়ে বিশাল বিক্ষুব্ধ জনতা সশস্ত্র আক্রমণ হেনে সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস করতে থাকে, তখন স্থানীয় সিপিআই, সিপিআই (এম) নেতারা এই বিক্ষুব্ধ জনতাকে নিয়ন্ত্রণে আনবার চেষ্টা করে নিগৃহীত হন। সিপিআই এবং সিপিআই (এম) অন্যান্য অঞ্চলেও একই ভূমিকা পালন করে। খড়দহর ঘটনা সম্পর্কে ২৪ পরগনার পানিহাটি লোকাল কমিটির ২০ মার্চ জেনারেল বডির (জি বি) সভায় আলোচনা হয়। আলোচনায় বলা হয় যে খড়দহ এলাকায় আন্দোলন যেভাবে হিংসাশ্রয়ী হয়ে উঠেছে তাতে পার্টি সদস্যরা বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন। কারণ এর দায়দায়িত্ব সম্পূর্ণই সিপিআই (এম)-এর উপর বর্তাবে; যদিও এ ধরণের হিংসাশ্রয়ী আন্দোলন সংগঠিত করবার কোনো পরিকল্পনা পার্টির নেই। বলা হল

যে স্থানীয় নেতারা পরিস্থিতি সামাল দিতে পারছে না; আর সমাজবিরোধীরাই এর সুযোগ নিচ্ছে।[৫৯]

১৩ মার্চের প্রদেশ কমিটির সার্কুলার থেকেই আন্দোলনে সিপিআই (এম)-এর ভূমিকা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা জন্মে। সার্কুলারটির শিরোনাম ছিল—"বর্তমান আন্দোলনে পার্টির ভূমিকা।" সার্কুলারটি ছিল খুব গোপন। এই সার্কুলারে বলা হয়েছিল যে যখন বসিরহাটের ঘটনাবলীর প্রভাব নদীয়া জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে তখন পার্টি ৯ অথবা ১০ মার্চ ধর্মঘট ডাকার জন্য যুক্তফ্রন্টের কাছে সুপারিশ করে। এক্ষেত্রে যদি সরকার দমননীতি চালাবার চেষ্টা করে তাহলে ১২ মার্চ পুনরায় ধর্মঘটের ডাক দেওয়া যেতে পারে বলেও পার্টি সুপারিশ করে। কিন্তু ১০ বা ১২ মার্চের ধর্মঘট মে বা জুনের দু-তিনদিনের ধর্মঘট পালন করার প্রস্তুতি হিশেবেই গণ্য করা হবে। তাহলে আন্দোলন গ্রামগঞ্জে ছড়িয়ে পড়বে। বিভিন্ন আঞ্চলিক কমিটিতে সার্কুলারটি ছড়িয়ে পড়ল। ১০ মার্চের বন্ধ সম্পূর্ণ সফল হল। তখন পার্টি নিজে তার শাখাগুলোকে স্থানীয় এলাকায় বন্ধ পালন করার নির্দেশ পাঠায়। উপরন্তু ১২ মার্চ সাধারণ ধর্মঘট ডাকবার জন্য যুক্তফ্রন্টের কাছে দাবি জানায়। কিন্তু যুক্তফ্রন্ট তাতে রাজি হয়নি। তখন পার্টি যুক্তফ্রন্টকে পরিষ্কার জানিয়ে দেয় যে যতদিন পর্যন্ত দাবি পূরণ না হবে এবং নেতাদের জেল থেকে মুক্তি না দেওয়া হবে ততদিন ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হবে না। এই তথ্য থেকে জানা যায় যে পার্টি সিপিআই প্রস্তাবিত অনশন ধর্মঘট পালনের পক্ষপাতী ছিল না; কারণ একদিনের অনশন পালন করার মধ্য দিয়ে সরকারকে জনবিরোধী কার্যকলাপ থেকে বিরত রাখতে বাধ্য করা যাবে না।[৬০] এই তথ্যে তৎকালীন পরিস্থিতিতে হিংসাশ্রয়ী আন্দোলন চালাবার কোনো নির্দেশ বা ইঙ্গিত দেওয়া হয়নি। এই মর্মে কলকাতা জেলা কমিটিও সার্কুলার জারি করে যার নম্বর ৮/৬৬।

পার্টি পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনের দিকে লক্ষ্য রেখেই এই আন্দোলনকে গণ আন্দোলনের রূপ দিতে চেয়েছিল। পার্টি চেয়েছিল খরার মরসুমে ধারাবাহিকভাবে বন্ধ পালন করতে, আর যুক্তফ্রন্টের মাধ্যমে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির জন্য আলোচনা চালিয়ে যেতে।

এটা সত্য যে, পার্টি সে সময় সশস্ত্র গণতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত করবার ভাবনাচিন্তা করছিল। কিন্তু ১৯৬৬-তে এ ধরণের কোনো বিপ্লব সংগঠিত করবার প্রস্তুতি পার্টির ছিল না। তাদের প্রভাবশালী নেতৃবৃন্দ জেলে বন্দী। যতদিন পর্যন্ত সর্বভারতীয় এবং রাজ্যস্তরে পার্টি সুসংগঠিত না হচ্ছে, ততদিন এ ধরণের কোনো বৈপ্লবিক আন্দোলনে ডাক দেবার প্রশ্নই ছিল না। তাতে পার্টির ক্ষতিই হত। এ ধরণের বৈপ্লবিক পদক্ষেপ নেওয়া তখনই সম্ভব যখন শ্রমিক কৃষক মেহনতি মানুষের মধ্যে পার্টির নেতৃত্ব সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। জেলে বন্দী নেতারাও হিংসাশ্রয়ী আন্দোলন সংগঠিত করায় সম্মত ছিলেন না। তবুও সীমাবদ্ধ আন্দোলন চালিয়ে সরকারের মোকাবিলা করার প্রচেষ্টা চলতে থাকল।

সুতরাং এটা পরিষ্কার যে সিপিআই (এম) আন্দোলনের সূচনা করেনি বা পরিচালনাও করেনি। কিন্তু এই আন্দোলন থেকে পার্টি লাভবান হয়েছে। রাতারাতি পার্টি জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠে যায়। সরকার এক বিবৃতির মাধ্যমে ঘোষণা করে যে এই হিংসাশ্রয়ী আন্দোলনের জন্য সিপিআই (এম) পার্টিই দায়ী এবং এ থেকে পার্টি জনগণের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। তাই নিজের স্বার্থে পার্টি (সি পি আই এম) এই আন্দোলনকে থামতে দেবার পক্ষপাতী ছিল না। পার্টির নীতিই ছিল যতদিন না

নেতাদের মুক্তি দেওয়া হয় ততদিন তারা এই আন্দোলন চালিয়ে যাবে। কারণ, ১৯৬৭-র প্রথম দিকেই বিধানসভা নির্বাচনে তারা তাদের জয়ধ্বনি শুনতে পেয়েছিলেন। 'পশ্চিমবঙ্গের সংগ্রামী জনগণকে লাল সেলাম'—এই শিরোনামে প্রকাশিত একটি প্রচারপত্রে যে নির্দেশনামা পার্টি জারি করেছিল তা থেকেই পার্টির মনোভাব বোঝা যায়। এই প্রচারপত্রে জনবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে এক কঠিন সংগ্রামের জন্য সমস্ত শ্রেণীর মানুষকে প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানানো হয়েছিল।

২৬ মার্চ সিপিআই (এম) এককভাবে ময়দানে এক জনসভা অনুষ্ঠিত করে। জ্যোতি বসু ছিলেন প্রধান বক্তা। তিনি সরকারের খাদ্যনীতিকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন এবং ঘোষণা করেন যে যতদিন পর্যন্ত সমস্ত দাবি পূরণ না হবে ততদিন আন্দোলন চলবে। তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন যে যতদিন পর্যন্ত কংগ্রেস সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা না যাবে ততদিন কোনো সমস্যারই সমাধান হবে না। তিনি বন্দীদের মুক্তির দাবি জানান এবং ঘোষণা করেন যে কংগ্রেস সরকার চাইছে সিপিআই (এম) পার্টিকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাকে শেষ করে দিতে।

২৭ মার্চ ময়দানে এক জনসভা ডেকে যুক্তফ্রন্ট প্রতিবাদ দিবস পালন করে। এই জনসভায় জ্যোতি বসু ঘোষণা করেন যে বর্তমান সংকটের সুষ্ঠু সমাধানের জন্য মুখ্যমন্ত্রী এবং যুক্তফ্রন্টের মধ্যে বৈঠক ব্যর্থ হয়েছে। সুতরাং ৬ এপ্রিলের সাধারণ ধর্মঘটের কর্মসূচির কোনো পরিবর্তন হবে না; অর্থাৎ ৬ এপ্রিল ধর্মঘট হবেই। এইভাবে সিপিআই (এম) যুক্তফ্রন্টকে সরকারের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক আন্দোলনের পথে নিয়ে যায়। এর মূল লক্ষ্য সাধারণ নির্বাচনের আগে পর্যন্ত জনগণের ভেতরের আন্দোলনের উৎসাহ জিইয়ে রাখা।[৬১]

যদি সিপিআই বা সিপিআই (এম) অথবা মার্কসবাদী বামপন্থী যে কোনো দলই প্রাথমিকভাবে আন্দোলন শুরু না করে থাকে তাহলেও সমস্যা থেকেই যাচ্ছে। তা হল বামপন্থীরা আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করার আগে কারা এর নেতৃত্ব দিয়েছিল? শ্রমজীবী মানুষ ধর্মঘটে সাড়া দিয়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু তারা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেনি। তারা নিজস্ব এলাকায় আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল, কিন্তু তারা একটি নির্দিষ্ট শ্রেণী (শ্রমজীবী সম্প্রদায়) হিশেবে আন্দোলনে নামেনি। ১৯৫৯-এর আন্দোলনে এই শ্রমজীবী মানুষের এক অংশ সক্রিয়ভাবে আন্দোলনের বিরোধিতা করে এবং কোথাও কোথাও তারা ধর্মঘটী শ্রমিকদের সাথে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। মোটামুটিভাবে বলা যায় ১৯৬৬-র আন্দোলনের সময় এই শ্রমজীবী শ্রেণী নিরপেক্ষ ছিল। এই শ্রেণী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল এমন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। কৃষক সমাজও এই আন্দোলন থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখেছিল। মাঝারি কৃষক, জমিদার এবং বড় বড় জমিদাররা সরকারের খাদ্যনীতিতে ক্ষুব্ধ ছিল এবং সরকারবিরোধী আন্দোলনে তারা বরং খুশিই হয়েছে। কিন্তু তারা এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেনি। ভূমিহীন কৃষকরা মুখ বুজে কষ্ট সহ্য করেছে এবং বামপন্থীরা গ্রামে জোতদারের ফসল কেড়ে নেবার কাজে এই ভূমিহীনদের নামিয়ে গ্রামে শ্রেণী সংঘাত সৃষ্টি করতে চায়নি। আন্দোলন কৃষক বিদ্রোহের রূপ ধারণ করতে পারত। কিন্তু তা হয়নি। পরিবর্তে কৃষকবধূরা চালের চোরাকারবারে নেমে পড়ে। মধ্যবিত্ত শ্রেণী মৌখিক সহানুভূতি জানিয়েছে। কিন্তু তারা সক্রিয়ভাবে পথে নামেনি। তাহলে কারা মারমুখী হয়ে

সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করল? যে সমস্ত অঞ্চলে ঘটনাগুলি ঘটেছে সেই অঞ্চলের জনগণের শ্রেণীবিন্যাস বিশ্লেষণ করলেই এদের পরিচয় পাওয়া যাবে। এই ঘটনাবহুল এলাকাগুলো উদ্বাস্তু অধ্যুষিত। ব্যারাকপুর মহকুমা, রিষড়া কোন্নগর, হিন্দমোটর এলাকা, যাদবপুর, বেহালা, বরিষা, সার্সুনা, সখের বাজার এবং কলকাতার আশেপাশের বস্তি এলাকাগুলো ছিল উদ্বাস্তুতে পরিপূর্ণ। নদীয়া জেলায় উদ্বাস্তুরাই ছিল বৃহত্তম জনগোষ্ঠী এবং,কলকাতা, ২৪ পরগনা ও নদীয়া জেলার মোট উদ্বাস্তুর সংখ্যা ছিল পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ। শিয়ালদহ থেকে কৃষ্ণনগর, ডায়মন্ডহারবার থেকে বজবজ এবং হাওড়া থেকে ব্যান্ডেল পর্যন্ত রেললাইনের দুধারে গড়ে-ওঠা কুঁড়েঘরগুলোর সবই গড়ে তুলেছিল উদ্বাস্তুরা। যে কিশোর বাহিনী রেললাইন তুলে ফেলার কাজে নেমেছিল তারা দূর থেকে আসেনি। বন্‌ধ-এর দিন সকালবেলা এরা এ সমস্ত অঞ্চল থেকে বেরিয়ে এসে ভাঙচুর করে আবার যথাস্থানে চলে যেত। 'দ্য স্টেট্‌সম্যান' পত্রিকার খবরেও প্রকাশ পেয়েছে যে তারা নিকটবর্তী বস্তি এলাকাতেই ঢুকে পড়ত। হতাহতের তালিকা থেকেও একই তথ্য ফুটে ওঠে। খড়দহে নিহত বাবলু দাস রেললাইনের ধারে অবস্থিত সূর্য সেন নগর কলোনির বাসিন্দা এবং বেহালায় নিহত শুভেন্দু মুখার্জি বেহালা কলোনির বাসিন্দা। যার মৃত্যুকে ঘিরে হাঙ্গামা ছড়ায় সেই নুরুল ইসলাম ছিল স্থানীয় কিশোর। কিন্তু কৃষ্ণনগরের দাঙ্গার সময় থেকেই যে বিক্ষুব্ধ জনতা পথে নেমে পড়েছিল তাদের অধিকাংশই উদ্বাস্তু। স্থানীয় নিম্নমধ্যবিত্ত ছাত্র, পেশাদার গুণ্ডা এবং সাধারণ গুণ্ডা, চাল চোরাকারবারীরাও এই দাঙ্গাহাঙ্গামায় অংশ নিয়েছিল। কিন্তু মূল ভূমিকা পালন করেছে উদ্বাস্তুরা। এমনকী উত্তরবঙ্গেও একই ঘটনা ঘটেছে। উত্তরবঙ্গে ফালাকাটা এবং আলিপুরদুয়ারে যেখানে দাঙ্গা ছড়িয়েছে সেই অঞ্চলগুলোও ছিল উদ্বাস্তু অধ্যুষিত। আসানসোলে দাঙ্গাহাঙ্গামায় অংশ নিয়েছে হকার যাদের অধিকাংশই অ-বাঙালি। সরকারি হিশেব অনুযায়ী ৩৯ জন মৃতের মধ্যে মাত্র চার জনের প্রকৃত পরিচয় জানা গিয়েছে। এদের মধ্যে তিন জনই উদ্বাস্তু। যেহেতু পুলিশ রেকর্ড পাওয়া যায়নি সেহেতু বাকিদের ঠিকানা বা পরিচয়ও জোগাড় করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু সরকারবিরোধী এই তীব্র রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে যারা অংশগ্রহণ করেছিল তাদের মধ্যে উদ্বাস্তু কিশোরদের সংখ্যা বিবেচনা করে এটা অনুমান করা যায় যে মৃত উদ্বাস্তুর সংখ্যা অ-উদ্বাস্তুদের সমান বা তারও বেশি হতে পারে। যারা জেলে গিয়েছিল তাদের সংখ্যাও প্রায় সমান সমান। তাদের মধ্যে কয়েক হাজার ছিল কিশোর। ফরোয়ার্ড ব্লক এবং পি এস পি-র দেওয়া যৌথ বিবৃতি থেকেই বিষয়টি পরিষ্কার বোঝা যায়। এই যৌথ বিবৃতিতে তারা ঘোষণা করেছিল যে হাজার হাজার কিশোর জেলে বন্দী থাকা অবস্থায় মুখ্যমন্ত্রীর সাথে আলোচনা টেবিলে বসা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এই কিশোরদের সঙ্গে যে সমস্ত যুবক গ্রেপ্তার হয়েছিল তাদের সংখ্যা যোগ করলে উদ্বাস্তুদের সংখ্যা ৪০০০-এর কম হবে না। চন্দননগর শহরে রেললাইনের পূর্বদিকে অবস্থিত, আর উদ্বাস্তু কলোনিগুলো ছিল পশ্চিমদিকে। ১০ মার্চ শহরে সম্পূর্ণ বন্‌ধ পালিত হয়। কিন্তু শহরবাসীরা দাঙ্গায় অংশগ্রহণ করেনি। রেললাইনের পশ্চিমদিকের কলোনি থেকে কিশোররা এসে স্টেশন আক্রমণ করে ও মালগুদাম জ্বালিয়ে দেয়। যারা গ্রেপ্তার হয়েছিল তারা সকলেই ওই কলোনির বাসিন্দা।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে সিপিআই বা সিপিআই(এম) কোনো পার্টিই এই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের উদ্যোক্তা নয়। এ আন্দোলন ছিল স্বতঃস্ফূর্ত যার মূল ভূমিকায় ছিল উদ্বাস্তুরা।

কিন্তু যখন আন্দোলন ক্রমশ তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে তখনই সিপিআই ও সিপিআই(এম) আন্দোলনে নেতৃত্বদানে এগিয়ে আসে। উভয় পার্টির মধ্যে আদর্শগত পার্থক্য থাকলেও সরকারবিরোধী আন্দোলনে তারা কেউ পিছিয়ে থাকেনি। আর এই যৌথ আন্দোলনের ফলেই তারা কংগ্রেসের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছিল।

১ With Dr. B. C. Roy and others Chief Ministers of West Bengal. Vol. I, p-267
২ তদেব, পৃ ২৬৮
৩ তদেব, পৃ ২৬৯
৪ অমৃতবাজার পত্রিকা, ৩ জুলাই, ১৯৫৩
৫ তদেব, ২ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৩
৬ তদেব, ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৩
৭ তদেব, ৫ জুলাই, ১৯৫৩
৮ তদেব, ৫ জুলাই, ১৯৫৩
৯ তদেব, ১৬ জুলাই, ১৯৫৩
১০ অমৃতবাজার পত্রিকা, ১৭ জুলাই।
১১ তদেব, ১৭ জুলাই, ১৯৫৩
১২ তদেব, ১৯ জুলাই, ১৯৫৩
১৩ তদেব, ২৩ জুলাই, ১৯৫৩
১৪ তদেব, ২৪ জুলাই, ১৯৫৩
১৫ তদেব, ২৫ জুলাই, ১৯৫৩
১৬ তদেব, ২৬ জুলাই, ১৯৫৩
১৭ তদেব, ২৭ জুলাই, ১৯৫৩
১৮ তদেব, ৫ অগস্ট, ১৯৫৩
১৯ বিজয় মজুমদার, ইন্দু গাঙ্গুলি, জগদ্বন্ধু ব্যানার্জি ও অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার
২০ সরকারি দলিল
২১ তদেব
২২ With Dr B. C. Roy and other Chief Ministers of West Bengal. P-131.
২৩ তদেব, পৃ ১২৪
২৪ তদেব, পৃ ১৪১
২৫ তদেব, পৃ ২০৫
২৬ তদেব, পৃ ১৯৯-২০০
২৭ তদেব, পৃ ৪১১
২৮ তদেব, ৪১৩
২৯ দ্য স্টেটসম্যান, ৫ আগস্ট ১৯৫৯
৩০ With Dr. B. C. Roy and other Chief Ministers of West Bengal, Vol. I, P-422
৩১ দ্য স্টেটস্‌ম্যান, ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯
৩২ তদেব, ২ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯
৩৩ With Dr. B. C. Roy and other Chief Ministers of West Bengal. P-240
৩৪ দ্য স্টেটস্‌ম্যান, ৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯

৩৫ তদেব, ২ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯

৩৬ তদেব, ২ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯

৩৭ তদেব, ৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯

৩৮ Marcus Franda—Radical Politics in West Bengal, P-136

৩৯ দ্য স্টেটস্‌ম্যান, ১৬ মার্চ, ১৯৬৬

৪০ Marcus Franda—Radical Politics in West Bengal. P-136

৪১ দ্য স্টেটস্‌ম্যান. ৩০ মার্চ, ১৯৬৬

৪২ তদেব, ৫ মার্চ, ১৯৬৬

৪৩ তদেব, ৬ মার্চ, ১৯৬৬

৪৪ তদেব, ১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬

৪৫ তদেব, ২৯ মার্চ, ১৯৬৬

৪৬ তদেব, ১১ মার্চ, ১৯৬৬

৪৭ তদেব, ১১ মার্চ, ১৯৬৬

৪৮ তদেব, ১২ মার্চ, ১৯৬৬

৪৯ তদেব, ১২ মার্চ, ১৯৬৬

৫০ তদেব, ১২ মার্চ, ১৯৬৬

৫১ তদেব, ১২ মার্চ, ১৯৬৬

৫২ তদেব, ১৪ মার্চ, ১৯৬৬

৫৩ তদেব, ২৮ মার্চ, ১৯৬৬

৫৪ তদেব, ২৯ মার্চ, ১৯৬৬

৫৫ তদেব, ৩০ মার্চ, ১৯৬৬

৫৬ তদেব, ৩০ মার্চ, ১৯৬৬

৫৭ সরকারি দলিল

৫৮ তদেব,

৫৯ তদেব,

৬০ সিপিআই দলিল

৬১ সরকারি দলিল

## একাদশ অধ্যায়

# পুনরাবলোকন

ষাটের দশকে উদ্বাস্তু আন্দোলন বাম ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাথে মিশে যায়। হতাশাগ্রস্ত পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের প্রতি কেন্দ্রের কংগ্রেসি সরকার কোনোপ্রকার সহানুভূতি দেখায়নি; বরং তাদের অস্তিত্বকে বারবার অস্বীকার করার চেষ্টা করেছে। তখন তাদের পাশে এসে দাঁড়ায় বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলি এবং তারা উদ্বাস্তুদের নিয়ে জবরদখল কলোনি প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। জবরদখল কলোনি প্রতিষ্ঠা এবং উদ্বাস্তুদের জীবনজীবিকার স্বার্থে বামপন্থী দলগুলির সরকারবিরোধী আন্দোলন উদ্বাস্তুদের মনে বামপন্থার প্রতি আনুগত্যের সৃষ্টি করে। সেই আনুগত্য এবং সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের অকুণ্ঠ সমর্থনকে পাথেয় করেই ১৯৭৭-এ নির্বাচনের মাধ্যমে বামপন্থী দলগুলি পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতা দখল করে বামফ্রন্ট সরকাব গঠন করে।

ক্ষমতা দখল করেই বামফ্রন্ট সরকার গ্রামীণ সংস্কারের উপর বিশেষ জোব দেয় এবং গ্রামাঞ্চলে একটি গণতান্ত্রিক পরিকাঠামো তৈরি করে। সরকার ও বামপন্থী দলগুলিব মধ্যে গভীর বন্ধনের ফলে কৃষকদের উপর থেকে জমিদাবদের অত্যাচার বন্ধ হল এবং গণতান্ত্রিক উপায়ে গ্রামে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু হল। জমির মালিকদের ক্ষমতার বিলুপ্তি, ভূমিহীনদের মধ্যে জমি বিতরণ, কৃষিশ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ, 'অপারেশন বর্গা'র মাধ্যমে ভাগচাষীদের নাম নিবন্ধীকরণ এবং গ্রামে স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ জীবনে আমূল পরিবর্তন ঘটে।

রাজ্য সরকারের ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে বামপন্থীরা এই সংস্কারমূলক কাজ বাস্তবায়িত করেছিল। জমিদখল এবং দখলীকৃত জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টনের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গ্রামীণ ভূমিহীন ও দরিদ্র কৃষকদেরও তারা সংঘবদ্ধ কবেছিল। বেনামী জমি উদ্ধার ও ভাগচাষীদের নাম নিবন্ধীকরণ সম্পূর্ণ আইনানুগ ব্যাপার। কিন্তু তা সময়সাপেক্ষ। বামপন্থী দলগুলি বেনামী জমি উদ্ধার, ভূমিহীনদের মধ্যে জমি বণ্টন ও ভাগচাষীদের নাম নিবন্ধীকরণের জন্য গ্রামাঞ্চলে প্রচণ্ড আন্দোলন গড়ে তোলে। ফলে জমির মালিকের পক্ষে মামলা মোকদ্দমা করে গ্রামের ভূমিব্যবস্থায় এই পরিবর্তনের প্রবাহকে থামিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি। সরকারি সমর্থন ও বিভিন্ন বামপন্থী দলের আন্দোলনের ফলে গ্রামীণ ভূমিব্যবস্থায় যে প্রায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে, তার সঙ্গে জবরদখল কলোনি গড়ে তোলার পদ্ধতিগত মিল লক্ষ্য করা যায়।

গ্রামাঞ্চলে ভূমিব্যবস্থায় পরিবর্তনে বামফ্রন্টের সাফল্য গভীরভাবে অর্থবহ। 'অপারেশন বর্গা' ১·৫ লক্ষ ভাগচাষীদের নিরাপত্তা দান করে, ১৭·২ লক্ষ ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে ৩·৪ লক্ষ হেক্টর উদ্বৃত্ত জমি বণ্টিত হয় এবং নিয়মিত নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক উপায়ে গ্রামের স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়।

রাজ্য সরকার ভূমি সংস্কারের এই কর্মসূচি গ্রহণের উদ্যোক্তা এবং তা বাস্তবে রূপায়িত হচ্ছে কিনা তার উপর সজাগ দৃষ্টি রেখে চলছিল। এই বামফ্রন্ট সরকারের শক্তির উৎস ছিল রাজ্যের বিপুলসংখ্যক উদ্বাস্তু যারা বামপন্থী আন্দোলনে নতুন মাত্রা এনে দিয়েছিল। কংগ্রেসি নেতৃবৃন্দ এদের অবজ্ঞা করেছিল। স্যার যদুনাথ সরকার এই মানুষগুলোকে কাজে লাগিয়ে নতুন সমৃদ্ধ দেশ গড়ে তোলার আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর আবেদনে কর্ণপাত করা হয়নি। এ দেশীয় কংগ্রেসি নেতৃবৃন্দের ধারণা ছিল যে এই বাঙাল উদ্বাস্তুরা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের পেছনে ফেলে এগিয়ে যাবে এবং তাদের সন্তানসন্ততিদের জীবনে সংকট নিয়ে আসবে। তাদের মানসিকতা প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের ধারাতেই প্রবাহিত হচ্ছিল এবং দেশবিভাগের পর পশ্চিমবঙ্গে যে দুর্বিষহ অবস্থার সৃষ্টি হতে চলেছিল তা তাদের নেতৃবৃন্দও উপলব্ধি করতে পারেনি। বাস্তব অবস্থার মোকাবিলায় তারা তাদের খোলশ ছেড়ে বেরিয়ে আসেনি। তারা ভেবেছিল এই দুঃস্বপ্নের দিন কেটে যাবে। কিন্তু তাদের ধারণা ভুল প্রমাণিত হল। তারা এই সত্য উপলব্ধি করতে পারেনি যে যাদের তারা বোঝা বলে মনে করছিল তারাই ছিল প্রকৃত সম্পদ এবং এই সম্পদ একটি মুসলিম রাষ্ট্র তাদের উপহার দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে সামাজিক কল্যাণে রাজ্য সরকার এই মানবসম্পদকে ব্যবহার করতে পারত। এই ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ গঠনমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারত; যেমন : দেশবিভাগের আগে কেন্দ্রীয় সরকার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, উদ্বাস্তুদের নিয়ে যৌথ আন্দোলন গড়ে তুলে সেই প্রতিশ্রুতি পালনে কেন্দ্রকে বাধ্য করা, ভূমিসংস্কার করে পশ্চিমবঙ্গে যতটা সম্ভব উদ্বাস্তুদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা, কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থার সাহায্যে শিল্পনগরী গড়ে তোলা এবং পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ চিত্রের রূপান্তর ঘটিয়ে পাঞ্জাবের মতো পশ্চিমবঙ্গকে আধুনিক শিল্পরাজ্যে পরিণত করা প্রভৃতি। এ সমস্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে একদিকে যেমন ব্যাপকহারে ভূমি সংস্কার এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি ধরণের শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠত, তেমনি পশ্চিমবঙ্গে শিল্পায়নের পরিকাঠামো তৈরি হত। ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে রাজ্যের অভ্যন্তরীণ বাজার সৃষ্টি হয়ে ভবিষ্যতে পশ্চিমবঙ্গে শিল্পায়নের পরিবেশ গড়ে উঠত। পাঞ্জাবে তা হয়েছিল। পূর্ব-পাঞ্জাব পশ্চিম-পাকিস্তানি উদ্বাস্তুদের দিকে আন্তরিকভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল এবং ভারতীয় সম্পদ ঢেলে উদ্বাস্তুদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসনদানের জন্য কেন্দ্রকে বাধ্য করতে যৌথ আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। এইভাবে নতুন পাঞ্জাব গড়ে ওঠে এবং সেখানে উদ্বাস্তু ও অ-উদ্বাস্তুদের মধ্যে ব্যবধান সম্পূর্ণ ঘুচে যায়। বর্তমানে পাঞ্জাবেই মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ সর্বোচ্চ। পাঞ্জাবের প্রায় সর্বত্রই কৃষিক্ষেত্র যান্ত্রিকীকৃত হয়েছে, উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বর্তমানে পাঞ্জাব ভারতের শিল্পোন্নত রাজ্যের অন্যতম। দারিদ্র্য আর বর্তমানে পাঞ্জাবের সমস্যা নয়, সমস্যা হল অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় তার সম্পদবৃদ্ধির প্রতিযোগিতা।

পশ্চিম-পাকিস্তানি উদ্বাস্তুদের প্রতি পূর্ব-পাঞ্জাবের মানুষ সহানুভূতি দেখিয়েছিল। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মানুষ পূর্ব-পাকিস্তান থেকে আসা উদ্বাস্তুদের দিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকিয়েছে, তাদের অবজ্ঞা করেছে। ফলে দেশকে ঠেলে দিয়েছে এক ধ্বংসাত্মক পথে। উদ্বাস্তুরা কলকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য শহরাঞ্চলে রেললাইনের দুপাশে বাঁশ-টালি দিয়ে ঝুপড়ি গড়ে তুলেছে। ১৯৪৯ থেকে সারা পশ্চিমবঙ্গেই এ ধরণের জবরদখল কলোনি গড়ে উঠেছে। ১৯৫১-র উচ্ছেদ আইনের মাধ্যমে এই সমস্যা

সমাধানে সরকারি প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ফলে এই জবরদখল কলোনিগুলোর সরকারি স্বীকৃতি লাভের দাবিতে যে ধারাবাহিক আন্দোলন গড়ে ওঠে তার কাছে সরকার পরাজয় স্বীকার করে এবং নির্দিষ্ট কিছু জবরদখল কলোনিকে স্বীকৃতিদানের নীতি গ্রহণ করে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় জবরদখল কলোনি গড়ে তোলার প্রচেষ্টা রোধ করতে সরকার পারেনি। সংক্রামক ব্যাধির মতো এ ধরণের কলোনি গড়ে উঠতে থাকে। এই ব্যাধি প্রতিরোধ বা নিরাময়ের কোনো ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয়নি। সমস্যা সমাধানের সরকারি ইচ্ছা পুরোপুরি ব্যর্থ হয়। জবরদখলকারীদের মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় মাথার উপর একটু আচ্ছাদন এবং যেন তেন প্রকারে তার মধ্যে মাথা গুঁজে থাকা। তারা ত্রাণ অথবা পুনর্বাসন কিছুই চায় না। সরকারের দেখেও না দেখার ভানেই তারা সন্তুষ্ট। জবরদখল কলোনি গড়ে তুলবার জন্য উদ্বাস্তুরা জমি দখল করতে মরিয়া হয়ে ওঠে। তাদের এই বেপরোয়া মনোভাবে স্থানীয় জনগণ এবং সরকার উভয়েই ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। একদিকে উচ্ছেদ আইন কার্যকর করার ক্ষেত্রে সরকারি ব্যর্থতা, ১৯৫৪-তে ১৪৯টি জবরদখল কলোনিকে স্বীকৃতিদানের জন্য মন্ত্রিকমিটির সুপারিশ, অন্যদিকে অতিদ্রুত রাজ্যের সর্বত্র জবরদখল কলোনি গড়ে ওঠা—এই অবস্থায় সরকার দিশেহারা হয়ে পড়ে। উদ্বাস্তু কলোনিগুলিকে সরকারি স্বীকৃতিদানের সঙ্গে জমি অধিগ্রহণের বিষয়টি জড়িত। 'উচ্ছেদ আইন' এবং ১৯৪৬-এর হারে জমির মূল্য নির্ধারণ করতে জটিলতা সৃষ্টি হওয়ায় জমি অধিগ্রহণের বিষয়টি দীর্ঘসূত্রিতার কবলে পড়ে। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের এক আদেশ বলে ১৯৪৬-এর মূল্যমান অনুযায়ী জমি অধিগ্রহণের সরকারি প্রচেষ্টা বাতিল হয়ে যায়। সুপ্রিম কোর্ট সমকালীন বাজারদর অনুযায়ী জমি অধিগ্রহণের আদেশ দেয়। ফলে জমি অধিগ্রহণের বিষয়টি সরকারের কাঁধে বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। এই পরিস্থিতিতে ১৯৪৬-এর মূল্যমান অনুযায়ী জমি অধিগ্রহণ করতে সংবিধানের ৩১নং ধারার সংশোধনের প্রয়োজনীযতা দেখা দেয়। ফলে কলোনিগুলোকে সরকারি স্বীকৃতিদানেব বিষয়টি আপাতত চাপা পড়ে যায়। উচ্ছেদ আইন অনুযায়ী জমি থেকে উদ্বাস্তুদের উচ্ছেদ করতে হলে সেই জমির কাছাকাছি বিকল্প বাসস্থানের ব্যবস্থা আবশ্যিক। কিন্তু কাছাকাছি ওই ধরণের জমি পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। এদিকে সরকারি শিবিরগুলোতেও উদ্বাস্তু উপছে পড়ছিল। সুতরাং পূর্ব-পাকিস্তানি উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সবকার যতদিন না কোনো সঠিক নীতি নির্ধারণ করছে এবং রাজ্যে কত উদ্বাস্তু রয়েছে তাদের সঠিক পরিসংখ্যান নিয়ে তাদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসনদানের জন্য কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ না করা হচ্ছে ততদিন রাজ্যসরকারের কিছুই করণীয় ছিল না। কিন্তু যখন কেন্দ্রীয় সরকার দণ্ডকারণ্য প্রকল্প চালু করল তখন সরকারি শিবিরে উদ্বাস্তু পরিবারের সংখ্যা ছিল ৩৫,০০০। উদ্বাস্তুদের কোনো সঠিক পরিসংখ্যান ছিল না এবং জবরদখল কলোনিগুলো কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টির বাইরেই থেকে যায়। পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক বিকাশের সহায়ক কোনো শিল্পনগরীও গড়ে ওঠেনি যেখানে উদ্বাস্তুদের কর্মসংস্থান হতে পারে। সরকার নিজেই স্বীকার করেছে যে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনদানের মতো জমি রাজ্যে নেই। কিন্তু তাদেরকে শিল্পশ্রমিকে পরিণত করবার জন্য সরকারি উদ্যোগে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প কিংবা আধা সরকারি কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানও গড়ে তোলা হয়নি। ১৯৬১-তে কেন্দ্রীয় সরকার এই সিদ্ধান্তে এল যে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু সমস্যা আর নেই, তার অবশেষ (residuary) মাত্র আছে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই মনোভাবের তীব্র বিরোধিতা করেও রাজ্য সরকার এমন ভাব দেখাতে থাকে যেন সমস্যাটির অবশেষই

আছে এবং এই সমস্যা সমাধানের জন্য যে যৎসামান্য সাহায্য কেন্দ্রীয় সরকার পাঠাত সেটাই রাজ্য সরকার সাগ্রহে গ্রহণ করতে থাকে।

উদ্বাস্তু কলোনির সংখ্যা কিন্তু বেড়েই চলল এবং সেই কলোনিগুলোর সরকারি স্বীকৃতিলাভের আন্দোলনও থেমে থাকল না। কলোনিগুলোর স্বীকৃতিদান একটি জটিল স্থাবর সম্পত্তি বিষয়ক সমস্যা। এই স্বীকৃতিদানের ক্ষেত্রে কতকগুলি প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। এর জন্য ১৯৮৭-র বিধানসভা নির্বাচন পর্যন্ত অপেক্ষা করার প্রয়োজন ছিল। কারণ প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী নির্বাচনের প্রাক্কালে ঘোষণা করেছিলেন যে ১৯৭১-এর আগে গড়ে ওঠা সমস্ত জবরদখল কলোনিকেই স্বীকৃতি দেওয়া হবে।

রাজ্য সরকারের উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তরের হিশেব অনুযায়ী ১৯৭০-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে অননুমোদিত জবরদখল কলোনির সংখ্যা ছিল ৬০৭টি। প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর ঘোষণা অনুযায়ী তখন পর্যন্ত এই ৬০৭টি কলোনিকেই স্বীকৃতিদান করা হল। কিন্তু সমস্যার কোনো সমাধান হল না। ১৯৭০-এর পরও জবরদখল কলোনির সংখ্যা বেড়েই চলল। বাংলাদেশ থেকে নির্যাতিত কৃষক ও উপজাতিরা চলে আসছিল এবং তারা রেললাইনের দুধারে রেলের জমি বা অন্যান্য অঞ্চলে সরকারি জমির উপর জবরদখল কলোনি গড়ে তুলছিল। অধিকাংশ কলোনিই কোনো না কোনো প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় গড়ে উঠছে। তাদের দলীয় রাজনীতির স্বার্থেই তারা এদের আশ্রয় দিচ্ছে। তাদেরকে স্থানীয় রাজনৈতিক মিছিল এবং বিক্ষোভ সমাবেশে যোগদান করতে হয় এবং কলকাতার বিশাল সমাবেশে তাদের যেতে হয়। তাদের নির্বিচার আনুগত্যের ফলে খুব শীঘ্রই তারা রেশন কার্ড এমনকী ভোটাধিকারও পেয়ে যায়। যে দলের পৃষ্ঠপোষকতায় তারা বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা ভোগ করছে সেই দলের তারা 'বন্দী ভোটার'। তারা রাজনৈতিক ভৃত্য ছাড়া কিছুই নয়। পৈতৃক জন্মভূমি বাংলাদেশে নির্যাতন ও বাধ্যতামূলক ধর্মান্তরিত হয়ে জীবনযাপনের চেয়ে তারা এ ধরণের মূল্যবোধহীন জীবনযাপনকেই শ্রেয় মনে করে।

মুসলিম রাষ্ট্র হিশেবে বাংলাদেশের উত্থান এবং সেখান থেকে সমস্ত বিধর্মী চলে এলেও জনাগম কোনোদিন বন্ধ হবে না। বাংলাদেশের মুসলমানরা আসতে থাকবে এবং এমন একদিন আসবে যখন তাদের চাপে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদেরই এ রাজ্যে টিকে থাকা দায় হয়ে পড়বে। বহু বাংলাদেশি মুসলমানের সাক্ষাৎকার আমি নিয়েছি। তারা বেশিদিন আগে বাংলাদেশ থেকে আসেনি; কিন্তু তারা বর্তমানে ভারতের নাগরিক। তারা হিন্দু উদ্বাস্তুদের মতো কুঁড়েঘর তৈরি করেছে; হিন্দুদের থেকে তাদের আলাদা করা কঠিন। এ সমস্ত বাংলাদেশি মুসলমান যুবক-যুবতীরা তাদের পরিচয় গোপন করে চলার চেষ্টা করে এবং তারা কখনোই স্বীকার করে না যে তারা বাংলাদেশ থেকে এসেছে। কিন্তু যে সকল কিশোর জুতো-পালিশ করে বা ভিক্ষে করে খায় তারা আবার এতটা সতর্ক নয়। তারা আমার কাছে স্বীকার করেছে যে তারা বাংলাদেশি। আমি এ ধরণের অনেক জুতো-পালিশওয়ালার কাছে জানতে চেয়েছি তারা এখানে স্থায়ীভাবে থাকতে ইচ্ছুক না বাংলাদেশেই ফিরে যেতে চায়। তাদের সকলে একই উত্তর দিয়েছে যে বাংলাদেশে ফিরে যাবার কোনো প্রশ্নই আসে না। কারণ সেখানে তারা কোনোমতেই প্রতিদিন ৫ টাকার বেশি আয় করতে পারে না; কিন্তু এখানে তাদের প্রতিদিনের আয় ৭ থেকে ১০ টাকার মধ্যে অর্থাৎ বাংলাদেশের প্রায় তিনগুণ আয় তারা এখানে করে (বাংলাদেশের টাকার মূল্যমান অনুযায়ী)। বাংলাদেশ পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশের অন্যতম। সেখানকার

অর্থনীতি বৈচিত্র্যহীন। মানবসম্পদকে কাজে লাগাতে না পারার ফলে বাংলাদেশের মানুষ ভারতে বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে চলে আসছে। কারণ নামমাত্র সীমান্ত পেরিয়ে পশ্চিমবঙ্গে আসাই সহজ। সুতরাং আজ আর বাংলাদেশ থেকে হিন্দুদের বিতাড়নের প্রশ্ন নেই। বাংলাদেশের হিন্দুদের আজ হোক কাল হোক সেদেশ ছেড়ে তাদের চলে আসতেই হবে। যে বিষয়টি বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ তা হল পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বাংলাদেশ থেকে আসা মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য। পশ্চিমবঙ্গে এমন কতকগুলি জেলা রয়েছে যেগুলোকে বাংলাদেশের জেলারই অচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে মনে হয়। বাংলাদেশ থেকে মুসলমানরা চলে আসায় এদেশে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলগুলির এক বিশাল সাম্প্রদায়িক শক্তিতে পরিণতি হবার সম্ভাবনা মারাত্মকভাবে দেখা দিয়েছে। মুসলমান সংখ্যাধিক্যের ফলে যে সমস্যার সৃষ্টি হতে চলেছে সেদিকে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতারা উদাসীন। কারণ, তারা মুসলমান ভোটের জন্য লালায়িত। ভবিষ্যতে তাদের এর খেসারত দিতে হবে। পূর্ববঙ্গ থেকে নামমাত্র সীমান্ত পেরিয়ে এদেশে মুসলমানদের চলে আসাটা নতুন নয়। ব্রিটিশ ভারতেও এ ঘটনা নিয়মিত ঘটত। ময়মনসিংহে আমার ছাত্রজীবনে আমি নিজেই দেখেছি মুসলমান ঔপনিবেশিকদের বিদায় অভ্যর্থনা জানানো হচ্ছে। তারা আসামের পার্বত্য উপজাতিদের বনাঞ্চল দখলের জন্য যাচ্ছিল। তখন থেকেই আসামে মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য এমন মাত্রায় পৌঁছতে থাকে যে আসামে ক্রমশ মুসলমান সংখ্যাধিক্য হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল।

বাংলাদেশ যদি তার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বজায় রেখে চলে তাহলে বর্তমান জনাগম সাম্প্রদায়িক শক্তিকে মদত জোগাবে এ ধরণের ভাবনার কোনো কারণ নেই। কিন্তু বাংলাদেশ মৌলবাদীদের আক্রমণ থেকে তার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা করতে পারবে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে। বরং বাংলাদেশে মৌলবাদীপ্রভাব বেড়ে যাবার সম্ভাবনাই প্রবলতর। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ তার বাঙালি ঐতিহ্য হারাবে এবং মুসলিম জগতের অংশবিশেষে পরিণত হবে। যদি তাই-ই হয় তবে বাংলাদেশি মুসলমানরা পশ্চিমবঙ্গে এসে এখানকার মুসলিম মৌলবাদের হাত শক্ত করবে এবং বাঙালি হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ব্যবধান গড়ে তুলবে।

বাংলাদেশ থেকে মুসলমানরা পশ্চিমবঙ্গে এলেও তেমন কিছু জটিলতা দেখা দিত না যদি বামফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ মানুষকে মার্ক্সবাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করে তুলতে পারত এবন গ্রামাঞ্চলেই একটি আত্মনির্ভরশীল মার্ক্সবাদী নেতৃত্ব গড়ে উঠত। আন্তর্জাতিক সীমান্ত থাকা সত্ত্বেও এপার বাংলা ওপার বাংলার মধ্যে যাতায়াত চলছেই। সেক্ষেত্রে হয়তো মার্ক্সবাদ বাংলাদেশেও ছড়িয়ে পড়তে পারত। মার্ক্সবাদী নেতৃত্ব যে গড়ে ওঠেনি তার প্রমাণ তিনটি পঞ্চায়েত নিবাচনী ফলাফল।এতে দেখা যায় যে পশ্চিমবঙ্গে লেফেব্‌ভর বর্ণিত 'গ্রামীণ বুর্জোয়া' শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু মার্ক্সবাদী আদর্শে উদ্বুদ্ধ কোনো নেতৃত্ব গড়ে ওঠেনি। অতএব গ্রামাঞ্চলে মৌলবাদের শক্তিবৃদ্ধি খুবই স্বাভাবিক।

অবশ্য এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে বামফ্রন্ট সরকার বাংলার গ্রামাঞ্চলে বিরাট পরিবর্তন ঘটিয়ে পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে গতির আবেগ এনে দিয়েছে। কিন্তু ক্ষমতার দায়িত্বভার, একটি দুঃস্থ জাতি, সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে ক্ষমতা প্রয়োগের সীমাবদ্ধতা এবং পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির উপর অ-বাঙালি মূলধনের প্রভাব বামফ্রন্ট সরকারকে এমনসব কর্মসূচি গ্রহণে বাধ্য করছে যা বামপন্থার আদর্শের

পরিপন্থী। পাশাপাশি শরিক দলগুলি নিয়ে দীর্ঘদিন একটানা ক্ষমতায় থাকা এবং শক্তিবৃদ্ধির জন্য বামপন্থী দলগুলির পারস্পরিক দ্বন্দ্ব বামপন্থাকে ঐক্যবদ্ধ না করে বিভক্ত করছে। পশ্চিমবঙ্গে একজন বাঙালি হিন্দুর বর্তমান পরিচয় হয় সে সিপিআই(এম), সিপিআই, আরএসপি, এসইউসি, ফরোয়ার্ড ব্লক, সোস্যালিস্ট পার্টি অথবা কংগ্রেস। সমাজে তার স্থান নির্ধারিত হবে তার দল বিধানসভা অথবা লোকসভায় কতটা ক্ষমতার অধিকারী তার উপর। এতে এক ধরণের জাতিভেদ প্রথার সৃষ্টি হচ্ছে; নেতা এবং কর্মীরা বামপন্থার আদর্শ বেমালুম ভুলে যাচ্ছে। ফলে নির্বাচনী কেন্দ্রে ক্ষমতা বজায় রাখতে গিয়ে বামফ্রন্টের শরিক দলগুলির মধ্যেই খুন, ঘরবাড়ি পোড়ানো, লুঠপাট প্রভৃতি ঘটনা ঘটছে। গোষ্ঠী রাজনীতির কাছে পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থ হয়ে উঠেছে গৌণ।

১৯৭৭-এ পশ্চিমবঙ্গে সিপিআই(এম)-এর নেতৃত্বে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক অবস্থা তখন বিধ্বস্ত : ২০০৬০০ রুগ্ণ শিল্প, অনাহার ক্লিস্ট শ্রমিকরা আত্মহত্যা করছে, অনাহারে মারা যাচ্ছে, ৪৫ লক্ষ শিক্ষিত বেকার যুবক হতাশায় মুহ্যমান। তারা সুস্থ সামাজিক কাঠামো ভেঙে চুরমার করে দিতে উদ্যত। পাশাপাশি অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি চালনে দক্ষ কারিগর শ্রেণীরও অভাব নেই কলকাতা শহরে। সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি তা হল পশ্চিমবঙ্গ সাম্প্রদায়িকতা, আঞ্চলিকতাবাদ, সন্ত্রাসবাদমুক্ত রাজ্য—শিল্প স্থাপনের আদর্শ স্থান। বামফ্রন্ট সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় শিল্পপতিদের পশ্চিমবঙ্গে শিল্প স্থাপনে এগিয়ে আসার সম্ভাবনা দেখা দেয়। বিভিন্ন অঞ্চলে অ-বাঙালিদের প্রাধান্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ অঞ্চলগুলো হল আসানসোল, রানীগঞ্জ, বার্নপুর, শিলিগুড়ি, খড়্গপুর, রিষড়া, টিটাগড়, জগদ্দল, কাঁকিনাড়া, কাঁচরাপাড়া প্রভৃতি। বাঙালিরা এসমস্ত অঞ্চলে নিজগৃহে পরবাসী।

কলকাতা থেকে বাঙালি উদ্বাসন বহুদিন আগে থেকেই শুরু হয়েছিল। পঞ্চাশের দশকে পূর্ববঙ্গ থেকে লক্ষ লক্ষ বাঙালি উদ্বাস্তু এসে কিছুদিনের জন্য কলকাতাকে বাঙালি সংখ্যাগরিষ্ঠ নগরীতে পরিণত করেছিল। কিন্তু ভিনরাজ্য থেকে অ-বাঙালিদের কলকাতায় আগমন, পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সহায়তায় সরকারের পক্ষ থেকে জোর করে উদ্বাস্তুদের ভিনরাজ্যে প্রেরণের ফলে কলকাতায় ক্রমশ বাঙালিরা সংখ্যালঘু হয়ে পড়ে।

আদমসুমারির হিশেব থেকেই বাঙালিদের সংখ্যা হ্রাস এবং অ-বাঙালিদের সংখ্যাবৃদ্ধির চিত্র পরিষ্কার ফুটে ওঠে। ১৯৫১-র আদমসুমারি অনুযায়ী কলকাতার মোট জনসংখ্যার ২৫ শতাংশ ছিল অ-বাঙালি। ১৯৮১-র হিশেবে দেখা যায় এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৬·৩৯ শতাংশ। অর্থাৎ তিন দশকে কলকাতায় অ-বাঙালিদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৪৭ শতাংশ।

কলকাতায় সমস্ত ভারী শিল্প যেখানে বিপুল পরিমাণে পুঁজি নিয়োগের প্রয়োজন, তা অ-বাঙালি শিল্পপতিদের দখলে। বাঙালি যুবকদের পক্ষে কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে স্বনিযুক্তি প্রকল্প গড়ে তোলাও সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। শহরে ক্ষুদ্র পেশায় নিযুক্ত শ্রেণী বাঙালি। খুচরা বিক্রেতাদের অধিকাংশই বাঙালি। অ-বাঙালিদের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে অধিকাংশ বিক্রেতাই বাঙালি। পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু আগমনের ফলে শিল্প কলকারখানায় বাঙালি শ্রমিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। বাঙালিরা যে দৈহিক পরিশ্রমবিমুখ, উদ্বাস্তুরা এ বদ্‌নাম ঘুচিয়েছে। অসংগঠিত ক্ষেত্রেও উদ্বাস্তু শ্রমিকদের সংখ্যা লক্ষণীয়। অ-বাঙালি অধ্যুষিত অঞ্চল ছাড়া অন্যান্য এলাকার রিকশাচালকেরা

অধিকাংশই বাঙালি উদ্বাস্তু। অনেকেই বাস, ট্যাক্সি, ট্রাক চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করছে। পশ্চিমবঙ্গে হকারের সংখ্যা ২ লক্ষের কম হবে না এবং তাদের ৮০ শতাংশই উদ্বাস্তু। তবে সরকারের সক্রিয় সহযোগিতায় বাঙালিরা কুটির শিল্পে উল্লেখযোগ্য উন্নতি করেছে। বাঙালিরা বিশেষত উদ্বাস্তুরা কর্মবিমুখতা দূর করে প্রতিযোগিতামূলক শিল্প বাণিজ্যের জগতে তারাও যে টিকে থাকার ক্ষমতা রাখে তারও অনেক সম্ভাবনা তাদের মধ্যে দেখা গেছে।

ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি মহল ১৯৭৭-এর নির্বাচনের পর বামফ্রন্টের বিজয়কে স্বাগত জানিয়েছিল। 'বেঙ্গল চেম্বার অব্ কমার্স'-এর প্রেসিডেন্ট জহর সেনগুপ্ত এবং 'ইন্ডিয়ান চেম্বার অব্ কমার্স'-এর প্রেসিডেন্ট জগমোহন জাটিয়া আশাপ্রকাশ করেছিলেন যে বামফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নমূলক কাজ দ্রুততার সাথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে।তাঁদের এই প্রত্যয় জন্মেছিল যে বামফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ উন্নয়নমূলক কাজে নিবেদিতপ্রাণ। তারা অবশ্যই অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে উন্নয়নমূলক প্রকল্প হাতে নেবেন। সেনগুপ্ত গ্রামোন্নয়নের প্রাথমিকতার উপর বিশেষ জোর দেন। তাঁর মতে এক শ্রেণীর গ্রামীণ মানুষের কায়েমী স্বার্থ ক্ষুন্ন করে তাদের কর দিতে বাধ্য করা উচিত। কংগ্রেস সরকারেরও এ ধরণের কর আরোপের ইচ্ছা ছিল; কিন্তু পার্টির সাংগঠনিক সমস্যার জন্য তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। সেনগুপ্তের বিশ্বাস ছিল যে গ্রামীণ মজুরদের সর্বনিম্ন মজুরি নির্ধারণ, ভূমি সংস্কার, উৎপাদনবৃদ্ধি প্রভৃতি প্রকল্পের সঠিক রূপায়ণের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক উন্নয়নে বামফ্রন্ট সরকার সর্বোতভাবে প্রচেষ্টা চালাবে। এ বিষয়ে সরকার, শ্রমিক সংগঠনগুলো এবং শিল্পপতিগোষ্ঠী যৌথভাবে শিল্পোন্নয়ন ও রাজ্যের আর্থিক সমৃদ্ধি সাধনে সক্রিয় হবে। জনমোহন জাটিয়াও একই আশা পোষণ করেছিল।[১] এই সবক্ষেত্রেই ১৯৭৭-এর থেকে বামফ্রন্ট সরকার আশাতীত সাফল্য অর্জন করেছে। এই সময়কালে বামফ্রন্ট সরকার ভূমি সংস্কারের বাস্তব রূপায়ণ ঘটিয়েছে। ভূমিহীনদের মধ্যে জমিবণ্টন করেছে, গ্রামীণ উৎপাদনের মাত্রার বৃদ্ধি ঘটিয়েছে এবং গ্রামীণ জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা বাড়িয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার (কংগ্রেস) প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করলে এই কর্মসূচিসমূহ অধিকতর সাফল্য লাভ করত এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

১৯৭৭ থেকে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসীন। এই সরকারের পেছনে রয়েছে শ্রমজীবী সাধারণ মানুষ; সর্বোপরি ৮০ লক্ষ উদ্বাস্তু। এরাই গড়ে তুলেছে বামফ্রন্টের নিশ্ছিদ্র ভোটব্যাঙ্ক। ক্ষমতাদখলের লড়াইয়ে তারাই বামফ্রন্টের মূল শক্তি। ১৯৭২-এর নির্বাচন (রিগিং) বাদে ১৯৫২ এবং তার পরবর্তী নির্বাচনগুলিতে সিপিআই (এম) ও তার সহযোগী দলের প্রতি উদ্বাস্তুদের আনুগত্য অটুট ছিল—একথা অনস্বীকার্য।

তবে নির্বাচনের ফলাফল থেকে সিপিআই (এম) এবং অন্যান্য বামদলগুলির প্রতি উদ্বাস্তুদের আনুগত্যের কোনো তথ্যভিত্তিক পরিসংখ্যান পাওয়া যাবে না। কারণ পশ্চিমবঙ্গে নির্দিষ্ট করে কোনো উদ্বাস্তু নির্বাচনকেন্দ্র নেই। তবে বুথভিত্তিক ভোটের পরিসংখ্যান থেকে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে অধিকাংশ উদ্বাস্তুই বামফ্রন্ট প্রার্থীদের ভোট দেয়। এমনকী ১৯৮৪-র লোকসভা নির্বাচনেও উদ্বাস্তুরা বামপন্থী প্রার্থীদেরই সমর্থন করেছে। বিশিষ্ট উদ্বাস্তু নেতা অনিল সিংহ উদ্বাস্তু অধ্যুষিত অঞ্চলের বুথভিত্তিক ভোটের হিশাব করে দেখিয়েছেন যে উদ্বাস্তুরা বামপন্থীদের প্রতি তাদের আনুগত্য অটুট রেখেছে। কারণ উদ্বাস্তুদের দুঃসহ জীবন থেকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে এনেছে এই

বামফ্রন্ট। ইউ সি আর সি নেতৃবৃন্দের পরিচালন দক্ষতায় কিভাবে উদ্বাস্তুরা বামপন্থীদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল তা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সামাজিক কাঠামোগত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সিপিআই অথবা সিপিআই (এম) কোনো দলই এই উদ্বাস্তু জনগোষ্ঠীকে ব্যবহার করেনি। তারা উদ্বাস্তুদের ব্যবহার করেছে ক্ষমতাদখলের হাতিয়াররূপে। ফলে উদ্বাস্তুদের মধ্যে বামপন্থী মতবাদের প্রসার সিপিআই (এম) এবং অন্যান্য বামপন্থী দলগুলিকে ভোটদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে গেছে। কিন্তু তারা উদ্বাস্তুদের বিশেষ করে নব-প্রজন্মের উদ্বাস্তুদের বামপন্থী (মার্ক্সবাদী) আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে পারেনি।

পঞ্চাশ বছর পরেও পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের গা থেকে উদ্বাস্তুর গন্ধ মুছে যায়নি। পশ্চিম-পাকিস্তানি উদ্বাস্তুদের আর উদ্বাস্তু বলে চেনা যায় না; তারা এখন এদেশের সম্ভ্রান্ত, সম্পন্ন মানুষ। তার কারণ পূর্ববঙ্গ থেকে ঘর-ছাড়া মানুষের প্রবাহ এখনো বন্ধ হয়নি। এখনো তারা আসছে এবং রেল-লাইনের দুধারে ও অন্যত্র ঝুপড়ি গড়ে তুলছে। কিছুদিনের মধ্যেই এই ঝুপড়িগুলো কলোনির রূপ নিচ্ছে। 'এভাবে ব্যাঙের ছাতার মতো পূর্ববঙ্গের ঘর-ছাড়া মানুষের কলোনি গড়ে উঠছে। এরা বাংলাদেশি নাগরিক। কিন্তু তারা আর বাংলাদেশে ফিরে যাবে না। এদেশে এদের অস্তিত্বের কোনো বৈধ স্বীকৃতি নেই। এরা প্রায় 'রাষ্ট্রহীন নাগরিকে'র পর্যায় পড়ে। যতদিন বাংলাদেশে অ-মুসলমান আছে, ততদিন এই ঘরছাড়া মানুষের মিছিল বন্ধ হবে না; ততদিন এই কলোনি গজিয়ে উঠতেই থাকবে। ঠিক কত মানুষ এভাবে এই কলোনিগুলিতে বাস করছে তার সঠিক পরিসংখ্যান নেই। এই সব অননুমোদিত কলোনি সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্বীকৃতি দিয়েছে। এদের সংখ্যা ৯৯৮। কিন্তু ইতিমধ্যে আরো নতুন কলোনি গড়ে উঠছে যারা স্বীকৃতি পায়নি। যারা স্বীকৃতি পায়নি তাদের স্বীকৃতি দিলেও আরো কলোনি গজিয়ে উঠবে। তখন তাদের স্বীকৃতির প্রশ্ন উঠবে।

পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু সমস্যা প্রধানত জবরদখল কলোনির সমস্যা এবং বিশেষভাবে অপেক্ষাকৃত নতুন গড়ে ওঠা কলোনির সমস্যা। এই সমস্যার সমাধান অত্যন্ত দুরূহ। কেননা ১৯৪৬ থেকে যে উদ্বাস্তুপ্রবাহ এদেশে আসতে শুরু করেছে তা আজও অব্যাহত, কালও তা থাকবে। সমস্যাটির সমাধান বাংলাদেশ ও ভারত সরকারের মধ্যে বোঝাপড়ার উপর নির্ভরশীল এবং বোঝাপড়া যে সহজ নয় তা চাকমা উদ্বাস্তুদের কথা মনে রাখলে বোঝা যাবে। চাকমারা যাতে বাংলাদেশে ফিরে যেতে পারে তার জন্য ভারত সরকার ও বাংলাদেশের সরকারের মধ্যে কথাবার্তা চলছে, কিন্তু সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। ভারত সরকার অগ্রণী হওয়াতে ত্রিপুরার চাকমাদের সমস্যা ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের সমস্যায় পরিণত হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশ থেকে যে অ-মুসলমান বাঙালিরা পশ্চিমবঙ্গে চলে আসছে, এসে কলোনি গড়ে তুলছে, তাদের নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কিংবা ভারত সরকারের কোনো শিরঃপীড়া নেই। তারা পশ্চিমবঙ্গের জনস্রোতের মধ্যে মিশে যাচ্ছে, ঝুপড়ি তৈরি করছে, খুদকুঁড়ো যা কুড়িয়ে পাচ্ছে তাই খাচ্ছে, কীটের জীবনযাপন করছে। বাইরে থেকে এদের চেনা যাচ্ছে না; এদের আকৃতি-প্রকৃতি, চালচলন, কথাবার্তা সবই এদেশীয় মানুষের মতো। এরা যে বাংলাদেশি তা এরা বিশেষভাবে প্রকাশও করতে চায় না। এদের অস্তিত্ব প্রায় অনুচ্চারিত।

পশ্চিম-পাকিস্তান থেকে গোটা অ-মুসলমান জনসমষ্টি ভারতে চলে আসায় একটি ব্যাপক পরিকল্পনার দ্বারা পশ্চিম-পাকিস্তানি উদ্বাস্তুদের সমস্যার দ্রুত সমাধান হয়েছে

এবং অল্পকালের মধ্যেই উদ্বাস্তু ও উদ্বাস্তু নয় এমন মানুষের সীমারেখা মুছে গেছে। কিন্তু পূর্ব-পাকিস্তান থেকে হিন্দুদের একবারে উপড়ে ফেলা হয়নি। এই প্রক্রিয়া আজও চলছে। অতএব উদ্বাস্তু ও উদ্বাস্তু নয় এমন মানুষের মধ্যে ব্যবধান থেকেই যাচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধানের কোনো সম্ভাবনা নেই যতদিন বাংলাদেশ থেকে উদ্বাস্তুরা আসতে থাকবে। অর্থাৎ পুলিন মণ্ডলের খালি গায়েই সারাজীবন কাটাতে হবে। পুলিন মণ্ডলের বাস উত্তরপ্রদেশের নৈনিতালের উদ্বাস্তুদের গ্রাম বাসন্তীতে। তিনি এই প্রতিজ্ঞা করেছেন যে যতদিন উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান না হচ্ছে ততদিন তিনি জামা গায়ে দেবেন না। তিনি সারা ভারতের উদ্বাস্তু কলোনিতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ঘুরেফিরে পশ্চিমবঙ্গে আসছেন। কিন্তু এতদিনে তিনি হয়তো জেনে গেছেন যে তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর চকচকে উজ্জ্বল শরীর রোদে-বৃষ্টিতে অনাবৃতই থেকে যাবে। যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন তাঁকে ঘুরে বেড়াতে হবে, জানতে হবে উদ্বাস্তুদের পরনে কাপড় আছে কিনা, তারা দুবেলা দু মুঠো খেতে পায় কিনা, তাদের ছেলেমেয়েরা স্কুলে যায় কিনা। তাঁকে ক্রমাগতই পথ চলতে হবে যতদিন না উদ্বাস্তুদের সঙ্গে এদেশের মানুষের ব্যবধান মুছে যাচ্ছে।

# সংযোজন

সরকার কর্তৃক স্বীকৃতির সময় অনুযায়ী জবরদখল কলোনিগুলিকে চার ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে : (১) মন্ত্রী কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৫৪-তে ১৪৯টি (১৪৯ গ্রুপ); (২) ১৯৭৫-এ ওয়ার্কিং গ্রুপ কর্তৃক অনুমোদিত ১৭৫টি কলোনি (১৭৫ গ্রুপ); (৩) প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী কর্তৃক ১৯৮৭-তে ৬০৭টি (৬০৭ গ্রুপ) এবং (৪) পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক ১৯৯৫-এর ডিসেম্বরে অনুমোদিত ৯৯৮টি (৯৯৮ গ্রুপ)। এই সব স্বীকৃত জবরদখল কলোনি ছাড়াও অননুমোদিত জবরদখল কলোনি আছে এবং তাদের সংখ্যা আরো বাড়বে। তাদের কোনো পরিসংখ্যান নেই। এই জবরদখল কলোনি ছাড়াও সরকারি পুনর্বাস কলোনি আছে ৬৭৯টি। তাছাড়া ব্যক্তিগত উদ্যোগে গঠিত প্রাইভেট কলোনি আছে ২৯৯টি। ৭০,০০০ পরিবার এই ধরণের কলোনিতে বসবাস করে।এদের মধ্যে অনেক পরিবার গৃহনির্মাণ বাবদ সরকারের কাছ থেকে কিছু আর্থিক সাহায্য পেয়েছিল। সবসুদ্ধ পশ্চিমবঙ্গে ৭৫০টি প্রাইভেট কলোনি আছে। কিন্তু ৫০ বা তার চেয়ে বেশি পরিবারসম্পন্ন কলোনিগুলিকেই এখানে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। এখানে জবরদখল কলোনি, সরকারি পুনর্বাসম কলোনি ও প্রাইভেট কলোনির তালিকা সংযোজিত হল।*

১ দ্য স্টেটস্‌ম্যান, ১৮ জুন, ১৯৭৭

* পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন উদ্বাস্তু কলোনির তালিকা অনিল সিংহ প্রণীত 'পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু উপনিবেশ' থেকে সংগৃহীত হয়েছে।

# জবরদখল কলোনির তালিকা
## ১৪৯ গ্রুপ

**জেলা—কলিকাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা-যাদবপুর-টালিগঞ্জ-ঢাকুরিয়া-কসবা**
**মোট কলোনির সংখ্যা-৫৮**

১· আদর্শ নগর
২· আদর্শ পল্লী
৩· আমাদের বাস্তুহারা পঞ্চায়েত
৪· অরবিন্দ নগর
৫· অশোক নগর
৬· আশুতোষ ইউ বি
৭· আশুতোষ পল্লী ইউ বি
৮· আজাদগড়
৯· বাঘা যতীন (পার্ট ইউ বি)
১০· বিধান কলোনি ইউ বি (সন্তোষপুর)
১১· বিধান পল্লী (কামডহরী)
১২· বাপুজী নগর সোসাইটি
১৩· বাপুজী কলোনি (ঢাকুরিয়া)
১৪· বাস্তুহারা সমিতি (আনন্দপল্লী)
১৫· বিজয়গড়
১৬· বিধানপল্লী সমিতি (ইব্রাহিমপুর)
১৭· বিজয়নগর (কসবা)
১৮· বিক্রমগড়
১৯· বঙ্গশ্রী
২০· চিত্তরঞ্জন (ইউ বি)
২১· দাশনগর
২২· গান্ধী
২৩· যাদবগড়
২৪· কাটজুনগর
২৫· ক্ষুদিরাম নগর (কসবা)
২৬· লক্ষ্মীনারায়ণ
২৭· মিত্রাবাস
২৮· নবনগর
২৯· নয়া বরিশাল
৩০· নেহরু
৩১· নেলিনগর (ইউ বি)
৩২· নেতাজীনগর
৩৩· নিঃস্ব
৩৪· পল্লীশ্রী
৩৫· প্রতাপগড় ইউ বি
৩৬· পোদ্দারনগর
৩৭· রাজেন্দ্রপ্রসাদ
৩৮· রামকৃষ্ণ উপনিবেশ (পার্ট ইউ বি)
৩৯· রামগড়
৪০· রিজেন্ট
৪১· শহীদনগর (পার্ট ইউ বি)
৪২· শহীদ সুনীলনগর (তিলজলা)
৪৩· সমাজগড়
৪৪· সংহতি
৪৫· শান্তিপল্লী (আরাকপুর)
৪৬· শান্তিপল্লী (যাদবপুর)
৪৭· শান্তিগড়
৪৮· শান্তিনগর
৪৯· শক্তিপল্লী মঙ্গল সমিতি
৫০· শরৎ বোস যৌথ (ইউ বি)
৫১· শ্যামা
৫২· শ্রীকলোনি
৫৩· সূর্যনগর
৫৪· সুচেতানগর
৫৫· তিলকনগর
৫৬· বিদ্যাসাগর (পার্ট ইউ বি)
৫৭· বিবেকানন্দনগর
৫৮· বিবেকনগর

**বেহালা**

১· অরবিন্দ পল্লী
২· বাটওয়ারা বিধ্বস্ত
৩· সমরগড়
৪· ঠাকুরপুকুর পল্লীমঙ্গল সমিতি

## জেলা—উঃ ২৪ পরগনা

**দমদম**

১· সুরেন বাগ
২· হরকালী
৩· শীল কলোনি
৪· রায় মল্লিক
৫· মল্লিক
৬· আনোয়ার
৭· বহিরাগত হিন্দু
৮· শেঠ কলোনি
৯· মনোহর
১০· মহাজাতি নগর
১১· হরেন্দ্র
১২· কুঞ্জমল্লিক বাগ
১৩· শ্যামাপ্রসাদ
১৪· লালগড়
১৫· মাইকেল মধুসূদন
১৬· লক্ষ্মীনগর
১৭· প্রফুল্লনগর
১৮· রাজা দেবেন্দ্র
১৯· দুর্গাবতী
২০· প্যাটেলনগর
২১· শরৎচন্দ্র
২২· ক্ষুদিরাম
২৩· বাপুজী
২৪· দাগা
২৫· ভগবতী
২৬· পূর্ববঙ্গ
২৭· মতিলাল
২৮· লাহা
২৯· হিন্দ্
৩০· অমরপল্লী
৩১· নেহরু
৩২· কমলাপুর
৩৩· ঘোষ্ঠীবিহারী
৩৪· পল্লীশ্রী
৩৫· ভারতী
৩৬· ব্রহ্মচারী
৩৭· হরিহরনগর
৩৮· বান্ধবনগর
৩৯· প্রতাপাদিত্যনগর

**নৈহাটী**

১· বিজয়নগর
২· কৈশব
৩· প্রতাপনগর

**খড়দহ**

১· মহাজাতি নগর (আগরপাড়া)
২· দেশবন্ধুনগর ১নং
৩· দেশবন্ধুনগর ২নং
৪· দেশবন্ধুনগর ৩নং
৫· দেশবন্ধুনগর ৪নং
৬· দাস কলোনি
৭· স্বস্তিনগর (পানিহাটি)
৮· শেঠ
৯· শহীদ কলোনি
১০· দেশবন্ধু কলোনি (খড়দহ)
১১· শরৎ বোস
১২· টাউন কলোনি
১৩· বিবেকানন্দ ২নং
১৪· উষুমপুর উদ্বাস্তু পল্লী
১৫· সূর্য সেন নগর

**টিটাগড়**

১· সুভাষপল্লী

**বীজপুর**

১· দেশবন্ধু পল্লী
২· শহীদনগর
৩· নবনগর
৪· রামপ্রসাদ

**জগদ্দল**
১· হিন্দুস্থান
২· রামনগর
৩· গান্ধীনগর
৪· ক্ষুদিরাম নগর

**বেলঘরিয়া**
১· প্রফুল্লনগর
২· শহীদ যতীন দাস নগর
৩· দেশপ্রিয় নগর

**বরাহনগর**
১· উদ্বাস্তু বান্ধব সমিতি
২· সুভাষপল্লী
৩· মল্লিক কলোনি (বি টি রোড)
৪· ফরওয়ার্ড
৫· নেতাজী
৬· দেশপ্রিয় নগর (বি টি রোড)

**নোয়াপাড়া**
১· চুণারীপাড়া
২· জহর
৩· বাপুজী বাস্তুহারা
৪· সেবাগ্রাম

**হাবড়া**
১· আশুতোষ
২· সুভাষপল্লী

**হুগলি**
১· মাহেশ উদ্বাস্তু শিবির
২· নেহরু কলোনি
৩· শ্রীরামপুর বাস্তুহারা উপনিবেশ

## ১৭৫ গ্রুপ

**জেলা—কলিকাতা**
**মোট কলোনির সংখ্যা-১০**

১· শহীদ কলোনি
২· নিউ বিক্রমগড় কলোনি
৩· যোগেন্দ্র কলোনি
৪· শহীদ কলোনি
৫· যোগেন্দ্রনগর
৬· অরবিন্দনগর
৭· সুকান্তনগর
৮· রামকৃষ্ণপল্লী
৯· দুর্গা (পুর) কলোনি
১০· সাহাপুর কলোনি

**জেলা—উঃ ২৪ পরগনা**

**মোট কলোনির সংখ্যা-৮৬**

১· নেহরু কলোনি
২· স্বাধীনপল্লী
৩· নিউ মল্লিক কলোনি
৪· সারদাপল্লী
৫· এ্যাঙ্গেলস্ নগর
৬· বিজয়কৃষ্ণপল্লী
৭· অজয়নগর
৮· তরুণনগর
৯· বাস্তুহারা গণমঙ্গল সমিতি
১০· নেহরু কলোনি
১১· ঢাকা উদ্বাস্তু (শিবির)
১২· দেশবন্ধুনগর কলোনি
১৩· সিদ্ধেশ্বরী কলোনি
১৪· ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ইউথ কংগ্রেস
১৫· বেদিয়াপাড়া ত্রিনাথ কলোনি
১৬· নিউ গোষ্ঠবিহারী কলোনি
১৭· নতুন পল্লী বাস্তুহারা সমিতি
১৮· শাস্ত্রীজী কলোনি
১৯· শ্যামনগর উদ্বাস্তু কলোনি
২০· নিউ ন-পাড়া কলোনি
২১· বিধান পল্লী রিফিউজি কলোনি
২২· কালীমাতা রিফিউজি কলোনি
২৩· রামগড় কলোনি
২৪· বিধান কলোনি
২৫· সূর্য্য সেন কলোনি
২৬· সুভাষ পল্লী
২৭· নেতাজী পল্লী

২৮· রামকৃষ্ণপল্লী
২৯· সাথী পাড়া জগন্নাথ কলোনি
৩০· নিরঞ্জন সেন পল্লী
৩১· আদর্শ পল্লী
৩২· নব পল্লী
৩৩· পলতা আমবাগান কলোনি
৩৪· মতিনগর কলোনি
৩৫· নিউ কলোনি
৩৬· সরকার বাগান স্কোয়াটার্স কলোনি
৩৭· নিরঞ্জননগর কলোনি
৩৮· ব্যারাকপুর নগর কলোনি
৩৯· ইন্দিরা নগর
৪০· মধ্যবীরা কলোনি
৪১· বিজয় পল্লী
৪২· সুকান্ত পল্লী
৪৩· নিরঞ্জন পাড়া (দোগাছিয়া)
৪৪· নবীন পল্লী
৪৫· সভাষনগর ১নং
৪৬· সুভাষনগর ২নং
৪৭· রাজা রাধাকান্ত দেববাহাদুর
৪৮· অগ্নিশিখা কলোনি
৪৯· পাটনা কলোনি
৫০· বিক্রমজিৎ কলোনি
৫১· নিরঞ্জন পল্লী
৫২· মাতৃ পল্লী
৫৩· ক্ষুদিরাম পল্লী
৫৪· রামকৃষ্ণ পল্লী (২)
৫৫· উত্তর পাটনা উদ্বাস্তু পল্লী
৫৬· বানাপুকুর নগর
৫৭· উযুমপুর শিবির
৫৮· নেতাজী পল্লী
৫৯· উদ্বাস্তু বান্ধব সমিতি
৬০· বহিরাগত ভারতীয় বাস্তুহারা সমিতি
৬১· বিশ্বনাথ কলোনি
৬২· লক্ষ্মীনগর কলোনি
৬৩· ঝিল কলোনি
৬৪· জ্যোতিনগর (হৃদয়পুর)
৬৫· সুভাষনগর কলোনি
৬৬· শহীদবন্ধু নগর কলোনি
৬৭· নবপল্লী সমিতি (হাবড়া)
৬৮· মহাপ্রভু কলোনি (,, )
৬৯· শ্রীরামপ্রসাদ কলোনি (গুমা)
৭০· নেতাজীনগর কলোনি (১)
৭১· হাসনাবাদ রেলওয়ে গেট
৭২· কাদিহাটি নেতাজীনগর কলোনি
৭৩· নিরঞ্জন পল্লী—(১)
৭৪· আজাদহিন্দ গড়
৭৫· শরৎপল্লী
৭৬· নোয়াপাড়া শাল বাগান
৭৭· নেহরু বাগ
৭৮· বনবিহারী কলোনি
৭৯· সুভাষগড় কলোনি
৮০· মহাপ্রভু কলোনি
৮১· বারাসত স্টেশন পাড়া উদ্বাস্তু কলোনি
৮২· বিধান কলোনি
৮৩· লেনিন নগর উদ্বাস্তু কলোনি
৮৪· মহাত্মা শিশির পল্লী
৮৫· তরুণ পল্লী কল্যাণ সমিতি
৮৬· নবজীবন পল্লী

**জেলা—দঃ ২৪ পরগনা**
**মোট কলোনির সংখ্যা-১৫**

১· কৈবল্য নগর
২· শহীদ প্রমানন্দ নগর
৩· ক্ষুদিরাম বোস কলোনি
৪· বিবেকানন্দ কলোনি
৫· এস এস ধাওয়ান কলোনি
৬· সুভাষপার্ক
৭· নেতাজীনগর পল্লী পঞ্চায়েত
৮· শ্যামাপ্রসাদ পল্লী
৯· মধুসূদন পল্লী
১০· জাজবাগান জনকল্যাণ সমিতি
১১· রবীন্দ্র পল্লী
১২· সতীন সেন নগর
১৩· জ্যোতিনগর কলোনি
১৪· প্রফুল্ল সেন কলোনি
১৫· হরিদেবপুর জনকল্যাণ সমিতি

**জেলা—নদীয়া**
**মোট কলোনির সংখ্যা-১০**

১· বিক্রমপুর কলোনি

২· চাঁদমারী কলোনি
৩· গোঁসাই কলোনি
৪· মুরাতিপুর উদ্বাস্তু কলোনি
৫· বিক্রমপুর কলোনি
৬· ইন্দিরা পল্লী
৭· নেতাজী কলোনি
৮· মুরাতিপুর উদ্বাস্তু কলোনি (২)
৯· কীর্তিনগর
১০· ইন্দিরা পল্লী স্মৃতিপল্লী

**জেলা—মুর্শিদাবাদ**

১· মহাত্মা গান্ধী কলোনি

**জেলা—হাওড়া**
**মোট কলোনির সংখ্যা-৩১**

১· সরোজিনী নাইডু
২· কুমার বিষ্ণুপ্রসাদ রায় উদ্বাস্তু কলোনি
৩· নরসিংহ কলোনি
৪· শ্রীপল্লী কলোনি ৪নং
৫· ঋষি অরবিন্দ পল্লী
৬· শ্যামাপ্রাদ পল্লী
৭· চকপাড়া (৫)
৮· বিধানপল্লী (১)
৯· মহাদেব কলোনি (৯)
১০· তারকেশ্বর কলোনি (৩)
১১· শিবশক্তি কলোনি
১২· শক্তিনগর কলোনি
১৩· রামকৃষ্ণ সারদা পল্লী
১৪· চকপাড়া কলোনি (১)
১৫· প্রফুল্লচন্দ্র সেন কলোনি
১৬· চকপাড়া কলোনি (৮)
১৭· সুভাষ পল্লী
১৮· ললিতমোহন কলোনি
১৯· সুভাষ কলোনি
২০· নারায়ণ পল্লী
২১· বিধান পল্লী
২২· পদ্মজা নাইডু কলোনি
২৩· হরিশ হোড় কলোনি
২৪· আরামবাগ গান্ধী প্রফুল্ল সেন কলোনি
২৫· কুঞ্জপাড়া কলোনি
২৬· চকপাড়া কলোনি (৭)
২৭· বাস্তুহারা কলোনি
২৮· বিষ্ণুপ্রসাদ কলোনি
২৯· ডুইলা কেন্দ্র বাগান
৩০· বিবেকানন্দ কলোনি
৩১· বেলগাছিয়া রিফিউজি কলোনি

**জেলা—হুগলি**
**মোট কলোনির সংখ্যা-৯**

১· ভদ্রকালী কলোনি
২· রবীন্দ্রনগর কলোনি—৩
৩· কালীতলা কলোনি
৪· বিবেকানন্দ কলোনি
৫· নিরঞ্জন নগর
৬· বি পি আর কলোনি
৭· বীর ক্ষুদিরাম কলোনি
৮· শিব সোহাগিনী কলোনি
৯· নেতাজীনগর কলোনি

**জেলা—বর্ধমান**
**মোট কলোনির সংখ্যা-৫**

১· শ্রমিক নগর কলোনি
২· বিধান পল্লী
৩· সুকুমার নগর
৪· নেতাজী কলোনি
৫· ইন্দিরানগর কলোনি

**জেলা—বীরভূম**
**মোট কলোনির সংখ্যা-৭**

১· সাহেবডাঙ্গা কলোনি
২· আনন্দনগর
৩· শান্তিনগর
৪· মনসাতলা
৫· লাসডাঙ্গা কলোনি
৬· পলাশডাঙ্গা কলোনি (বাবুপুর)
৭· নবপল্লী কলোনি

# ৬০৭ গ্রুপ

# জবরদখল কলোনি

**কলিকাতা জেলা**
**মোট কলোনির সংখ্যা-১৩**

১· রেলওয়ে কলোনি
২· ক্ষুদিরাম কলোনি
৩· সত্যেন বোস নগর কলোনি
৪· পূর্ববঙ্গ বাস্তুহারা রিলিফ কলোনি
৫· এস এস ভি কলোনি
৬· মাঝেরহাট কলোনি
৭· পোড়াবস্তি কলোনি
৮· অরবিন্দ কলোনি
৯· বিপ্লবী ক্ষুদিরাম পল্লী
১০· সরকার বাগান বাস্তুহারা কলোনি
১১· চাঁদপুর কলোনি (শ্রীদুর্গা কলোনি ১)
১২· গভঃ কলোনি (বস্তি)
১৩· শহীদনগর কলোনি

**উঃ ২৪ পরগনা জেলা**
**মোট কলোনির সংখ্যা-১১০**

১· ইন্দিরানগর কলোনি
২· লেনিন গড় কলোনি
৩· নবকুমার গড়
৪· চৈতন্যনগর কলোনি
৫· আনন্দ নগর
৬· আজাদ হিন্দ নগর কলোনি
৭· ডোমপুকুর কলোনি
৮· মহাশক্তি নগর কলোনি
৯· উখুমপুর পল্লী (৪)
১০· সত্যপ্রিয় নগর
১১· রবীন্দ্রনগর কলোনি
১২· মাতঙ্গিনী হাজরা পল্লী
১৩· শতদল পল্লী
১৪· বিবেকনগর কলোনি
১৫· সতীন সেন পল্লী
১৬· শহীদ মহল (২)
১৭· দুলালনগর কলোনি
১৮· দীপকনগর কলোনি (২)
১৯· দীপকনগর কলোনি (৩)
২০· নিত্যানন্দ পল্লী
২১· বিবেকানন্দ পল্লী
২২· হো চি মিন নগর
২৩· নবপল্লী
২৪· নতুন পল্লী (বিজয়গড় কলোনি)
২৫· নেতাজীনগর কলোনি (১)
২৬· নিরঞ্জন পল্লী (২)
২৭· অম্বিকা পল্লী
২৮· রথতলা কলোনি
২৯· কার্তিক মল্লিক কলোনি
৩০· বিধান পল্লী
৩১· ক্রিশ্চিয়ান কলোনি
৩২· কাঁদিহাঁটি নেতাজী কলোনি
৩৩· কালীধাম কলোনি
৩৪· হরেকৃষ্ণ কলোনি
৩৫· নারায়ণ পল্লী (সর্বহারা)
৩৬· হরেকৃষ্ণ পল্লী (সুভাষপল্লী ২)
৩৭· কালিমাতা কলোনি (২)
৩৮· দেশপ্রিয় পল্লী
৩৯· বিধান কলোনি
৪০· এগারোর পল্লী
৪১· নিরঞ্জন সেন নগর
৪২· সেবাগ্রাম সাপ্লিমেন্টারি কলোনি
৪৩· শান্তিনগর উদ্বাস্তু কলোনি
৪৪· নিউ শ্রীপল্লী
৪৫· লেনিনগড়
৪৬· নিরঞ্জননগর ব্লক এ
৪৭· নিরঞ্জননগর
৪৮· ঈশ্বরদয়াল কল্যাণ পল্লী
৪৯· সুকান্ত পল্লী
৫০· আম্রপল্লী কলোনি
৫১· আমবাগান কলোনি
৫২· দীপকনগর কলোনি (১)
৫৩· ভগ্নী নিবেদিতা
৫৪· কালীনগর কোয়ার্টার্স কলোনি

৫৫· মাতঙ্গিনী স্কোয়াটার্স কলোনি
৫৬· বিবেকানন্দ কলোনি
৫৭· শাস্ত্রী পল্লী
৫৮· তরুণ পল্লী
৫৯· সর্বহারা পল্লী (১)
৬০· রামকৃষ্ণ কলোনি
৬১· শ্রীদুর্গা কলোনি
৬২· লক্ষ্মীনারায়ণ কলোনি
৬৩· বিপ্লবী সূর্য সেন কলোনি
৬৪· নিরঞ্জননগর (ব্লক—এ)
৬৫· নিরঞ্জননগর (ব্লক—বি)
৬৬· পানিহাটি জয়প্রকাশ কলোনি
৬৭· জয়প্রকাশ নারায়ণ কলোনি
৬৮· প্রজাতন্ত্র পল্লী
৬৯· নিউ আদর্শনগর কলোনি
৭০· নিউ জয়শ্রী পল্লী
৭১· উপেন্দ্র পল্লী
৭২· উত্তর বাসুদেবপুর উদ্বাস্তু কলোনি
৭৩· দক্ষিণ বন্দীপুর কলোনি
৭৪· অরুণোদয় পল্লী
৭৫· সুকান্তনগর
৭৬· অনন্তপুর উদ্বাস্তু কলোনি
৭৭· সুভাষনগর কলোনি (পীরগাছা)
৭৮· স্বামীজি নগর কলোনি
৭৯· হৃদয়পুর রেলওয়ে সাইড কলোনি
৮০· নিরঞ্জননগর (১, ২, ৩)
৮১· মতিনগর কলোনি
৮২· শ্যামাপ্রসাদ পল্লী
৮৩· আজাদ হিন্দ পল্লী
৮৪· সুলাঙ্গুরী কলোনি
৮৫· বাগজোলা নিউ ক্যাম্প
৮৬· নিরঞ্জন পল্লী (১)
৮৭· নেতাজী নগর (নিরঞ্জন পল্লী ২)
৮৮· নিউ নরেন্দ্রনগর স্কোয়াটার্স কলোনি
৮৯· নেতাজী পল্লী
৯০· মদনমোহন কলোনি
৯১· ১২নং রেল গেট কলোনি
৯২· রেলওয়ে সাইড কলোনি
৯৩· নতুন গ্রাম কলোনি
৯৪· কলেজকর্ণার স্কোয়াটার্স কলোনি
৯৫· কুমার পল্লী
৯৬· কররা কদমগাছি স্কোয়াটার্স কলোনি
৯৭· সিদ্ধার্থনগর স্কোয়াটার্স কলোনি
৯৮· চিত্তরঞ্জন উদ্বাস্তু
৯৯· নিত্যানন্দ পল্লী
১০০· ইউনিটি কলোনি (১)
১০১· ইউনিটি কলোনি (২)
১০২· সূর্য সেন কলোনি
১০৩· পণ্ডিতজি কলোনি
১০৪· কমলাপুর কলোনি
১০৫· তালতলা কলোনি
১০৬· বিবেক নগর
১০৭· সাদিক নগর
১০৮· মণিমারী কলোনি
১০৯· আরবিলিন কলোনি
১১০· নেতাজী পল্লী

**দঃ ২৪ পরগনা জেলা**
**মোট কলোনির সংখ্যা-৩৭**

১· জীবন মোহিনী ঘোষ পার্ক
২· কল্যাণ নগর কলোনি
৩· রামমোহন কলোনি
৪· শ্রীশ্রীমা সারদা পল্লী
৫· রাজা রামমোহন পল্লী
৬· জয়হিন্দ পল্লী
৭· প্রান্ত পল্লী
৮· সুভাষ পল্লী
৯· নিরঞ্জন সেন পল্লী
১০· রঞ্জন পল্লী
১১· শরৎ পল্লী
১২· দীনেশ পল্লী
১৩· কংগ্রেস পল্লী (১, ২)
১৪· বাদল পল্লী
১৫· হিরেন সরকার ফার্ম রিফিউজি কলোনি
১৬· রামকৃষ্ণনগর পল্লী
১৭· নজরুল কলোনি
১৮· মানিকপুর সুভাষ কলোনি
১৯· পূর্ব ফুলবাগান কলোনি
২০· উত্তর ফুলবাগান কলোনি
২১· বীরনগর কলোনি
২২· বাঘা যতীন, ই ব্লক পূর্ব

২৩· বিদ্যাসাগর কলোনি (২)
২৪· কৃষ্ণকলি কলোনি
২৫· হেড়োভাঙা স্কীম (স্কীম) (২)
২৬· নিউ রবীন্দ্রনগর
২৭· বাঘা যতীন কলোনি (নিউ)
২৮· নবপল্লী সূর্য সেন নগর
২৯· বিনয়পল্লী উন্নয়ন সমিতি
৩০· এইচ, এল সরকার রোড গ্লাশ ফ্যাক্টরি কলোনি
৩১ দীনেশ নগর
৩২· জনতা পল্লী
৩৩· আদর্শনগর কলোনি
৩৪· বিনয়, বাদল, দীনেশ পল্লী
৩৫· বঙ্কিম পল্লী
৩৬· নিউ কলোনি
৩৭· কালীমাতা কলোনি

**নদীয়া জেলা**
**মোট কলোনির সংখ্যা-৬৫**

১· বঙ্কিমনগর কলোনি
২· রামকৃষ্ণ নগর—(কমুদনগর)
৩· নবীন পল্লী (নতুন পল্লী)
৪· মুক্তিনগর—(সুভাষপল্লী)
৫· রাজা রামমোহন পল্লী
৬· সুভাষ পল্লী
৭· বীরনগর চক্রবর্তীপাড়া কলোনি
৮· হরিতলা স্কোয়াটার্স কলোনি
৯· করুণাময়ী—(১)
১০· করুণাময়ী (২)
১১· বিধাননগর কলোনি
১২· মুক্তিনগর কলোনি
১৩· নিরঞ্জন পল্লী
১৪· বিধান পল্লী উন্নয়ন সমিতি
১৫· পানচর পল্লী, নেতাজী, বিধান কলোনি
১৬· তালতলা কলোনি
১৭· কাঁঠালতলা কলোনি
১৮· বোসপাড়া উদ্বাস্তু কলোনি
১৯· চাঁদমারী নতুন পল্লী
২০· যোগেন্দ্র নাথ কলোনি
২১· কল্যাণী সীমান্ত কলোনি
২২· বড়হাট কলোনি
২৩· ঝিলপাড় কলোনি
২৪· মিত্র কলোনি (২)
২৫· ১৪নং সান্তাল পাড়া
২৬· হরিপাড়া
২৭· বি, বি, ডি কলোনি
২৮· সীড ফার্ম আদিবাসী
২৯· আই, টি, আই কলোনি
৩০· বীর সিধু কানু নগর
৩১· পুকুরপাড় আমবাগান কলোনি
৩২· মাঝের চর কোনানগর মাঝের ব্লক (৩) নতুন পল্লী
৩৩· বিধান পল্লী
৩৪· পূর্বচাঁদমারী নতুন নগর কলোনি
৩৫· মাঝের চর কাছারিপাড়া দক্ষিণপাড়া
৩৬· শহীদ পল্লী
৩৭· দক্ষিণ চাঁদমারী
৩৮· বিবেকানন্দ কলোনি
৩৯· ল্যান্ড লীজ কলোনি
৪০· ধর্মবীর কলোনি
৪১· বিধান পল্লী
৪২· কে, বি এম, বাস্তুহারা কলোনি
৪৩· নেতাজী জবরদখল কলোনি
৪৪· বিধান পল্লী
৪৫· সুকান্ত নগর
৪৬· আনন্দ পল্লী
৪৭· লেনিন পল্লী
৪৮· সুকান্ত পল্লী
৪৯· হরেকৃষ্ণ কোংগার পল্লী
৫০· কানপুর
৫১· জোড়াকুঠি
৫২· শিমুলতলা অমৃতেন্দু কলোনি
৫৩· ধুবুলিয়া নতুন বাজার
৫৪· ধুবুলিয়া বিশ্বাস পল্লী, কাবুর কুলি কলোনি
৫৫· ফাঁসিতলা কলোনি
৫৬· রামকৃষ্ণ পল্লী
৫৭· উঁচুপাড়া কলোনি
৫৮· লেনিন কলোনি (নেহরুনগর কলোনি)
৫৯· স্তালিন কলোনি (ভূপেশ দে কলোনি)
৬০· স্তালিন কলোনি (সুভাষ কলোনি)

৬১· বিপ্রনগর কলোনি
৬২· কানাইনগর কলোনি
৬৩· নেতাজী কলোনি
৬৪· মুজাফ্‌ফর নগর কলোনি
৬৫· শহীদ বাদল দত্ত কলোনি

## হাওড়া জেলা
## মোট কলোনির সংখ্যা-৩১

১· শান্তি কলোনি
২· নেতাজীনগর চাঁদমারী
৩· রাজচন্দ্রপুর
৪· বালানন্দ নগর উপনিবেশ
৫· শ্রীনগর কলোনি (২)
৬· শ্রীনগর কলোনি (৩)
৭· শ্রীনগর কলোনি
৮· মা সারদা পল্লী
৯· মাটি নগর উপনিবেশ
১০· মাটিগড়
১১· নৃপেন্দ্র পল্লী
১২· রবীন্দ্রনগর
১৩· বিনয়, বাদল, দীনেশ সরণী পল্লী
১৪· সূর্য্য সেন উদ্বাস্তু কলোনি
১৫· উদ্বাস্তু কলোনি
১৬· পশ্চিমপাড়া কলোনি
১৭· আতরালী বিশ্বাস কলোনি
১৮· ঋষি দাস কলোনি
১৯· ঋষি দাস কলোনি (২)
২০· সূর্য্যনগর কলোনি
২১· সুকান্ত পল্লী কলোনি
২২· ভারতমাতা কলোনি নং (১)
২৩· বিবেকানন্দ পল্লী
২৪· নতুন নগর কলোনি
২৫· পশ্চিম দাশ নগর (নবজীবন)
২৬· রামকৃষ্ণ পল্লী
২৭· ভারতমাতা (২) (৩)
২৮· চন্দ্রপুর কলোনি
২৯· চর আরফুলী কলোনি
৩০· কাঁটাপুকুর কলোনি
৩১· খাঞ্জাদাপুর কলোনি

## মেদিনীপুর জেলা
## মোট কলোনির সংখ্যা-৯

১· দীনেশ নগর
২· বরিশাল কলোনি
৩· বেলদা
৪· বামুনপাড়া
৫· টুড়িপাড়া-স্কোয়াটার্স কলোনি
৬· গোপালী স্কোয়াটার্স কলোনি
৭· বুলবুল চাটি স্কোয়াটার্স কলোনি
৮· ঝাড়গ্রাম বঙ্গ গড়িয়া, বামদা জঙ্গলখাস
৯· উদয়পালী ক্যাটনমেন্ট, বারোপাথরা টাঙ্গীগোড়া

## হুগলি জেলা
## মোট কলোনি সংখ্যা-৩৮

১· পিলখানা
২· নিরঞ্জননগর (২)
৩· গান্ধীনগর কলোনি
৪· নিচুপট্টি ধানকল কলোনি
৫· মিলন পল্লী, চান্দার নগর
৬· নিরঞ্জন কলোনি
৭· লাহা নগর
৮· মাইকেল পল্লী
৯· সারদা পল্লী
১০· রাজাবাগান
১১· নারায়ণ পল্লী
১২· বি বি ডি কলোনি
১৩· দাস কলোনি
১৪· শান্তি কলোনি
১৫· ত্রিবেণী রেলওয়ে ঘাট
১৬· বিমলা ব্যানার্জি
১৭· নিরঞ্জন পল্লী
১৮· নেতাজী সুভাষ কলোনি
১৯· কৃষ্ণ দাস
২০· মিতালী পল্লী
২১· সরস্বতী
২২· হৃষিকেশ পল্লী
২৩· অমল পল্লী
২৪· ক্ষুদিরাম পল্লী

২৫· টিনা জবরদখল
২৬· ইটভাটা কলোনি
২৭· নারিকেলবাগান কলোনি
২৮· নবপল্লী
২৯· স্বামীজি পল্লী
৩০· রেলঘাট কলোনি
৩১· সুকান্ত কলোনি
৩২· জ্যোতি কলোনি
৩৩· ডাডপুর কলোনি
৩৪· দঃ গোপালতারা মল্লিক কলোনি
৩৫· পরমেশ্বরী গিরিধারী কলোনি
৩৬· অমল পল্লী (২)
৩৭· নেতাজী নগর (২)
৩৮· সুবোধ পল্লী (২) (মহাডাঙ্গা কানচাটি)

**বর্ধমান জেলা**
**মোট কলোনি সংখ্যা-৬৬**

১· নতুন পল্লী কলোনি
২· লেনিন নগর কলোনি
৩· আদর্শ পল্লী
৪· শালিমাবাদ নং—১
৫· সুকান্ত পল্লী
৬· রসুলপুর নতুন কলোনি
৭· হরেকৃষ্ণ কোংগার কলোনি
৮· বিষ্ণুপুর কলোনি
৯· পাল্লা চাচাই জবরদখল কলোনি
১০· মহেশডাঙ্গা জবরদখল কলোনি
১১· মস্তেশ্বরতলা ক্যানেলপাড়া কলোনি
১২· চাপুই কলোনি
১৩· পল্লীশ্রী কলোনি
১৪· সেগুনবাগান কলোনি (বরসুল)
১৫· জিতেননগর কলোনি
১৬· চোরা কলোনি
১৭· ডাঃ আম্বেদকর কলোনি
১৮· রতিবতী চন্দ্র জবরদখল কলোনি
১৯· রায়ডাঙ্গা কলোনি
২০· রবীন্দ্র কলোনি
২১· রথতলা ওল্ড কলোনি
২২· তাজাগঞ্জ খালপাড়
২৩· গণতন্ত্র কলোনি
২৪· বারোদুয়ারী কলোনি
২৫· সদরঘাট খালপাড় কলোনি
২৬· বামনপুকুর কলোনি
২৭· সুকান্ত কলোনি
২৮· হরিপালী কলোনি
২৯· পাতলবারা কলোনি
৩০· তেঁতুলতলা কলোনি
৩১· দেশবন্ধুনগর কলোনি
৩২ পানাগড় বাজার কলোনি
৩৩· সুকান্ত পল্লী কলোনি
৩৪· শ্রীমা কলোনি
৩৫· শিবশঙ্কর কলোনি
৩৬· খানপুকুর কলোনি
৩৭· সুকান্ত পল্লী কলোনি
৩৮· আমবাগান কলোনি
৩৯· সুভাষ পল্লী
৪০· বিধান পল্লী বিদ্যাসাগর কলোনি
৪১· গোবিন্দ কলোনি
৪২· শরৎ পল্লী কলোনি
৪৩· নিয়ামতপুর ক্যাম্পিং গ্রাউন্ড
৪৪· রবীন্দ্র পল্লী
৪৫· বামাজিৎ কলোনি
৪৬· রায়নগর কলোনি
৪৭· আদর্শ কলোনি
৪৮· সুভাষ পল্লী
৪৯· রসুলপুর কলোনি
৫০· বালুই বসত কলোনি
৫১· বিহার নতুন পল্লী
৫২· হরেকৃষ্ণ নগর কলোনি
৫৩· দীনেশনগর শিয়ালডাঙ্গা জবরদখল কলোনি
৫৪· শঙ্করী পুকুর (১)
৫৫· আশিসনগর কলোনি
৫৬· মিলকী আদর্শ পল্লী কলোনি
৫৭· নেতাজী পল্লী কলোনি
৫৮· জয়তী পালি কলোনি
৫৯· শহীদ ক্ষুদিরাম কলোনি
৬০· স্বস্তি পল্লী কলোনি
৬১· রামোদী কলোনি
৬২· শ্যামপুর এস, এস, কলোনি
৬৩· ডাঙ্গাপাড়া পাথরকুচি কলোনি

৬৪· ডিকৌরি কলোনি
৬৫· সুকান্ত পল্লী কলোনি
৬৬· দাসপাড়া কলোনি

**মুর্শিদাবাদ জেলা**
**মোট কলোনি সংখ্যা-১৩**

১· বারোদুয়ারী (নতুন পাড়া) কলোনি
২· কুসুমখোলা কলোনি
৩· বিবেকানন্দ কলোনি
৪· পার্শপুর লেনিন কলোনি
৫· বাবলা বনা কলোনি
৬· বিধাননগর কলোনি
৭· সেকেন্দী পাহাড় কলোনি
৮· সিংহপাড়া কলোনি
৯· নয়াপল্লী
১০· সূর্যনগর
১১· সুভাষ কলোনি
১২· ইছাগঞ্জ গঙ্গাধর জবরদখল কলোনি
১৩· রামেশ্বরপুর মল্লিক পাড়া

**বীরভূম জেলা**
**মোট কলোনি সংখ্যা-২২**

১· পাহাড়পুর
২· চন্দ্রপুর
৩· বালিতা
৪· শম্ভুনগর
৫· চারার
৬· মুক্তি নগর
৭· বসন্ত নগর
৮· চাপলা
৯· দেবীপুর
১০· পলাশডাঙ্গা (পূর্বপাড়া)
১১· নাইলডাঙ্গা
১২· ক্ষুদ্রপুর
১৩· লক্ষ্মীপুর
১৪· সন্তোষপুর
১৫· নেতাজীনগর
১৬· খোয়ার বুনি
১৭· শ্রীচন্দাপুর
১৮· হালসীডাঙ্গা
১৯· টেকিন্দা ঘাট
২০· ছোট্ট শিমুলিয়া
২১· টিকুরি
২২· রামনগর

**বাঁকুড়া**
**মোট কলোনির সংখ্যা-২৯**

১· রাঙামাটি কমিটি কলোনি
২· শান্তিপুর কলোনি
৩· দেউলী সুভাষ পল্লী
৪· ভিটশেয়ার বাউর কুণ্ডা কলোনি
৫· পক্ষীচাঁদ পল্লী
৬· মথুরা রানাচক গৌরমিলন পল্লী
৭· সরিষা ডিহি কোতলপুর কলোনি
৮· আমিডাহি কলোনি
৯ চুয়াডাঙ্গা কলোনি
১০· বিতলন মহামায়া কলোনি
১১· বেঙ্গল চককালা পাত্রাই পল্লী
১২· সাপুরা তণ্ডুলমায়ী কলোনি
১৩· খাটনগর কলোনি
১৪· নিত্যানন্দপুর বালুয়া পল্লী
১৫· অমৃতপাড়া বসিয়া রামপুর কলোনি
১৬· কুরামপুর ভাটপাড়া মৌসংযুক্ত কলোনি
১৭· বড় পালসুরা কলোনি
১৮· উত্তর পটাশপুর বারাসাত, মুরাপাড়া কলোনি
১৯· পারুলিয়া কোষাটপুর রামনগর শালখাড়া পল্লী
২০· পাচপাড়া শুলীচর, গোবিন্দপুর কলোনি
২১· দক্ষিণ গোবিন্দপুর কলোনি
২২· উদয় পল্লী
২৩· বরিমিনা কলোনি
২৪· রামকৃষ্ণ পল্লী
২৫· পল্লীশ্রী কলোনি
২৬· সীতারামপুর মানা কলোনি
২৭· শ্রীনগর কলোনি

২৮· তেলেন্দা বিবেকানন্দ পল্লী
২৯· চর দামোদর মোহনা কলোনি

## জলপাইগুড়ি
## মোট কলোনির সংখ্যা-৩৯

১· ভক্তি নগর স্কোয়াটার্স কলোনি
২· হরেকৃষ্ণ স্কোয়াটার্স কলোনি
৩· শরৎপল্লী স্কোয়াটার্স কলোনি
৪· বঙ্কিম নগর স্কোয়াটার্স কলোনি
৫· শীতল পাড়া স্কোয়াটার্স কলোনি
৬· ঠাকুর নগর স্কোয়াটার্স কলোনি
৭· আনন্দনগর স্কোয়াটার্স কলোনি
৮· মহামায়া স্কোয়াটার্স কলোনি
৯· ঢাকা উদ্বাস্তু স্কোয়াটার্স কলোনি
১০· ধুম ডাঙ্গী স্কোয়াটার্স কলোনি
১১· সূর্য সেন স্কোয়াটার্স কলোনি
১২· নিরঞ্জন নগর স্কোয়াটার্স কলোনি
১৩· নেতাজী নগর স্কোয়াটার্স কলোনি
১৪· পাকাঘাট স্কোয়াটার্স কলোনি
১৫· শান্তিনগর স্কোয়াটার্স কলোনি (১,২)
১৬· অশোকনগর (১,২)
১৭· অজয় ঘোষ পল্লী স্কোয়াটার্স কলোনি
১৮· বানার হাট আদর্শপল্লী স্কোয়াটার্স কলোনি
১৯· মালা নেতাজী বাস্তুহারা কলোনি (১,২)
২০· রামকৃষ্ণ কলোনি
২১· বাঘা যতীন কলোনি
২২· ইন্দিরা গান্ধী কলোনি
২৩· বাঘা যতীন কলোনি
২৪· রবীন্দ্র নগর কলোনি
২৫· অরবিন্দ স্কোয়াটার্স কলোনি
২৬· হ্যামিলটন (রবীন্দ্রনগর)
২৭· বিধান পল্লী
২৮· আনন্দ নগর
২৯· ভোলার ডাবরি ও সুবর্ণনগর
৩০· রবীন্দ্রনগর
৩১· চিত্তরঞ্জন
৩২· খোড়াডাঙ্গা
৩৩· পূর্ব নগর থলী
৩৪· উত্তর নগর থলী
৩৫· ছোট্ট ডালডালী ও গোছামারি
৩৬· সুবান কলোনি
৩৭· কুঞ্জনগর
৩৮· বিজয় নগর স্কোয়াটার্স কলোনি
৩৯· ঢাকেশ্বরী স্কোয়াটার্স কলোনি

## কোচবিহার
## মোট কলোনির সংখ্যা-২৬

১· পাতাল খোয়া
২· রাসমণি কলোনি
৩· পুটিমারি বস্কির বেস কলোনি
৪· বিধান উপনিবেশ
৫· নিউ পাটাকুরা কলোনি
৬· ইন্দ্রজিৎ, নেহরু নগর, চন্দননগর
৭· শ্যামসুন্দর কলোনি
৮· খাগরী বাড়ি কলোনি
৯· গারাবঙ্গা ও ছাতাওয়ালাকা কলোনি
১০· গান্ধীনগব কলোনি
১১· প্রিয়গঞ্জ কলোনি
১২· ঢাকেশ্বরী নং (১)
১৩· আশুতোষ পল্লী—(১)
১৪· নেতাজী কলোনি
১৫· আশুতোষ পল্লী—(২)
১৬· রামকৃষ্ণ পল্লী
১৭· দুবাই ব্লক কলোনি
১৮· শ্যামসুন্দর কলোনি—(২)
১৯· চাকোহাকা গভঃ জায়গীর ল্যান্ড
২০· নাতুয়ার পুর কলোনি
২১· বাণীশোয়র কলোনি (বাণীশ্বর কলোনি)
২২· সাজিরপাড় ঘারা মারা
২৩· গোপাল নগর কলোনি
২৪· দাড়িবাস কলোনি
২৫· মিড্‌ল ক্লাশ কলোনি
২৬· কোদাল ধোয়া—২

**দার্জিলিং**
**মোট কলোনির সংখ্যা-১৭**

১· মহাকাল স্কোয়াটার্স কলোনি
২· দুর্গাদাস কলোনি
৩· ডাবগ্রাম উন্নয়ন (১)
৪· ডাবগ্রাম উন্নয়ন (২)
৫· দেশবন্ধু পাড়া
৬· দেবাশিষ স্কোয়াটার্স কলোনি
৭· দাস স্কোয়াটার্স কলোনি
৮· শ্রমিকনগর স্কোয়াটার্স
৯· উদয়ন উন্নয়ন কলোনি
১০· বাঘাযতীন কলোনি
১১· সুভাষনগর
১২· বি বি ডি কলোনি
১৩· আদর্শ নগর কলোনি
১৪· নতুন পাড়া
১৫· প্রান্তিক পল্লী
১৬· জ্যোতিনগর (২)
১৭· পাতি কলোনি

**মালদহ**
**মোট কলোনির সংখ্যা-৩৮**

১· মঙ্গলবাড়ি কলোনি
২· খইহাটা কলোনি
৩· গান্ধী কলোনি
৪· চর কাশিমপুর কলোনি
৫· খানপুর কলোনি
৬· বাগলা বাড়ি কলোনি (রানীর গড়)
৭· বিল বাড়ি নাজীব খান কলোনি
৮· বুড়াবুড়িতলা কৃষ্ণপল্লী কলোনি
৯· পশ্চিম শরিমন গোলাপল্লী কলোনি
১০· আদি মা কলোনি
১১· উঃ মহিমাগড় কাঞ্চনগড় কলোনি
১২· গোবিন্দপুর কলোনি
১৩· ডুবা খোকন কলোনি
১৪· কদুবাড়ি কলোনি
১৫· চন্দ্রাইল কলোনি
১৬· বেল বাড়ি কলোনি
১৭· কুতুব শহর গোলঘর কলোনি
১৮· গোসানীবাগ কলোনি
১৯· কুতুব শহর কলোনি
২০· ডাল্লা কলোনি
২১· প্রতিডাঙ্গা কলোনি
২২· আগ্রা কলোনি
২৩· তোলাই কলোনি
২৪· হরিশচন্দ্রপুর আরংগাছি কলোনি
২৫· নন্দগড় পল্লী কলোনি
২৬· পাথর শাশুলী কলোনি
২৭· ধরেন্দ্র এবং যোগী পাথার কলোনি
২৮· কাচিয়ামোড় কলোনি
২৯· চৈতনগাছি মধ্য কান্দুয়া কলোনি (ডেয়ারিফার্ম)
৩০· বুলবুল চণ্ডী রাইস মিলস্ কলোনি
৩১· বকসীনগর কলোনি
৩২· জয়দেবপুর কলোনি
৩৩· দীগল বাড়ি কলোনি
৩৪· বারোয়াডাঙ্গা কলোনি
৩৫· বাঙ্গাটোলা কলোনি
৩৬· ফুলডাঙ্গা কলোনি
৩৭· চিনিডাঙ্গা কলোনি
৩৮· কান্দুয়া কলোনি

**পঃ দিনাজপুর**
**মোট কলোনির সংখ্যা-৫২**

১· পীরপুকুর কলোনি
২· হাইরোড কালীতলা কলোনি
৩· নেতাজী পল্লী কলোনি
৪· শক্তিনগর কলোনি
৫· শিল্পীনগর কলোনি
৬· মালীপাড়া কলোনি
৭· মা মনসা কলোনি
৮· ১নং এয়ার পোর্ট কলোনি (পশ্চিম)
৯· সুভাষ কলোনি
১০· দেশবন্ধু কলোনি
১১· সন্তোষী মা কলোনি

১২· কারবালা কলোনি
১৩· টুরবাঘা কলোনি
১৪· ড্রাইভার্স কলোনি
১৫· পারপাতিরাম হালদার কলোনি
১৬· এ কে গোপালন কলোনি
১৭· পাবনা কলোনি
১৮· ছিন্নমস্তা পল্লী কলোনি
১৯· হাপটিয়া গাছ উদ্বাস্তু কলোনি
২০· ধিয়াগড় কলোনি
২১· জায়াগুরী জায়াপুরা উদ্বাস্তু কলোনি
২২· হুলানুগাছ উদ্বাস্তু কলোনি
২৩· মনগাছ উদ্বাস্তু কলোনি
২৪· চাকসুবিদ হারমেন কলোনি
২৫· সানিয়াস কলোনি
২৬· খাদিমপুর মালদার পাড়া ভেস্ট কলোনি
২৭· আত্রী কলোনি
২৮· ভাটপাড়া কলোনি
২৯· ডাঙ্গী পাথরঘাটা কলোনি
৩০· ডাঙ্গী দক্ষিণ কলোনি
৩১· কামালপুর নেতাজী কলোনি
৩২· অ্যাতেয়ার কলোনি
৩৩· নামাডাঙ্গা কলোনি
৩৪· দুর্গাপুর কলোনি
৩৫· পদ্মপুকুর কলোনি
৩৬· জোড়াপানি উদ্বাস্তু কলোনি
৩৭· সুবান্ধিগাছি উদ্বাস্তু কলোনি
৩৮· রাতুগাছি উদ্বাস্তু কলোনি
৩৯· তিন মাইল রোড উদ্বাস্তু কলোনি
৪০· তিন মাইল রেল স্টেশন উদ্বাস্তু কলোনি
৪১· আদ্রাগাড়ি (দক্ষিণ) উদ্বাস্তু
৪২· কংগ্রেস কলোনি (জ্যোতি নগর—২)
৪৩· কংগ্রেস কলোনি
৪৪· সাঁতরাগাছি নিরঞ্জনপল্লী উদ্বাস্তু কলোনি
৪৫· আড়িয়াগাও, নারায়ণ উদ্বাস্তু কলোনি
৪৬· অনন্তনগর মিলন পল্লী উদ্বাস্তু কলোনি
৪৭· নিরঞ্জন উদ্বাস্তু কলোনি
৪৮· প্রমোদনগর উদ্বাস্তু নগর
৪৯· দক্ষিণ কসবা রবীন্দ্র উদ্বাস্তু কলোনি
৫০· হরিচাঁদ উদ্বাস্তু কলোনি
৫১· শক্তিনগর কলোনি
৫২· শিল্পীনগর কলোনি

# অননুমোদিত জবরদখল কলোনির তালিকা

**কলিকাতা জেলা**
**মোট কলোনির সংখ্যা-১১**

১। বিধান পল্লী
৩৮, উপেন্দ্রচন্দ্র ব্যানার্জি রোড
মানিকতলা
২। প্রমোদ দাশগুপ্ত কলোনি
মানিকতলা
৩। নতুন পল্লী
৩৪ বাগমারী রোড
মানিকতলা
৪। বিবেকানন্দ পার্ক
লেক হস্‌পিটাল ক্যাম্প
যতীন বাগচী রোড
৫। বাস্তুহারা বাজার
৫/১ রমানাথ বিশ্বাস লেন
৬। ক্যালকাটা রিলিফ কমিটি
৩০, সি· এন· রায় রোড
৭। বিদ্যাসাগর কলোনি
৩, ভবানীপুর রোড
(১৭ নং ডি· এল· খাঁ রোড)
কলি—২৭
৮। সত্যেন বোস নগর
১১৫ বোস পুকুর রোড
৯। সেলিমপুর নেতাজী কলোনি
ঢাকুরিয়া
১০। বিপ্লবী উদ্বাস্তু সমিতি
২৮/১ মুরারি পুকুর রোড
মানিকতলা
১১। বেকার বাজার বাস্তুহারা
কলোনি
টালির নালা

**উত্তর ২৪ পরগনা জেলা**
**মোট কলোনির সংখ্যা—১৩৮**
**থানা—বারাসাত**

১। বকুলপুর রোড সাইড কলোনি
২। পিয়ারীচরণ সরকার কলোনি, বারাসাত
৩। বিদ্যাসাগর কলোনি, বারাসাত
৪। মা মনসা কলোনি বহিরা কালীবাড়ি
৫। প্রমোদনগর ১নং কাজিপাড়া
৬। প্রমোদনগর ২নং কাজিপাড়া
৭। ইউনিটি কলোনি ৩নং নন্দগড়
৮। শহীদ বিনয় ঘোষ কলোনি, বনমালীপুর
৯। অগ্রগামী উদ্বাস্তু কলোনি
১০। দোহারিয়া মাঠপাড়া শাহেব বাগান
বিবেকানন্দ রিফিউজি কলোনি গঙ্গানগর
১১। শান্তিময় নগর
১২। শহীদ বিনয় ঘোষ বারাসাত
১৩। শহীদ রামপ্রসাদ নগর
১৪। দ্বিজ হরিদাস কলোনি, হৃদয়পুর
১৫। হেমন্ত বসু নগর
১৬। বিবেকানন্দ কলোনি—২নং
১৭। ভগৎ সিং নগর, কদম্বগাছি
১৮। শম্ভু ঘোষ কলোনি কদম্বগাছি
১৯। কানাইনগর কলোনি, কদম্বগাছি
২০। নলিনী গুহ কলোনি, কদম্বগাছি
২১। নেতাজী কলোনি—বারাসাত
২২। হেমন্ত বসু কলোনি—১ নোয়াপাড়া
২৩। হেমন্ত বসু কলোনি—২ নোয়াপাড়া
২৪। নজরুল কলোনি, রাজারহাট থানা
২৫। রামকৃষ্ণ সারদা কলোনি, মধ্যমগ্রাম
২৬। চিত্তরঞ্জন উদ্বাস্তু কলোনি, গঙ্গানগর
২৭। মহিষাবাথাম—মধ্যমগ্রাম

২৮। দত্তপুকুর দীঘির পাড়—দত্তপুকুর

**থানা—হাবড়া**

২৯। প্রফুল্ল নগর, রেল—১
৩০। প্রফুল্লনগর রেল—২
৩১। নেহরুবাগ রেলওয়ে কলোনি
৩২। ৩নং রেলওয়ে কলোনি
৩৩। শ্রীনগর রেলওয়ে কলোনি
৩৪। বটগাছতলা রেলওয়ে কলোনি
৩৫। সর্দার পাড়া রেলওয়ে কলোনি
৩৬। ১নং রেলওয়ে কলোনি
৩৭। তেঁতুল রেল কলোনি
৩৮। ২৯নং রেলগেট শ্রীপুর কলোনি
৩৯। অশোক নগর III রেলওয়ে গেট
৪০। বিদ্যা রেলওয়ে স্টেশন কলোনি
৪১। গুমা রেলওয়ে স্টেশন কলোনি
৪২। নবজীবন পল্লী অশোক নগর

**থানা—বসিরহাট**

৪৩। নেওড়া দিঘি কলোনি

**থানা—বনগ্রাম**

৪৪। প্রমোদ নগর—১
৪৫। প্রমোদ নগর—২
৪৬। প্রমোদ নগর—৩
৪৭। নেত্র নগর

**থানা—এয়ারপোর্ট**

৪৮। তরুণ সেনগুপ্ত কলোনি মহাজাতিনগর
৪৯। কাটাখাল কলোনি
৫০। মাইকেল নগর খালধার উদ্বাস্তু সমিতি
৫১। তরুণ সেনগুপ্ত উপনগরী—
৫২। রাধাকৃষ্ণ পল্লী—২

**থানা—নিমতা**

৫৩। সংগ্রামী অম্বিকা নগর কলোনি
৫৪। রামকৃষ্ণ পল্লী
৫৫। নবারুণ পল্লী উন্নয়ন সমিতি

**থানা—লেকটাউন**

৫৬। শহীদ কালিপদ সামন্ত নগর
৫৭। লালকুঠি উদ্বাস্তু কলোনি
৫৮। পাতিপুকুর বিধান পল্লী
৫৯। ঋষি অরবিন্দ কলোনি
৬০। বি· আর· আম্বেদকর কলোনি
৬১। সরোজ মুখার্জি কলোনি
৬২। শিবপদ পল্লী

**থানা—দমদম**

৬৩। সুভাষশংকর পল্লী
৬৪। বাস্তুহারা উন্নয়ন সমিতি
৬৫। বিভূতি পল্লী
৬৬। বেদিয়াপাড়া, নিরালা প্রমোদ নগর কলোনি
৬৭। বাগেরহাট বিপ্লবী কলোনি
৬৮। বাস্তুহারা রেল কলোনি
৬৯। ভূমিহীন বাস্তুহারা সমিতি
৭০। তারকনাথ কলোনি
৭১। মধুগড় ২নং উদ্বাস্তু কলোনি
৭২। মুসলিম পরিত্যক্ত বাড়ি আর· এন· গুহ রোড
৭৩। বাস্তুহারা উন্নয়ন সমিতি
৭৪। শহীদ অরুণ মণ্ডল কলোনি
৭৫। দ্বিজহরি কলোনি
৭৬। তেরোর পল্লী

**থানা—বেলঘরিয়া**

৭৭। মে দিবস পল্লী দক্ষিণেশ্বর
৭৮। কৃষ্ণজীবন পল্লী দক্ষিণেশ্বর
৭৯। পূর্বশ্রী পল্লী কামারহাটি
৮০। নিত্যানন্দ কলোনি কামারহাটি
৮১। সুকান্ত পল্লী সংগ্রাম সমিতি আড়িয়াদহ
৮২। শান্তিনগর দক্ষিণেশ্বর
৮৩। তেঁতুলতলা মহাজাতিনগর
৮৪। ডোমেস্টিক এরিয়া আঞ্চলিক কমিতি দক্ষিণেশ্বর

**থানা—বরাহনগর**

৮৫। ভারত পল্লী উদ্বাস্তু কলোন বনহুগলি
৮৬। সর্বহারা উদ্বাস্তু কলোনি বনহুগলি
৮৭। সন্তোষ মিত্র কলোনি
৮৮। নৃসিংহ নগর 'এ' ব্লক এ· কে· মুখার্জি রোড
৮৯। নোয়াপাড়া শ্রীপল্লী এ· কে· মুখার্জি রোড
৯০। শহীদ অরুণ মণ্ডল সমিতি এ· কে· মুখার্জি রোড
৯১। নবপল্লী

৯২। নিউ ফরওয়ার্ড কলোনি
৯৩। নৃসিংহ নগর (বি)
৯৪। নোয়াপাড়া শান্তি পল্লী
৯৫। নিউ নোয়াপাড়া ২নং
৯৬। সুভাষ পল্লী ২নং
৯৭। নিউ নোয়াপাড়া ১নং
৯৮। বীথি দে কলোনি

**থানা—খড়দহ**

৯৯। ঋষি বঙ্কিমগড় উন্নয়ন সমিতি
১০০। সিদ্ধেশ্বরী কলোনি—২
১০১। বিবেকানন্দ পল্লী
১০২। দেবগ্রাম পল্লী
১০৩। জ্যোতি নগর
১০৪। বিবেকানন্দ কলোনি
১০৫। নেতাজী সুভাষ নগর
১০৬। মাদরাইল হঠাৎ কলোনি
১০৭। শহীদ তীর্থ কলোনি

**থানা—জগদ্দল**

১০৮। স্থিরপাড়া হঠাৎ কলোনি
১০৯। শান্তি নিবাস পল্লী
১১০। গুরদহ নতুন পল্লী
১১১। মুক্তি নগর
১১২। গড় শ্যামনগর ২নং
১১৩। মুজফফর নগর
১১৪। শ্যামদাস পল্লী
১১৫। প্রাণতোষ পল্লী
১১৬। প্রতাপ নগর
১১৭। সাধুখাঁ প্রসাদ কলোনি
১১৮। মূলাগড় জবর দখল কলোনি
১১৯। মূলাগড় নতুন পাড়া কলোনি
১২০। বিবেকানন্দ গড়
১২১। প্রমোদ নগর

**থানা—ন'-পাড়া**

১২২। নয়াপাড়া উদ্বাস্তু কলোনি
১২৩। পূর্ব রামনগর কলোনি
১২৪। না-পুকুর ধার কলোনি
১২৫। নতুন পল্লী
১২৬। কল্যাণ নগর

**থানা—বীজপুর**

১২৭। রবীন্দ্র পল্লী উদ্বাস্তু কলোনি
১২৮। নতুন পল্লী উদ্বাস্তু কলোনি
১২৯। বিবেকানন্দ পল্লী
১৩০। রাজবন্দী গড়

**থানা—নৈহাটী**

১৩১। রামকৃষ্ণ পল্লী
১৩২। ইন্দিরা নগর কলোনি
১৩৩। বি· আর· এস· কলোনি
১৩৪। নিরঞ্জন পাড়া
১৩৫। শরৎ পল্লী
১৩৬। বিজয় নগর ৩ নং
১৩৭। বিজয় নগর ২ নং
১৩৮। নজরুল কলোনি (বারাসাত, দত্তপুকুর)

**দক্ষিণ ২৪ পরগনা**
**মোট কলোনির সংখ্যা-৪৪**

**থানা—ক্যানিং**

১। সুকান্ত পল্লী
২। গান্ধী কলোনি
৩। রাজপুর রবীন্দ্র পল্লী
৪। পথের দাবী
৫। পথের শেষ
৬। বাঁশরা রবীন্দ্রপল্লী
৭। বাঁশরা সংগ্রামী নগর
৮। বাঁশরা সংগ্রামী নগর—২
৯। প্রতাপগড়
১০। শক্তি পল্লী
১১। উদয়ন পল্লী
১২। বাঁশরা বিদ্যাধরী কলোনি
১৩। পিয়ালী কলোনি
১৪। নবপল্লী কলোনি
১৫। বিপ্লবী নগর

**থানা—গোসাবা**

১৬। সত্যনারায়ণপুর
১৭। অমলা মেথী
১৮। মেথুরা খাণ্ডা

**থানা—বারুইপুর**

১৯। ব্যোমপুর
২০। হরেন্দ্র পল্লী
২১। বিদ্যাধরী নগর

২২। বিপ্লবী সূর্য্য সেন নগর
২৩। খোলাকাটা সংগ্রামী কলোনি
২৪। সুভাষ পল্লী

**থানা—কুলপী**

২৫। হারা কলোনি
২৬। কুলপী কালী কলোনি
২৭। মশামারী কলোনি

**থানা—তিলজলা**

২৮। পূর্ব পঞ্চান্নগ্রাম কলোনি
২৯। ইস্ট ভি· আই· পি জাগরণী
৩০। প্রাণকৃষ্ণ নগর
৩১। বাস্তুহীন কলোনি
৩২। উত্তর পঞ্চান্নগ্রাম—২
৩৩। উদয় নগর কলোনি
৩৪। নয়ন পল্লী
৩৫। নস্করহাট খালপাড় উদ্বাস্তু
৩৬। উদয় কলোনি
৩৭। ইন্দিরা নগর
৩৮। শহীদ কলোনি

**থানা—বেহালা**

৩৯। নিউ পার্ক কলোনি
৪০। বিদ্যাসাগর কলোনি
৪১। সোদপুর কলোনি
৪২। সাহাপুর কলোনি

**থানা—ডায়মন্ডহারবার**

৪৩। লেনিন কলোনি

**থানা—সোনারপুর**

৪৪। জগদ্দল নিউ কলোনি

## নদীয়া জেলা
## মোট কলোনির সংখ্যা-৩৭

**থানা—কল্যাণী**

১। কল্যাণী নেতাজী সুভাষ পল্লী (২)
২। সুকান্ত পল্লী—২
৩। রঘুনাথপুর
৪। বিধান পল্লী—২
৫। বিধান কলোনি—২
৬। তালতলা সীমান্ত—২
৭। রবীন্দ্রনাথ কলোনি—২
৮। যোগেন্দ্রনাথ—২
৯। সুভাষ নগর কলোনি
১০। পটলঘাট স্কোয়াটার্স কলোনি
১১। শহীদ পল্লী—২
১২। যোগেশপুর সাপ্লিমেন্টারি
১৩। কল্যাণী সীমান্ত—২
১৪। বিদ্যাসাগর
১৫। বিধানপল্লী উন্নয়ন সমিতি—২
১৬। বিবেকানন্দ পল্লী
১৭। শীতলাতলা
১৮। ঘোষপাড়া কল্যাণী—২
১৯। বিনয়, বাদল, দীনেশ কলোনি—২
২০। বুদ্ধপার্ক
২১। বোটপার্ক
২২। মুরাতপুর কলোনি—২
২৩। চাঁদমারী কলোনি—২
২৪। বিধান পল্লী—২
২৫। ক্ষুদিরামপুর পল্লী
২৬। ধরমবিরা নং—২
২৭। শহীদ ক্ষুদিরাম
২৮। বকুলতলা
২৯। বেলা মিত্র নগর
৩০। নবপল্লী গৌরচাঁদ
৩১। মাঝের চর কলোনি—২
৩২। মাঝের চর, কোনার নগর—২
৩৩। গয়েশপুর চেকপোস্ট কলোনি

**থানা—হরিণঘাটা**

৩৪। ষষ্ঠীতলা কলোনি
৩৫। বিবেকানন্দ কলোনি

**থানা—নবদ্বীপ**

৩৬। নবপল্লী ফনসীতলা

**থানা—রাণাঘাট**

৩৭। হিজলী লাইন-পার কলোনি

## হাওড়া জেলা
## মোট কলোনির সংখ্যা-২৯

**থানা—উলুবেড়িয়া**

১। শরৎ পল্লী (উলুবেড়িয়া)
২। কইজুড়ি—১নং উলবেড়িয়া

৩। কইজুড়ি—২নং উলবেড়িয়া
৪। কইজুড়ি—৩নং উলবেড়িয়া
৫। কইজুড়ি—৪নং উলবেড়িয়া
৬। কইজুড়ি—৫নং উলবেড়িয়া

**থানা—সাঁকরাইল**

৭। নরেন্দ্র পল্লী (সাঁকরাইল)
৮। সরস্বতী পল্লী সাঁকরাইল
৯। বঙ্গলক্ষ্মী পল্লী (শিবপুর)
১০। সর্বমঙ্গলা পল্লী (শিবপুর)
১১। পদ্মপুকুর পল্লী (শিবপুর)
১২। অমলকুণ্ডু পল্লী (জগাছা)
১৩। সুকান্ত পল্লী (জগাছা)
১৪। সালসা পূর্ব পল্লী (ডোমজুড়)
১৫। বাঁকড়া সুভাষ পল্লী (ডোমজুড়)
১৬। রামকৃষ্ণ পল্লী (ঘোষপাড়া)
১৭। জবরদখল রিফিউজি কলোনি (বোটানিক্যাল গার্ডেন)
১৮। ডুইলা নজরুল পল্লী (মৌরীগ্রাম)
১৯। রামকৃষ্ণ কলোনি (দাসনগর)
২০। বিদ্যাসাগর কলোনি (বালি)
২১। নেতাজী নগর ২নং (বালি)
২২। রামকৃষ্ণ কলোনি (ঘোষ পাড়া)
২৩। ইন্দিরা কলোনি (বাকসাড়া)
২৪। রাজেন্দ্রপুর নং—২
২৫। শহীদ বীরেন দাস কলোনি (নিশ্চিন্দা)
২৬। ইন্দিরা নগর কলোনি (নিশ্চিন্দা)
২৭। বিদ্যাসাগর কলোনি (মৌরীগ্রাম)
২৮। রাজীব পল্লী উন্নয়ন সমিতি (বাঁকড়া)
২৯। সুকান্ত কলোনি (চক কাশী)

**হুগলী জেলা**
**মোট কলোনির সংখ্যা—১১২**

**থানা—চুঁচুড়া**

১। মিলন বিধান দেশবন্ধু নগর
২। আনন্দ পল্লী
৩। কংগ্রেস নগর
৪। পাল পাড়া
৫। জগদ্ধাত্রী পল্লী
৬। নন্দন পল্লী
৭। ভূপতিনগর কলোনি
৮। বলাগড় লেনিন নগর
৯। শান্তিপূর্ণ কলোনি
১০। রবীন্দ্রনগর দেশবন্ধু পল্লী
১১। নলডাঙ্গা নারায়ণপুর
১২। শ্যামা পল্লী
১৩। নবপল্লী
১৪। রবীন্দ্রনগর পশ্চিমপাড়া
১৫। অরবিন্দ পল্লী
১৬। কেওটা হেমন্ত বসু কলোনি
১৭। লেনিন পল্লী
১৮। সুভাষনগর ২নং
১৯। গোপীনাথপুর জবরদখল কলোনি
২০। চন্দননগর শরৎ সরণী জবরদখল কলোনি
২১। চণ্ডীনগর
২২। শান্তিপল্লী
২৩। দেশবন্ধু কলোনি
২৪। কোদালিয়া ঝিলপার্ক

**থানা—চন্দননগর**

২৫। মাখনলাল কলোনি
২৬। ইন্দিরা কলোনি
২৭। বোড়াই চণ্ডীতলা
২৮। বিবেকানন্দ পল্লী
২৯। কানাই সরকার ঘাট নিচুপাড়া
৩০। শুড়ি ঘাট নিচু পট্টি
৩১। শ্মশান কালী পল্লী
৩২। শহীদ নগর
৩৩। রাসবিহারী কলোনি
৩৪। দিনেমার ডাঙ্গা কাটুলপাড়া জবরদখল পল্লী
৩৫। শুরিঘাট—২ কালিচরণ ঘোষ কলোনি
৩৬। নতুন পল্লী
৩৭। ব্রাহ্মণ দীঘি
৩৮। করের ধর কলোনি
৩৯। ভবানী সেন পল্লী

**থানা—ভদ্রেশ্বর**

৪০। মিলন নগর
৪১। ভ্রমর দীঘি জবরদখল কলোনি
৪২। কুঞ্জনগর
৪৩। পশ্চিম চণ্ডীতলা
৪৪। পান পাড়া জবরদখল কলোনি

৪৫। মানকুণ্ডু দক্ষিণপাড়া এম· জি কলোনি
৪৬। মিলন নগর জবরদখল উদ্বাস্তু কলোনি
৪৭। ক্ষুদিরাম কলোনি
৪৮। জগদ্ধাত্রী কলোনি

থানা—পাণ্ডুয়া

৪৯। হঠাৎ কলোনি
৫০। তারা কলোনি
৫১। তিন্ন্যা কলোনি
৫২। বোড়োলা কলোনি
৫৩। কৃষ্ণ দাস কলোনি
৫৪। বিমল ব্যানার্জী কলোনি

থানা—ত্রিবেণী

৫৫। স্বামী বিবেকানন্দ কলোনি
৫৬। নেতাজী সুভাষ কলোনি
৫৭। প্রমোদ কলোনি
৫৮। ১নং নেতাজী কলোনি
৫৯। সরকার পল্লী
৬০। লক্ষ্মী কলোনি ২নং গেট

থানা—বিশরপাড়া

৬১। তারণমালী কলোনি

থানা—মগরা

৬২। বিপ্লবী সূর্য্য সেন কলোনি
৬৩। বি পি আর কলোনি—১
৬৪। নারায়ণী পল্লী
৬৫। জ্যোতি কলোনি
৬৬। বি· পি· আর কলোনি ২নং
৬৭। ত্রিবেণী রেলওয়ে ঘাট
৬৮। খগেন্দ্র পল্লী
৬৯। কালীতলা
৭০। বিশরপাড়া রাধাকান্ত মুখার্জি স্মৃতি কলোনি
৭১। কালীতলা ১নং কলোনি
৭২। কালীতলা ২নং কলোনি
৭৩। কালীতলা কলোনি
৭৪। রথতলা কলোনি
৭৫। কালীতলা রথতলা—২
৭৬। গজাঘাণ্ডা নবীন পল্লী
৭৭। কোলা বি· পি· আর কলোনি
৭৮। সরস্বতী কলোনি
৭৯। প্রমোদ পল্লী
৮০। গজাঘাণ্ডা পল্লী, বাসুদেবপুর, মজুমদার পল্লী
৮১। গজাঘাণ্ডা কলোনি
৮২। কারা কৃষ্ণ পল্লী
৮৩। ক্ষুদিরাম পল্লী
৮৪। নতুন গ্রাম পল্লী
৮৫। বি· পি· আর· কলোনি—৩

থানা—ডুমুরদহ

৮৬। বিদ্যাসাগর গোপালপুর
৮৭। সারদা পল্লী

থানা—বলাগড়

৮৮। ফুলতলা কলোনি
৮৯। কুঞ্জ নগর
৯০। শ্রীরামপুর কলোনি
৯১। সিজা সুভাষ কলোনি
৯২। তেঁতুলিয়া কলোনি
৯৩। চন্দ্রঠাকুর কলোনি
৯৪। নিমতলা জবরদখল কলোনি
৯৫। সুখারিয়া আনন্দময়ী কলোনি
৯৬। সিতারাম ওঙ্কারনাথ কলোনি

থানা—বৈদ্যবাটী

৯৭। রাস গড় বাগান কলোনি

থানা—খামারপাড়া

৯৮। খামারপাড়া বংশবেড়িয়া

থানা—শ্রীরামপুর

৯৯। কালীতলা কোন্নগর কলোনি
১০০। রথতলা কলোনি
১০১। বাস্তুহারা বাজার সমিতি

থানা—উত্তরপাড়া

১০২। কানাইপুর জবরদখল কলোনি
১০৩। কানাইপুর মধ্য জবরদখল কলোনি
১০৪। উত্তরপাড়া থানা বাস্তুহারা আঞ্চলিক পরিষদ

থানা—কোদালিয়া

১০৫। কৃষ্ণপুর কলোনি
১০৬। ক্ষুদিরাম কলোনি
১০৭। ঝিপুর কলোনি

থানা—হিন্দমোটর

১০৮। বিনয়, বাদল, দীনেশ পল্লী

**থানা—নয়াসরাই**

১০৯। নয়াসরাই সুকান্ত কলোনি
১১০। রসন তারা বাগান সুকান্ত নগর
১১১। লেনিন নগর
১১২। নয়া সরাই ঝুলন্ত ব্রীজ কলোনি

## জেলা—বর্ধমান
## মোট কলোনির সংখ্যা-৪৮

**থানা—কাঁকসা**

১। কাঁকসা হরেকৃষ্ণ পল্লী
২। রাধামোহন পুর
৩। শ্যামবাজার বাগান পাড়া
৪। নেতাজী কলোনি
৫। মসনা মানা কলোনি
৬। বসুধা বিল পাড়া
৭। শ্যামবাজার কলোনি
৮। সাতকানাইয়া দঙ্গল নেতাজী
৯। বসুধা বাঁধ ধার কলোনি
১০। বসুধা কলোনি
১১। বনকাঠি কলোনি
১২। ২নং পানাগড় বাজার
১৩। দুবরাজপুর কলোনি
১৪। শ্রীরামপুর কলোনি
১৫। রানীপুর কলোনি
১৬। অজয় পল্লী
১৭। শিবপুর কলোনি
১৮। বগুরা পাড়া কলোনি
১৯। বিলপাড়া কলোনি

**থানা—আউশগ্রাম**

২০। বকুলতলা কলোনি
২১। ১নং গোপালপুর কলোনি
২২। হরিনাথপুর কলোনি
২৩। হাট মাধবপুর কলোনি
২৪। ২নং গোপালপুর কলোনি
২৫। বঙ্গশ্রী কলোনি
২৬। বঙ্গপল্লী
২৭। আনন্দ নগর
২৮। বক্সি বাঁধ

**থানা—গলসী**

২৯। জয়কৃষ্ণপুর
৩০। লক্ষ্মীপুর
৩১। দক্ষিণ ভাষাপুর
৩২। গরম্বা মানা কলোনি
৩৩। গরম্বা কলোনি
৩৪। ঝুঝুটি কলোনি
৩৫। সত্যানন্দপুর
৩৬। কালীমোহনপুর
৩৭। মিঠাপুর

**থানা—দুর্গাপুর**

৩৮। বিদ্যাসাগর পল্লী
৩৯। দক্ষিণ পল্লী

**থানা—কোকওভেন**

৪০। সুকান্তপল্লী ক্যানেল পাড়
৪১। ক্ষুদিরাম কলোনি
৪২। প্রগতি পল্লী

**থানা—মেমারী**

৪৩। উদয পল্লী

**থানা—সুরজনগর**

৪৪। ঢাকেশ্বরী সুরজনগর কলোনি

**থানা—বর্ধমান সদর**

৪৫। ভাতশালা নতুন কলোনি
৪৬। বিজয়নগর কলোনি
৪৭। জগৎবেড় মীর ডোবা কলোনি
৪৮। নিত্যপাল কলোনি

## জেলা—মেদিনীপুর
## মোট কলোনির সংখ্যা-১৭

**থানা—মেদিনীপুর**

১। ভগবতী পল্লী কলোনি
২। নতুন দেহী
৩। বরিশাল নং ২

**থানা—শালবনী**

৪। ভুরিপাড়া
৫। দীনেশ নগর—২

**থানা—খড়গপুর**

৬। সূর্য্যনগর কলোনি
৭। ভুরিপাড়া—২ (রবীন্দ্রপল্লী)
৮। দীনেশ নগর কলোনি
৯। সুকান্ত পল্লী

১০। সুকুমার নগর
১১। নতুন পল্লী
১২। সুভাষ পল্লী
১৩। বিবেকানন্দ কলোনি
১৪। রাজ কলেজ কলোনি
১৫। অরবিন্দ কলোনি
১৬। বান পাটনা কলোনি
১৭। সুকান্ত পল্লী

**জেলা—বীরভূম**
**মোট কলোনির সংখ্যা—৪৭**

**থানা—বোলপুর**

১। মধ্যঘোড়া পাল পাড়া কলোনি
২। মধ্যঘোড়া
৩। নামুঘোড়া কলোনি
৪। বরদেহী কলোনি
৫। বড় সিমুলিয়া
৬। সেনকোপুর দিঘির পাড়
৭। কাকুতিয়া হাটপুকুর
৮। কাকুতিয়া বড়বাগান
৯। রাইপুর
১০। নীরপুর—I
১১। নীরপুর—II
১২। রজৎপুর
১৩। উত্তর নারায়ণ পুর
১৪। সুখ বাজার
১৫। দেবীপুর
১৬। সুভাষ পল্লী
১৭। খয়ের বুনি—II
১৮। জয়দেব
১৯। অজয় পল্লী

**থানা—সাঁইথিয়া**

২০। সুকান্ত পল্লী
২১। কুসুম দিঘী
২২। কলুরায়পুর
২৩। খাসপুর
২৪। ব্যাসপুর
২৫। মুরোডিহি মোপাড়া
২৬। নেতাজী পল্লী
২৭। বিবেকানন্দ পল্লী

**থানা—মুরারাই**

২৮। বালিও
২৯। লক্ষ্মীনগর
৩০। রতনপুর

**থানা—লাবপুর**

৩১। ষষ্ঠী নগর
৩২। তারপুর
৩৩। কালীনগর
৩৪। বীর মন্দির
৩৫। রাজারামপুর

**থানা—ময়ূরেশ্বর**

৩৬। পুকুর পাড়া
৩৭। ভগবতী
৩৮। মলেশ্বর (মদিয়ানা)

**থানা—মহম্মদপুর**

৩৯। রাজ্যধর পুর
৪০। নরসিংহ পাড়া

**থানা—নানপুর**

৪১। হৃদয়পুর

**থানা—নলহাটি**

৪২। ভুটিয়া

**থানা—রামপুরহাট**

৪৩। তারাপীঠধাম

**থানা—সিউড়ী**

৪৪। তিলপাড়া
৪৫। সৎসঙ্গ
৪৬। চুরার—II
৪৭। পাঁচরা কটন মিল

**বাঁকুড়া জেলা**
**মোট কলোনির সংখ্যা-৯**

**থানা—বরজোড়া**

১। পল্লীশ্রী স্কোয়াটার্স কলোনি
২। বড়মানা কলোনি
৩। রামকৃষ্ণ পল্লী

**থানা—মেঝিয়া**

৪। ঠাকুর পল্লী
৫। চুয়া বেড়িয়া বিল ধার এবং ছাতনা রোড
৬। চন্দননগর স্কোয়াটার্স কলোনি
৭। শ্রীনগর কলোনি

**থানা—সোনামুখি**

৮। নিত্যানন্দপুর কলোনি

**থানা—পাত্রসার**

৯। দক্ষিণ গোবিন্দপুর রিফিউজি কলোনি

## জেলা—জলপাইগুড়ি

**মোট কলোনির সংখ্যা-৯৮**

**থানা—জলপাইগুড়ি সদর**

১। মুজিবগড় কলোনি
২। পিলখানা কলোনি
৩। সুভাষ উন্নয়ন পল্লী
৪। সুকান্ত নগর কলোনি
৫। করলাচর কলোনি
৬। জগন্নাথ কলোনি
৭। পরেশ মিত্র কলোনি
৮। বিবেকানন্দ পল্লী
৯। মৌমারী কলোনি
১০। রামকৃষ্ণ-সারদা পল্লী
১১। রাহুত নগর
১২। বিবেকানন্দ কলোনি
১৩। বিবেকানন্দ পাড়া কলোনি
১৪। জলপাইগুড়ি স্টেশন কলোনি
১৫। সারদা পল্লী
১৬। নিউ টাউন কলোনি
১৭। পদ্ম দীঘি কলোনি

**থানা—মাল**

১৮। প্রেমগঞ্জ কৃষি কলোনি
১৯। প্রমোদ নগর
২০। আদর্শ কলোনি
২১। মহাকাল পাড়া
২২। বাঘাযতীন কলোনি
২৩। বিবেকানন্দ পল্লী
২৪। টিচার্স কলোনি
২৫। মাল কলোনি

**থানা—ময়নাগুড়ি**

২৬। দেবী নগর কলোনি
২৭। সুভাষ নগর কলোনি
২৮। অরবিন্দ নগর কলোনি
২৯। শক্তি নগর কলোনি
৩০। মাধব ডাঙ্গা
৩১। পানবাড়ি কলোনি

**থানা—ধুবগুড়ি**

৩২। বামনতরি কলোনি
৩৩। বামনতরি নতুন কলোনি

**থানা—ফলাকাটা**

৩৪। ইন্দিরা কলোনি
৩৫। রায়চাগা বঙ্গাইপুর কলোনি
৩৬। বাবুপাড়া কলোনি
৩৭। হাতিডাঙ্গা
৩৮। সরোজনগর
৩৯। পূর্ব হরিচরণ ভিটা

**থানা—আলিপুরদুয়ার**

৪০। বাদল নগর
৪১। ভোলার ডাবরি কলোনি
৪২। গিরিন্দ্র নগর
৪৩। মিলন পল্লী
৪৪। প্রমোদ নগর
৪৫। বাগরি বাড়ি
৪৬। মহামায়া কলোনি
৪৭। চাকিয়া ভিটা
৪৮। বাবুপাড়া উদ্বাস্তু কলোনি
৪৯। চেওচাকাটা কলোনি
৫০। পটলতলা কলোনি
৫১। তোতাপাড়া উদ্বাস্তু কলোনি
৫২। কামাখ্যাগুড়ি কলোনি
৫৩। বিধান নগর কলোনি নং ১
৫৪। বিধান নগর কলোনি নং ২
৫৫। পলাশবাড়ি নদীর চর
৫৬। নিউ টাউন কলোনি
৫৭। কালীবাড়ী কলোনি
৫৮। অরবিন্দ নগর নং ২
৫৯। শামুকতলা কলোনি
৬০। পলাশবাড়ী কলোনি
৬১। ধর উদ্বাস্তু কলোনি
৬২। শক্তিনগর উদ্বাস্তু কলোনি

**থানা—রায়গঞ্জ**

৬৩। নবগ্রাম কলোনি
৬৪। সুকান্ত কলোনি নং ১
৬৫। সুকান্ত কলোনি নং ২
৬৬। রামকৃষ্ণ কলোনি
৬৭। কৃষ্ণনগর কলোনি
৬৮। শ্রীনগর শান্তিপাড়া

৬৯। অম্বরি কামার ভিটা
৭০। চাকিয়া ভিটা কৃষ্ণনগর
৭১। রামকৃষ্ণ কলোনি কলোনি ২
৭২। সমর নগর কলোনি ২
৭৩। রাজগঞ্জ উদ্বাস্তু কলোনি ২
৭৪। আমতলা কলোনি ১
৭৫। আমতলা কলোনি ২
৭৬। সুভাষ নগর
৭৭। জয়ন্ত নগর
৭৮। ক্ষুদিরাম পল্লী
৭৯। সুকান্তনগর কৃষি কলোনি
৮০। নেতাজী উদ্বাস্তু কলোনি
৮১। জ্যোতি নগর
৮২। জলডুমুর হাটখোলা
৮৩। আদর্শ পল্লী
৮৪। সীতাগুড়ি
৮৫। বলরাম বনবাস
৮৬। কালীনগর খগেন্দ্র
৮৭। গকুল ভিটা
৮৮। জলডুমুর সো
৮৯। হরিচরণ ভিটা কৃষি
৯০। নয়ন পাড়া
৯১। চয়ন পাড়া
৯২। ক্ষুদিরাম কলোনি (২, ৩, ৪)
৯৩। সুভাষ নগর (এ, বি, সি)
৯৪। আমতলা কলোনি (ডাবগ্রাম)
৯৫। আশিগড় কলোনি
৯৬। জয়নগর কলোনি
৯৭। শীতলপাড়া ইণ্ডিয়ান কলোনি
৯৮। প্রকাশ নগর দাদাভাই কলোনি

## কুচবিহার জেলা
## মোট কলোনির সংখ্যা-১৭

### থানা—কোতয়ালী

১। সালামারা পাড়া—৩
২। সাজের পাড়া কাঁঠালবাড়ি
৩। পিয়াজবাড়ী কলোনি
৪। সিংগীমারী পঞ্চপুর
৫। নিউ দেবরি কলোনি
৬। শান্তিনগর কলোনি
৭। খড়িমালা খাগড়াবাড়ি
৮। জয়নগর কলোনি

### থানা—তুফানগঞ্জ

৯। পুরাতন হাসপাতাল পাড়া
১০। চাকোমারী ও মধুরভাষা

### থানা—ঘোকাশডাঙ্গা

১১। সৌদারবাস কলোনি 'এ' ব্লক
১২। সৌদারবাস কলোনি 'বি' ব্লক
১৩। ভেলকোপা কলোনি

### থানা—শীতলকুচি

১৪। মাঘপালা কলোনি

### থানা—সিংগুমারী

১৫। মধুরভাষা 'বি' কলোনি

### থানা—মাথাভাঙ্গা

১৬। বলাশি কলোনি

### থানা—পুটীমারী

১৭। বাশদাবানাটি বাড়ি কলোনি

## দার্জিলিং জেলা
## মোট কলোনির সংখ্যা-৭৬

### থানা—শিলিগুড়ি

১। প্রাণকৃষ্ণ কলোনি
২। হরিজন মজদুর কলোনি
৩। মাতঙ্গিনী কলোনি—১
৪। মাতঙ্গিনী কলোনি—২
৫। সর্বহারা কলোনি
৬। চিত্তরঞ্জন কলোনি
৭। জ্যোতিনগর কলোনি—১
৮। রাজা রামমোহন কলোনি
৯। সবংগড় কলোনি
১০। ক্ষুদিরাম কলোনি
১১। প্রমোদ নগর কলোনি
১২। সুকান্ত পল্লী
১৩। স্বামীনগর কলোনি
১৪। বিবেকানন্দ নগর কলোনি
১৫। পঞ্চনাই কলোনি
১৬। সূর্য্যসেন কলোনি
১৭। রনবস্তি কলোনি
১৮। হকার কর্ণার মার্কেট
১৯। লিচু বাগান কলোনি
২০। আদর্শ পল্লী

২১। বিপ্লব ঘোষ কলোনি
২২। হেমন্ত বসু কলোনি
২৩। সন্তোষী নগর কলোনি
২৪। মহারাজ কলোনি
২৫। প্রান্তিক পল্লী (ভরত নগর)
২৬। শ্রীকলোনি
২৭। বলাসন কলোনি

**থানা—বাগডোগরা**

২৮। ডুমরিগুড়ি উত্তর বাগডোগরা
২৯। শ্রীকলোনি
৩০। হো-চি-মিন কলোনি
৩১। ক্ষুদিরাম কলোনি—২
৩২। হরেকৃষ্ণ পল্লী
৩৩। জ্যোতিনগর কলোনি—৪
৩৪। ত্রৈলক্ষ নগর কলোনি
৩৫। অশোকনগর কলোনি
৩৬। স্টালিনপুর কলোনি
৩৭। গঙ্গাধর কলোনি
৩৮। সুকান্ত পল্লী

**থানা—মালপাড়া**

৩৯। হেমন্ত বসু কলোনি

**থানা—চম্পামারী**

৪০। জ্যোতি নগর কলোনি—৩
৪১। দুর্গা নগর
৪২। আম্বেদকর নগর কলোনি
৪৩। গণেশ ঘোষ কলোনি

**থানা—মাটিগড়**

৪৪। পরিমল কলোনি
৪৫। সমরনগর কলোনি
৪৬। দেবীনগর
৪৭। দুর্গা নগর—II
৪৮। আনন্দময়ী উদ্বাস্তু কলোনি
৪৯। নিউ কলোনি
৫০। হরেকৃষ্ণ কলোনি
৫১। প্রমোদনগর
৫২। পাল পাড়া—I
৫৩। লেনিনপুর কলোনি
৫৪। বিবেকানন্দনগর—II
৫৫। তরিজোতা বালাসেম কলোনি
৫৬। ভোগাবিটা কলোনি
৫৭। পাল পাড়া নং—II
৫৮। রবীন্দ্রনগর
৫৯। নেতাজী পল্লী
৬০। জ্যোতিনগর—৪
৬১। জ্যোতিনগর—৫

**থানা—খড়িবাড়ি**

৬২। ভোদ্রা জ্যোতি কলোনি
৬৩। দেবীগ্রাম কলোনি—১
৬৪। দেবীগ্রাম কলোনি—২
৬৫। মাটিগড়া গভঃ কলোনি
৬৬। সাহাধরগঞ্জ কলোনি

**থানা—রানীডাঙ্গা**

৬৭। রানীডাঙ্গা উদ্বাস্তু কলোনি
৬৮। রাধিকা রঞ্জন কলোনি

**থানা—ফাঁসিদাহ**

৬৯। জ্যোতি নগর কলোনি—৬
৭০। জ্যোতিনগর কলোনি—৭

**থানা—চটেরহাট**

৭১। চটেরহাট উদ্বাস্তু কলোনি
৭২। বিধাননগর উদ্বাস্তু কলোনি

**থানা—বাতাসি**

৭৩। ভিটাঘাটা সুবল ভিটা কলোনি
৭৪। বাতাসি উদ্বাস্তু কলোনি
৭৫। রামধন উদ্বাস্তু কলোনি-১
৭৬। রামধন উদ্বাস্তু কলোনি-২

**মালদা জেলা**
**মোট কলোনির সংখ্যা-১২৮**

**থানা—হাবিবপুর**

১। রামকৃষ্ণপুর (এগ্রিঃ)
২। জগন্নাথপুর (এগ্রিঃ)
৩। হরিশচন্দ্রপুর (এগ্রিঃ)
৪। রাধাকান্তপুর (এগ্রিঃ)
৫। গোপীনাথপুর
৬। কালীতলা
৭। সোলাডাঙ্গা
৮। কালীপুকুর
৯। কালীপুকুর—২
১০। টিলাসান (এগ্রিঃ)
১১। দোলমালপুর

১২। চাঁদপুর
১৩। দক্ষিণ চাঁদপুর
১৪। পাতিলগড়
১৫। রনজিৎপুর
১৬। অনুরাধাপুর
১৭। কলাইবাড়ি
১৮। তেঘারিয়া
১৯। কোতলপুর (এগ্রিঃ)
২০। হরিপুর
২১। এই হো ফিল্ড পাড়া
২২। সোনাবাঁধ
২৩। ঠাকুরনগর
২৪। ঝিনঝিনি পুকুর
২৫। বুলবুল চণ্ডী স্টেশন
২৬। ছাতা কলোনি
২৭। পুকুর পাড়
২৮। কুলাডাঙ্গা

**থানা—গাজোল**

২৯। শ্রীকৃষ্ণপুর (এগ্রিঃ)
৩০। মুরিয়া কুণ্ডু (এগ্রিঃ)
৩১। জোড়গাছি
৩২। রানীপুর
৩৩। পাবনা পাড়া
৩৪। ইট বাঁধা
৩৫। চম্পা দীঘি
৩৬। রসিকপুর (এগ্রিঃ)
৩৭। দুর্গাপুর
৩৮। দাসনগর
৩৯। নীলনগর
৪০। কালীনগর
৪১। কাঞ্চননগর
৪২। বাঁচাহার
৪৩। লক্ষ্মীনারায়ণপুর
৪৪। ভাগন কলোনি
৪৫। আকুণ্ড
৪৬। আনন্দপল্লী
৪৭। জীগিন
৪৮। মশালদীঘি
৪৯। দেবীদহ
৫০। কাশীমপুর
৫১। মাধাগাসোল ভেস্ট পাড়া
৫২। জলসা খাসপাড়া
৫৩। ছোট জলসা
৫৪। আকালপুর
৫৫। আরাজি জলসা (এগ্রিঃ)
৫৬। বাবলা বোনা
৫৭। চিটু পল্লী
৫৮। রংগ ভিটা
৫৯। শংকর পুর
৬০। সরসা ডুবি
৬১। পোলাডাঙ্গা
৬২। পারহরিনগর
৬৩। বাণীওয়াল
৬৪। সিটকা মহল
৬৫। আদিনা রিফিউজি পাড়া
৬৬। ছয় ঘাটি
৬৭। তুলসী ডাঙ্গা
৬৮। বুড়ি দহ (এগ্রিঃ)
৬৯। কৃষ্ণনগর
৭০। পিরোল তোলা
৭১। ইমাম নগর
৭২। বাদডাঙ্গা
৭৩। শান্তিনগর
৭৪। মহিষাল
৭৫। হাটনগর
৭৬। শ্রীরামপুর
৭৭। নরসিংহ ডাঙ্গা
৭৮। গৌরাঙ্গপুর
৭৯। সুলাই ডাঙ্গা
৮০। নয়া পাড়া
৮১। খানাকালো
৮২। সূর্য্যনগর
৮৩। বয়ার ডাঙ্গি

**থানা—বামনগোলা**

৮৪। তালভিটা (এগ্রিঃ)
৮৫। বাট্রোলী
৮৬। রাঙামাটি
৮৭। কৃপাদহ
৮৮। ডাকাতপুকুর
৮৯। কাটুয়াডাঙ্গা
৯০। জামডাঙ্গা
৯১। দামুর

৯২। নিমডাঙ্গা
৯৩। বামন গোলা উত্তরপাড়া
৯৪। বামন গোলা দক্ষিণপাড়া
৯৫। নলগোলা পূর্ব পাড়া
৯৬। নলগোলা পশ্চিম পাড়া
৯৭। তেলচিটকা
৯৮। রাখালপুকুর (এগ্রিঃ)
৯৯। পাকুয়া খাস পাড়া
১০০। আধা ডাঙ্গা (এগ্রিঃ)
১০১। নন্দিনী দহ (এগ্রিঃ)
১০২। হাঁসপুকুর (এগ্রিঃ)
১০৩। আসাম পাড়া (এগ্রিঃ)
১০৪। খুটা দহ (এগ্রিঃ)
১০৫। তুলা ভিটা
১০৬। বড় ভিটা (এগ্রিঃ)
১০৭। ডোবা ডাঙ্গা
১০৮। সোনঘাট (এগ্রিঃ)
১০৯। তালতলা (এগ্রিঃ)
১১০। ঢাকা পাড়া
১১১। শ্রীবিষ্ণুপুর
১১২। ভুলকিমারী (এগ্রিঃ)

**থানা—মালদা**

১১৩। মহানন্দা কলোনি
১১৪। ছাতিয়ান মোড়
১১৫। গান্ধী কলোনি
১১৬। নবাবগঞ্জ রিফিউজি পাড়া
১১৭। সাহাপুর রিফিউজি পাড়া
১১৮। কোর্ট স্টেশন বাকচা কলোনি
১১৯। চর লক্ষ্মীপুর সারদা পল্লী
১২০। দেবীপুর
১২১। মঙ্গলবাড়ি রিফিউজি পাড়া

**থানা—কালিয়াচক**

১২২। ধুলিয়ানচর ১নং (এগ্রিঃ)
১২৩। ধুলিয়ানচর ২নং (এগ্রিঃ)
১২৪। ধুলিয়ানচর ৩নং (এগ্রিঃ)
১২৫। ধুলিয়ানচর ৪নং (এগ্রিঃ)
১২৬। ভাঙ্গাতোল্লা

**থানা—ইংলিশ বাজার**

১২৭। পুরাতুলি হাতলপাড়া
১২৮। বুড়াবুড়িতলা

**উত্তর দিনাজপুর**
**মোট কলোনির সংখ্যা-১৪৭**

**থানা—রায়গঞ্জ**

১। নেতাজীনগর কলোনি
২। রোলগোলা সংগ্রামী কলোনি
৩। হাই রোড নলতাপাড়া কলোনি
৪। সুকান্ত পল্লী
৫। অরবিন্দ কলোনি
৬। নেতাজী সুভাষ
৭। শ্যামা কলোনি ১নং
৮। শ্যামা কলোনি ২নং
৯। খামিগাঘাট কলোনি
১০। শিল্পী নগর—২নং
১১। শক্তি নগর—১নং
১২। কসবা বামন কলোনি
১৩। কৈমারী উদ্বাস্তু কলোনি
১৪। মেহারু উদ্বাস্তু কলোনি
১৫। ক্ষুদিরাম উদ্বাস্তু কলোনি
১৬। শক্তিগড় সংগ্রামী কলোনি
১৭। সূর্য সেন উদ্বাস্তু কলোনি
১৮। লক্ষ্মীনিয়া কাঁতার কলোনি
১৯। নেতাজী সুভাষ কলোনি
২০। নারায়ণপুর কলোনি
২১। দক্ষিণ গোয়ালপাড়া কলোনি
২২। গৌরী উদ্বাস্তু কলোনি
২৩। হরেকৃষ্ণ কলোনি
২৪। মহীপুর কলোনি
২৫। আর্যগ্রাম কলোনি
২৬। গুজরহাট কলোনি
২৭। কাঞ্চনপল্লী দক্ষিণপাড়া কলোনি
২৮। অশোকপল্লী
২৯। মানস কলোনি
৩০। নিউ মিলনপাড়া কলোনি
৩১। নেতাজী সুভাষ কলোনি (নসবতপুর)

**থানা—ইসলামপুর**

৩২। শক্তি নগর কলোনি
৩৩। মিলন পল্লী কলোনি
৩৪। সংগ্রামী উদ্বাস্তু কলোনি
৩৫। ইসলামপুর রেলওয়ে কলোনি
৩৬। রাধানগর

৩৭। ফরাবাড়ি জবরদখল কৃষি কলোনি
৩৮। সুকান্ত পল্লী
৩৯। দরিভিটা কলোনি
৪০। মনীন্দ্র পল্লী
৪১। আলিগঞ্জ কলোনি
৪২। মানসিং ভক্তিবিলাস আশ্রম
৪৩। রাহাতপুর কলোনি
৪৪। দিমুরুল্লা কলোনি
৪৫। ক্ষুদিরাম পল্লী কলোনি
৪৬। ধালন্‌চা কলোনি
৪৭। চোপরাঝাড় কলোনি
৪৮। থানা কলোনি
৪৯। পুরাতন স্টেশন আমবাগান
৫০। পুরাতন স্টেশনবাড়ি কলোনি ১
৫১। পুরাতন স্টেশনবাড়ি কলোনি ২
৫২। ভারত উদ্বাস্তু কলোনি
৫৩। রায়পুর পশ্চিম রবীন্দ্র
৫৪। তিমপুল উদ্বাস্তু কলোনি
৫৫। বিবেকানন্দ পল্লী
৫৬। দংপাল কলোনি
৫৭। রামকৃষ্ণপুর কলোনি
৫৮। সুচিয়ালী ঢাকেশ্বরী কলোনি
৫৯। লক্ষ্মীপুর সরকার কলোনি
৬০। কালানাগিন্
৬১। গৈশাল কলোনি

**থানা—করণদীঘি**

৬২। তুনদী দীঘি কলোনি
৬৩। পশ্চিমঘরবানী কলোনি
৬৪। ঘোষপাড়া কলোনি
৬৫। মধ্যঝড়বাড়ি কলোনি
৬৬। পূর্বঝরবাড়ি কলোনি
৬৭। আবদুলপুর কলোনি
৬৮। লোহাপুচি কলোনি
৬৯। রাশখোয়া মালদা কলোনি
৭০। কিক্রাতালি কলোনি
৭১। কৈতার তালপুকুর
৭২। ঘোষপুর নেতাজী কলোনি
৭৩। রাশাখোয়া স্কুলপাড়া
৭৪। পিচলা কলোনি
৭৫। বিকাইর কলোনি
৭৬। আলতাপুর কলোনি
৭৭। সাধনপুর কলোনি
৭৮। সোনাপুর কলোনি
৭৯। তুনিভিটা কলোনি

**থানা—চাকুলিয়া**

৮০। দিহুতি বালুরবাঁধ কলোনি
৮১। পূর্ব মধুশেখর কলোনি
৮২। মধুশেখর (পশ্চিম)
৮৩। কমলপুর কলোনি
৮৪। ডুমুরিয়া কলোনি
৮৫। হাসানপুর কলোনি
৮৬। আসুহড়াগড় কলোনি
৮৭। বরা কলোনি
৮৮। সুরশাপুর কলোনি
৮৯। শিখার কলোনি
৯০। ভক্তিরায় কলোনি
৯১। রামকৃষ্ণ কলোনি
৯২। বিধান পল্লী

**থানা—গোয়াল পুকুর**

৯৩। তেলিয়াপুকুর কলোনি
৯৪। কাঞ্চনশ্রী আদিবাসী কলোনি
৯৫। পাকুরিয়া আদিবাসী কলোনি
৯৬। গড়গাছা কৃষিজীবী আদিবাসী
৯৭। হাসকুণ্ড কৃষিজীবী আদিবাসী
৯৮। ডাঙ্গিপাড়া শ্রীপুর কলোনি
৯৯। নন্দঝড় কলোনি
১০০। পামাল উদ্বাস্তু কলোনি
১০১। ভাতার উদ্বাস্তু কলোনি
১০২। হরেকৃষ্ণ কোণ্ডার উদ্বাস্তু
১০৩। ডুবকল উদ্বাস্তু কলোনি
১০৪। ধুবিল বিবেকানন্দ
১০৫। গান্ধী কলোনি
১০৬। শান্তি উদ্বাস্তু কলোনি
১০৭। নেতাজী সুভাষ বসু কলোনি
১০৮। রায়পুর পূর্ব বিজয় কলোনি
১০৯। গোপালগঞ্জ কলোনি
১১০। ধরমপুর কলোনি
১১১। শান্তিনগর
১১২। জিমনাথপুর আদিবাসী
১১৩। পারিহাল পুর আদিবাসী
১১৪। আতঘরি আদিবাসী কলোনি
১১৫। গোয়ালী আদিবাসী কলোনি

১১৬। ভাঙ্গনবাড়ি আদিবাসী কলোনি
১১৭। চাকলাগড় আদিবাসী কলোনি
১১৮। কুকরাদহ আদিবাসী কলোনি
১১৯। দক্ষিণ আমবারি আদিবাসী কলোনি

**থানা—চাপড়া**

১২০। চাপড়া রামকৃষ্ণ আদিবাসী কলোনি
১২১। ভগবতী উদ্বাস্তু কলোনি
১২২। মালাবাড়ী কৃষিজীবী জবরদখল উদ্বাস্তু কলোনি
১২৩। মোলানিগঞ্জ কৃষিজীবী জবরদখল উদ্বাস্তু কলোনি
১২৪। সীতপারা কৃষিজীবী জবরদখল উদ্বাস্তু কলোনি
১২৫। মোনলানি আদিবাসী কৃষিজীবী জবরদখল উদ্বাস্তু কলোনি
১২৬। মোল্লুকডাঙ্গা কৃষিজীবী জবরদখল উদ্বাস্তু কলোনি
১২৭। ললিতগঞ্জ কৃষিজীবী উদ্বাস্তু কলোনি
১২৮। সোলদিঘী কৃষিজীবী জবরদখল উদ্বাস্তু কলোনি
১২৯। ভোসভিতি কৃষিজীবী জবরদখল উদ্বাস্তু কলোনি
১৩০। কলাগাচ কৃষিজীবী জবরদখল উদ্বাস্তু কলোনি
১৩১। খুনিয়া কৃষিজীবী জবরদখল উদ্বাস্তু কলোনি

**থানা—ঘোষপুকুর**

১৩২। মঙ্গলবাড়ি

**থানা—হেমতাবাদ**

১৩৩। হেমতাবাদ হরিচাঁদ কলোনি
১৩৪। সুরঙ্গপুর কলোনি
১৩৫। কাশিমপুর কলোনি
১৩৬। ইসলামপুর আদর্শ উদ্বাস্তু কলোনি

**থানা—কালিয়াগঞ্জ**

১৩৭। কালীতলা কলোনি
১৩৮। শান্তি উদ্বাস্তু কলোনি
১৩৯। পাবনা উদ্বাস্তু কলোনি
১৪০। পিরপুকুর বিবেকানন্দ

**থানা—বংশিহারি**

১৪১। বিশ্বনাথপুর কলোনি
১৪২। শিয়ালদহ কলোনি
১৪৩। করই উদ্বাস্তু কলোনি
১৪৪। হিংগুর কালিতলা
১৪৫। রামকৃষ্ণ কলোনি

**থানা—ডালখোলা**

১৪৬। সূর্যনগর কলোনি

**থানা—দেবীঝোড়া**

১৪৭। কাঁচাকলি কৃষিজীবী জবরদখল উদ্বাস্তু কলোনি

**দক্ষিণ দিনাজপুর**

**মোট কলোনির সংখ্যা-৪০**

**থানা—বালুরঘাট**

১। রানীনগর
২। মঙ্গলপুর আশ্রম কলোনি
৩। ফুলঘরা কলোনি
৪। সুকান্ত পল্লী
৫। মজুমদার স্মৃতি কলোনি
৬। দিগরা কলোনি
৭। হরিগ্রাম গোপালবতী কলোনি
৮। ডাকবাংলাপাড়া বিবেকানন্দ কলোনি
৯। সাহেব কাছারি ধীরেন ব্যানার্জি সমিতি
১০। ধুলাতাইর উদ্বাস্তু কলোনি
১১। করিমগুতিন মহাতীর্থ
১২। তুর্সিল দক্ষিণপাড়া
১৩। বাদামিক পুরাতন কলোনি
১৪। মধ্য খাদিমপুর কালিতলা ভেস্ট কলোনি
১৫। শিবনাথ কলোনি
১৬। খিদিরপুর হালদারপাড়া কলোনি
১৭। বাউল আদিবাসী কলোনি
১৮। সহদেব কলোনি
১৯। ডাকরা উত্তর কলোনি
২০। পাগলিগঞ্জ অউটর কলোনি
২১। উত্তর শতখণ্ড কলোনি
২২। অমতি খণ্ড কলোনি (পশ্চিম)
২৩। মালঞ্চ কলোনি
২৪। শংকরপুর কলোনি
২৫। নুন-ইল—আদিবাসী
২৬। মইদপুর কলোনি
২৭। মিলন মন্দির কলোনি
২৮। হরিগ্রাম উত্তরপাড়া কলোনি

২৯। হরিগ্রাম মধ্যপাড়া
৩০। গোপালবতী আদিবাসী
৩১। বড়াখাইল কলোনি
৩২। হরিগ্রাম আদিবাসী
৩৩। মনিপুর উত্তরপাড়া কলোনি

**থানা—তপন**

৩৪। অরেন্দা কলোনি
৩৫। নিমগাচী (ডোবা) কলোনি
৩৬। খলসি (ডোবা) কলোনি
৩৭। তপন স্কুলমোড় কলোনি

**থানা—গঙ্গারামপুর**

৩৮। প্রমোদ উদ্বাস্তু কলোনি
৩৯। পি ডবলু ডি পাড়া কলোনি
৪০। মহারাজপুর স্কুলপাড়া

# সরকারি পুনর্বাসন কলোনি

**জেলা উত্তর ২৪ পরগনা**
**মোট কলোনির সংখ্যা-২৫৯**

**বারাসাত মহকুমা**

১। বারাসাত (বারাসাত)
২। বনমালীপুর নোয়াপাড়া
৩। বালুরিয়া
৪। গঙ্গানগর—২
৫। নোয়াপাড়া
৬। রামকৃষ্ণপুর
৭। গোপালপুর
৮। ঘুচুরিয়া চক্রঘাটা
৯। হরিহরপুর—১
১০। আবদুলপুর
১১। আলগরিয়া
১২। কয়ড়া (বারাসাত)
১৩। পশ্চিম ইছাপুর
১৪। হাদিপুর চুপরিঝোড়া
১৫। গঙ্গানগর—১
১৬। সুবর্ণপুর
১৭। আমিনপুর
১৮। আজিজনগর
১৯। ভাশিলা—১
২০। ভাশিলা—২
২১। নেবাধাই—১
২২। নেবাধাই—২
২৩। ঝিকরা
২৪। যাদবপুর/ বোয়ালিয়া
২৫। বৈকুণ্ঠপুর মদনপুর
২৬। ধনিয়া
২৭। দেয়াড়া
২৮। রেকযোয়ানী
২৯। রাজবল্লভপুর
৩০। বড়বেড়িয়া
৩১। মল্লিকবেড়িয়া
৩২। হরিহরপুর—২
৩৩। দিগরা তালসা
৩৪। পাটডাঙ্গা
৩৫। কেওটাসেনডাঙ্গা
৩৬। সলুয়া উলুডাঙ্গা—১, ২, ৩
৩৭। কুমারডাঙ্গা নাতনি
৩৮। গোবরডাঙ্গা—১
৩৯। গোবরডাঙ্গা—২
৪০। বাঁশপুল—১
৪১। বাঁশপুল—২
৪২। কাঁকপুল
৪৩। জয়গাছি
৪৪। বাইগাছি
৪৫। মধ্যমগ্রাম
৪৬। কয়াডাঙ্গা
৪৭। বনবনিয়া
৪৮। আসরাফাবাদ
৪৯। হাবড়া সাব—স্কীম ১, ২
৫০। হাবড়া সাব—স্কীম ৮
৫১। হাবড়া সাব—স্কীম ২
৫২। হাবড়া সাব—স্কীম ৬
৫৩। হাবড়া সাব—স্কীম ৫
৫৪। হাবড়া সাব—স্কীম ৩
৫৫। দোহারিয়া সাহারা
৫৬। হাবড়া টাউনশিপ (অশোক নগর)
৫৭। হাবড়া (টোবাবেরিয়া)
৫৮। হাবড়া প্রোডাকসান সেন্টার
৫৯। বড়বেড়িয়া রতনপুর

**ব্যারাকপুর মহকুমা**

৬০। বন-হুগলি
৬১। নন্দননগর
৬২। উত্তর নিমতা ২
৬৩। ঘোলা নাটাগড়
৬৪। রামভদ্রবাটী

৬৫। শান্তিনগর
৬৬। জাফরপুর
৬৭। আগাপুর-কোদালিয়া-মাসুন্দা
৬৮। বরানগর নোয়াপাড়া
৬৯। টিটাগড়
৭০। খড়দহ ২
৭১। রহড়া
৭২। পানিহাটি
৭৩। সুখচর (মেইন)
৭৪। সুখচর ২
৭৫। সুখচর ৩
৭৬। সোদপুর তারাপুকুরিয়া
৭৭। সোদপুর ডেভেলপমেন্ট
৭৮। কাঁদিহাটি
৭৯। মাঠকলগড়ুই, দমদম
৮০। উত্তর নিমতা ৫
৮১। বেলঘরিয়া ১
৮২। বেলঘরিয়া ৪
৮৩। আড়িয়াদহ কামারহাটী
৮৪। নাটাগড়
৮৫। পানশিলা—১
৮৬। পানশিলা—২
৮৭। মামুদপুর
৮৮। ভাটপাড়া
৮৯। আতপুর সুন্দিয়া
৯০। খাসবাটী
৯১। মনিরামপুর
৯২। নোয়াপাড়া (সাপ্লি)-১
৯৩। পানপুর (সাপ্লি)
৯৪। নোয়াপাড়া (সাপ্লি)
৯৫। হালিশহর—২
৯৬। হালিশহর—৩
৯৭। চন্দনপুকুর—১
৯৮। চন্দনপুকুর (সাপ্লি)
৯৯। ইছাপুর—৩
১০০। ইছাপুর—৫
১০১। ইছাপুর (উইভার্স)
১০২। শ্যামনগর ভারত হাউসিং
১০৩। গারুলিয়া ফিসারম্যান
১০৪। গারুলিয়া নোয়াপাড়া
১০৫। গড়-শ্যামনগর—১
১০৬। শ্যামনগর—২
১০৭। শ্যামনগর—৩
১০৮। গুরদহ—১
১০৯। গুরদহ—২
১১০। গুরদহ কাওগাছি
১১১। রাহুতা
১১২। আতপুর মুলাজোড়
১১৩। কাঁকিনাড়া গোস্বামী ওয়ার্ডস্টেট
১১৪। কাঁকিনাড়া স্থিরপাড়া
১১৫। নারায়ণপুর
১১৬। মাদ্রাইল
১১৭। কোনা—১, ২
১১৮। কোনা—৩
১১৯। নান্না
১২০। হালিশহর—১
১২১। হালিশহর মল্লিকেরবাগ
১২২। মল্লিকেরবাগ
১২৩। বেলঘরিয়া—৬
১২৪। খড়দহ-রহড়া
১২৫। রহড়া-পাতুলিয়া
১২৬। কেরুলিয়া বন্দিপুর
১২৭। আগরপাড়া—৪
১২৮। আগরপাড়া—৫
১২৯। পানিহাটী (সাপ্লি)
১৩০। সোদপুর—৩
১৩১। আহারামপুর মাসুন্দা
১৩২। তারাপুকুরিয়া
১৩৩। উত্তর নিমতা—৪
১৩৪। উত্তর নিমতা—২
১৩৫। বেলঘরিয়া—২
১৩৬। বহ-হুগলি, তালবাগান
১৩৭। বন-হুগলি—২
১৩৮। কালিদহ (দমদম)
১৩৯। আগাপুর কোদালিয়া (মাসুন্দা) সাপ্লি
১৪০। বন-হুগলি—৩
১৪১। হরিণঘাটা
১৪২। বন-হুগলি—৪
১৪৩। টিটাগড় প্রাইমারি সেন্টার
১৪৪। পানপুর

**বসিরহাট মহকুমা**

১৪৫। বসিরহাট—১

১৪৬। বসিরহাট—২
১৪৭। বসিরহাট—৩
১৪৮। দণ্ডীরহাট
১৪৯। মালঙ্গাপাড়া
১৫০। গোকুলপুর
১৫১। চণ্ডীপুর (বাদুরিয়া)
১৫২। গোবরা তরণীপুর
১৫৩। পূর্ব পলতা—১
১৫৪। পূর্ব পলতা—২
১৫৫। মথুরাপুর
১৫৬। আঁধার মানিক
১৫৭। পুনরা
১৫৮। গোবিন্দপুর
১৫৯। নলবেরা—১
১৬০। নলবেরা—২
১৬১। মেদিয়া
১৬২। চণ্ডীপুর—২
১৬৩। রসুই
১৬৪। গোড়াগাছা
১৬৫। দক্ষিণ চাতরা
১৬৬। উমাপতিপুর
১৬৭। বেনা
১৬৮। নেওয়াদিঘী
১৬৯। কোটাল বাগ

**বনগাঁ মহকুমা**

১৭০। বনগাঁ—১
১৭১। চাঁপাবেড়িয়া
১৭২। বনগাঁ চাঁপাবেড়িয়া
১৭৩। হেলেঞ্চা কলোনি
১৭৪। চাঁদপুর
১৭৫। হেলেঞ্চা—২
১৭৬। খোরদা কুলবেড়িয়া
১৭৭। বৈচিডাঙ্গা
১৭৮। কুলবেড়িয়া
১৭৯। জিয়ালা স্কীম
১৮০। ট্যাংরা
১৮১। চড়ুইগাছি
১৮২। অঙ্গার পুকুর স্কীম
১৮৩। বোয়ালদা
১৮৪। কমলাপুর
১৮৫। পানচিতা
১৮৬। বেদিয়াপোতা
১৮৭। সুঁটিয়া
১৮৮। ট্যাংরা—২
১৮৯। বাংলানী
১৯০। পাটসিমুলিয়া
১৯১। ট্যাংরা ক্যাম্প স্কীম
১৯২। কুমারখোলা
১৯৩। তেঘরি
১৯৪। আউশঘাটা
১৯৫। বৈখোলা
১৯৬। আষাঢ়ু
১৯৭। কুমারখোলা—২
১৯৮। মণ্ডবঘাটা
১৯৯। ধলানি স্কীম
২০০। সিন্দ্রানি
২০১। ঝাউডাঙ্গা
২০২। পাঁচপোতা
২০৩। বাক্‌শা
২০৪। রামপুর
২০৫। ভবানীপুর কুলিয়া
২০৬। সন্তোষা
২০৭। মাগুরকোণা
২০৮। চরমণ্ডলবাগ
২০৯। হাঁসপুর শিমুলিয়া
২১০। পাথুরিয়া
২১১। হাঁসপুর মরালডাঙ্গা
২১২। জয়তারা
২১৩। রামনগর
২১৪। শশাডাঙ্গা
২১৫। কুলধরপুর
২১৬। নৃসিংহখোলা
২১৭। আংরাইল
২১৮। হামকুড়া
২১৯। মামা-ভাগিনা
২২০। আকাইপুর নতিডাঙ্গা
২২১। মামুদপুর দমদমা
২২২। মশ্যমপুর
২২৩। আকাইপুর-দরবাসিনি
২২৪। কোলা
২২৫। ভরতপুর
২২৬। নীলদর্পণ

২২৭। সিংজোল
২২৮। রামপুর
২২৯। মণ্ডবঘাটা
২৩০। পারমাদন-পাথুরিয়া-টাকশিলা
২৩১। রামচন্দ্রপুর

**সংযুক্তি**

২৩২। উত্তর পাটনা
২৩৩। আগরপাড়া—২
২৩৪। তারাপুকুরিয়া
২৩৫। বাসুদেবপুর স্কীম
২৩৬। কাঁকিনাড়া মণ্ডলপাড়া
২৩৭। ঘোলা উত্তর হাট
২৩৮। মহাপ্রভু কলোনি
২৩৯। সুভাষপল্লী
২৪০। রামকৃষ্ণপল্লী
২৪১। সারদাপল্লী
২৪২। পদ্মপুকুর পাড়
২৪৩। কেশবপল্লী
২৪৪। আনন্দপল্লী
২৪৫। শাস্ত্রীজীপল্লী
২৪৬। নবপল্লী
২৪৭। পশ্চিম ইছাপুর
২৪৮। সোনাডাঙা—১
২৪৯। সোনাডাঙা—২
২৫০। রতনপুর
২৫১। গঙ্গানগর এক্স ক্যাম্প
২৫২। বর্ণবেড়িয়া এক্স ক্যাম্প
২৫৩। রামপুর এক্স ক্যাম্প
২৫৪। আংরাইল
২৫৫। পাথুরিয়া পারমাদনলোক
২৫৬। রঘুবীরপুর
২৫৭। হোমকুড়া
২৫৮। পাঁচপোতা এক্স ক্যাম্প
২৫৯। বালতিয়া এক্স ক্যাম্প (হাড়োয়া)

**দক্ষিণ ২৪ পরগনা**

**মোট কলোনির সংখ্যা-৫৯**

১। পূর্ব বরিষা—৫
২। পূর্ব বরিষা—১
৩। কন্যানগর
৪। গড়িয়া লস্করপুর
৫। গাঙ্গুলি বাগান
৬। পাড়ুই
৭। দেবীপুর গুড়গুড়িয়া
৮। মৌখালি-কুমারখালি
৯। হেড়োভাঙ্গা ১নং স্কীম
১০। লস্করপুর
১১। সোনারপুর আরপাঁচ ১
১২। কুলটি আউটফল স্কীম—১
১৩। কুলটি আউটফল স্কীম—২
১৪। কুলটি আউটফল স্কীম—৩
১৫। কুলটি আউটফল স্কীম—৪
১৬। কুলটি আউটফল স্কীম—৫
১৭। কুলটি আউটফল স্কীম—৬
১৮। বাঙ্গাল জগতলা
১৯। সন্তোষপুর
২০। পূর্ব বরিষা—৩
২১। সৈয়দপুর
২২। সিরিটি
২৩। বাসুদেবপুর—১
২৪। সরখেলহাট—২
২৫। রামনারায়ণপুর তালুক
২৬। পশ্চিম ববিষা—১
২৭। পশ্চিম বরিষা—৪
২৮। বাসুদেবপুর পশ্চিম বরিষা
২৯। বাসুদেবপুর—১
৩০। গঙ্গারামপুর
৩১। দক্ষিণ বেহালা—৩
৩২। বোড়াল
৩৩। জগদ্দল সোনারপুর
৩৪। রাজপুর বৈকুণ্ঠপুর
৩৫। বাবহাসফরতাবাদ
৩৬। চৌহাটী
৩৭। রায়পুর—২
৩৮। নাকতলা—১
৩৯। নাকতলা—২
৪০। বৈষ্ণবঘাটা—২
৪১। বাঁশদ্রোণী
৪২। বাঁশদ্রোণী চাকদা (সাপ্লিমেন্টারি)
৪৩। বাঁশদ্রোণী চাকদা—২
৪৪। কামডহরী
৪৫। ব্রহ্মপুর

৪৬। কসবা
৪৭। বেহালা স্কীম (আলিপুর এয়ারফিল্ড)
৪৮। মুরাদপুর, বেহালা
৪৯। মুরাদপুর—২
৫০। পঞ্চান্ন গ্রাম ১
৫১। উত্তরভাগ
৫২। বেগমপুর
৫৩। মুরাদপুর—১
৫৪। সরখেলাহাট
৫৫। পঞ্চান্ন গ্রাম—২
৫৬। পঞ্চান্ন গ্রাম—৩
৫৭। পঞ্চান্ন গ্রাম—৪
৫৮। পঞ্চান্ন গ্রাম—৫
৫৯। রাজপুর এক্স ক্যাম্প

**নদীয়া জেলা**
**মোট কলোনির সংখ্যা-৫৮**

১। লিচুতলা
২। জাগুলি
৩। কপিলেশ্বর দিঘা
৪। চাকদা
৫। খোসবাসপুর
৬। হামিদপুর
৭। গয়েশপুর
৮। গোকুলপুর
৯। কাটাগঞ্জ—১
১০। কাটাগঞ্জ—২
১১। কাটাগঞ্জ—৩
১২। কাটাগঞ্জ—৪
১৩। কাটাগঞ্জ—৫
১৪। মাঝের চর
১৫। সগুনা গ্রিনবেল্ট
১৬। গয়েশপুর (আরবান)

**কৃষ্ণনগর মহকুমা**

১৭। কৃষ্ণনগর কলোনি
১৮। কালীনগর
১৯। ধুবুলিয়া
২০। আমঘাটা—১
২১। আমঘাটা—২
২২। বেলপুকুর পলতা
২৩। কামারহাটী লোহাগাছী
২৪। জায়ঘাটা
২৫। বগুলা মুড়াগাছা
২৬। গুটিয়া
২৭। বেথুয়াডহরি
২৮। কাটালিয়া
২৯। রহমতপুর
৩০। রসিকপুর
৩১। হরেকৃষ্ণপুর
৩২। আউশতুল্লা নগর
৩৩। মোবারকপুর
৩৪। চর মাজদিয়া

**রানাঘাট মহকুমা**

৩৫। তাহেরপুর
৩৬। রানাঘাট রথতলা
৩৭। কুপার্স আরবান
৩৮। নাসরা
৩৯। পাঁচবেড়িয়া
৪০। কুপার্স এ ও বি
৪১। বারবেড়িয়া
৪২। রূপশ্রী পল্লী স্কীম
৪৩। চাকুডাঙ্গা

**শান্তিপুর**

৪৪। নৃসিংহপুর
৪৫। গোবিন্দপুর ১ সাপ্লি
৪৬। গোবিন্দপুর ৩ সাপ্লি
৪৭। গোবিন্দপুর ৪
৪৮। কৃষ্ণনগর সংযুক্তি
৪৯। শ্রীদুর্গা
৫০। কুপার্স আর, আই, সি
৫১। ধুবুলিয়া হাটমেন্ট
৫২। ধুবুলিয়া—২
৫৩। ধুবুলিয়া—৩
৫৪। ধুবুলিয়া—৪
৫৫। ধুবুলিয়া—৫
৫৬। ধুবুলিয়া—৬
৫৭। কুপার্স এক্স ক্যাম্প

**মুর্শিদাবাদ**
**মোট কলোনির সংখ্যা-২৭**

**বহরমপুর মহকুমা**

১। মধুপুর—১

২। বিষ্ণুপুর
৩। বেনজাতিয়া—২
৪। হাতিনগর
৫। মাদাপুর
৬। বৈরগাচী—১
৭। বৈরগাচী—৩
৮। গোয়ালজান
৯। চালতিয়া
১০। বেনজাতিয়া
১১। মুক্তিনগর
১২। বৈরগাচী—২
১৩। খিদিরপুর
১৪। শিবপুর
১৫। মহালান্দী, বহরমপুর
১৬। কুলবেড়িয়া
১৭। বরুয়া সারুলিয়া
১৮। কুরমিতলা
১৯। আমাইপাড়া
২০। বাগদাহার
২১। মধুপুর—২
২২। আয়েশাবাগ
২৩। ধুসরিপাড়া
২৪। পুরাপাড়া
২৫। রঘুনাথগঞ্জ
২৬। বাগডাহর (অংশ—১)
২৭। বরুয়া সারুলিয়া নং—২

**হাওড়া জেলা**

১। বাঁকড়া ধরসা

**হুগলি জেলা**

**মোট কলোনির সংখ্যা-৬০**

**শ্রীরামপুর মহকুমা**

১। মাখলা—১
২। মাখলা—২
৩। কোতরং—১
৪। কোতরং—২
৫। কানাইপুর
৬। রিষড়া—১
৭। রিষড়া—৩
৮। সুভাষনগর
৯। রাজ্যধরপুর
১০। শেওড়াফুলি—১
১১। শেওড়াফুলি—২
১২। শেওড়াফুলি (সাপ্লি)
১৩। দীর্ঘাঙ্গা
১৪। সুভাষনগর (বারুজীবী স্কীম)

**সদর মহকুমা**

১৫। কৃষ্ণপুর চন্দনপুর
১৬। কাপাসডাঙ্গা ১ ও ২
১৭। মিয়ারবেড়
১৮। নলডাঙ্গা নারায়ণপুর
১৯। বলাগড়
২০। রবীন্দ্রনগর
২১। কেওটা—১
২২। কেওটা—২
২৩। কেওটা—৩
২৪। মিরডাঙ্গা
২৫। সোমরা
২৬। জিরাট—১
২৭। জিরাট—২
২৮। আইদাকিসমত
২৯। বলাগড়
৩০। বংশবেড়িয়া—২
৩১। বংশবেড়িয়া
৩২। নগরপাড়া
৩৩। শংখনগর
৩৪। সারাই
৩৫। মহানাদ
৩৬। রামনাথপুর
৩৭। দক্ষিণপাড়া
৩৮। দিংগলহাট আদিসপ্তগ্রাম
৩৯। চুঁচুড়া
৪০। চম্পাহাটী
৪১। বল্লভপুর
৪২। তালবানা

**চন্দননগর মহকুমা**

৪৩। কুলিহান্দা
৪৪। ভদ্রেশ্বর
৪৫। ভদ্রেশ্বর—২
৪৬। খরিগাচী
৪৭। সারদাপল্লী

৪৮। চন্দননগর খলিসানি—১
৪৯। লিচুনগর—১
৫০। চন্দননগর—১
৫১। চন্দননগর—২
৫২। চন্দননগর—৩
৫৩। চন্দননগর—৪
৫৪। উত্তর চন্দননগর
৫৫। মানকুণ্ডু ভদ্রেশ্বর
৫৬। বন্ধু বলাগড়
৫৭। বারসাই
৫৮। টিনা এক্স ক্যাম্প সাইট
৫৯। টিনা এক্স ক্যাম্প
৬০। বলাগড় এক্স ক্যাম্প

**বর্ধমান জেলা**

**মোট কলোনির সংখ্যা-২৬**

**আসানসোল মহকুমা**

১। আসানসোল—২
২। আসানসোল—৩
৩। রানীগঞ্জ
৪। বীরভানপুর
৫। নারসামুদা
৬। বোগরা
৭। সোলানপুর
৮। বেরা
৯। মোহিশিলা
১০। পুরুষোত্তম নগর
১১। কুলিয়াপুর-দিহিকা-চাপরাদি

**সদর বর্ধমান মহকুমা**

১২। বেদিয়াডাঙ্গা
১৩। নারী
১৪। ভাতশালা
১৫। ইচ্‌লাবাদ—১
১৬। ইচ্‌লাবাদ—২
১৭। শাঁখারিপুকুর
১৮। কুরুল
১৯। উরো
২০। কাঁকসা
২১। গোপালপুব
২২। মানকব
২৩। নবাব নগর
২৪। বালিডাঙ্গা
২৫। সাঁকো
২৬। পাল্লা চাচই
২৭। মহেশ ডাঙা

**মেদিনীপুর জেলা**

**মোট কলোনির সংখ্যা-৫৪**

**মেদিনীপুর সদর মহকুমা**

১। মেদিনীপুর টাউন এক্সটেনশন
২। তালবাগিচা ব্লক 'এ'
৩। ঝাড়গ্রাম
৪। কেলেঘাই—১, ২
৫। গড়বেতা

**মহকুমা—সদর নর্থ**

৬। খররুল্লাচক
৭। তালবাগিচা 'বি' এবং 'সি'
৮। চণ্ডীপুর গোলঘরিশা
৯। দক্ষিণসোল
১০। বাঁশদা কাঁকবাপুঁজি
১১। চন্দ্রকোনা
১২। কদমদিহী
১৩। মহাসোল
১৪। আমসোল
১৫। পূর্ব কবমসোল
১৬। পশ্চিম করমসোল
১৭। নারায়ণপুর
১৮। নবকোপা
১৯। নীলগঞ্জ পূর্ব
২০। তুলসীচাটি—১
২১। তুলসীচাটি—২
২২। বামনীসোল
২৩। বাগরিডিহি
২৪। পিয়াসালা
২৫। লডাগামার—১
২৬। লডাগামার—২
২৭। লডাগামার—৩
২৮। ঝলঝলি
২৯। তালডাঙরা
৩০। ভেনুয়া সাহেবডাঙা
৩১। আমচাপা
৩২। রাংতা

৩৩। ভুলা—১
৩৪। ভুলা—২
৩৫। ভেঙাদহ পূর্ব
৩৬। ভেঙাদহ পশ্চিম
৩৭। ভেঙাদহ মধ্য
৩৮। সাতবিন্দা
৩৯। খড়কাটা পূর্ব
৪০। খড়কাটা দক্ষিণ
৪১। কেশিয়া
৪২। গুপ্তমনি
৪৩। কাতুই মারো
৪৪। নীলগঞ্জ পশ্চিম
৪৫। প্রতাপপুর
৪৬। মানিকঘটিয়া
৪৭। চুন পাড়া
৪৮। ইণ্ডিখাঁরা
৪৯। ইটেমারা
৫০। বাঁকরা
৫১। নাইকান সোল
৫২। বিলেনান্দ্র কোনা রোড
৫৩। কলাবনি
৫৪। সরাশাঙ্কা

**বীরভূম জেলা**

১। চিনপাই
২। বৈয়াসপুটে
৩। বোলপুর আমবাগান
৪। শেখরপুর
৫। ইলামবাজার
৬। পুকুরোয়ারা
৭। কোয়ারপুর

**বাঁকুড়া জেলা**

১। লোকপুর প্রভাতপুর

**জলপাইগুড়ি**

১। দেবগ্রাম
২। পাতকাটা
৩। মাসকালাই বাড়ি
৪। মাসকালাইবাড়ি এক্সটেনশন
৫। পানডাপাড়া
৬। বেলাকোভা
৭। ধাবগঞ্জ
৮। বেরুবাড়ি
৯। তালমা রিভারসাইড
১০। তালমা সাতখামার
১১। শক্তিগড় জি, এস,
১২। শক্তিগড় জি, এস, এক্স
১৩। মোতিনগর জি, এস, (এগ্রি)
১৪। তাতাপুর এগ্রি কলোনি

**কুচবিহার**

**সদর মহকুমা**

১। তালুকচক—১
২। তালুকচক—২
৩। তালুকচক—৩
৪। রূপসি
৫। চকচকা মার্কেট
৬। তালুক গুড়িহাটী
৭। তালুকবরা আতিয়াবাড়ি রাধানগর
৮। নিজামনগর
৯। ভাঙাই—১
১০। কোদালদহ
১১। দরিবাগ কলোনি
১২। ভাঙানি—২
১৩। জোড়াই—'এ'
১৪। জোড়াই—'সি'
১৫। জোড়াই—'এফ'
১৬। কাসিয়াবাড়ি কোঅপারেটিভ

**জেলা—দার্জিলিং**

১। ডাবগ্রাম—১
২। ডাবগ্রাম—২
৩। চাওপুখুরিয়া
৪। মাটিগড়া

**জেলা—মালদহ**

১। সরবরি
২। মোকাতিপুর
৩। বেচামারী
৪। সাহাপুর
৫। বাজীতপুর
৬। জলকরবিথান
৭। অমৃতী
৮। পিরোজপুর—১

৯। পিরোজপুর—২
১০। পিবোজপুর—৩
১১। মোসালদা
১২। মোবারকপুর—১
১৩। মোবারকপুর—২
১৪। চক বাহাদুরপুর
১৫। কানদারান

## পশ্চিম দিনাজপুর

### বালুরঘাট মহকুমা

১। ইন্দ্রনারায়ণপুর
২। বালুপারা

### ইসলামপুর মহকুমা

৩। শিবনগর
৪। শ্রীকৃষ্ণপুর
৫। রমেশপুর
৬। ঠাকুরনগর
৭। গৈসাল
৮। অজিতবাস কলোনি
৯। স্টেট ফার্ম
১০। আব্রাহামপুর
১১। নিরাপদনগর
১২। রাজুলডাটা

# সংযুক্তি কলোনি

## উত্তর ২৪ পরগনা জেলা

বাগজোলা ক্যাম্প

কৃষ্ণপুর ও চণ্ডীবেড়িয়া মৌজা

১। ক্যাম্প—১
২। ক্যাম্প—২
৩। ক্যাম্প—৩
৪। ক্যাম্প—৪
৫। ক্যাম্প—৫
৬। ক্যাম্প—৬
৭। ক্যাম্প—৭
৮। ক্যাম্প—৮
৯। ক্যাম্প—৯
১০। ক্যাম্প—১০
১১। ক্যাম্প—১১

**বসিরহাট মহকুমা**

১২। বালতিয়া

**বারাসাত মহকুমা**

**১৩। তাবাবেড়িয়া**

## দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা

১। সোনারপুর ক্যাম্প—১
২। সোনারপুর ক্যাম্প—২
৩। সোনারপুর ক্যাম্প—৩
৪। সোনারপুর ক্যাম্প—৪
৫। রাজপুর বাজার
৬। পঞ্চান্ন গ্রাম—১
৭। পঞ্চান্ন গ্রাম—২
৮। পঞ্চান্ন গ্রাম—৩
৯। পঞ্চান্ন গ্রাম—৪

## জেলা নদীয়া

১। কুপার্স ক্যাম্প
২। চাঁদমারী

## জেলা হুগলি

১। বলাগড় রেলওয়ে সাইট
২। বাসাই

## হাওড়া জিলা

১। জগাছা
২। লিলুয়া—২
৩। চকপাড়া
৪। পোদরা
৫। গুয়াবেড়িয়া
৬। জগৎবল্লভপুর
৭। সাক্রাহাতী—২
৮। শ্যামসুন্দরচক
৯। উত্তর বাকসারা—১
১০। বালী নিসচিন্দা—১
১১। বালী নিসচিন্দা—২
১২। বালী অভয়নগর
১৩। বালী সাঁপুইপাড়া
১৪। সাক্রাহাতী—১
১৫। সাত্রাগাছি
১৬। পুলিয়া উনসানি
১৭। বাউরিয়া—১
১৮। বাউরিয়া—২
১৯। বলরামপোতা
২০। উত্তর বাঁকসারা—২
২১। বেলগাচী
২২। বেলগাছিয়া কিসমেত

## জেলা বর্ধমান

১। নবাব নগর
২। কাশিপুর
৩। রামচন্দ্রপুর

## বীরভূম জেলা

**সদর মহকুমা**

১। হাটজান বাজার

**সাঁইথিয়া মহকুমা**

২। কালিকাপুর
৩। তাঁতাপুর
৪। মুড়াদিহী

৫। বালসুন্দা
৬। উত্তর বামনিগ্রাম
৭। উত্তর তিলপাড়া
৮। কুরমশা
৯। শামরঘাটা
১০। পলাশডাঙ্গা
১১। কাগাস সুগারকেন
১২। পশ্চিম সাহাপুর

**বাঁকুড়া জেলা**

**সদর মহকুমা**

১। পার্বতীপুর লিকেপুর
২। মেতালা

# প্রাইভেট কলোনি

## উত্তর ২৪ পরগনা

### ব্যারাকপুর মহকুমা

১। নবনগর
২। নবনগর লিচুবাগান
৩। চিত্তরঞ্জন কলোনি
৪। পানবস্তি কল্যাণগড়
৫। দেশবন্ধু কলোনি
৬। রামকৃষ্ণনগর
৭। বৈকুণ্ঠনগর
৮। নবারুণ পল্লী
৯। প্রসাদনগর
১০। হরিনগর
১১। পল্লীমঙ্গল
১২। পিয়ারাতলা কলোনি
১৩। বঙ্কিমনগর
১৪। রবীন্দ্রপল্লী
১৫। গুরদহ নিউ কলোনি
১৬। নেতাজী সুভাষনগর
১৭। বামনপাড়া
১৮। উষুমপুর পল্লী
১৯। আদর্শপল্লী
২০। শ্রীরামনগর
২১। অমরাপুরি

### বারাসাত মহকুমা

২২। রাজা রামমোহন পল্লী
২৩। রামকৃষ্ণ পল্লী
২৪। বনমালীপুর
২৫। কালিকাপুর
২৬। বিজয়নগর
২৭। মনোরঞ্জন পল্লী
২৮। কৈলাসনগর
২৯। শক্তিনগর
৩০। অশ্বিনীপল্লী
৩১। বাঁধাঘাট যমুনা
৩২। অখিলপল্লী
৩৩। সুভাষপল্লী
৩৪। সরকারপাড়া
৩৫। বড়াবেড়িয়া শ্রীমা
৩৬। সেনডাঙ্গা রাজেন্দ্র সিকদার
৩৭। প্রসাদপুর

### বসিরহাট মহকুমা

৩৮। বিনোদ কলোনি
৩৯। গোয়ালপোতা
৪০। মহামায়া কলোনি
৪১। আরবেলিয়া
৪২। দ্বীপ মেদিয়া

### বনগাঁ মহকুমা

৪৩। দেবগড়
৪৪। শক্তিগড়
৪৫। প্রতাপগড়
৪৬। ঢাকাপাড়া
৪৭। সুভাষনগর
৪৮। ঠাকুরনগর
৪৯। চাঁদা

## দক্ষিণ ২৪ পরগনা

### আলিপুর সদর

১। পুরন্দর
২। বিনয়পল্লী
৩। বাঁশদ্রোণী প্লেস
৪। বাঘাযতীন প্লেস
৫। মথুরাপুর
৬। সন্তোষপুর কোঅপারেটিভ
৭। অরবিন্দ বোস কলোনি
৮। প্রফুল্ল সেন উপনিবেশ
৯। রবীন্দ্রনগর কলোনি—৪
১০। মারাপোতা কলোনি
১১। সাহেব বাগান

১২। মৌশামারী

**ডায়মন্ড হারবার**

১৩। কৃষ্ণদাসপুর জয়শ্রী

## জেলা—নদীয়া

**নদীয়া সদর মহকুমা**

১। বনগ্রাম
২। কালীপুর
৩। উত্তর ভাট জঙ্গল
৪। দক্ষিণ ভাট জঙ্গল
৫। ধীরেন্দ্রনগর, সেনপাড়া, চরদিগনগর, করিমপুর
৬। সত্যনগর
৭। তারক নগর
৮। দুর্গাপুর স্বর্ণখালি
৯। তারকগঞ্জ
১০। তারকগঞ্জ বিলপুর
১১। আউদিয়া
১২। পুলখালি
১৩। বারুইপাড়া
১৪। বিরঞ্জননগর
১৫। চর স্বরূপগঞ্জ
১৬। গুদিগাছা
১৭। চরব্রহ্মনগর (উঃ)
১৮। চরব্রহ্মনগর (দঃ)
১৯। চরমাজদিয়া.(দঃ)
২০। চরমাজদিয়া (উঃ)
২১। গৌরানগর
২২। বাবলাবন
২৩। চর স্বরূপগঞ্জ (পূঃ)
২৪। চীটাগাং কলোনি
২৫। তারানগর
২৬। চর সাধুগঞ্জ
২৭। চর চাকুন্দি
২৮। নয়াচর
২৯। বল্লভপাড়া
৩০। বরচাঁদগড়
৩১। কাঠালবাড়িয়া
৩২। ডাক্কা
৩৩। পতিকাবাড়ি
৩৪। সত্যপুর
৩৫। কুবিরনগর
৩৬। নাকাশিপাড়া
৩৭। সোনাতলা ও চাঙ্গা
৩৮। ঢাকুলা
৩৯। কালীবশ
৪০। রাজাপুর
৪১। বাঁগারীয়া
৪২। সত্যপুর (আরপাড়া)
৪৩। খানজিপুর

**রানাঘাট**

৪৪। সান্যালচর
৪৫। কুস্তিপাড়া
৪৬। বেলাপাড়া
৪৭। গোবিন্দপুর

## জেলা—মুর্শিদাবাদ

**সদর মহকুমা**

১। হাফিনা ইন্দ্রনগর
২। সব্জিকাটরা প্রাইভেট
৩। শ্রীকৃষ্ণপুর
৪। সাবিত্রীনগর
৫। আমতলা ভরামারা
৬। লক্ষ্মী নারায়ণ—২
৭। লক্ষ্মী নারায়ণ—১
৮। বরিশাল (নবনগর) বেরহামপুর
৯। গিরিজাপাড়া (সৈদাবাদ)
১০। কুমার দুর্গানাথ
১১। হরিদাসবাটী প্রাইভেট
১২। কৃষ্ণমাটী
১৩। গোয়ালজান
১৪। রবীন্দ্রনগর
১৫। দহপাড়া

## জেলা—হাওড়া

**সদর মহকুমা**

১। মিরপাড়া এল, পি
২। সাবিত্রী এল, পি
৩। ভট্টনগর এল, পি
৪। লিচুবাগান সুকান্তনগর এল, পি
৫। গরিয়া রোড
৬। নিশ্চিন্দা কো-অপারেটিভ

৭। নেতাজীনগর এল, পি
৮। শেখপাড়া এল, পি
৯। পটুয়াপাড়া এল, পি
১০। খানজেদপুর
১১। কান্তাপুর
১২। শান্তিনগর

**জেলা—হুগলি**

**চন্দননগর**

১। শান্তিপল্লী
২। শান্তিনগর
৩। কমলপল্লী
৪। কানাইলাল নং—১
৫। পালপাড়া সদর মহকুমা
৬। ল্যান্ড-অব্ সুনীলকুমার মুখার্জি
৭। ল্যান্ড-অব্ ভোলা নন্দী
৮। ল্যান্ড-অব্ মনোরঞ্জন নন্দী
৯। ল্যান্ড-অব্ করুণা পাইন
১০। ল্যান্ড-অব্ নির্মল সুন্দরী
১১। শিবপুর ময়রাপাড়া কলোনি
১২। শিবপুর কলোনি
১৩। আমতলা
১৪। নফাই পল্লী
১৫। শিবতলা
১৬। আঠারবিঘা কলোনি
১৭। ল্যান্ড-অব্ সুভাষ দাস

**শ্রীরামপুর মহকুমা**

১৮। তারাপুকুর
১৯। পদ্মবটী

**জেলা—বর্ধমান**

**বর্ধমান সদর মহকুমা**

১। আমবাগান
২। নীলপুর
৩। কাঞ্চননগর
৪। বিজয়নগর
৫। উদয়পল্লী
৬। আলীপুর
৭। মোবারকপুর কলোনি
৮। বৈদ্যডাঙ্গা কোঅপারেটিভ
৯। রসুলপুর পশ্চিমাড়া
১০। বসতপুর
১১। লক্ষ্মণগাঙ্গ
১২। অরগ্রাম
১৩। দেবপুর

**আসানসোল মহকুমা**

১৪। গোপালনগর
১৫। বিরুদিহা

**কালনা মহকুমা**

১৬। জাপত কলোনি
১৭। কাটাগঙ্গা
১৮। যোগীপাড়া
১৯। ফড়িংগাছি
২০। কেশবপুর
২১। কৃষ্ণদেবপুর
২২। ধাত্রীগ্রাম বসাকপাড়া
২৩। নদাই কলোনি
২৪। শাষপুর
২৫। ভাতশালা
২৬। রাজপুরা
২৭। চম্পাহাটী
২৮। শ্রীরামপুর
২৯। চক্রহাটপুর
৩০। নসরৎপুর
৩১। হাট সিমলা বসাকপাড়া
৩২। পশ্চিম নসরৎপুর

**কাটোয়া মহকুমা**

৩৩। পলুহাট
৩৪। মণ্ডলহাট
৩৫। ইচাইহাট
৩৬। চরাপতাই হাট
৩৭। গাজাপুর
৩৮। চর বিষ্ণুপুর
৩৯। সাঁকাইল
৪০। উধারণপুর
৪১। বেনেপাড়া ইনায়েতপুর
৪২। নৈহাটি

**জেলা—মেদিনীপুর**

**সদর মহকুমা**

১। ধলবালুন
২। বনপাটনা
৩। কিউকোতা

**জেলা—বীরভূম**

১। সৎসংঘ

**জেলা—জলপাইগুড়ি**

**আলিপুর দুয়ার**

১। অরবিন্দনগর
২। সূর্যনগর
৩। সুভাষপল্লী
৪। ফালাকাটা
৫। বীরপাড়া

**সদরমহকুমা**

৬। আম্‌বরী ফালাকাটা
৭। শহীদগড়
৮। হাসপাতাল পাড়া
৯। সুভাষনগর
১০। দেবীনগর
১১। আনন্দনগর
১২। মাধবডাঙ্গা কলোনি
১৩। বশিলারীডাঙ্গা এগ্রিঃ
১৪। ভক্তিনগর নং—১
১৫। ভক্তিনগর নং—২
১৬। নারায়ণপুর
১৭। গোমিরা পারা ঘোরাদেও, সরকারপাড়া, পাথনপাড়া, মালকানিপাড়া
১৮। শিংগিমারী

**জেলা—কুচবিহার**

**সদর মহকুমা**

১। টাফিমারী কলোনি
২। নাধাফেলা কলোনি
৩। রামপুর
৪। মহিসকুচি
৫। জালদোহা
৬। ফেরসাবেরি
৭। ভানুকুমাব
৮। বলরামপুর
৯। আন্দরমফুলবরী
১০। হলদিবাড়ি মিডিল ক্লাস
১১। বিজয়নগর
১২। তিস্তানগর
১৩। উপান চাওনরিক
১৪। ১২ কলোনি (মাথাভাঙ্গা)
১৫। গান্ধীনগর
১৬। বানেশ্বর
১৭। সাজেরপাড়া ঘরমা
১৮। সুভাষ কলোনি
১৯। খোলতা কলোনি
২০। ভারত কলোনি
২১। প্রবোধনগর কলোনি
২২। অলকপুরী কালনা মহকুমা
২৩। বিবেকানন্দ কলোনি
২৪। কোদালদহ—২
২৫। গোপালনগর বলাসি কলোনি
২৬। দারিবোধ কলোনি

**জেলা—মালদা**

**সদর মহকুমা**

১। আসরফপুর
২। পার্বতীডাঙ্গা
৩। দেরলা
৪। মৈভিটা
৫। আরাগাছি
৬। তেলনাই
৭। ভুসাডাঙ্গা
৮। নীলনগর
৯। বাচাহার
১০। বুড়িদহ
১১। কুতুব শহর
১২। আদিনা
১৩। বুনাইডাঙ্গা
১৪। কুপাদহ
১৫। সাপমারী
১৬। শোনঘাট
১৭। হাসপুকুর
১৮। ছোটপাথারি
১৯। রাখালপুকুর
২০। পারহবীনগর
২১। গাজিয়াপাড়া
২২। গান্ধীনগর
২৩। নতুন হৃষীপুর
২৪। সিরশি
২৫। বাবলাবন

২৬। বয়রাগাছি
২৭। বানিয়াল
২৮। কাগাসুরা
২৯। মশালদিঘী
৩০। অহোরাবাঁধ
৩১। কালীনগর
৩২। নীলনগর
৩৩। উপদলবিল